জনপদ জনপথ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

পরিবেশক :
নাথ ব্রাদার্স
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ :
১লা জানুয়ারী ১৯৫৮

প্রকাশক :
শ্রীপ্রণবকুমার ভট্টাচার্য ও
শ্রীপ্রদ্যোৎকুমার ভট্টাচার্য
হরিপাল, হুগলী

মুদ্রক :
হরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
১, রমাপ্রসাদ রায় লেন
কলিকাতা-৭০০০ ৬

সর্ববিধ সহায়তায় :
শ্রীদেবকুমার চট্টোপাধ্যায় ও
শ্রীসুধীরকুমার সামন্ত
সেওড়াফুলি, হুগলী

শ্রদ্ধেয় কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে—

(পুণার মুলামুঠা নদীর ধারে
সেই জ্যোৎস্না রাতটির স্মরণে)

লেখকের অন্যান্য বই

খরোষ্ঠী লিপিতে রক্ত
কিশোর রোমাঞ্চ অমনিবাস
হাওয়া সাপ
কঙ্কগড়ের কঙ্কাল
গোপন সত্য
অলীক মানুষ
বসন্ত তৃষ্ণা
রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র
স্বপ্নের মতো
আনন্দমেলা
নিশিলতা
মায়ামৃদঙ্গ
কালো বাকসের রহস্য
মাকাসিকোর ছায়ামানুষ
বনের আসর
নিঝুম রাতের আতঙ্ক
টোরা দ্বীপের ভয়ঙ্কর
ভয়ভুতুড়ে
কালো মানুষ নীল চোখ
হাট্টিম রহস্য
রহস্য রোমাঞ্চ
সবুজ বনের ভয়ঙ্কর

জনপদ জনপথ

যে মেয়েটি দরজা খুলে দিল, তারপর সোজা বলল—কাকে চাই? জামাই-বাবুকে তো? নেই। কেন নেই, কোথা গেছে, অত খবর আমি রাখিনে—সে পুরোপুরি আলোর মধ্যে রয়েছে—আর চন্দন রাস্তায়। ছোট রাস্তা—পিঠের দিকে টিমটিমে বালবটা জ্বলছে অনেক উঁচুতে—তাই চন্দনের মুখটা দেখা যাচ্ছিল না। এত ঝিমঝিম নির্জনতা চারপাশে! ঝোপঝাড় গাছপালার ফাঁকে একতালা ঘরবাড়ি। অনেক খুঁজে পরেশদার বাড়িটা পাওয়া গেছে। রিকশোওলা খুব মেহনত করেছে বলতে হয়। তাকে বখ্‌শিশ্‌ ও কৃতার্থতাসূচক বিদায় দিয়ে দরজায় কড়া নেড়েছিল চন্দন। তারপর তো এই সম্ভাষণ!

মেয়েটিকে চেনা চেনা লাগছিল। পরমুহূর্তে চন্দন ফিক্‌ করে হেসে উঠল। ...রুমা না? আমি চন্দনা—জিয়াগঞ্জ থেকে আসছি।

রুমা একটু ঝুঁকে ওকে দেখে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে ফেলল।...চন্দনদা! কী অবাক! আমি ভাবলাম...কাথাটা শেষ না করে সে মুখ ঘুরিয়ে অস্ফুট চেঁচাল, দিদি, দিদি! কে এসেছে দেখে যাও। জিয়াগঞ্জের চন্দনদা!

বাড়ির ভিতর চকিতে একটা দুদ্দাড় ব্যস্ততা টের পাওয়া যাচ্ছিল। অদ্ভুত সুর করে যে ছেলেমেয়েরা এতক্ষণ পড়া মুখস্থ করছিল, বোঝা যায় ওরাই দৌড়ে আসছে। রুমার পিঠের কাছে চারটে মুণ্ডু দেখা গেল। তাদের ভিড় ঠেলে চন্দন রুমার পিছনে বাড়ি ঢুকতেই স্নেহধারা বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বলল, কে, চন্দন? এস এস। ভালো আছো তো? বাড়ির খবর ভালো? আজই তোমাদের কথা ভাবছিলাম।...

স্নেহবউদির গলার স্বরটা কেমন নিস্তেজ মনে হল চন্দনের। বারান্দায় মোটামুটি উজ্জ্বল আলো। ওকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। চেহারাতেও কেমন যেন ময়লা জমেছে। একটু রোগা হয়ে গেছে না স্নেহবউদি! চন্দন কোনদিন তাকে প্রণাম করেছে কিনা মনে পড়ছিল না সে মুহূর্তে, তাহলেও ঢিপ করে একটা প্রণাম করে বসল। পরেশদার সঙ্গে চন্দনের বয়সের তফাত বড়জোর দু-তিন বছর। বিয়ে করলেই চন্দনেরও এমন একগুচ্ছের ছেলেমেয়ে হয়ে যেত নিঃসন্দেহে। পরেশদা হুট করে সাত তাড়াতাড়ি কেন বিয়ে করে বসেছিল, আজও চন্দনের কাছে তা একটা রহস্য। সে বলল, হঠাৎ এসে পড়লাম—একটা টেলিগ্রাম পেয়ে।

স্নেহধারা বলল, টেলিগ্রাম! কিসের টেলিগ্রাম? কে করল?

চন্দন বারান্দার খালি তক্তাপোষে ফোলিও ব্যাগটা রেখে বলল, চাকরির ইণ্টার-ভিউ। অমনি ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে এলাম। বাপ্‌স্‌, অনেক অচেনা জায়গায় গেছি—এমন হয়রান কক্ষনো হইনি। কখন থেকে ঘুরছি, বাড়ির হদিস মেলে না। যাকেই জিগ্যেস করি, বলে—চিনিনে। ব্যাপার কি বউদি? পরেশদার মতো

মার্কামারা লোক এখানে এখনও অচেনা! ভাবতে অবাক লাগে সত্যি!

স্নেহধারা কাকে ডেকে বলল, বালতি আর মগটা এই সিঁড়ির কাছে এনে দে। আর রুমা—থাক, লতুকেই পাঠাচ্ছি। লতু, শুনে যা।

বলে সে চন্দনের দিকে ঘুরল। চোখে এবং ঠোঁটের কোণে কী যেন ঝিলিক দিচ্ছিল. চন্দনের চোখ এড়াল না—তার অবাক লাগল একটু। স্নেহধারা বলল, হ্যাঁ—মার্কামারা লোক বলেই তো কেউ বাড়ি দেখাতে চায় না। ওঠ, হাতমুখ ধুয়ে ফেল। রুমা, বাইরের ঘরটা খুলে দে। চন্দন, তোমার কাপড় ছাড়ার দরকার হলে ওঘরে যাও।

রুমা বারান্দার শেষ প্রান্তে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, পরশু থেকে আলোটা জ্বলছে না। মোমবাতি চাই যে! লতুকে দুটো মোমবাতি আনতে বলো।

স্নেহধারা বলল, তোদের যত পেট ব্যথা—অসময়ে! কেন, কালই তোকে বললাম সুধীর ঠাকুরপোকে ডেকে নিয়ে আয়। লাইনটা দেখে দেবে—কোথায় কী হল।

রুমা অন্ধকার ঘরটার দরজা খুলে দিয়ে সরে আসছিল। বলল, দুদিন দুবেলা করে চারবার গেছি। সুধীরটুধীর কারো পাত্তা নেই। মোড়ে যে মিস্ত্রিটা ফ্যান সারায়, সে আসবে বলেছিল—

স্নেহধারা বলল, থাক। অত খুঁটিয়ে কিছু শুনতে চাইনি। আরে! লতু, ইনতু! তোরা কাকুকে প্রণাম করলিনে? আয় এদিকে।

আট-ন'বছরের দুটি ছেলেমেয়ে পায়ে পায়ে জড়াজড়ি করে এসে ঢিপ করে প্রণাম সেরেই ঘরে ঢুকছিল। স্নেহধারা ধমক দিল, কাজ আছে। এদিকে আয়। আর সনতু, মানতু। তোমরাও এস—এস। প্রণাম করো কাকুকে।

চার-ছয় বছরের আর দুটি ছেলেমেয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। দুজনেই দুটো পেনসিল চিবোচ্ছে। তারা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছিল আগন্তুককে। স্নেহধারা ওদের হাত ধরে টেনে প্রণাম করিয়ে ছাড়ল। চন্দন হো-হো করে হেসে বলল, কী-মুশকিল!

স্নেহধারা বলল, মানুষকে শ্রদ্ধাভক্তি করতে যদি এখন থেকে না শেখাই, শিখবে কবে? যত দিন বেঁচে আছি, আমি তো চেষ্টার ত্রুটি করব না। মলে তখন ওদের বাবার হাতে পড়বে—বাবা তখন নিজের পথে চালাতে চেষ্টা করবে নিশ্চয়। মানুষকে বলতে শেখাবে, গাছপাথর—যাক্ গে। হাতমুখ ধোও। এসেছ, এত মনে জোর পেলাম ভাই!

স্নেহধারা লতু-ইনতুর হাত ধরে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। চন্দন কেমন অস্বস্তিতে পড়ে গেল। একটা কিছু নেপথ্যে যেন রয়ে গেছে—আঁচ করতে পারছে না। পরেশদা একটু উদ্দাম স্বভাবের মানুষ ছিল, সেটা ঠিক। জিয়াগঞ্জ ছেড়েছে আজ আট-ন বছরেরও বেশি। এখানে কী একটা ব্যবসা করে অবস্থাও নাকি কিছুটা গুছিয়েছে। চিঠিপত্রে মধ্যে মাঝে এই সব খবর একটু আধটু থেকেছে। আজ এখানে এসে পড়ে ঘরবাড়ি ও ছেলেমেয়েদের পোশাক-আসাক দেখে আঁচ করা যায়, খবরটা বরং কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভাবা যায় না, পরেশদার মতো লোকের এমন একখানা বাড়ি হয়েছে। তবু কোথায় একটা কিন্তু এসে দাঁড়াচ্ছে বারবার।

চন্দন ডাকলে, রুমা, শোন।

রুমা কাছে এসে হাসিমুখে দাঁড়াল। সে এতক্ষণ স্থির তাকিয়ে চন্দনকে দেখছিল।

চাপা গলায় চন্দন বলল, ব্যাপার কী রুমা? পরেশদা কোথায়?

রুমা ভুরু কুঁচকে অন্য দিকে তাকিয়ে জবাব দিল, কে জানে! তিন দিন ধরে বাড়ি নেই।

চন্দন অবাক হয়ে বলল, বাড়ি নেই মানে? কোথায় গেছে?

রুমা মুখ নামিয়ে বলল, কিছু তো বলে যায় না জামাইবাবু। হুট করে যায় আবার হুট করে আসে। সেও কোন সময়ের ঠিক নেই—হয়তো দুপুর রাত্তিরেই এসে হাজির হল।

চন্দন অগাধ জলে পড়ে গেল।...কেন? পলিটিক্যাল অ্যাবস্কণ্ডার নাকি?

রুমা চাপা হেসে ফেলল।...যা! ও কিছু না। পরে শুনবেখন। দিদি বলবার জন্যে ধড়ফড় করছে এতক্ষণ।..চন্দনদা, বরং এক কাজ করো। এখানেই কাপড় ছেড়ে ফেলো না। আমি কাটছি।

চন্দন বলল, খুব—খুব যে মুখ খুলেছে এখানে এসে! এ্যাঁ?

রুমা আলোয় ভরা ঘরটায় ঢোকার মুখে ঘুরে আর একবার মৌন হেসে গেল। ব্যাগ খুলে লুঙ্গি বের করতে করতে চন্দন কিছু পুরনো কথা ভাবছিল। জিয়াগঞ্জে থাকত যখন, তখন রুমার বয়স দশ থেকে বারো বড় জোর। অনাথা এই শালীটির দায়ভার পরেশদা হাসিমুখে নিয়েছিল মাথায়। অথচ তখন কী দুরবস্থা পরেশদার! এঁদো গলির স্যাঁতসেঁতে ঘরে সারাদিন বসে হারমোনিয়াম মেরামত করত। সাউ অ্যাণ্ড সন্সের বাজনার দোকানের ঠিকে কাজের এক সামান্য মিস্ত্রী ছিল সে। দেখলে দুঃখ হ'ত ভারী। আরো নানারকমের কাজকর্ম করেছে পরেশদা। বই বাঁধতে পারত। হ্যাসাগ স্টোভ গ্রামোফোন সারাতে জানত। এমন কি শেষ অব্দি কিছুদিন ছায়া সিনেমার অপারেটারের কাজও করেছিল। কী কথায় ম্যানেজারকে মেরে বসল। তার ফলে চাকরিটা গেল। অত মাথা গরম হলে গরীব মানুষের চলে না। অথচ পরেশদার রক্তে কী একটা ছিল।

চন্দনের সঙ্গে কোন আত্মীয়তার সম্পর্কই অবশ্য নেই। নেহাত পাড়ার ছেলে—মুখোমুখি আজন্ম বাস। তবে শুধু চন্দনের নয়, পরেশদা ছোট্ট শহরটার আরো অনেক ছেলেরই দাদার অধিকার কাড়তে পেরেছিল। ছেলেদের মধ্যে ঝঞ্ঝাট লাগলে সেই ছিল চরম মধ্যস্থতা করার মতো যুবক। সবাই তাকে মানত। শ্রদ্ধা করত। জিয়াগঞ্জ ছেড়ে ভাগ্যের খোঁজে বেরিয়ে পড়ার সময় তাকে দল বেঁধে সবাই ট্রেনে তুলে দিয়েছিল। বলেছিল, চিঠিপত্র দেব বরাবর, জবাব দিতে ভুলো না পরেশদা। কেউ বলেছিল, সব সময় গিয়ে জ্বালিয়ে আসব পরেশদা।

কেউ চিঠি লেখেনি। কেউ আসেনি রূপপুর চটিতে। কেবল চন্দন বাদে। চন্দনের মনে পরেশদা বাদেও আরো দুটো স্মৃতি দুর্মর ছিল—সে হচ্ছে স্নেহধারা বউদি আর তার হাসিখুশি চঞ্চল বোন, এই রুমা। ফুটবল খেলে এসে উপুড়

হয়ে শুয়েছে চন্দন। জানালা দিয়ে ডেকেছে· রুমা! এই রুমকি! ব্যস, অমনি রুমা হাজির। এক ঘণ্টা পিঠে কোমরে পায়ে দাপাদাপি করে আরাম দিয়ে গেছে বালিকা রুমা। গঙ্গায় ওকে দু'হাতে শূন্যে তুলে সাঁতার কেটেছে চন্দন। রাগ করলে সন্দেশ খাইয়েছে। রুমা কিশোরী হতে হতে জিয়াগঞ্জ ছেড়ে চলে গেল জামাইবাবুর সঙ্গে। তারপর কত দিন শূন্য আর নিঃসঙ্গ হয়ে উঠেছিল চন্দনের জীবন। আসলে সবই অভ্যাস। একটা অভ্যাস ছেড়ে ফের নতুন একটা অভ্যাসে ধাতস্থ হলেই ফের সব ঠিকঠাক হয়ে যায়। চন্দনের আর কোন কষ্ট হয়নি। কেবল স্মৃতি—স্মৃতি ভারী চক্রান্তকারী।

লতু-ইনতুরা হই হই করে এসে গেল, মোম এনেছি! মোম এনেছি!

রুমা বেরিয়ে এসে মোম দুটো হাতে নিয়ে বলল, এ কী রে! এতটুকুন! এ দিয়ে কী হবে? যা—ফেরত দিয়ে বড়গুলো আন্।

চন্দন হাত মুখ ধুতে ধুতে বলল, থাক্। ওই হবে। ইলেকট্রিরির হালহদিস একআধটু জানি। চলো, কী হয়েছে দেখছি।

একটু পরেই স্নেহধারা এল। হাতে প্লেট আর জলের গ্লাস। বলল, ও বেলা এলে ইলিশ খাওয়াতে পারতাম। খুব সস্তা এবার।

চন্দন বলল, ওই যাঃ। আসবার সময় একটা ইলিশ আনলেও পারতাম। ঘাট পেরোনর সময়—

রুমা জিভে জল টেনে বলল, ই-স্‌স্! জিয়াগঞ্জের গঙ্গার ইলিশ! ফেট্! তুমি করেছ কী!

স্নেহধারা বলল, তাই তো! জিয়াগঞ্জের কথা ভুলেই গেছি—কত বছর হয়ে গেল। আচ্ছা চন্দন, সেই সরলা-কমলার বিয়ে কোথায় হল? পিনাকীবাবুর মা বেঁচে আছে তো? আর—সেই যে ঘাটের ধারে বাড়ি, রিটায়ার্ড সাব-জজ ভদ্রলোক—সেই যে গো, মুসলমান ফ্যামিলি, মেয়েটার নাম কী যেন ছাই...

রুমা বলল, নাও—এখন সারা শহরের খবর দাও ওকে! দিদি, চন্দনদা লাইন সেরে দেবে বলছে।

যেন কথাটা চন্দনকেই মনে করিয়ে দেওয়া। চন্দন ঢক্‌ঢক্ করে জল খেয়ে উঠে দাঁড়াল।...হ্যাঁ দিচ্ছি।

স্নেহধারা আঁতকে উঠে বলল, না না! কী হয়ে আছে কোথায়—এক্ষুনি বিপদ হয়ে যাবে। ছেড়ে দাও। তুমি বরং আমার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নাও ভাই। রুমা, ওকে নিয়ে যা।

চন্দন পা বাড়িয়ে বলল, ভেবো না। পরেশদার মতো...হঠাৎ হেসে উঠল সে। বউদি, তোমার মনে পড়েছে? সেবার পুজোর প্যাণ্ডেলে আলোর ভার নিয়েছিল পরেশদা—তারপর ধুন্ধুমার অগ্নিকাণ্ড! কী বিপদ!

স্নেহধারাও হাসল।...হ্যাঁ, গোঁয়ার লোকেরা তো অমনি করে পরের বিপদ ডেকে আনে—নিজেও বিপদে পড়ে যায়।

বাগ্নাঘরের দরজায় কে একজন ছোক্‌রা মতো উঁকি মেরে বলল, জল ফুটছে বউদি।

স্নেহধারার যেন নড়তে ইচ্ছে নেই। বলল, চা ফেলে নামিয়ে রাখ্। যাচ্ছি।

আরে! সত্যি লাইন সারবে নাকি? বসো, বসো। অন্দুর থেকে ক্লান্ত হয়ে এলে। রুমাটাকে নিয়ে আর পারা যায় না। একটু হুজুগ পেলেই হল।...লতু ইনতু! কী হল? পড়া শুনতে পাচ্ছিনে যে।

চন্দন দেশলাই বের করে রুমার হাতের সরু মোমটা জ্বালিয়ে দিল। সে সময় সে লক্ষ্য করল, রুমা তাকে দেখছে। কী দেখছে রুমা? শরীরের বা চেহারার বদ-বদল? মিলিয়ে নিচ্ছে আগের সেই চেনাটার সঙ্গে? হয়তো তাই। একটু চমক খেলে গেল চন্দনের মনে। রুমা এখন প্রায় যুবতী। বয়স কত হবে? আঠারো-উনিশ তো বটেই। রুমা তাকে কোন চিঠি লেখেনি কোনদিন। তবে তার খবর পরেশদার চিঠিতে থাকত।..

দরজার কাছে স্নেহধারা দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকার ঘরে সামান্য মোমের কাঁপন্ত আলোয় খুব ঘনিষ্ঠ দাঁড়িয়ে ওরা দুজনে বোর্ডটা দেখছে। স্নেহধারা বলল, আলোর শিস ঢুকছে নাকে—একটু তফাতে ধর না!

চন্দন বলল, ঠিক আছে। বউদি, স্ক্রুড্রাইভার আছে?

রুমা অস্ফুট হাসল। প্রাক্তন মিস্ত্রীর বাড়ি—থাকা উচিত ছিল নিশ্চয়। কিন্তু দুঃখিত—নেই। তবে ছুরি আছে। দেব?

হঠাৎ কেন কে জানে চন্দন চমকে উঠল। স্নেহধারা ডাকল, গাঁদা, রান্নাঘরের তাকে একটা ছুরি আছে দিয়ে যা।...

দোষটা সুইচেরই। একটা তার সবুজ হয়ে জ্বলে গেছে। স্নেহধারা চায়ের কাপ হাতে যখন ঢুকল তখন ঘরে উজ্জ্বল আলো। রুমা জানালা খুলতে খুলতে বলল, খুলে তো দিচ্ছি। দারুণ মশা কিন্তু। জঙ্গল কেটে শহর বসছে, মশাদের পুনর্বাসন হচ্ছে না। চন্দনদা, কী চাকরি তা তো বলছ না? মসকুইটো রিহ্যাবিলিটেশনের নয় তো?

তিনজনেই হাসল। স্নেহধারা বলল, সেও একটা খুলে ফেলবে হয়তো। যা হচ্ছে। চন্দন, এবার তোমার চাকরির খবরটা শুনি! বলো।

চন্দন একটু চুপ করে থেকে বলল, বড্ড অদ্ভুত ব্যাপার। লোকাল কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, একজন চালাক চতুর সুশিক্ষিত ম্যানেজার দরকার—কমার্সে ডিগ্রী থাকলে ভালো হয়। তাছাড়া বিজনেস ম্যানেজমেণ্ট কোর্স যারা শেষ করেছে, তারাই প্রেফারেন্স পাবে। মাইনে মোটামুটি ভালোই। রুমা, এখানে আলফা ডিস্ট্রিবিউটার্সটা কোথায় জানো?

রুমা ঘাড় নাড়ল।...না। দিনে দিনে কত সব ভুতুড়ে কনসার্ন ব্যাঙের ছাতার মত গজাচ্ছে এখানে। অত খবর কে রাখে!

স্নেহধারা বলল তোমার দাদা অবশ্য চেনে। আসুক—ভেবো না।

চন্দন বলল, বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল মাস আষ্টেক আগে। তক্ষুণি দরখাস্তও করে বসলাম। একবার ভাবলাম, পরেশদাকে জানাই—পরে ঠিক করলাম থাক্‌গে। চাকরি তো হবেই না—যা চাইছে তেমন কোয়ালিফিকেশন তো আমার নেই-ই।... হঠাৎ আজ সকালে জরুরী টেলিগ্রাম হাজির—এক্ষুণি চলে এস।

রুমা বলল, টেলিগ্রামটা কই?

ব্যাগে আছে। ব্যাগটা নিয়ে এস না লক্ষ্মীটি।... বলে চন্দন ঘরটার ভিতর

এতক্ষণে চোখ বুলালো। খুব বেশি দিনের বাড়ি নয়। দেয়ালগুলো ধব্-ধবে সাদা, মসৃণ, সুদৃশ্য।

দেয়ালে একটা ক্যালেণ্ডার ঝুলছে। আরে! কোথায় বসে আছে সে? আসলে জিয়াগঞ্জের পরেশদা ও তার ঘরের স্মৃতি এত চেপে বসেছিল চোখে, যে বর্তমানটা খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছিল না। সে গদীআঁটা সোফায় বসে রয়েছে। তার সামনে বসে আছে স্নেহ বউদি। রুমা এতক্ষণ বউদির পাশে হাতলে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো-বসার মাঝামাঝি ভঙ্গীতে অবস্থান করছিল। এমন চমৎকার বেতের সোফাসেট পরেশদার বাইরের ঘরে! শোকেসে পুতুলের জগৎ! কোণে কারুকার্যকরা বাদামী টুলের ওপর উড়ুক্কু বক। একদিকে ছোট্ট তক্তপোশটায় গদী—চমৎকার চাদর বিছানো. তার ওপর দুটো তাকিয়া। অন্য কোণে উঁচু টুলের ওপর সুদৃশ্য ঢাকনা—ওপরে ফুলদানিতে প্লাস্টিকের ফুল।

একটু অস্বস্তিতে ফের আচ্ছন্ন হল চন্দন। রুমা ব্যাগটা এনে টেবিলে রেখে বলল, থাক্। আর দেখে কাজ নেই। সকালে আমাকে নিয়ে বেরোবে। খুব বড় জায়গা তো নয়—মোটে এক রত্তি। খুঁজে বের করা যাবে।

স্নেহধারা উঠে দাঁড়াল।...রাত্তিরে আটা না ভাত খাও তোমরা?

চন্দন বলল, কিচ্ছু ঠিক নেই। আর আমি তো সর্বভুক, তা জানো বউদি।

স্নেহধারা বলল, রুমা, আয় তো। ময়দা মাখতে দিয়েছি। আমি সেঁকব, তুই বেলে দিবি।

রুমা বুড়ো আঙুল নেড়ে বলল, উঁহু। আমার পড়া ডিসটার্ব হয়ে গেল তখন থেকে। আমি ও ঘরে চললাম। তুমি গ্যাঁদাকে নিয়ে লেগে যাও না!

সে সত্যি সত্যি কেটে পড়ল। স্নেহধারা হাসতে হাসতে চলে গেল। বলে গেল, শুয়ে হাত-পা ছড়াও ততক্ষণ। গরম গরম সেঁকে দিচ্ছি। ঘুমিয়ে পড়ো না কিন্তু।

ঘরে একা বসে রইল চন্দন। ঘরের ভিতরটা অনেকক্ষণ ধরে দেখে নিল। পরেশ-দার এই সচ্ছলতার উৎস হাতড়াচ্ছিল হয়তো। কিন্তু একটু পরেই দেখল, ঘুরে-ফিরে কেবল রুমার কথাই তার মাথায় আসছে। রুমা—সেই রুমা! আজ চাঞ্চল্য জাগাতে পারছে তাঁর মনে, এটাই আশ্চর্য! আর সেই সঙ্গে কোত্থেকে হুড় হুড় করে ঝড়ো হাওয়ার মতো অপরিচিত একটা আশা তাকে ঘিরে ধরছে। ঘুরপাক খাচ্ছে। না—রুমার সঙ্গে প্রেম ভালোবাসার আশা নয়—সেটা এক রকম ভাবাই যায় না। সেই একরত্তি মেয়েটি আজ এত বড় হয়েছে, তাকে পুরুষের চোখে দেখতে লজ্জা করছে তার। কিন্তু খালি মনে হচ্ছে চাকরিটা হবে। হবে। তারপর সেও পরেশদার মতো দিদি ভাই-বোন মা বাবা সবাইকে জিয়াগঞ্জের সেই ঘিঞ্জি গলি থেকে এখানে এনে তুলবে। তারও ভাগ্যে এসে যেতে পারে এমনি চমৎকার ঝকঝকে ঘর, মসৃণ দেয়াল আর উজ্জ্বল সিলিং। সন্ধ্যা রাত্রি হলেও বাস থেকে দেখেছ এখানে আকাশটা বিশাল। চারদিকে যথেষ্ট খোলামেলা। অনেক আলো আছে। বাতাস আছে। নতুন জীবনের স্পন্দন আছে। এখানে থাকতে থাকতে মায়ের হাঁপানিটা সেরে যেতেও পারে। বাবার খিটখিটে মেজাজও ভালো হতে পারে। রুমা নিশ্চয় এখন কলেজে পড়ে। স্কুল কলেজ আছে বোঝা যাচ্ছে। দিদির কি কোন

চাকরি মিলবে না এখানে? দিদির ভাগ্য—ত্রিশ বছর বয়সের শিক্ষিকা, অযথা স্ক্যাণ্ডালে চাকরিটা গেল তো গেলই। দু'বছর ধরে বসে আছে—নিষ্কর্মার ধাড়ি হয়ে গেছে একেবারে। প্রাইভেট টিউশানিও একটা জোটাতে পারে না। হয়তো পারতো—ওই স্ক্যাণ্ডাল!...যাক্‌গে। এখন নিজের এটা জুটে গেলে মঙ্গল।

চন্দন মশার কামড় টের পাচ্ছিল। কী ঘোর স্তব্ধতা এখানটায়! সে উঠে গিয়ে জানালার ধারে দাঁড়াল। গাছপালার ফাঁকে ইতিউতি আলো জ্বলছে। একটা ব্যাপক অন্ধকারের অংশে সামান্য কিছু কারুকার্য যেন। দূরে মোটর-গাড়ির আওয়াজ শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে। ওদিকে আকাশটা একটু উজ্জ্বল। ওখানেই তবে সেই চৌরাস্তা—যেখানে বাস থেকে নেমেছিল। রিকশোওলা বেশ অমায়িক লোক। বলছিল, দেখতে দেখতে কী সব হয়ে গেল বাবু। মাঠের মধ্যে উড়ে এসে বসল এক যাদুপুরী। ছিল একটা ছোট্ট চটি। মানসুড়েদের আড্ডা। ছেলেবেলায় দেখেছি, একা কেউ সন্ধ্যেবেলা চৌরাস্তা পেরিয়ে পারত-পক্ষে হাঁটত না। যারা চটিতে রাত কাটাত, তারা থাকত দল বেঁধে। অস্ত্রশস্ত্র থাকত সঙ্গে। পরে অবিশ্যি পুলিশ চৌকি বসল। তাও উপদ্রব।

আর ওদিকের জঙ্গলটা দেখেননি বাস থেকে? দীঘির পাড়ে? দেখেছিল হয়তো। রিকশোওলা বলছিল, ঠাহর করলে দেখতে পেতেন, মধ্যিখানে গাছের ডগায় লিশান উড়ছে। ওই হল গোলাপ শা'র দরগা। সে অনেক কথা বাবু! গৌড়ের বাদশার গুরু তিনি। একা বাস করতেন দীঘির পাড়ের জঙ্গলে। ভয়তরাস নেই। সাধকের মন সাধনা নিয়েই থাকে। একদিন হল কী...

কী হল, আর শোনা যায়নি। পরেশদার বাড়ি এ লোকটা জানত না। তবে ভাল চেনে তাকে। নাম শুনেই বলেছিল, কলোনীর ভিতর কোথায় থাকেন যেন ওরে বাবা, তাঁর লোক আপনি! আসুন, লিয়ে যাই। বাবুকে বলবেন, মঙ্গল—মিঠিপুবের মঙ্গল বাউরির রিকশোয় এসেছি!...

স্নেহধারা ডাকছিল, চন্দন, ও চন্দন! এবার এস ভাই! রাত বেড়ে গেল।

বারান্দায় আসন পেতে দিয়েছে। খেতে খেতে চন্দন বলল, রুমা কই?

স্নেহধারা বলল, নির্ঘাৎ ঘুমিয়ে পড়েছে। যত ধিঙ্গি হচ্ছে, তত বদঅভ্যাস বাড়ছে মেয়ের। রুমা, ঘুমোলি নাকি?

রুমার সাড়া এল না। চন্দন বলল, আর—ওরা সব, ওদের খাওয়া হয়েছে?

স্নেহধারা বলল, নাঃ। দিচ্ছি।

ঘুমিয়ে পড়েনি তো?...চন্দন কান পেতে ওদের পড়াশোনার সেই আওয়াজ শোনার ভঙ্গী করল।...কই, সব তো চুপ। বউদি আমি খাচ্ছি। ওদের দ্যাখো।

স্নেহধারা উঠে দাঁড়াল।...এক্ষুণি ঘুমোবে কী! মোটে তো আটটা। দেখছ কাণ্ড? এতটুকুন ফাঁক পেলেই স্বভাব সব ফেটে বেরোবে। রুমা! লতু! ইনতু!

কতক্ষণ পরে ঢুলুঢুলু চোখে বিছানা পেতে মশারি টাঙিয়ে প্রায় টলতে টলতে রুমা বেরিয়ে যাচ্ছে। চন্দনের একটা কথারও জবাব দ্যায়নি। হয়তো ঘুমের ঘোরেই এ সব করে গেল। হাসতে হাসতে চন্দন যখন মশারি গুঁজে দিচ্ছে বিছানায়, স্নেহধারা বাইরে দাঁড়িয়ে বলে গেল, দরজা বন্ধ করে দাও ভাই। ভীষণ চোরের জায়গা!..

নতুন জায়গায় গিয়ে পড়লে চন্দনের একটুও ঘুম হয় না। তার ঘুম আসছিল না। সবে হেমন্ত শুরু হয়েছে। একটু একটু হিম পড়ছে। একবার ঘুমিয়ে পড়েছিল—স্বপ্নও দেখছিল, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল তার। বেশ শীতবোধ হচ্ছে। জানালাগুলো বন্ধ করে দেওয়া দরকার। ক্লান্তির আলস্যে তার উঠতে ইচ্ছে করছিল না। পায়ের দিকটায় রুমা কোন চাদর রেখে গেছে কিনা কে জানে। পা বাড়িয়ে টের পেল না সে। তখন উঠল। চারিদিকে ঘোর স্তব্ধতা। কদাচিৎ চাপা গুরগুর আওয়াজ উঠে ফের মিলিয়ে যাচ্ছে। হাইওয়েতে গাড়ি যাচ্ছে হয়তো। মশারি থেকে বেরোনর মুহূর্তে কোথাও একটা শব্দ হল কিসের। চাপা কথাবার্তা শুনতে পেল। শব্দটা বাড়ির ভিতর থেকে আসছিল। হঠাৎ চন্দনের মনে পড়ল, তখন আরও একবার ওই রকম আওয়াজ যেন শুনেছিল। হয়তো ঘুমের আচ্ছন্নতার মধ্যেই। দরজা খোলার শব্দ, কোন চেনা কণ্ঠস্বর। পরেশদা এসেছে নাকি?

সে মেঝেয় গিয়ে দাঁড়াল। সিগ্রেট খাবার ইচ্ছে করছিল। হাত বাড়িয়ে বালিশের পাশ থেকে সিগ্রেট দেশলাই নিল। তারপর টের পেল, হ্যাঁ—পরেশদারই গলা।

..আঃ, কী হচ্ছে! ছাড়ো, পা ছাড়ো বলছি!

...না না। আমার গলা টিপে মারো, তারপর যেখানে খুশি যেও।

..বিলু, জুলুম করো না! আঃ, কী হচ্ছে! ওরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে—

...ওঘরে চন্দন রয়েছে—আঃ, ছি ছি ছি!

...কেন তুমি এমনি করে রাতবিরেতে ঘুরে বেড়াবে? বলো—কী তোমার এমন কাজ যে ঘরসংসার ছেড়ে বাইরে রাত কাটাতে হয়?

...ঘরসংসার আমি দেখছি না তো কে দেখছে! বিলু দেরি হয়ে যাচ্ছে।

....দেখ, আমি সব বুঝি। সব জানি। আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবে না। আমার জিয়াগঞ্জের সেই এঁদো গলিই ভাল ছিল। কেন এখানে তোমার সঙ্গে এলাম গো!

বিলু—স্নেহধারা বউদির ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠার শব্দ হল। তারপর রুমার গলা শোনা গেল।..দিদি! ঘরে এসো বলছি। কেলেঙ্কারী করো না, রাতদুপুরে। চলে এস এক্ষুণি।

কান্নাব শব্দটা দরজা বন্ধ করার শব্দে চাপা পড়ল। একটুখানি নীরবতা। তারপর পরেশদাব ভারী গলা—রুমা, চন্দনকে বলিস, কাল দুপুর নাগাদ আলফাতেই আমার সঙ্গে দেখা হবে। তারপর ফের দরজা বন্ধ করার শব্দ। নীরবতা। দরজা বন্ধ করার শব্দ। এবং ফের নীরবতা। কার্তিকের শিশির হিম নক্ষত্র আর অন্ধকার, পোকামাকড়ের ডাক, রূপপুর চটি পেরিয়ে হাইওয়েতে দূরগামী ট্রাকের চলে যাওয়া—আর ঘুম এল না চন্দনের।

যখন এল, তখন নীলচে কুয়াশার গায়ে ভোরের আলতারঙ মৃদু আলো এসে লেগেছে।

দুই

জায়গাটা যত বড় ভেবেছিল, অল্প হেঁটেই বোঝা গেল তত বড় কিছু নয়। চারদিক থেকে চারটে রাস্তা একখানে এসে মিলছে। সেখানটা কেন্দ্র করে চারদিকে ছড়ানো ছিটানো বসতি গড়ে উঠেছে। কিন্তু কোথাও কোন সামঞ্জস্য নেই। নিঃসন্দেহে একটা টাউনশিপ—অথচ পিছনে কোন প্ল্যানিং ছিল বা আছে বলে মনে হয় না।

যতটুকু বোঝা গেল, আসলে এ ছিল একটা সুবিস্তৃত বাঁজা ডাঙা। প্রাগৈতিহাসিক যুগের কোন একটা পাহাড়কে যদি দুরমুশের ঘায়ে বসিয়ে দেওয়া যায়, এই রকম দেখাবে। চারদিকের চারটে রাস্তার প্রত্যেকটাই চৌমাথা থেকে যে-যার দিকে উতরাইয়ের ঢালুতে নেমে গেছে। তাই ওখানে দাঁড়ালে মোটামুটি এলাকাটা নজরে পড়ে। অসমতল ধানের মাঠ—কোথাও সবুজ, কোথাও বা হলুদ হয়ে রয়েছে। দূরে-অদূরে কার্তিকের কুয়াশাঢাকা গ্রাম-গ্রামান্তর। কোথাও একলা কোথাও দল বেঁধে থাকা তালগাছ। সকালের রোদে চিকমিক করছে দূর বিলের জল, সরু নদী. বালির চড়া আর ব্রীজ। এই নিসর্গের মধ্যে অন্তত এখন—এ মুহূর্তে ভাল লাগার মতো অনেক কিছু আছে। তবে পরে কেমন লাগবে বলা যায় না। চন্দন সামনে কিছুটা দূরে জঙ্গলটার দিকে তাকিয়েছিল, খুঁজছিল কোথায় সেই পীরের দরগার নিশান। রুমা বলল, ব্যাস, এই তো সব ফুরুলো, নটে গাছটি মুড়ুলো। আমাদের রূপপুর চটির খেল খতম। সুতরাং ফেরা যেতে পারে।

চন্দন অন্যমনস্ক ছিল। মুখ ফিরিয়ে বলল, উঁ?

রুমা খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠল হঠাৎ। এই! কোথায় তোমার সেই আলফা গামা বিটা?

চন্দন বলল, এগুলো তেজষ্ক্রিয় রশ্মির নাম—খালি চোখে দেখা যায় না। তবে বড্ড মারাত্মক রশ্মি সব। যাক্‌ গে, সে পরে দেখা যাবে। রুমা, এখানে রেস্তোরাঁ—মানে আমরা বসে চা খেতে পারি এমন চায়ের দোকান নেই?

রুমা পা বাড়িয়ে বলল, চায়ের দোকান চারপাশে অনেক আছে। ওই তো দেখতে পাচ্ছ!

চন্দন বলল, চলো না—ওই দোকানটায় গিয়ে বসি। ওরা আমার আলফা কোম্পানির খোঁজ দিতে পারবে নিশ্চয়।

রুমা চোখ কপালে তুলে বলল, মাথা খারাপ! এ সব দোকানে...ফেট্‌! যত সব আজে-বাজে লোকের আড্ডা। দেখছ না চেহারাগুলো?

চন্দন বলল, তোমরা—মানে মেয়েরা কোথায় আড্ডা দাও?

রুমা ওর অজ্ঞতায় না হেসে পারল না।...তুমি কি সত্যি সত্যি এটা টাউনশিপ ভেবেছ নাকি?

সেই রকমই তো মনে হচ্ছে! এত সব দোকানপত্তর, লোকজন, বাস, রিকশো, লরী।

যাঃ, সব গেঁয়ো ভূতের আড্ডা। চারপাশের গাঁ থেকে ব্যাপারী আর জোতদার আর চাষাভুষোরা এসে মাছির মতন ভন্‌ভন্‌ করছে।...রুমা বিরক্ত মুখে বলল। ...ফাইনালটা শেষ হতে অপেক্ষা। আমি বাবা ফুরুত করে কাটব!

তোমাদের কলেজটা কোথায়? দেখালে না তো রুমা?

রুমা দাঁড়িয়ে বলল, এখানে কলেজ কী? কলেজ সেই আট মাইল দূরে—কান্দীতে। বাসে যাই, বাসে ফিরি। আর সে কী গাদাগাদি, ঘাম, দুর্গন্ধ!

চন্দন একটু হাসল।...সে সবখানে। কলকাতায় গিয়ে দেখে এসো না।

রুমা বলল, সেখানে ভিড় আছে—কিন্তু এমন নোংরা লোকেদের গায়ে গা দিয়ে কেউ চলে না।

চন্দনের কেমন খারাপ লাগছিল রুমার মতামত। সে মনে মনে বলল, ভাগ্যিস পরেশদার মতো লোকের সঙ্গে তোমার দিদির বিয়ে হয়েছিল।...সে জিয়াগঞ্জের সেই বালিকা রুমার কথা ভাবছিল। তখন রুমা কত চমৎকার মেয়ে ছিল। পৃথিবী সম্পর্কে তখন তার ধারণা যাই থাক, কোন মতামত দিতে জানত না। সম্ভবত রুমার মনে এখন অপর্যাপ্ত লোভ জন্মে গেছে। সম্ভবত একটা সৌন্দর্য রুচি আর ঔচিত্যের বোধ অর্জন করেছে সে। এটা অবশ্য ভালো। এটা মানুষের মধ্যে না জন্মালে মানুষ সেই আদিম দশাতেই থেকে যেত।

রুমা বলল, চন্দনদা, কথা বলছ না যে?

কী বলব?

জায়গাটা কেমন লাগল?

মন্দ কী!

তোমার পুষিয়ে যাবে। তুমি তো জামাইবাবুর চেলা। আমার কথা যদি জিগ্যেস করো, বলব—হঠাৎ রুমা লাফিয়ে উঠল।...এই! একদম ভুলে গেছি। সোর্স অফ্‌ ইনফরমেশান জানতে চেও না—জামাইবাবুর সঙ্গে তোমার দেখা হবে দুপুরবেলা—আলফাবিটাগামাতে।...সে হেসে উঠল ফের।

চন্দন অবাক হবার ভান করে বলল, তাই নাকি?...কিন্তু সেটা কোথায় বের করা দরকার যে!

আছে কোথাও!...রুমা বলল।...সামনে ওই ট্রান্সপোর্ট কোম্পানিটা দেখছ, ওখানে এক ভদ্রলোক জামাইবাবুর বন্ধু। ওঁকে জিগ্যেস করতে পারো। যাবে?

চন্দন ব্যস্তভাবে বলল, যাবো না আবার?

দুজনে এগিয়ে গেল। রাস্তার পর কিছু ফাঁকা জমি—তারপর গেট মতো। তারকাঁটার বেড়ায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে কতকগুলো মস্তো ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। একটা বাস ধোওয়া হচ্ছে। এদিকে-ওদিকে কেউ কেউ দাঁড়িয়ে বা বসে জটলা করছে। একটা শান্ত সকালের যে স্তব্ধতা, তা খুব একটা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে না এই সব কাজে ও আলাপচারিতায়। ওরা গেটে ঢুকতে ঢুকতে দেখল একটা ট্রাক ব্যাক করা হচ্ছে এবং তার পিছনে দাঁড়িয়ে হাত দেখাচ্ছেন এক মোটাসোটা ভদ্রলোক। পরনে ধুতি আর ফুলশার্ট। সোনার বোতামগুলো চিক্‌চিক্‌ করছে। আঙুলে অনেকগুলো আংটি—লালপাথর বসানো। ভদ্রলোকের গায়ের রঙ বেশ ফরসা। গোঁফটা পুরু—সুচলো। কতকটা রাণা প্রতাপের মতো। মাথায় টেরি

করা, পরিপাটি কাঁচাপাকা চুল। রুমা বলল, ইনিই।

চন্দন একটু কেশে বলল, নমস্কার।

ভদ্রলোক মাথাটা সামান্য দোলালেন। তাঁর মনোযোগ ট্রাকটার দিকে বেশি। গাড়িটা ঠিক জায়গায় না পৌঁছনো অব্দি এদের আমল দেবেন না সম্ভবত। চন্দন ও রুমা মুখ তাকাতাকি করে একটু হেসে নিল।

রোগা সিড়িঙে চেহারার খাকি পাতলুন আর খয়েরী হাওয়াই শার্ট পরা একটি লোক ওপাশে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট খাচ্ছিল। সে এগিয়ে এসে বলল, অফিসে গিয়ে বসুন। এক্ষুণি এসে পড়ছেন বাবু।

ট্রাকগুলোর ভিতর দিয়ে কাদা বাঁচিয়ে দুজনে গিয়ে বারান্দায় উঠল। পাশাপাশি দুটো ঘর। খোলা ঘরটায় আপিস সম্ভবত। দুদিকে দুটো টেবিলে খাতা আর ফাইলপত্তর রয়েছে। পেপারওয়েট আছে। কলমদানি আছে। র‍্যাকেও অনেক খাতা ফাইল। মেঝেয় কালো তেলতেলে কী সব যান্ত্রিক পার্টস এলামেলো ছড়ানো। চেয়ারের পিছনে আর দেয়ালের কোণে কয়েকটা টায়ার। তেলের টিন। দেয়ালের ক্যালেন্ডারে মা কালী ও রামকৃষ্ণের ছবি। বড় বড় হরফে ছাপা রয়েছেঃ কমলা ট্রান্সপোর্ট কোং, রূপপুর চটি, মুর্শিদাবাদ। স্থাপিত—১৯৫৭। প্রোঃ শ্রীশিশিরকুমার চন্দ্র শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ্র।

নতুন জায়গায় গিয়ে কারো জন্যে অপেক্ষা করতে হলে সেখানকার সব কিছু খুঁটিয়ে না দেখে উপায় থাকে না। চন্দন প্রায় মুখস্থ করে ফেলল আগাগোড়া। এমন কি টেবিলের নিচে একটা তেলজবজবে মস্তো বল্টুটাও তার পুরো মনে এঁকে গেল। বল্টুটা দেখে তার খারাপ লাগছিল। কেন খারাপ লাগছিল সে জানে না। মনে হচ্ছিল, ওটা পাশের কৌটোয় তুলে রাখলেই পারতো। কারো ধুতির পাড়ে কিংবা পায়ে কালি লেগে যেতে পারে। সে বলল, রুমা, তোমাকে উনি চেনেন না?

রুমা ঘাড় নাড়ল। পিছন থেকে সেই রোগা লোকটি বলল, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? বসুন না! ওই তো চেয়ার রয়েছে।

যেন এইটে বলার অপেক্ষা ছিল, দুজনে বসল। রুমা চাপা গলায় বলল, দেখছ? এরা জিগ্যেসও করছে না—কোত্থেকে আসছি, কেন আসছি। ফেট! আমার খারাপ লাগছে। একেই জিগ্যেস করো না, কোথায় তোমার সেই কোম্পানিটা?

চন্দন বলল, সেও ঠিক।.. সে চেয়ার থেকে একটু ঝুঁকে বাইরের দিকে লোকটাকে খুঁজল। লোকটা আছে। বারান্দায় কোণে দাঁড়িয়ে একমনে সিগ্রেট খাচ্ছে আর ফিক্‌ফিক্‌ করে চাপা হাসছে। ব্যাপার কী? পাগল নয় তো?

না, চন্দন দেখল, তার সামনে নিচে ট্রাকের তলায় একজন গদী বিছিয়ে চিৎপাত শুয়ে এঞ্জিনের নিচেটায় কী খুটখাট করছে। তারই সঙ্গে চাপা গলায় রসিকতা করছে লোকটা। চন্দন ডাকল, দাদা শুনুন?

লোকটা এগিয়ে এসে বলল, বাবু এক্ষুণি আসছেন!

চন্দন বলল, একটা ব্যাপারে আমরা এসেছি। এখানে আলফা ডিসট্রিবিউটারিসটা কোথায় বলতে পারেন?

লোকটা ভ্রু কুঁচকে বলল, আলফা ডিসট্রিবিউটারস! নাঃ, তেমন কিছু তো এখানে নেই।

চন্দন বলল, সে কী! আমি কাগজে—

লোকটি চতুর হাসল।...আজকাল কাগজে অমন কত কী লেখে। সে অন্য রূপপুর হবে। এটা রূপপুর চটি। সাঁইথের দিকে কিন্তু একটা রূপপুর আছে—ভালো জায়গা। বড় জায়গা। তা আসা হচ্ছে কোত্থেকে?

চন্দন বলল, জিয়াগঞ্জ।

লোকটা সিগ্রেটটা জুতোর তলায় নিবিয়ে বলল, আমাদের এখানে জিয়াগঞ্জের এক ভদ্রলোক থাকেন। চেনেন নাকি? পরেশ মজুমদার।

চন্দন বলল, খুব চিনি। আমি তো তার বাড়িতেই উঠেছি। আর ইনি—পরেশদার ইয়ে।

লোকটা কেন যেন ঝেঁঝে উঠল।...পরেশবাবু বলতে পারলেন না ঠিকানাটা?

চন্দন রুমার দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল। রুমার মুখে বিরক্তি ফেটে পড়ছে।

লোকটা চলে যেতে যেতে বলল, তাহলে বসুন। বাবু জানলেও জানতে পারেন—নানান জায়গায় চেনাজানা আছে ওনার।

রুমা বলল, ধ্যুত! চলো, কেটে পড়ি।

চন্দন চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, পরেশদা বলেছেন—ওখানে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে। তখন নিশ্চয়ই সেটা আশেপাশে কোথাও আছে। দুপুরের আগে খুঁজে বের করতেই হবে।

রমা ভ্রু কুঁচকে একটা পেপারওয়েট নাড়াচাড়া করতে থাকল।

চন্দন কতকটা স্বগতোক্তি করল, কী হেঁয়ালি! এ যেন কারো জীবন নিয়ে রসিকতা! শা—

শালা বলতে গিয়ে সে রুমার প্রতি শালীনতাবশত থামেনি, বাঘের গরগরে আওয়াজে প্রশ্নটা এসেছে বারান্দা থেকে—বলুন, কী চাই!

সেই গুঁফো ভদ্রলোক এসে নিজের জায়গায় বসলেন। তারপর রুমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনাকে চেনা-চেনা মনে হচ্ছে...

রুমা মুখ নামিয়ে বলল, পরেশবাবু আমার জামাইবাবু।

ওঃ হো! ঠিক ঠিক।...ভদ্রলোক অমায়িক হাসলেন।...বেশ বেশ। ভালো। আর এঁকে তো চিনতে পারলাম না?

চন্দন বলল, পরেশবাবু আমার দাদা বলতে পারেন। আমি জিয়াগঞ্জে থাকি। দেখুন, এখানে আলফা ডিসট্রিবিউটারস্ বলে...

ভদ্রলোক হাত তুলে বাধা দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ। নতুন একটা কারবার হচ্ছে। এখনও চালু হয়নি—হতে চলেছে। জায়গাটা একটা সেন্টার কি না—চারদিকে যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো। এ সব এলাকার ব্যবসায়ীরা সেই দূর বহরমপুর সাঁইথে থেকে, নয়তো কলকাতা থেকে দোকানের মালপত্র আনে। কাজেই বুঝতে পারছেন এমন একটা কনসার্ন এখানে থাকলে তাদের আর কষ্ট করতে হয় না। অর্ডার দিলেই যা যা দরকার ঘরে পৌঁছে দেবে কোম্পানি।

অবিশ্যি স্পেশাল দু'চারটে মালের সোল ডিস্ট্রিবিউটর এরা তো থাকবেই। যাক্‌গে, শুনুন—আপনিই তাহলে পরেশবাবুর লোক। ঠিক আছে। আপনার স্বাস্থ্য চেহারা তো বেশ ভালই। এ্যাদ্দিন কী করতেন?

চন্দন সরল মনে বলল, তেমন কিছু না। চাকরি-বাকরি তো পাইনি। ধরার লোক ছিল না। মাঝে কিছুদিন সাবরেজেস্টারী অফিসে ডিড-রাইটারের কাজ করেছি। তারপর একটা কাপড়ের দোকানে সেলস্‌ম্যান ছিলামু। মাইনেতে পোষাল না—ছেড়ে দিলাম। তারপর কিছুকাল ইলেকট্রিক ইঞ্জিনীয়ারিং পড়লাম। কাজও করলাম কিছু জায়গায়। সবখানেই ব্যর্থতা। পিছনে বড় ফ্যামিলির দায়িত্ব আছে। বুঝতেই পারছেন।

ভদ্রলোক হেসে উঠলেন। ..পরেশবাবুর জুড়ি তাহলে। ..সুধা, আরে সুধা! শুনে যা দিকি।

কালিঝুলি মাখা প্যান্ট গেঞ্জি পরে একটি বছর-দশেকের ছেলে এসে দাঁড়াল।

চা এনে দে। বিস্কুট-টিস্কুট আনবি।

রুমা হন্তদন্ত বলল, না, না। আমার জন্যে চা-ফা না।

খাবেন না? ঠিক আছে। সুধা, একটা চা।...ভদ্রলোক চন্দনের দিকে ঘুরে বললেন, আপনি এক কাজ করুন। বারোটার মধ্যে চলে আসুন। কোথায় আসতে হবে বলে দিচ্ছি। এখান থেকে বেরিয়ে সোজা পুবের রাস্তায় তার মানে যেটা কান্দী যাচ্ছে, সেদিকে কিছু দূর এগিয়ে বাঁযে দরগাডাঙা—মানে পীরের আস্তানা, ডাইনে ইটখোলা। ইটখোলার পরেই দেখবেন বোন মিল কো-অপারেটিভ—তার ঠিক উলটো দিকে, মানে আপনার...

চন্দন বলল, বাঁদিকে তো?

হ্যাঁ—বাঁদিকে। পেট্রোলপাম্প আর গ্যারেজ। গ্যারেজে সোজা গিয়ে জিগ্যেস করবেন, বেচুবাবু কোথায় বসেন। ব্যস্‌।

আপনার নামটা জানিনে স্যার।

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন—আমি শিশিরকুমার চন্দ্র।

চা খেয়ে পথে বেরিয়ে রুমা ফেটে পড়ল...ওই লোকটাকে তুমি স্যার বললে?

চন্দন বলল কেন? ক্ষতি কী? মনে হচ্ছে, উনিও কোম্পানির একজন লোক। একটু তোয়াজ না করলে চলে? ওরা চিরদিন তোয়াজ পেতে অভ্যস্ত, ভাবে— এটাই নিয়ম। তাই—

রুমা বলল, পায়ের ধুলো নিলেও পারতে!

চন্দন একটা সিগ্রেট ধরিয়ে বলল, রুমা—এখনও তুমি সেই কচি বালিকাই আছো। মানুষ আজকাল কীভাবে বেঁচে আছে, তা তো টের পাও না। এই একটা চাকরি পেলে একটা ফ্যামিলিতে কী অসম্ভব কাণ্ড ঘটে যায়, তুমি ভাবতেও পারবে না।

রুমা শান্তভাবে বলল, দারিদ্র্যের সম্পর্কে তোমার কাছ থেকে না শুনলেও চলবে। আমি শুধু বলছি, ওকে স্যার না বললেই চলত।

কী জানি! মুখ দিয়ে শালা বেরিয়ে গেল।...চন্দন হো হো করে হেসে উঠল।

শালা বেরোলে তো তোমাকে প্রণাম করে বসতাম। স্যার বেরোল কিনা।

চন্দন একটু অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাল। নতুন-আসা উত্তুরহাওয়া চওড়া রাস্তা ভরিয়ে দিচ্ছে ক্রমশ। রুমার চুলগুলো উড়ছে। মুখের সেই সরল লালিত্য কোথায় হারিয়ে ফেলেছে রুমা? গঙ্গার জলে ভিজে মুখ নিয়ে করুণ চোখে তাকানো সেই বালিকা এখনও মনের ভিতর দাঁড়িয়ে আছে। চাপল্য ছিল তখনও- কিন্তু সবই যেন ভিজে-ভিজে লাগত। এখন প্রখর আলোয় বড় খসখসে দেখাচ্ছে। রুক্ষ উদ্ধত প্রগলভ। অবশ্য এটা সাজে রুমার। জামাইবাবুর সচ্ছল-তার মধ্যে বেঁচে থেকে ওর কমনীয়তা নমনীয়তা—সব কিছু খুবই টানটান হয়ে উঠেছে। হয়তো বিয়েও হবে কোন সচ্ছল সংসারে। তারপর রুমা আরও বদলে যাবে।

রুমা একটু এগিয়ে পড়েছিল। চন্দন খুব আস্তে আস্তে হাঁটছে। রুমা পিছিয়ে বলল, চাকরি যে হওয়াই—সে তো বুঝে গেছি। মনে হচ্ছে জামাইবাবুরই হাত আছে পিছনে। টেলিগ্রামটাও। কাজেই তুমি এখন এখানের বাসিন্দা হয়ে গেলে। ইস্! ভাবতেও আনন্দ হচ্ছে চন্দনদা!

চন্দন বলল, কিসের আনন্দ?

রুমা হালকাভাবে জবাব দিল, কিসের আবার? আগের মতো—সেই যে জিয়াগঞ্জে যখন থাকতাম।

শরীর ব্যথা করলে পিঠে নাচানাচি করতে পারবে তো?

হুঁ-উ। ভার সইতে পারবে কিনা দ্যাখ্ আগে।

কিন্তু এখানে তো গঙ্গা নেই!

নেই—সেই তো বাঁচোয়া। দু'হাতে তুলে আর সাঁতার কাটার মুরোদ তো নেই। আমার ওজন এখন কত জানো?

তোমার সব মনে আছে দেখছি, রুমা।

আছে—ছেলেবেলায় কথা কেউ ভোলে? .. তবে চন্দনদা, আগের মতো পিকনিক এখানে করা যায়। ওদিকে একটা নদী আছে—ভারী চমৎকার। বেশ গাছপালা জঙ্গলও আছে। গত শীতে আমরা সব পিকনিক করে এলাম। সে কী আনন্দ!

চন্দন সিগ্রেটটা ফেলে দিয়ে বলল, শুধু আনন্দ নিয়েই বাঁচতে নেই—মাঝে মাঝে দুঃখের স্বাদ পাওয়া ভালো। তবে না আনন্দটা টের পাওয়া যায়।

রুমা ঝাঁঝাল স্বরে বলল, ফিলসফি রাখো বাবা! ফিলসফি মানে তো বুঝি, স্রেফ গেঁয়োমি।

একটা বাস সশব্দে চলে গেল ধুলো উড়িয়ে। তার ওপর-পাশ—সবখানে গাদাগাদা লোক। এ্যাসিস্ট্যান্টটা চেঁচাচ্ছে—নগর ইন্দ্রাণী সাঁকোর ঘাট! নগর ইন্দ্রাণী সাঁকোর ভাট! দু'হাতে মুখ ঢেকে তফাতে সরে গিয়েছিল রুমা। কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, কী দেখছ? ওদিকে যাবে নাকি? নগর ইন্দ্রাণী সাঁকোর ঘাট?

চন্দন ঘুরে পা বাড়াল।...না। এমনি দেখলাম। চলো!

কিছুক্ষণ নীরবতা। বাঁদিকে ব্লক অফিস আর কোয়ার্টার্স। একখানে গেটের মাথার ওপর লেখা আছে—রূপপুর উন্নয়নী। অনেক কৃষ্ণচূড়া গুলমোহরের

গাছ। সুদৃশ্য ফুলবাগিচা। লন। তার ওপাশে হাসপাতাল। তারপর স্কুল! রাণী সর্বাণী হায়ার সেকেণ্ডারী এ্যাণ্ড মালটিপারপাস্ স্কুল। বোর্ডিং। এদিকটা বেশ সাজানো-গোছানো। পাঁচিলের গায়ে ঝাকড়মাকড় বুগান-ভিলিয়ার ঝাঁপি। একটা ড্রেন। ড্রেনে কে একজন পেচ্ছাপ করছিল। কাজ শেষ করে সে রাস্তায় এল। চন্দন তাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। মুখোমুখি হতেই সে বলে উঠল, রাজেনবাবু! কী ব্যাপার? আপনি এখানে কোথায়?

ভদ্রলোক চন্দনের বয়সী। পরনে পরিষ্কার সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি। এক লাফে এগিয়ে এল সে।...আরে, আরে! কী কাণ্ড!

চন্দন বলল, কাল সন্ধ্যায় এসেছি। একটু কাজ আছে। আপনি এখানে কী করছেন?

আর বলবেন না। সেই ম্যাস্টারী। স্রেফ ছেলেঠ্যাঙানি—থুড়ি! জিভ কেটে রাজেন বলল, আজকাল আর ছেলেদের ঠ্যাঙানো যায় না। মাস্টারদেরই ওরা ঠ্যাঙায়। আর বলবেন না। আছেন কেমন?

এক রকম।...চন্দন বলল।...পরিচয় করিয়ে দিই। জিয়াগঞ্জের পরেশবাবুকে চিনতেন?

রাজেন ঘাড় নাড়ল।

পরেশদা আমাদের দাদা। এখানেই আছেন অনেকদিন। তাঁর শ্যালিকা।

রাজেন ভ্রূ কুঁচকে রুমাকে দেখে নিয়ে নমস্কার করল। রুমাও। রাজেন বলল, এখানের পরেশবাবুকে অবশ্যই চিনি—মানে জানি। পরিচয় নেই। ওঁকে কে না চেনে এখানে! যাক্‌গে মরুক গে! কদিন আছেন? ওবেলা আসুন বোর্ডিং-এ! আড্ডা দেওয়া যাবে।

চলে আসতে আসতে রুমা বলল, ব্যস্, তাহলে একজন পুরনো সঙ্গী জুটে গেল। তোমার লাক্, চন্দনদা॥

চন্দন বলল, জিয়াগঞ্জে মাস্টারি করতেন ভদ্রলোক। মাস্টার হিসেবে ছাত্র-দের মধ্যে খুব পপুলার ছিলেন। সেক্রেটারীর সঙ্গে বনল না।

রুমা হঠাৎ লাফিয়ে উঠল।...এই! এখানের স্কুল ম্যাগাজিনে ওঁর একটা লেখা পড়েছি মনে হচ্ছে। বেশ ভালো লেখেন ভদ্রলোক।

চন্দন বলল, তাই নাকি! পদ্যটদ্য?

উঁহু—গপ্‌পো। খুব ভাল লেগেছিল। ভদ্রলোকের সঙ্গে ভালো করে আলাপ করতে হবে তো!

বেশ তো।...চন্দন দাঁড়াল। রুমা, এবার লেফ্‌ট টার্ন। তাই না?

রুমা পা বাড়িয়ে বলল, ছোট্ট জায়গা—চিনতে ভুল হবে কেন? আমি যখন এলাম, তখন তো আরো একটুখানি ছিল, দেখতে দেখতে বেশ বেড়ে গেল। কী হল? এস!

যাই, বলে চন্দন তাকে অনুসরণ করল। সে দূরে জঙ্গলভরা। দীঘির পাড়ে দরগার নিশানটা দেখতে পেয়েছিল। রিকশোওলা কী গল্প বলছিল—শোনা হয়নি। গল্পটা শুনতে ইচ্ছে করছে।

সেই ছোট্ট রাস্তা। দুপাশে ঝোপঝাড় গাছপালার ফাঁকে অনেক ঘরবাড়ি।

আলোর ব্যবস্থা আছে। একটা বাড়ির সামনের জমিতে একটি মেয়ে গাইগরুর খুঁটি পুঁতছে। গরুটা লাফালাফি করছে। দুরমুশ তুলে তেড়ে যাচ্ছে মেয়েটি।

রুমা ডাকল, কল্পনা, আজ কলেজ গেলে না যে?

মেয়েটি এদের দেখে একটু সলজ্জ হেসে ক্ষান্ত হল।...গেলাম না। তুমি?

আমি এক্ষুনি বেরোব।...রুমা এগিয়ে কী সব কথা বলতে থাকল ওকে, চন্দন শুনতে পাচ্ছিল না।

সে পরিবেশটা খুঁটিয়ে দেখছিল। কোন কোন বাড়ির সামনে পিছনে সবজিক্ষেত ফুলগাছ। নারকোল গাছও রয়েছে—তবে শ্রীহীন। বোঝা যায় এ-মাটি তাদের অনুকূল নয়। ওদিকে প্রকাণ্ড একটা বটগাছের মাথায় রাজ্যের বক বসে আছে। একটা বিধ্বস্ত সেকেলে বাড়িও আছে ওখানে—হয়তো মসজিদ বা মন্দির ছিল কোন সময়। কিছু মাটির বাড়িও দেখা যাচ্ছিল। হয়তো ছোট্ট গ্রাম-ট্রাম ছিল। এখনও সেটা নিজের অস্তিত্ব হারায়নি। চারপাশে কেমন স্তব্ধতা—পাখির ডাক, গাভীর হাম্বা, বাছুরের গলায় ঘণ্টার শব্দ, কে কাকে ডাকল, অল্প আলাপের আভাস এবং মাঝে মাঝে দূরের ট্রাকের গুড়গুড় আওয়াজ। হেমন্তের নীলধূসর আকাশ পেরিয়ে চলে গেছে বিজলী তার—বিশাল ফ্রেমের সঙ্গে আটকানো। সেকালের বুনিয়াদের ওপর একাল এসে চেপে বসেছে ক্রমাগত। তাই কোথাও কোন সুষম বিন্যাস নেই—একটা লণ্ডভণ্ড ভাব সবখানে। ছেঁড়া কাপড় জড়ানো কাঠি-কাঠি গড়নের গ্রাম্য যুবতী মেয়ের আশেপাশে রুমারাও হেঁটে বেড়াচ্ছে।

তারপর চেঁচাতে চেঁচাতে বেরিয়ে আসছে ওদিকে একটি বাচ্চা মেয়ে—খালি গা, পবনে হাফপ্যাণ্ট। গলায় সরু চেন। পিঠে হাত রেখে দৌড়চ্ছে। দরজা থেকে তার মা একটা চেলাকাঠ ছুঁড়ে মারল। কাঠটা চন্দনের সামান্য দূরে পড়ল। তবু সপ্রতিভ ভঙ্গীতে মেয়েটি গট্‌গট্‌ করে এসে কাঠটা কুড়িয়ে নিয়ে গেল। রুমা বলল, কি হল সবিতাদি? রানু কাঁদছে কেন?

সবিতাদি এতক্ষণে যেন চন্দনকে দেখল। ঘোমটা টেনে গজগজ করতে করতে বাড়ি ঢুকল। রুমা এসে বলল, দাঁড়িয়ে আছ কেন? বাড়ি ঢোক না!

চন্দন হাসল। তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।

রুমা দরজার কড়া নেড়ে বলল, কয়েকটা খবর নিলাম ওর কাছে—বুঝলে? সে ভারী মজার স্ক্যাণ্ডাল! বলব খন।

চন্দন বলল, মেয়েদের ব্যাপারে আমার উৎসাহ নেই।

আজ্ঞে না। ছেলেদেরই।...

দরজা খুলে দিল লতু। রুমা তার কানে-কানে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, তোর মা উঠেছে?

লতু বললে, উঁহু। শুয়ে আছে। কী জানি, জ্বর না গা-ব্যথা। কথা বলছে না।

রুমা আঁতকে উঠে বলল, সে কী রে! রান্না হচ্ছে তো? ও—গ্যাঁদা রাঁধছে! তাহলেই আজ কলেজ গেছি!...সে দৌড়ে রান্নাঘরে ঢুকল।

চন্দন থমকে দাঁড়িয়েছিল। সকালে চা-জলখাবার রুমাই দিয়েছিল। স্নেহ বউদির নাকি শরীর খারাপ। সে একবার খোঁজ নেবে ভাবল—পা বাড়াল। কিন্তু রাতের কথা মনে পড়ায় সোজা বাইরের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

তিন

অনেক মানুষের চেহারা স্থানকাল বিশেষেও বদলায় না। সেই একই পরেশদা! লম্বা চওড়া ছ'ফুট মানুষ, উজ্জ্বল শ্যাম গায়ের রঙ, সেই উজোন চুল, সরু গোঁফ—সব একই। তবে বাইরে কিছু বদবদল ঘটেছে। চোখে চশমা নিয়েছে। আগের মত প্যান্টশার্ট পরে না। হাত গুটানো ধুসর তাঁতের পাঞ্জাবি আর ধুতি রয়েছে পরনে। পায়ে পাম্পশু। আজও চেহারার কঠিন সংহত সৌন্দর্যের ভাবটা ঘোচেনি। চিবুক, ঠোটের ভাঁজ, খাড়া নাক—সবখানে চেনা অমায়িকতার চিহ্নগুলো অটুট। ভাবা যায় না, এই মানুষ রাগলে কী হয়ে ওঠে।

পরেশ বলল, সময় নেই হাতে। উঠি। রাত্তিরে খেয়েছি সাঁইথেতে, সকালে চা খেলাম কান্দিতে, দুপুরে খেয়ে এলাম বহরমপুরে নটুদার হোটেলে। আজ রাত্তিরে আবার কোথায় খাব ঠিক নেই—যাচ্ছি তো কলকাতা। এখন যা বলছি, মন দিয়ে শোন। এই ঘরটায় তুমি থাকবে—এই খাটিয়া। আর টেবিলের সামনে বসলেই তোমার অফিস। অলরাইট?

চন্দন হেসে মাথা দোলাল।

পরেশ বলল, ভেবো না। কোম্পানি শিগগির তোমাকে ঘর দিচ্ছে। আলাদা অফিসও ভাল জায়গায় পাবে। তারপর যদি আমাদের কপাল ফেরে, চাই কি তোমার একটা কোয়ার্টারও হয়ে যেতে পারে। তখন জ্যাঠামশাইদের এনে রাখতে পারো। কী বলেন হক সাহেব?

মধ্য বয়সী ধুতি পাঞ্জাবিপরা বেঁটে লোকটি হেসে উঠলেন। হ্যাঁ। তবে সবই নিজের হিম্মতে করে নিতে হবে। কোম্পানি চালাবার ভার যখন হাতে নিলেন, তখন যা যা সব দরকার—নিজেই করে নেবেন বইকি।

পরেশ বলল, আপাতত তোমার কাজকর্ম সব বুঝিয়ে দেবেন বেচুদা—শিশিরবাবুর ভাই॥ কোন অসুবিধে নেই। তবে ভাই, মাঝে মাঝে এক-একবার ঘোরাঘুরি করতে হবে নানা জায়গায়। অর্ডার সাপ্লাইয়ের কাজ তো! তাঁর জন্যে রাহাখরচ ইত্যাদি অবশ্যই পাবে। তোমার লোকজন থাকবে দরকার মতো। ট্রাক পাচ্ছ একটা। নাও, সিগারেট খাও।

একটা দামী সিগারেট এগিয়ে দিল পরেশ। চন্দন সিগ্রেটটা ধরিয়ে নিয়ে বলল, তাহলে আজই ফিরে গিয়ে জিনিসপত্র আনব ভাবছি। কিছু তো আনিনি সঙ্গে!

পরেশ ডাকল, হীরুবাবু, শুনুন! এই যে হীরুবাবু!

চন্দনের দু'পাশে কজন লোক বসে রয়েছে—বোঝা যাচ্ছিল এরাই কোম্পানিটা

গড়েছে। হক সায়েব, শিশিরবাবু, বেচুবাবু, আর একজন অবাঙালী। পাণ্ডেজী বলে তাঁকে ডাকছে ওরা। লম্বাটে গড়নের মানুষ, খুঁটিয়ে ছাঁটা চুল টিকি আছে, হাফহাতা সাদা ফতুয়া গোছের জামা, ধুতি, পাম্পশু। নাকটা অসম্ভব লম্বা। পাতলা ঠোঁট। বয়সে ওদের সবার চেয়ে বড়ো। পঞ্চাশ নির্ঘাৎ পেরিয়ে গেছে। এই সব লম্বানেকো লোকেরা খুব বোকা হয় বলে চন্দনের ধারণা। কিন্তু একটু আগই পরেশদা বলছিল যে, তেরশ পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের আগের বছর রূপপুরের নির্জন মাটিতে এই সাহসী লোকটি খোলভূষির দোকান খোলেন। নানান অঞ্চলের গরুর গাড়ি এখানে এসে বিশ্রাম নিত। বলদগুলোর খাবার যোগাতেন পাণ্ডেজী। তারপর দুর্ভিক্ষ লাগল। তখন বলদে খাবে কী, মানুষই সব খেয়ে শেষ করতে লাগল। পাণ্ডেজী এখন লাখপতি মানুষ।.. এবং এই সব শুনে পাণ্ডেজী ভাঙা দাঁতে খুব হাসছিলেন।

হীরুবাবু পেট্রোল পাম্পের দিক থেকে এসে গেল। কুঁজো বকের মতন চেহারা লোকটির, তার ওপর ঢিলে প্যান্টশার্টে যা দেখাচ্ছে, হাসি পায়। পরেশ বলল, এক কাজ করুন। ক্যাশে শতখানেক টাকা হবে? দিন তো জলদি।

হীরুবাবু টাকা এনে দিলে টাকাগুলো চন্দনের হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, যা দরকার কিনে নেবে। না—সংকোচ করো না। পরে মাইনে থেকে কেটে দেবে ব্যাস! আর ওঁদেরও কিছু দিয়ে আসা লাগবে। তাই না? বেচুদা, ওঁকে আর একশো দিও॥ কেমন? চন্দন, ওঁর সঙ্গে একটু কষ্ট করে যাবে? তাহলে তুমি কাল থেকে লেগে যাচ্ছ। ঠিক আছে? আর কিছু বলবে?

চন্দন সলজ্জ হেসে মাথা দোলাল।

তুমি আমার সঙ্গেও যেতে পারো, চন্দন।..পরেশ উঠে দাঁড়িয়ে বলল।...আমি তো ট্রাকে যাচ্ছি। বহরমপুরে তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাব। তুমি বাসে জিয়াগঞ্জ চলে যাবে।

চন্দন বললে, তাহলে তো একবার ওখানে যেতে হয়। ব্যাগটা আছে।

পরেশ বলল, ব্যাগের কী দরকার? রমা রেখে দেবে—ভেবো না।

না।. চন্দন একটু ভেবে বলল, আচ্ছা ঠিক আছে।

পরেশ বেরিয়ে কাকে বলল, এই ফরিদ, আমার বাড়িতে একটা খবর দিয়ে আয় তো। জলদি। বলবি, চন্দনবাবু রাত্রে এসেছিলেন জিয়াগঞ্জ গেছেন জরুরী কাজে। কাল ফিরবেন। বলতে পারবি তো?...

রাস্তার একটা সবুজ রঙের ট্রাক দাঁড়িয়ে ছিল। ওরা উঠে বসতেই স্টার্ট দিল। চন্দন ভাবছিল, বেচুবাবুকে আরও একশো টাকা দিতে বললেন পরেশদা—সেটার কী হবে? এখন টাকার কথা তোলা কি ঠিক হবে? টাকাটা পেলে এত ভালো হ'ত! পরেশদার যা কাজের চাপ—বলার পরই ভুলে গেছেন। কিন্তু বেচুবাবুও কি ভুলে গেলেন? বা রে!

না—বেচুবাবু ভোলে নি দৌড়ে এসে গেল।...আরে ও পরেশ। সেই টাকাটা!

পরেশ কপালে করাঘাত করে জিভ কাটল।...দেখছ কাণ্ড? নৃপেন, রোখো রোখো।

এই মন্টু, রিকশো কই তোর ?...

পরেশ একটু হেসে চন্দনের কানের কাছে মুখ আনল।...শালারা আমাকে যা ভয় পায়, ভাবতে পারবিনে চাঁদু। তোর দিব্যি। ভয় পায়—অথচ দারুণ বিশ্বাস করে। ভাবতে পারিস? এই সব লাখ-দুলাখের মালিকেরা আমাকে খুশী রাখতে পারলে সেইফ মনে করে—জিয়াগঞ্জের এই পরেশ মজুমদারকে বিশ্বাস করে—কারণ, আমি কখনও ওদের সঙ্গে কোন তঞ্চকতা করি নি। করি নি—অথচ ওই বোকাগুলোর ঘাড়ে কাঁঠাল ভে'ঙ দিব্যি খেয়ে এসেছি॥..খিক খিক করে হেসে উঠল সে।

চন্দন বলল, যত বোকা ওদের ভাবছ, ওরা তত বোকা না হতেও পারে।

বুড়ো আঙুল নেড়ে পরেশ বলল, কিসসু আসে যায় না তাতে। ওদের বুঝিয়ে দিতে পেরেছি যে, এই পরেশ মজুমদার ছাড়া ওদের কোন নিরাপত্তা নেই। ওরা রূপপুর চিটিতে তাহলে কি অবস্থায় পড়বে জানিস? ভাগাড় দেখিছিস তো, ভাগাড়? এটা একটা ভাগাড়। চারিদিকে ওৎ পেতে রয়েছে শেয়াল-শকুন। হাঃ হাঃ হাঃ!

হাসতে থাকল পরেশ। চন্দন বলল, তোমার অনেক কথা জানি না পরেশদা। জানতে ইচ্ছে করে।

পরেশ হাসি থামিয়ে একটু গম্ভীর হল। বলল, সে নিজমুখে কি বলব? ওরাই যেচে তোকে শুনিয়ে দেবে। এখানের লোকেরাও শোনাতে পিছপা হবে না। সবই করলাম জীবনে, পেলামও অনেক কিছু—কিন্তু চন্দন, মাঝে মাঝে বড় দুঃখ হয় কি জানিস ভাই? লোকের কাছে আমি ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠলাম। রূপপুর চিটির লোকেরা সামনে-পিছনে ভয় যথেষ্ট করে—কিন্তু ঘেন্না কি কম করে? অথচ আমি কোন শালার পাকা ধানে মই দিই নি! হ্যাঁ ঘেন্না আমাকে করে—কারণ আমি এখানে এসে সামান্য ট্রাক ড্রাইভার হলাম—তারপর যে করে হোক নিজেই ট্রাক-মালিক হয়ে উঠলাম। ব্যবসা করে পয়সা কামালাম। বাড়ি করলাম। পেট্রোল পাম্প বসালাম॥ ওরা ভাবে, আঙুল ফুলে কলাগাছ হবে কেন?

চন্দন হেসে বলল, সেই তো। কেন হল, তা আমিও বলছি।

পা সামনে তুলে একটু হেলান দিয়ে পরেশ বলল, সব কথা আমি নিজেও বুঝিনে—বলাও যায় না। শুধু বলব, যুগের ফসল আমি কাটতে পেরেছি। বেশি কৌতূহল দেখাস নে, সব টের পাবি এক সময়। ঘড়ি দেখল সে।...দেখেছ, শালা বেচার কাণ্ড? নৃপেন গলা বাড়িয়ে দ্যাখ তো ভাই—শালা আসছে নাকি!

ড্রাইভারটা মুখ বাড়িয়ে দেখার সঙ্গে সঙ্গে রিকশোয় এদিকে বেচুবাবু হাজির। হাত বাড়িয়ে একশো টাকার নোট দিয়ে বলল, পরেশ, জ্ঞানবাবুর গদীতে বড়বাবু এসে বসে আছে।

পরেশের ভ্রূ কুঁচকে গেল। বলল, মুখার্জি?

হ্যাঁ। আমাকে ডাকছিল। রিকশো থেকে নামি নি—আসছি বলে এলাম।

আমার কথা জিজ্ঞেস করলে বলো কলকাতা গেছি—ফিরতে দেরি হবে। চলো হে নৃপেন!

গাড়ি খুব জোরে চলছিল। ঢালু হয়ে নেমে গেছে পথ। হাওয়া দিচ্ছিল উদ্দাম। পরেশ বলল, শীতের কাপড়-চোপড় সব এনো। যা যা নেই—সময়মত কিনে নিলেই চলবে।

চন্দন বলল, পরেশদা!

উঁ!

চন্দন চুপ করে গেল। ভাবল, কথাটা এক্ষুণি বলা ঠিক হবে কিনা। অথচ সেই রাতে আসা অব্দি যে অস্বস্তিটা জেগে উঠেছিল, এতক্ষণে সেটা বেড়ে গেছে অনেকখানি। একটা অন্ধকার রহস্যময় জায়গার এক পাশে আলো পড়েছে- সেখানে সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। চারদিকে কী বা কারা আছে, কী ঘটছে, সে জানতে পারছে না।

পরেশ বলল, কী?

কিছু না।

উঁহু। তোমার মুখ দেখে টের পাচ্ছি কী বলতে চাচ্ছ।

নাঃ। এমনি।

পরেশ ওর কাঁধে হাত রাখল।··একজন জানাশোনা বিশ্বাসী কাকেও খুঁজছিলাম। তাই তোমাকে ডেকেছিলাম, চন্দন। যখন কাগজে বিজ্ঞাপনটা দিই, তখন কোম্পানীর ব্যাপারটা ঠিক দানা বেঁধে ওঠে নি। তাই সময় লাগল। খুলে বলাই ভালো, ডিস্ট্রিবিউটারের কাজকর্ম আমি একাই করতাম। কিন্তু মাঝে কতকগুলো হেভী লস খেয়ে একটু ঠেকে গিয়েছিলাম। টাকা চাই। তখন ওই শালাদের ধরতে হল। দিনের পর দিন বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাজী করালাম। রেজিস্ট্রেশন হল। ব্যাঙ্কে টাকা পড়ল। এবার কাজ। কিন্তু ভাই চন্দন, বুঝতেই তো পারছ—যা দিনকাল পড়েছে তাতে সোজা আঙুলে ঘি ওঠে না। আইন মেনে চললে তো ব্যবসাকড়ি ডকে উঠে যাবে। এখানেই যা একটুখানি ঘোরপ্যাঁচ। ধরো, হঠাৎ তোমাকে দুপুর রাত্রে ঘুম থেকে ডেকে তোলা হল। বলা হল, কিছু মালপত্র এসেছে। তুমি যথারীতি ডেলিভারি নিলে। কাগজে সই করে দিলে। এ পর্যন্ত ব্যাপারটা ঠিক আছে। তারপর একটুখানি লুকোচুরির খেলা। কারণ, যে কোন সময়ে পুলিস বা আই বির লোক এসে হাজির হতে পারে। কই, মালগুলো দেখি।...তুমি তাদের কনসাইনমেণ্ট চালান বা ভাউচার ইত্যাদি কাগজপত্র দেখালে। কেমন? এখানেই তোমার বুদ্ধিশুদ্ধির পরিচয় দিতে হবে। কারণ ওই কাগজগুলো সব ফিকটিসাস কোম্পানির নামে। সেই কোম্পানিকে খুঁজে বের করার আগেই ওদের সঙ্গে ম্যানেজ করে নিতে হবে। মনে রেখো—যথেষ্ট সময় তুমি পাচ্ছ। এই সময়ের সদ্ব্যবহার তোমাকে করতেই হবে।

চন্দন গুম হয়ে গেল। সে বাইরে তাকাল। হেমন্তের বিকেল। দুধারে সবুজ ধানের রঙ হলুদ হয়ে পড়েছে কোথাও কোথাও। কুয়াশার টুপি পরে দাঁড়িয়ে আছে দূরের গাছপালা। পাখিরা উড়ে যাচ্ছে সেদিকে। পাড়াগাঁয়ের পৃথিবীর সুন্দর প্রাকসন্ধ্যা শান্তি ও নির্জনতা ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে চলেছে

ধাবমান গর্জনকারী একটা শক্তি—ষড়যন্ত্র সংশয় আর শঠতার প্রতীক যেন সে। কোথায় চলে এল চন্দন? তার বুক কাঁপল। ভয়ার্ত চোখে সে পরেশকে একবার দেখে নিল।

পরেশ অস্ফুট চেঁচাল. আরে গেল, গেল! দুঃ ছাই!

চন্দন চমকে উঠেছিল। কিছু চাপা পড়ল নাকি?

পরেশ বলল, ব্যাঙ! রাত্তিরে বেশ মজা হয়। সাপগুলো এক নয়ানজুলি থেকে উঠে আরেক নয়ানজুলিতে যেতে চায়। কংক্রিট স্ল্যাবের ওপর আলো পড়ে। শালা, বুকের খাঁজে চাকার শব্দ লাগছে তখন—সে কি ধড়ফড়ি! কিন্তু পিছল জায়গায় ওরা তো ভারী কাবু। ফ্যাঁচ করে ভারী চাকা চলে যায়। ভাবা যায় না!

এই সব কথায় মাঝে মাঝে পুরানো পরেশদা ফিরে আসছে। সেই ভঙ্গী, হাসি, চোখ নাচানো—অবিকল। মুখ তুলে ঠিক সেভাবেই বাইরে তাকাচ্ছে—যে তাকানো তার কোন ভাবনা চিন্তাকেই প্রকাশ করে না। শিশু যেমন করে বাইরের পৃথিবীটা দ্যাখে, এ চাউনি যেন ঠিক সেই রকম।

তোর বউদি যা শাপমন্যি করছে! বুঝলি রে?

চন্দন সাড়া দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই ফের পরেশ বলল, বুঝলি নৃপেন? বিয়ে করিস নি, ভালই আছিস ভাই। তোমার সম্পত্তি লাটে উঠুক, আর দুনিয়া জাহান্নামে যাক, দু' রাত্তির পরে-পরে একটা রাত্তির অন্তর গলা ধরে শোওয়া চাই-ই। নৈলে কুরুক্ষেত্র।

চন্দন বলল, বউদির জ্বরটর হয়েছে মনে হল!

পরেশ বলল, তুই শুনলি নাকি? তোকে বলি নি। তোর গুরুজনের একটু খিটকেল করলাম রে, চন্দন।

চন্দন তার কথার পুনরাবৃত্তি করল, বউদির জ্বর হয়েছে। সারাদিন শুয়ে আছে দেখছিলাম।

ওর জ্বরজারি বারো মাস। ছেড়ে দে। নে, সিগারেট খা।...সিগারেট বের করে পরেশ বাইরে আঙুল তুলে বলল, ওই যে গ্রামটা দেখা যাচ্ছে—ব্রীজের ওধারে, শিশিরদার গ্রাম।

হাওয়া বাঁচিয়ে দুজনে সিগারেট জেবলে নিল। চন্দন বলল, যাই হোক। তোমার এখন মাঝে মাঝে বাড়ি শোওয়া ভালো পরেশদা। ওরা একা মেয়ে-ছেলে রাত কাটায়। জায়গার বদনাম আছে শুনছিলাম।

পরেশ বলল, পাগল! পরেশ মজুমদারের বাড়ি পা বাড়াবে, এলাকার তেমন কেউ নেই। তার দলবল নিতান্ত সামান্য নয়। আর রুমা—রুনাকে তো দেখলি। কী মনে হল?

কী মনে হবে?...চন্দন খুব আস্তে বলল কথাটা।

কিছু মনে হল না? তোর হাতে গড়া মেয়ে। মনে হল না, শান দেওয়া তলোয়ার? ?

কী জানি!

কী জানি?..পরেশ তার বিশাল হাতের থাবায় চন্দনের ঘাড়টা ধড়ল...স্পষ্ট কথা শোন চন্দন। আমি ভাই বরাবর ফ্র্যাংক কথাবার্তা বলি। ওই মা-বাপ মরা

মেয়েটাকে এতটুকুন থেকে মানুষ করছি, লেখাপড়া শেখাচ্ছি। সে চাকরি করবে—সে জন্য নয়।

তবে কী জন্যে ?

ঘাড়টা আস্তে আস্তে ছেড়ে দিয়ে সিধে হল পরেশ। বলল, মেয়েটা বাঘিনী হবে রে চন্দন বুঝলি ? আর পাঁচটা বাঙালী মেয়ের মতো ন্যাকান্যাকা ঢঙে চাকরি করতে ও জন্মায়নি।...হঠাৎ পরেশ গলাটা চাপা করল।...তোকে সব বলা যায়। রুমার নামে আমার অনেক কিছু রয়েছে। ওই পাম্প, ট্রাক দুটো, আরো অনেক কিছু—ব্যাঙ্ক এ্যাকাউণ্ট তো আছেই। এগুলো ওনলি ফর-মাই সেফটি, বুঝলি ? আর তোর বৌদির নামে বাড়িটা আছে। আমার শালা কিস্যু নেই। নেই—কারণ বাধা আছে। বাধা ছিল। সে অনেক হিসট্রি। পরে একদিন তোকে সব বলব। এখন কথা হচ্ছে, রুমা—রুমা সামান্য মেয়ে নয়।

চন্দন হেসে উঠল।

পরেশ—একদিন জিয়াগঞ্জের অন্ধকার স্যাঁতসেতে ঘরে কী কথায় ঠাট্টার ছলে যেমন বলেছিল, ঠিক তেমনি সুরে, এই গর্জমান শক্তিশালী ট্রাকটার ভিতর বসে বলে উঠল, হাসিস নে চাঁদু। তোর গলাতেই ঝুলিয়ে দেব শালীটাকে।

চন্দন আরো জোরে হেসে উঠল। কিন্তু নিজেই টের পেল—হাসিটা শুকনো, চেষ্টাকৃত অকারণ। সামঞ্জস্যহীন এই হাসির নিচে বিকট একটা কিছু ওৎ পেতে রয়েছে। পরক্ষণে তার মাথার ভিতরটা শুকনো লাগল।.

চাঁদু !

উঁ ?

ওকে তোর পছন্দ হয় ?

পরেশদা !...চন্দন অস্ফুটকণ্ঠে বলল। কী যা তা বলছ ? তুমি ড্রিংক করেছ নির্ঘাৎ !

করি—কিন্তু এখনও করিনি।...পরেশ সহজভাবে বলল।...তোকে বহরমপুরে নামিয়ে দিয়ে সাউবাবুর ওখানে যাবো—তখন। কিন্তু প্রস্তাবটা জানিয়ে রাখলাম। ঠিক আছে ?

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ। পিছনে খোলোর মধ্যে বসে ট্রাকের লোকগুলো গান গাইছে। আবছা শোনা যাচ্ছে। কী উদ্দাম বাতাস ! অন্ধকার নামছে ক্রমশ। বড় বড় গায় দু'ধারে। হেডলাইট জ্বলে উঠল। সাঁত সাঁত করে সরে যাচ্ছে দু-পাশে সব বিশাল ছায়া—মাঠের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে। একটা গরুর গাড়ি আসছিল। বলদ দুটোর চোখ উজ্জ্বল নীল হয়ে উঠল। একটা চাকা নামিয়ে নৃপেন গাল দিল, এই শালা শুয়ারকা বাচ্চা ! কানা নাকি ? তীব্র হর্নের শব্দে আর কিছু শোনা গেল না। চন্দন টের পেল তার মধ্যে একটা বিপুল অস্থিরতা জাগছে। একটা ঝড় বইছে হু-হু করে। কিছুক্ষণের জন্যে সে ভাবতে ভুলে গেল। স্বপ্নের মধ্যে তার এই যাত্রা—কেমন যেন অসহায়—কিছু বলা যায় না, করা যায় না। নিজের ওপর কোন নিয়ন্ত্রণ আর নেই। সে চোখ বুজল। দেখল রুমাকে। গঙ্গাজল স্নিগ্ধ ভিজে মুখ নিয়ে অপেক্ষমান বালিকা রুমাকেই।

তারপর শ্যাওলাধরা নবাবী আমলের ক্ষুদে ইটের তৈরী জিয়াগঞ্জের বাড়িটা সাঁত ছরকুটে হেসে ওকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছিল।

সাড়া পেয়ে বাবা লণ্ঠন হাতে দৌড়ে এলেন। দরজা খুলেই তাঁর প্রথম প্রশ্ন—হল? কী বলল ওরা?

চন্দন টলতে টলতে হাঁটছিল। শুধু ছোট হুঁ বলে সে এগিয়ে গেল বারান্দায়। শতরঞ্চি বিছিয়ে ভাইবোনদের পড়াচ্ছিল দিদি পারুল। ওকে দেখে সবাই ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল। সবার মুখে প্রশ্ন আঁকা। মা ভিতর থেকে বললেন. চাঁদু এলি? খবর ভাল, না খারাপ?

জবাব দিলেন বাবা। অভিজ্ঞ লোক। বললেন, হয়েছে। হবে না কেন? কমার্সে ডিগ্রী, তার ওপর ইলেকট্রিক ইঞ্জিনীয়ারিং—কই রে, তোর দাদাকে হাত-মুখ ধোয়ার জল দে।

পারুল বলল, তোর ব্যাগ কোথায়?

চন্দন মেঝের শতরঞ্চিতে বসে পড়েছিল। বলল, আছে ওখানে। কাল সকালেই সব গুছিয়ে যেতে হবে। এক গ্লাস জল দে তো দিদি।

দিদি বলে না চন্দন—তার মুখে দিদি শুনে হয়তো নয়, আগের কথাটা পারুলকে চঞ্চল করে তুলেছে। সে প্রায় লাফাতে লাফাতে ঘরে ঢুকল। ভাই-বোনগুলো সেই মুহূর্তে কলরব করে উঠল, চাকরি হয়েছে, দাদার চাকরি হয়েছে!

সারা বাড়িটা হা-হা করে হাসছে। মা বেরিয়ে এলেন হাসিমুখে। বললেন, হ্যাঁ রে তা মাইনে টাইনে কী রকম দেবে?

চন্দন বিকৃত মুখে ঘুরে বলল, চারশো। পরে আরও বাড়তে পারে।

ফের একটা চাপা গুঞ্জন এবং তারপর কলরব উঠল চারপাশে। বাবা হাসছেন। মা হাসছেন। পারুল হাসছে। সতু নাণ্টু লিলি হাসছে! হাসছে নবাবী আমলের সরু ইটের বাড়িটা। তার দেয়ালে একদঙ্গল ছায়া নাচছে। উৎসবের এই নির্বোধ বেলুনটা এক ঘুষিতে ফাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করল চন্দনের। ফিস্‌ফিস্‌ করে কণ্ঠগুলো উচ্চারণ করছিল, চারশো—চা-র-শো! এবং আঙুলগুলো যতবার নড়ে উঠছিল—নিরুচ্চার হাসিখুশি নিরাপত্তাসূচক কঠিন কংক্রিট 'চার-শোতে'—ততবার চন্দনের মনে হল—একটা কিছু করা দরকার।

অথচ কিছুই হয়ে উঠল না। সে নিঃসাড় হাতে খুচরো নোটগুলো বের করে বাবার হাতে দিল। বলল, একশো আছে।

বাবার জিভ বেরিয়ে গেল।...আগাম দিলে? অ্যাডভান্স?

সবাই নিঃশব্দে টাকা দেখছে। একটা ভয়ঙ্কর স্তব্ধতা কয়েক মুহূর্ত—তারপর বাবা একটু কাশলেন। বললেন, কাল সকালে আর বাজার করার পয়সা ছিল না। বীরুর কাছে যেতে বলেছিলি, একটু আগে পারু ফিরে এল। কলকাতা থেকে আসেই নি। কবে আসবে ঠিক নেই। দায়িত্বহীন, দায়িত্বহীন! একটা ফ্যামিলির জীবন নিয়ে ছেলেখেলা।

বাবার গলাটা শেষ দিকে জড়িয়ে গেল। মা বললেন, তুমি পারুলকে নিয়ে বাজারে যাও। সকালে যাবে বলছে, দেরি করা ঠিক হবে না। ঘাটের দিকে ঘুরে এসো না! হরেনের নৌকোটা দেখে এসো। মাছটাছ পাও নাকি।

চন্দন বলল, একটা বড় দেখে ইলিশ এনো—যদি পাও। স্নেহবউদির বাড়িতে দেব। মা, কাল সকাল অব্দি মাছটা পচে যাবে না তো?

বাবা বললেন, কী দরকার? সক্কালে ঘাট হয়ে যাবি—তখন ওর কাছেই নিবি। আমি বলে রাখছি। তবে এখন বড় আশা কম। ইলিশ আর নাকি ওঠে না জালে।

পারুল বলল, হ্যাঁ রে, ওরা সব কেমন আছে? সত্যি বাড়ি-ফাড়ি করেছে নাকি? আর তোর সেই রুমকি কেমন আছে?

চন্দন ঘুরে তীব্র দৃষ্টে তাকাল।...কার রুমকি?

হাসতে হাসতে সরে গেল পারুল।...মা থলে-টলে সব কই?...

অনেক রাত হল শুতে। পাশের ঘরে মা-বাবার কথাবার্তার গুনগুনানি কানে আসছে। ও-ঘরের মেঝেয় পারুল আর লিলি শোয়॥ তারা হয়তো শুনছে কথাগুলো। ভবিষ্যতের জল্পনাকল্পনা। বাড়িটা আজ রংমহলের রূপ নিয়েছে। ওদের চোখে তার জেল্লা ঠিকরে পড়ছে। এ ঘরে একা চন্দন। তার ঘুম এল না গতরাতের মতোই। রাত যত বাড়ছিল, এ পুরনো শহরের সব শব্দ যত চাপা পড়ছিল—স্তব্ধতার নিচে, দেয়ালের ফাটলের ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছিল চন্দন বুঝতে পারছিল—ক্রমশ তার চেতনা পরিষ্কার হয়ে আসছে। সে সব স্পষ্ট বুঝতে পারছে। পরেশদার কোম্পানীটা আসলে কী, কেন পরেশদাকে সবাই ভয়-ঘেন্না করে, তার বেনামী সম্পত্তির উৎস কোথায়, আর বেচুবাবুর মুখে কোন বড়বাবু মুখার্জির কথা শুনে পরেশদার মুখের বিকৃতি, একটু করে—আস্তে আস্তে স্পষ্ট হচ্ছে। কুয়াশা সরে গিয়ে রোদে যেমন পৃথিবীটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তার বুকের ভিতর থেকে একটা চাপা শ্বাস শির্‌শির্‌ করে মগজে গিয়ে ঢুকল। সিগারেটের পর সিগারেট খেল সে। পায়চারী করল মাঝে মাঝে। সে জিয়াগঞ্জে খুব সৎ ছেলে বলে পরিচিত॥ সবাই তাকে ভালবাসে। সাহায্য করতে চায়। তা না হলে কবে এই পরিবারটা ধ্বংস হয়ে যেত। পথে আশ্রয় নিতে হত। আর এইবার সে অবিকল রূপপুর চটির পরেশ মজুমদার হয়ে উঠবে।

না—এটা কোন ন্যায়-অন্যায় ধর্মাধর্ম বিবেকের প্রশ্ন নয়। প্রশ্নটা অন্যখানে॥ সে পারবে তো? জীবনে কখনও মিথ্যা বলে নি। চুরি করে নি। চন্দন, তুমি পারবে তো? এ তোমার সাহস ও শক্তির কাছে একটা সরল প্রশ্ন। এ একটা চ্যালেঞ্জ। এবং ভোরে যখন প্রথামত গেনুবাবু গলিপথে খঞ্জনী বাজিয়ে গঙ্গাস্নানে গেল, গাইতে গাইতে গেল—ভজ গৌরাঙ্গ পুজ গৌরাঙ্গ লহ গৌরাঙ্গের নাম রে, সে চোখ খুলল। এইমাত্র সে একটা স্বপ্ন দেখছিল। অতল কালো উত্তরঙ্গ গঙ্গার জলের ওপর দু-হাতে সে রুমাকে ধরে আছে—ভিজে স্নিগ্ধমুখ বালিকা রুমার, দু'চোখে করুণ ত্রাস—চন্দনদা, ডুবে যাইনে যেন!

চার

প্রথম কয়েকটা দিন রুমাদের ওখানে আর যাবার অবকাশ ছিল না, চেষ্টাও ছিল না। জিয়াগঞ্জ থেকে ফিরে এসে রুমার সঙ্গে দেখা হয় নি। সে তখন

কলেজে। দেখা না হয়ে বেঁচে গিয়েছিল যেন। কী লজ্জায় না ফেলেছেন পরেশদা! স্নেহবউদি ওখানে থাকার জন্যেই জেদ ধরেছিল—সেটা অসম্ভব। থাকলে অবশ্য একটা অসুবিধে থেকে বেঁচে যেত—সেটা খাওয়ার। যে লোকটি রাঁধে, সে বামুন বলেও না—কেমন নোংরা যেন। এর থেকে স্বপাক খাওয়া ভালো। কিন্তু সময় নেই। যতটা ভেবেছিল কাজ তার চেয়েও বেশি এবং কাজেরও কোন সময়-অসময় নেই। রাত দুপুরে ঘুম থেকে তুলে লোকেরা গুদাম খুলতে বলে। আগের রাতে একগাদা মোটর পার্টস এসেছিল। সেগুলো আপাতত গুদামে রেখেছে। ওবেলা সব পাঠাতে হবে বেচুবাবুর হেফাজতে। কোথায় যাবে তা বেচুবাবু বলে নি। একটু-একটু বিরক্তি আসছিল চন্দনের। তার ওপর হক-সায়েবের বকবকানি। লোকটা তাকে ইতিহাস শোনায়। ওই উত্তর দক্ষিণ সড়কটার নাম বাদশাহী সড়ক। হোসেন শার আমলে তৈরী। ওই দরগাটা রাতারাতি আরব থেকে উড়ে এসেছিল।...শুধু তাই নয়, বুঝলেন বাবা, ওই সড়ক বেয়ে কত বাদশাহী ঘোড়সওয়ার গেছে, কত বর্গী এসেছে তলেয়ার নাচাতে নাচাতে, এসেছে গোরাপল্টন, বিদ্রোহী সিপাহীরা, সে কত ধুন্ধুমার কান্ড। আমি কান পাতলেই যেন শুনতে পাই। যখন রাত হয় ঘোর নিশুতি, আমি স্পষ্ট শুনি—ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্ ধুপ্...

লোকটিকে যা ভেবেছিল তা নয়। এ-সব লোক ধূর্ত হতে পারে না। গ্রাম্য সরলতা এর আষ্টেপিষ্টে জড়ানো। হাসি পায়, আবার ভালোও লাগে।

আর পান্ডেজী। সেও ভারি চমৎকার মানুষ। পরিষ্কার বাংলা বলতে পারে। টান একটু-আধটু আছে। সহজে ধরা যায় না। এই চটির অনেক গল্প সেও জানে। চোখের সামনে দেখেছে, কেমন করে গড়ে উঠল একটা লাভজনক বাণিজ্য কেন্দ্র। মুরশিদাবাদের এই এলাকাটায় বানবন্যা বিশেষ হয় না। উঁচু জায়গা—অথচ জেলার শস্য ভান্ডার। চারদিকে শুধু ধানের মাঠ। তার মাঝে অজস্র ক্যানেল। চাষীরা আর বর্ষার প্রত্যাশা খুব একটা করে না। এক মহকুমা শহর কান্দী ছাড়া এই সুবিস্তীর্ণ অঞ্চলে আর কোন বাণিজ্যকেন্দ্র নেই। সেই হয়েছে সুবিধে। পান্ডেজী তাকে রূপপুরের এই সম্ভাবনাটার উৎস বিশ্লেষণ করে শুনিয়েছেন। লোকটি ঝানু ব্যবসায়ী সন্দেহ নেই। তা না হলে দূর মুঙ্গের থেকে লোটা-কম্বল সম্বল করে এসে লাখপতি হয়ে বসলেন কেমন করে? মাত্র তো পঁচিশটে বছর বড়জোর।...

পান্ডেজী বলছিলেন, বাবুজী, রূপপুর আজ জমজমাট। ভিড় হল্লা লোক-জনে দিনরাত্রি গমগম করছে। উনিশশো তেতাল্লিশ সালে আমি যখন এলাম—চৌরাস্তার কাছে একটা ঝোপড়ি বানালাম। আরও কয়েকটা ঝোপড়ি ছিল। সেখানে সন্ধ্যার আগেই লোকেরা মালপত্র বেঁধেছেদে যে-যার গাঁয়ের দিকে চলে যেত। ওখানে একটা খুব বড় বটগাছ ছিল। সেটা পরে কেটে ফেলা হল। ওই গাছের নিচে কেবল কিছু বিদেশি গাড়োয়ান আর এই ঝোপড়িতে আমি একা। আঁধার ছমছম করত। একটা খুন-খারাপি কিছু হলে চেঁচিয়ে মরলেও কোন লোকের সাড়া মিলবে না। তো ভগবানের ওপর বিশ্বাস রেখে আমি নিদ যেতাম। বাইরে গাড়োয়ানরা তাস খেলত। গান করত। গজল করে রাত ভোর

করে দিত। মাঝে মাঝে কেউ চেঁচিয়ে বলত, কে বটে? হুঁশিয়ার!... কখনও দূর থেকে গাড়ির চাকার ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ শোনা যেত। আওয়াজ বাড়ত। কাছে আসত। বটতলার গাড়োয়ানরা চেঁচিয়ে জিগ্যেস করত—কোথাকার গাড়ি? কোথা যাওয়া হবে? ওরা গাড়ির ওপর থেকে সাড়া দিত—হুই ধনেখালি. আখেরিগঞ্জো! নয়তো—লালগোলা কাতলামারি সুপারি-গোলা। এটা কি রূপপুরের চটি? সবাই এক সঙ্গে খুশি হয়ে বলত—হ্যাঁ। চলে এস।...বুঝতেই পারছেন, বাঘড়ী মুল্লুকের গাড়ি সব। আসছে কলাই-মাকড় নিয়ে রাঢ়ে ফিরি করতে। ধান নিয়ে ফিরে যাবে। বাবুজী, বাঘড়ী মুল্লুক বড় গরীব লোকের দেশ।...

..তো আমারও সাহস বাড়ত। সেই রাত্রে ওরা সব ভূষিখোল নেবে। গরু বলদকে খাওয়াবে। আমি সামান্য চালডাল নুনতেল লকড়িও রাখতাম। ওরা রান্না চাপাত। আর নিদ সে রাত্রে আসত না, তরাস লাগত, বটতলায় কোন কোন গাড়োয়ান থাকত না, সেই সব রাত্রে লম্ফ জেবলে সন্ত তুলসীদাসের রামায়ণ পড়তাম। বর্ষার সময় বেশির ভাগ রাত্রে চটি ফাঁকা থাকত। বাইরে ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি পড়ছে। চারধারে পোকামাকড় ডাকছে। আমি রামায়ণ পড়ছি। পড়তে পড়তে মনে জোর বাড়ছে। তো এক রাত্রে এক আজব কাণ্ড ঘটল।...

পাণ্ডেজী হঠাৎ চুপ করেছিলেন। বাইরে তাকিয়েছিলেন কিছুক্ষণ। যেন সেই রাত্রির চেহারাটা স্মরণ করছিলেন।

চন্দন অন্যমনস্ক। ভাবতে অবাক লাগে, কেউ কোথাও নেই—জনপদ থেকে দূরে বৃষ্টির রাতে চটিতে একটিমাত্র লোক গানের সুরে রামায়ণ পড়ছে।...

...তো আমি রামায়ণ পড়ছি। আচান্‌ক ঝাঁপের ওপর আওয়াজ। জোরে বৃষ্টি পড়ছে। তরাস বাজল বুকে। তাহলে এতদিনে আমার পালা পড়েছে। ভগবানকে স্মরণ করে ঝাঁপ একটু ফাঁক করলাম। হা রামজী!

কপালে করাঘাত করে একটু থেমেছিলেন পাণ্ডেজী। চন্দন বলেছিল, কী? কী দেখলেন?

...দেখলাম একটা মেয়ে।

চন্দন হেসে উঠেছিল। মেয়ে! বাঃ, বেশ রোমান্টিক ব্যাপার তো?

...হ্যাঁ—খুব আজব কাণ্ড। ত্রিশপঁয়ত্রিশের মধ্যে বয়েস হবে। খুব খাপসুরত চেহারা। ফরসা রং, টানাটানা চোখ। তো এখন তাঁর মেয়েকে দেখলেই মালুম হবে মা কেমন ছিল।

সে আছে নাকি?

হ্যাঁ। আছে। বলছি সেকথা। ঝাঁপ খুলেই মালুম হল, মেয়েটি ভীষণ ভিজেছে। আর মনে হল, সে বেমারি—কাতরাচ্ছে। কথা বলার ক্ষমতা নেই। আর তার কোলে একটি ছোট্ট লেড়কি। মা মেয়ে জোর ভিজেছে। ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপছে। ভগবানের ইচ্ছা বাবুজী। আমি ঝাঁপ তুলে বললাম, ঢুকে পড় জলদি। বাইরে জোর হাওয়া দিচ্ছে। তত বৃষ্টি পড়ছে ঝম্‌ঝম্‌ করে। আর সব খোপড়িগুলোর দু-দিক খোলা—আটচালার মতো। সেখানে কেউ তো

রাত্রে থাকে না! যাই হোক, জায়গা খুব কম আমার। তবু আশ্রয় দিলাম। বাবুজী মেয়েটি মুসলমান। বাঘড়ীমুল্লুক থেকে রাঢ়ে এসেছিল ভিখ মাঙতে। আট ন' মইল দূরে একটা গ্রাম আছে কাজিপাড়া। সেখানে কার বাড়ি বিয়ে ছিল। ভুখা পেটে অনেক গিলেছে। তারপর রাস্তা হাঁটতে লেগেছে! গাঁয়ের লোকেরা বারণ করেছিল, সন্ধ্যেবেলা, ঝড় বিষ্টির দিন, বেরিও না। কোথাও থেকে যাও। কিন্তু বয়স—মেয়ে মানুষর বয়স তখন আপনা বৈরী, বাবুজী। মন্দ লোকের ভাবসাব দেখে সাহস করতে পারেনি। লোক দেখানো কায়দায় এক জায়গায় শুয়েছিল বটে—কিন্তু যত রাত বাড়ে, মন ছট্‌ফট্‌ করে ডরে। চুপি-চুপি মেয়েকে কোলে নিয়ে অন্ধকারে বেরিয়ে পড়েছিল। এখন কাজিপাড়া আর রূপপুর চটি, এর মাঝে কোন বসতি নেই। বিলকুল ফাঁকা মাঠ। রাস্তার ধারে গাছপালা যা ছিল, দুর্ভিক্ষের টানে লোকেরা তাদের ডালপালা কেটে সাফ করে ফেলেছে। লকড়ির কাঠ বেচেছে। তারপর তো পথে নামতেই যেমন বৃষ্টি তেমনি হাওয়া। সেই সঙ্গে শুরু হয়ে গেছে পেটের বেমারি। বমি পায়খানা...

তো বাবুজী ভগবানের ইচ্ছা। কার রূপ ধরে কে আসে! আর আমি তো মানুষ বটে, না কী? ভাবলাম, রে শম্ভুচরণ, তোকে রামজী পরীক্ষা করতে একে পাঠিয়েছেন। ডাক্তার নাই, ওষুধ নাই, তেপান্তর জায়গা—বৃষ্টির রাত। আমি পারলাম না বাবুজী। শেষ রাতে মেয়েটি মারা গেল। তার বুকের কাছে তখন বাচ্চাটা ঘুমোচ্ছে। অনেক কান্নাকাটি করে তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার ঘরময় নোংরা। আমার হাত ভি নোংরা। পাথরের মতো বসে আছি।

তারপর?

পাণ্ডেজী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, সকাল হল। বৃষ্টি কমেছিল! ঝাঁপ বন্ধ করে পাশের গ্রাম ওই হাজারপুরে মুসলমানপাড়ায় খবর দিয়ে এলাম। ওরা এসে লাশ সরাল। মুসলমানদের মধ্যে এটা আমি দেখেছি বাবুজী।...তো আমি একজনকে পাহারায় রেখে কান্দী গেলাম পায়দল। ব্লিচিং পাউডার নিয়ে এলাম। ঘর ধুলাম। অবশ্যি আমার কিছু হয় নি। এই তো দেখছেন ষাট-পাঁয়ষাট বয়স হল—ভালোই আছি।

সেই বাচ্চা মেয়েটির কী হল পাণ্ডেজী?

আরে! সে বেঁচে আছে। মুসলমানপাড়ার ওরা এসে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভিক্ষের বছর—কে পুষবে? আর এদিকে মনে তরাস আছে—বাচ্চাটা না খেয়ে মারা গেলে মায়ের আত্মা যদি ক্ষতি করে? ওরা আমার কাছে এল। আমি বললাম, এক কাম করো। ওকে ওই পীরের দরগায় ফকির সায়েবের কাছে পেঁছে দাও। দ্যাখো না উনি কী বলেন! মাইলখানেক দূরে দীঘির পাড়ে—

হ্যাঁ, দেখেছি। ওই তো—ওদিকে।

ফকিরসায়েবের নাম ছিল মস্তানবাবা। ছেলে-বউ নিয়ে দরগায় থাকতেন। দরগার নামে কিছু সম্পত্তি ছিল। ওই দিয়েই চলে যেত। তাছাড়া মানত ইত্যাদি তো আছেই।

নিলেন ফকির সায়েব?

নিলেন। সে মেয়ে এখন তার স্বামীর সঙ্গে বাস করছে। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করে যায়। আমিও পালায় পরবে কিছু দিই।...তো, মস্তানবাবা নিজের ছেলের সাথেই ওর বিয়ে দিয়েছিলেন। কী আজব কান্ড! আপনি তো ওকে চেনেন! ওখানে ছোট্ট একটা স্টেশনারি দোকান আছে—ওই যে সেই মেয়েটি! কাল বিকেলে এসেছিল। দোকানটা ভালই চালাচ্ছে। ওদিকে ওর স্বামী দরগা দেখাশোনা করছে। ওরা ভালই আছে।

চন্দন অবাক হয়ে বলেছিল, সেই চুড়িওয়ালী মেয়েটি? কী যেন নাম—
—আলতা—আলতাবানী? হ্যাঁ, হাঁ—কাল বিকেলে এসেছিল, আমাদের গাড়ি কলকাতা যাচ্ছে নাকি। আপনাকে প্রণাম করল। বুঝেছি! জানেন—তখন কেমন লেগেছিল ব্যাপারটা!

রাস্তায় হঠাৎ সেদিন দেখা হয়ে গেল রুমার সঙ্গে। চন্দন আসছিল শিশিরবাবুর ট্রান্সপোর্ট অফিস থেকে। একটু এড়ানোর চেষ্টা করেছিল। পারল না। ছিঃ, কী ভাববে ও! সে দাঁড়িয়ে গেল রাস্তায়। রুমা কলেজ ফেরতি বাস থেকে নেমেছে। অকারণে মুখ ফেরাতে গিয়ে দেখে ফেলল চন্দনকে। এগিয়ে এল তক্ষুনি।...কী মশাই, ব্যাপার কী? খুব যে কাজের লোক হয়ে উঠেছেন দেখছি!

চন্দন হাসল অপ্রস্তুত ভঙ্গীতে। না। এক্ষুণি ভাবছিলাম, এবেলা সময় আছে। বউদির কাছে যাব। কেমন আছ? বউদির জ্বরটর সেরেছে?

রুমা বলল থাক। অত আত্মীয়তায় কাজ নেই। এ তো জানতাম বাবা, জামাইবাবুর চেলা—সে আবার কেমন হবে?

চন্দন বলল, তুমি রাগতে শিখেছ দেখছি। আমি ভাবতাম, যে ভীতু, সে রাগতে পারে না।

রুমা ভ্রূভঙ্গী করল।...কে ভীতু? আমি?

আমার স্মৃতি বলছে—জিয়াগঞ্জের স্মৃতি।

আর আমার জিয়াগঞ্জের স্মৃতি বলেছে, চন্দনদা নামে জনৈক ব্যক্তি ভীষণ ভীতু ছিল। যাক্ গে...রুমা হঠাৎ সিরিয়াস হল...আরে, ওদিকে বউদি তোমার জন্যে যে অস্থির। যাচ্ছ না কেন?

সময়ই পাই নে। যা চাকরি! সময় অসময় তো নেই—শুধু কাজ।

সে তো থাকবেই। এর নামই তো মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করা। তুমি খোঁটা দিচ্ছ না তো?

রুমা সত্যি সত্যি একটু অবাক হয়ে বলল, খোঁটা? কেন বলতো?

চন্দন হাঁটতে হাঁটতে বলল, কিছু না—এমনি বললাম। আচ্ছা রুমা, সেই স্ক্যান্ডাল না কী—বললে না তো?

রুমা আবার স্বাভাবিক হল।...বলব কখন? তারপর আর টিকি দেখিয়েছ?

এই তো দেখালাম। এবার বলো।

কিন্তু এখন তো মুড নেই আমার। মগজে ক্লাসের লেকচার টগবগ করে ফুটছে। বাপস্। কেন যে ওসব ছাইপাঁশ শেখে মানুষ, বুঝি নে!

শিক্ষিত হবে বলে।

ফেট্!

কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটল দুজনে। তারপর চন্দন মুখ খুলল প্রথমে।...রুমা!

উঁ?

হঠাৎ আনমনা হয়ে পড়লে যে?

না তো। এমনি। বাসের ধকল সামলাচ্ছি।

বিকেলের দিকে গাড়ির ভিড় বেশ বেড়ে যায়। চারদিক থেকে বাসগুলো এসে পড়ে। ট্রাক আসে অজস্র। ড্রাইভাররা দোকানে চা খেতে-খেতে আড্ডা দ্যায়। পাটের মরশুম পড়েছে জোর। এখানে-ওখানে পাট বোঝাই করছে ব্যাপারীরা। ধান-চালের বস্তা জড়ো হয়ে আছে। ট্রানজিস্টার রেডিওর শোর-গোলে উচ্চকিত পরিবেশ। মাঝে মাঝে এসে দাঁড়াচ্ছে একটা করে বাস। চেঁচাচ্ছে ওরা...রূপপুর, চটি রূপপুর!...সাঁইথে সাঁইথে···নগর ইন্দ্রাণী সাকোরঘাঁট! পাঁচগ্রাম, পাঁচগ্রাম!...বঁড়োয়া পুশুলে গীতগাঁ—লাভপুর! হেই লাভপুর যানে-বলে! তালে তালে তুখোড় ছোকরা অ্যাসিস্ট্যাণ্ট গানের সুরে যাত্রী ডাকছে। যাত্রীদের সাথে ভাড়া কিংবা মাল নিয়ে কণ্ডাক্টারের তুমুল ঝগড়া হচ্ছে। চৌরাস্তার কেন্দ্রে গোল ছোট্ট পার্কের ঘাসে কয়েকটি যুবক শুয়ে বা বসে গল্পগুজব করছে। হাত ধরাধরি একদঙ্গল বাচ্চা বেড়াতে বেরিয়েছে। আগে দুটি মহিলা। এ-পরিবেশে কেমন বেমানান লাগে। হাসপাতাল থেকে অ্যামবুলেন্স বেরিয়ে এল সেই সময়। পাশ দিয়ে চলে গেল ধুলো উড়িয়ে। ইটখোলার দিকে হিন্দুস্থানী ও সাঁওতাল মজুরের বসতিতে ঢোলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। আবছা গানের সুরও ভেসে এল।...

গোরা গোরা মুখড়া
তানিকো নাতিকি
হামরে নজর লাগি যায়,
নজর লাগি যায় জী॥

সব মিলিয়ে রূপপুর চটীতে এই সুরে আসন্ন সন্ধ্যার অর্কেস্ট্রা। হেমন্তের কুছাশা চালকল ইঁটভাঁটার চিমনি থেকে বেরোন ধোঁয়ার সাথে মেশে এক রহস্যময় ধূসরতার সামিয়ানা তৈরী করে ফেলেছে। নীচে এই আজব নগর।

আর সেই অবেলায়, দ্রুত ফুরিয়ে-যাওয়া আলোয়, দূরের গাঁওয়াল সেরে কোন মুসলমান বাউল এল গাইতে গাইতে। তার পরনে লম্বা হাজারতালির আলখেল্লা, মাথায় পাগড়ি, দুপায়ে ঘুঙুর, একহাতে তারযন্ত্র, বুকে ঝুলন্ত চিমটে, অন্য হাতে অদ্ভুত কমণ্ডলু।...

আজব শহর এ এক বানাইলে কোন জন
হায় হায়, আজব শহর॥
সেই শহরে রথ চালাইছে
একজনা তার সারথি,

দুইজনাতে রথটানে ভাই
দুইজনা জ্বালায় বাতি।
(সেই) রথের ভিতর বসে আছে চাঁদ সদাগর,
হায় হায় আজব শহর॥

বাউলটি আপনমনে গাইতে গাইতে চলে গেল ভিড় ভেদ করে—ভ্রূক্ষেপহীন। পথের ওপর কতক্ষণ ধরে, সব নির্ঘোষ ছাপিয়ে বাজতে থাকল আর বাজতে থাকল, ঝুম...ঝুম...ঝুম...ঝুম...ধারাবাহিক তার চলার ছন্দ দুপায়ের ঘুঙুরে।

চন্দন ডাকল, রুমা!

উঁ

কথা বলছ না কেন?

রুমা মুখ নিচু করে হাঁটছিল। দুহাতে বুকের কাছে ধরা বইপত্তর। মুখ তুলে একটু হাসল সে।...একটা কথা ভাবছিলাম। সেই ছেলেবেলার।

কী কথা বলো তো?

একদিন দৌড়তে দৌড়তে ড্রেনে পড়ে গিয়েছিলাম। মনে আছে?

না তো!

বাড়ি ঢুকতেই দিদি জোর মার দিল। ধিঙ্গি মেয়ে, লজ্জা করে না তোর? মার খেয়ে আমি কেঁদে উঠলাম। জামাইবাবু ছিল না। দেয়ালে ঠেস দিয়ে সন্ধ্যা অব্দি ভিজে নোংরা গায়ে দাঁড়িয়ে আছি। তারপর তুমি এলে। বললে, কী হল রে রুমকি? তারপর কী করলে বলতো?

কই, মনে নেই!

বারে! তুমি টানতে টানতে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে গেলে। রগড়ে সব ধুইয়ে দিলে অতবড় ধিঙ্গি মেয়েটার। জানো, তখন মনে মনে কত—কত কাঁদছিলাম। চোখে নয়—মনে। মুখে হাসি ছিল কিন্তু। আর এই মনের কান্নাটা কী ছিল জানো?

ওকে চুপ করতে দেখে চন্দন বলল, কী?

ঝড়বৃষ্টির মধ্যে মাথার ওপর ছাদ পেলে কী হয় চন্দনদা?

আনন্দ হয়। নিরাপদ লাগে।

কান্নাটা ছিল তারই। ভাবতুম—অন্তত একজন...হঠাৎ রুমা দাঁড়াল।...আচ্ছা চলি।

কী হল?

তোমার দেরী করিয়ে দিলাম কতক্ষণ। যাও, যাও, অনেক কাজ জমে গেছে।...বলে রুমা হনহন করে চলে গেল।

চন্দন অবাক হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। ডানদিকের কলোনীর পথে যতক্ষণ না সে মিলিয়ে গেল, নড়ল না। তারপর আস্তে আস্তে এগোল।

পেট্রোলপাম্পের কাছে যেতেই সে দেখল পরেশের সবুজ ট্রাকটা দাঁড়িয়ে আছে। বহরমপুর থেকে ফিরল তাহলে। তাড়াতাড়ি হেঁটে কাছে যেতেই দেখল বেচুবাবু আর পরেশদা কী সব আলোচনা করছে চাপা গলায়। বেশ উত্তেজনার ছাপ রয়েছে দুজনের মুখে।

তাকে দেখে পরেশ বলল, আরে এস। তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। ওদিকে এক কাণ্ড হয়ে গেছে। আমার দুঃসাহস—শিশিরদার পরামর্শ শুনিনি। জঙ্গীপুরের দিকে এক ট্রাক মাল পাঠিয়েছিলাম। ঘাট পেরোনর সময় গঙ্গায় নৌকো ডুবে সব কেলেঙ্কারী হয়ে গেছে। অবশ্যি ইনসিওর করা ছিল। সেই রক্ষে। কিন্তু বেচুদা, আমি উঠছি। এক্ষুনি আবার জঙ্গীপুর ছুটব। চন্দন, তুমি বাকিটা শুনে নাও বেচুদার কাছে।

হন্তদন্ত উঠে গেল পরেশ। চন্দন বেচুবাবুকে বলল, বলুন, দাদা।

বেচুবাবু শুধু বললেন, ইয়ে—আজ রাত্রে কিছু মাল আসছে। কখন পৌঁছবে, ঠিক নেই। গোডাউনে রেখে দেবেন। সকালে তো আমি আসছিই।...

রাত দুটোয় ঘুম ভেঙে গেল চন্দনের। ফরিদ ডাকাডাকি করছে। বাইরে ট্রাকের হর্নের শব্দ হচ্ছে। সে বাইবে বেরোল।

কাগজপত্রে রুমার নাম! সে কী! এতো হওয়া উচিত কোম্পানীর নামে—বরাবর তাই হচ্ছে। ড্রাইভার বলল, বাবু, জলদি সহি দিন। ঘুম আসছে।

চন্দন বলল, সীল লাগবে না? এ-নামের সীলটীল তো নেই।

কুছু দরকার নেই। ফর দিয়ে সহি দিন। ব্যস। ডেট দিন আগলা পরশু রোজের।

ওরা চলে গেল। গুদামে এসে চমকাল চন্দন। বলল, মাল ভেজা কেন?

ফরিদ হাসল।...কে জানে। সরুন, দরজা লাগাই।

পাঁচ

হকসায়েব চুপি চুপি বললেন, এক কাজ করলেই পারেন চন্দনবাবু। ওই যে জামাইভাণ্ডারের পাশে হোটেলটা আছে—দেখছেন? দ্যাখেননি? হোটেলটা ভাল। গত বছর উড়ে এসেছে এখানে।

চন্দন একটু হেসে বলল, উড়ে এসেছে মানে?

তা বই কি! বহরমপুরের এপারে রাধার ঘাট—দেখেছেন তো? বরাবর ওখান দিয়েই লোকে গঙ্গা পেরিয়ে শহরে যেত। কাজেই রাধার ঘাটে একটা ছোটখাট বাজারমতো ছিল। এমনি জমজমাট জায়গা। তারপর গঙ্গার ওপর সরকার-বাহাদুর ব্রীজ দিলে। বেশ খানিকটা তফাতেই দিলে। তখন হল কী রাধার ঘাট দিনে দিনে মরতে বসল।...হকসায়েব পানরাঙা দাঁত খুলে হো হো করে হেসে উঠলেন নিজের রসিকতায়।...ঘাটের মড়া হয়ে গেল রাধার ঘাট। জন নাই, প্রাণী নাই, সুনসান্ সকালসন্ধ্যে। খাঁ খাঁ করে চারদিক। সেই খাঁ খাঁ-করা রাধার ঘাটের হোটেলওয়ালি, রাধা তখন কী করে? সে—

বুঝতে পেরে চন্দন বলল, হোটেল-শুদ্ধ উড়ে এল রূপপুর চটিতে?

উৎসাহে মাথা দুলিয়ে হকসায়েব বললেন, এল। যাবে কোথায়? ওই যে—কথায় বলে, 'নদীর একূল ভাঙে তো ওকূল গড়ে, এই তে। নদীর খেলা! শোনেননি গানটা? আহা-হা বড় ভালো গান।

গানের স্বাদে, কিংবা জীবনের একটা গূহ্য তত্ত্বের আবেশে আবিষ্ট হয়ে হকসায়েব কিছুক্ষণ আপনমনে মাথা দোলালেন। তারপর বললেন, রাধা মেয়েটি বড্ড ভালো। আমাকে বাবা বলে। খুব খাতির করে। করবে না আবার! আগের দিনে রেতেবিরেতে কলকাতা-বহরমপুর নানা জায়গা থেকে এসেছি. ঘাট পেরিয়ে এসেই রাত কাটানোর আস্তানা খুঁজেছি। স্বজাতির হোটেল একটা ছিল ওখানে। কিন্তু রাধার সামনে দিয়ে সেখানের ঢোকার সাধ্যি আছে বাবা? ছিল না। ও আমার কোন জন্মের মা।

চন্দন প্রশ্ন করল, আপনি জন্মান্তর মানেন?

ধর্মে মানতে নাই, মর্মে মানি।...হকসায়েব ফের জোরে হাসলেন। যেন চমৎকার মিল দিয়ে কথা বলার গর্বে। তারপর বললেন, রাধা বড় আজব মেয়ে। বাইরে-বাইরে সে এক, ভিতরে অন্য। ওর ভিতরটা আমি দেখেছি কি না! আমি তো মুসলমান, তা সে আমার জন্যে আলাদা খাওয়া, আলাদা শোবার ব্যবস্থা করে দিত। আমি খেতাম বাবা। এখনও হিন্দুর বাড়ি খাই—আবার কত হিন্দুও আমার বাড়ির রান্না খেয়ে তারিফ করে? বাবা চন্দনবাবা...হঠাৎ চন্দনের হাত দুটো ধরে ফেললেন হকসায়েব।...আপনাকে আমার বাড়ি খেতে হবে একবেলা। রাজী?

চন্দন বলল, ভাবছিলাম নিজেই বলব। বলুন, কবে খাওয়াচ্ছেন?

আজই হোক। খবর পাঠাই, কেমন? মোটে চার মাইল রাস্তা।...হকসায়েব উঠে দাঁড়ালেন।

চন্দন ব্যস্ত হয়ে বলল, না, না। আরেক দিন হবে। বরং এক কাজ করুন না, আপনার ওই রাধার হোটেলেই ব্যবস্থা করে দিন। স্পেশাল ব্যবস্থা। মিলের ওপর হিসেব করে মাসকাবারে টাকা নেবে। এ হৃদয়রঞ্জন চক্কোত্তির রান্না আর সহ্য হচ্ছে না।

হকসায়েব বললেন, এক্ষুণি হয়ে যাবে। হৃদে ঠাকুর ফের শিশিরের গদীতে চলে যাক।

চন্দন দমে গিয়ে বলল, ওকে সেটা বলাই তো আমার পক্ষে মুশকিল। লোকটা এত ভক্তিটক্তি করে, মুখের ওপর ও-কথা বলিই বা কী করে?

সেটা ঠিক। হৃদয়ঠাকুর বড় মজার লোক। ঘোর গাঁজাখোর—দিনরাতে সব-সময় 'বাঁশিতে' টান দিয়ে মৌতাত জমিয়ে রাখে। ঢুলু ঢুলু চাউনি। তা বলে কাজের বেলা ভুলচুক বড় একটা হয় না। একটা বাদে—নুন-ঝালের ব্যাপারে তার হিসেবের গরমিল হয় দুবেলা। আর আসল ব্যাপারটা টের পেয়েছে চন্দন। লোকটা রান্নাটান্না মোটেও জানে না। কেউ সেকথা তুললে চোখ কপালে তুলে (ওটা তার অভ্যাস। যখন কারও সঙ্গে কথা বলে, তার দৃষ্টি আকাশে গিয়ে পড়ে এবং এইতে তাকে বেজায় রাগী মনে হয়।) হৃদয়ঠাকুর বলে, দ্যাখো হে, আথায়

ফুঁ শাঁখে ফুঁ আর কানে ফুঁ—এই তিনটে ফুঁ হল আমাদের ইয়ে। বুঝলে কিনা? ওসব ছেঁদো কথা আমাকে শুনিও না। আগুন জ্বলে যাবে, বলছি।... পরক্ষণে ফিক্ করে হেসে বলে, অবিশ্যি আরেক ফুঁ আমার আছে।

বেচুবাবু ধমক দিলে হৃদয়ঠাকুর আড়ালে চোখ মুছতে মুছতে বলে, ভারি তো পয়সা হয়েছে বেনের ছেলের! সানবাঁধার বেনেগুষ্টির কীর্তি সবাই জানে। আর আমি হলাম গে গোকর্ণের অসীম প্রতাপশালী জমিদারের এক হতভাগ্য সন্তান। যা না গোকর্ণে। দেখে আয়, আমার বংশের কী ছিল। যা—চলে যা না। ফিরে এসে মুখ খুলিস শালা। চোখ ট্যারা হয়ে যাবে। ওরে, আমার আগের পুরুষের প্রতাপে বাঘে গরু চরাত মাঠে। সে-খবর রাখিস?...

সেই হৃদয়ঠাকুর, রাতে যখন চন্দন হিসেবের কাগজ দেখছে, পায়ের কাছে উবু হয়ে বসে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে, চন্দন বলে, কী ঠাকুরমশাই, মৌতাতের সময় গেল যে। এখনও বসে কী করছ?

আপনাকে দেখছি বাবা।

আমাকে? কেন বলতো?

অনেক প্রশ্নেও ব্যাপারটা ফাঁস করে না সে আপাতত। এ-কথা-সে-কথার এলোমেলো সুতো ছড়ায়। অবশেষে টের পায় চন্দন। কিছু পয়সা-কড়ি চায় হৃদয়ঠাকুর। মেয়ের বাড়ি একবার যাওয়া দরকার। খালি হাতে যাওয়া ভাল দেখায় না। আর যাবেই বা কেমন করে? প্রাক্তন জমিদারসন্তান।

হৃদয়ঠাকুরকে কথাটা নিজের মুখে বলতে পারবে না চন্দন। বেচুবাবুই বলুক। আজই বলে দিক। দুপুরে যা খাইয়েছে, বমি করতে পারলে বেঁচে যেত। তাই হকসায়েব এলে কথাটা তুলেছিল সে। হকসায়েব রাধার হোটেলের কথা বললেন? দেখা যাক্ না।

বিকেলটা আজ ফাঁকাই ছিল। ইন্দ্রাণী থেকে লোক এসে টাকা দিয়ে যাবার কথা ছিল। সে বেচুবাবু রইল। চন্দন বলল, বেচুবাবু আমি আসছি। ওরা এলে আপনি একটু দেখবেন।

হকসায়েব বেচুবাবুর কানে ফিসফিস করে সম্ভবত হৃদয়ঘটিত ব্যাপারটার ফয়সালা করছিলেন এতক্ষণ। বেচুবাবু হাসতে হাসতে দুজনের উদ্দেশ্যেই বলল, ঠিক আছে।

হকসায়েব বললেন, কই, চলুন চন্দনবাবু। আপনাকে জায়গামতো পেঁছে দিয়ে আসি।

কথাটা সাংকেতিক—কারণ, হৃদয়ঠাকুর তখন কাছাকাছি এসে পড়েছে। বারান্দার নিচে কয়লা ভাঙছিল একটা বাচ্চা ছেলে। ওদিক থেকে বারবার এসে তদারক করে যাচ্ছিল হৃদয়। এবার বারান্দায় বসে কয়লার টুকরোগুলো গম্ভীর-মুখে পরখ করছে। করতে করতে বলল, ধুস্, শালা! করছিস্ কী! এই রসগোল্লার মতো হবে—এই যে, এইটের মতো। হ্যাঁ। তবে না গনগন করে আঁচ ঠিকবে বেরোবে। সেদ্ধ হবে। বাবুদের পেটে রামরাবণের যুদ্ধ হবে না!

ছেলেটি খিকখিক করে হাসতে হাসতে কয়লা ভাঙছে। বোঝা যায়, অবেলায় বেশ মৌজে আছে হৃদয়। চাপা গুনগুন করে গান গাইছে। মনটা একটু কেমন করে

উঠল চন্দনের। না—চাকরী যাচ্ছে না লোকটার। চন্দনের সঙ্গে সম্পর্কটা বোধ হয় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে! চন্দনের স্বভাবের কানুনটা এই। পরিচয় বা জানাশোনা যত সামান্যতম থাক, সে তাকে চটাতে ভয় পায়।

বারান্দায় ওদের দেখে হৃদয় পা নাচাতে নাচাতে বলল, আজ স্যার রাত্তিরে ছানার ডালনা খাওয়াব।

চন্দন শুধু বলল, তাই নাকি! বেশ তো!

দু'জনে চাপা হাসতে হাসতে রাস্তায় গিয়ে উঠল। কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটার পর হকসায়েব বললেন, বাবা চন্দনবাবু, আপনি আমার ছেলের মতো। কিছুদিন থেকে একটা কথা বলিবলি ইচ্ছে করে, পারি নে। এখন বলব?

চন্দন একটুখানি দাঁড়িয়ে বিস্মিতভাবে বলল, হ্যাঁ, নিশ্চয়।

আরো কিছুটা হাঁটার পর মুখ খুললেন হকসায়েব।...জানি না বলাটা উচিত হবে কি না। কারণ, হাজার হোক, আমি আপনার পর—পরেশবাবু আপনার নিজের লোক। তাই—

ওঁকে থামতে দেখে চন্দন কৌতূহলী হয়ে বলল, কী বলুন না শুনি? পরেশদা...আমার খানিকটা নিজের লোক বটে, কিন্তু আমার সঙ্গে তার সবদিকেই তফাৎ আছে।

হকসায়েব একটু হেসে বললেন, আছে—তা ধরতে পেরেছি বলেই তো কথাটা তুললাম। দেখুন বাবা, সেই যে কথায় বলে—'জেনেশুনে বিষ করেছি পান' আমার হয়েছে তাই। বাবা চন্দন, আপনি আমার ছেলে...চন্দনের হাত ধরে ফেললেন হকসায়েব।...কথাটা গোপন রাখবেন। আমি নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ—কোন সাতেপাঁচে থাকি নে। পৈতৃক জমি আছে খানিকটা। ওদিকে রেশম তাঁতের কারবার আছে গ্রামে। আমরা বাবা জোলার ছেলে। শিশিরবাবু আমার ক্লাসফ্রেন্ড ছিল কান্দী স্কুলে। তবে তার কথায় নয়, পাণ্ডেজী আমার দোস্ত—পাণ্ডেজীর কথায় এদের সঙ্গে আমি এক্‌নৌকোয় পা দিলাম। কিন্তু বাবা, যত দিন যাচ্ছে, বুকে ভয় বাড়ছে। কী যেন একটা গণ্ডগোল চলছে কোথায়—অথচ ঠিক ধরতে পারছি নে। এরা কেউ ভেঙেচুরে কিছু বলতেও চায় না। এদিকে রাত্তিরে আমার ঘুম নেই।...

হঠাৎ কণ্ঠস্বর চাপা করলেন হকসায়েব।.. ওদিকে নৌকোডুবি হল। ভরা গঙ্গায় মালশুদ্ধ ট্রাক গেল তলিয়ে। শুনছি, সেই মালের টাকা ট্রাকের খেসারাৎ পুরোপুরি ইনসিওরেন্স থেকে পাওয়া যাবে। এদিকে সে-রাতের যে মালগুলো এল...

চন্দন বলল, হুঁ। ভিজে ছিল সেগুলো।

তাহলে?

আমি কিন্তু কিছু বুঝিনি হকসায়েব। বিশ্বাস করুন।

আমি যেন বুঝেছি বাবা।

কী? কী বুঝেছেন?...চন্দনের চোখ জ্বলে উঠল এবার!

এরা নিজেরাই নৌকোর তলা ফাঁসিয়ে দ্যায়নি তো?

স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল চন্দন। কিছুক্ষণ তার গলার ভিতর শুকিয়ে

রইল। বুক ঢিপঢিপ করতে থাকল। তারপর সে সহজ হয়ে পা বাড়াল। বলল। তাতে আপনার কী? চলুন—পরেশদা খুব পাকা লোক।

হকসায়েবকে কেমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। চলতে চলতে বললেন পাণ্ডেজীর কথায় আমি দু হাজার টাকা দিয়েছি চন্দনবাবু। আমার সর্বস্ব বলতে পারেন।...

হোটেলের সাইনবোর্ডে লেখা আছেঃ রাধিকা হিন্দু হোটেল। রাধিকা বা রাধাকে দেখছিল চন্দন। বয়স এখনও চল্লিশ পেরোয়নি—কিন্তু ত্রিশের বেশি তো বটেই। মোটাসোটা শ্যামবর্ণ মেয়েটি। মোটামুটি সুশ্রী চেহারা। চওড়া লাল নকশিপাড় সাদা ধবধবে তাঁতের শাড়ি পরনে। পানরাঙা লাল ঠোঁট—একটু স্থূল। কানে সাদা পাথর বসানো বেলকুঁড়ি, গলায় চেনের লকেটহার, হাতভরা সোনার চুড়ি। গিন্নীর ধরনে কাপড় পরা। আঁচলে চাবির গোছা ঝুলছে। ছোট্ট তক্তাপোষের ওপর সতরঞ্চি—তার ওপর একটা বাক্সোর সামনে সে বসে চড়া গলায় হুকুম করেছিল। ..নেকি, বলি পাতাটা তুলবি? না, তোকেই তুলে ফেলে দেব! পরক্ষণে হাসি মুখে—রতন, রতনা রে! একবার যা না বাবা হারুবাবুর গদীতে। সেই দুক্কুরবেলা পেঁয়াজের কথা বলে এল, আলু বলে এল—কোথা বা পেঁয়াজ, কোথা আলু! মিনসে ক্ষেতে হাঁটু গেড়ে আলু পেঁয়াজ তুলছে নাকি রে!—বসুন বাবা, বসুন। বাবু আপনিও বসুন।—মা সন্ধ্যা, অ সন্ধ্যামণি! কেটলি বসা উনুনে। আমার বাবা এয়েছেন।

তক্তাপোষে দুজনে বসে পড়ল। চন্দন চোখ বুলিয়ে নিল চারপাশে। বেশ ছিমছাম পরিচ্ছন্ন বলা যায়। আসনগুলো চমৎকার। পিঁড়ি আছে, ছোট ছোট শেতলপাটি আছে, আবার গালিচামতোও রয়েছে। বোঝা যায়, লোক অনুযায়ী আসনের ব্যবস্থা। কাঁচা ইঁটের দেয়ালে মাটির পলেস্তারা—তার ওপর চুনকাম করা হয়েছে। সবুজ রঙ। দেয়ালভরা অজস্র ক্যালেন্ডার! দেবদেবীর বাঁধানো ছবি।

হকসায়েব বললেন, মা রাধিকে, তোমার নতুন মাসকাবারি মককেল এনে দিলাম। কাল থেকে খাবেন। সদ্বংশের ছেলে—উচ্চ শিক্ষিত।

রাধা এক পলক চন্দনের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, সে আমি দেখেই বুঝেছি। বলি, সারা জীবন মা-গঙ্গার ঘাটের ধারে এমনি তো কাটিয়ে এলাম না গো! কত মানুষ দেখলাম—কত রকম 'রঙ' কত রকম ছিরিছাঁদ। ঘাট পেরিয়ে যায়, ঘাট পেরিয়ে আসে। আমি বসে-বসে দেখি।...অ সন্ধ্যা! দিলি জল চড়িয়ে?

ভিতর থেকে সাড়া এল—দিয়েছি পিসিমা। আর সেই সময় চন্দনের মাথার পিছনে আওয়াজ হল—কে এল গো, কে এল?

চন্দন চমকে উঠে মুখ ফেরাল। খাঁচায় একটা ময়না। বাঃ, বেশ তো! সে বলে উঠল, পাখিটা কথা বলে দেখছি। কদ্দিন পুষেছেন?

রাধা বলল, অনেক দিন। তা, আমাকে আপনি বলছেন কেন বাবু? রাধা জীবনে কখনও আপনি ডাক শোনে নাই। সবাই তাকে রাধা বলেই ডাকে—আপনিও তাই বলবেন।

হকসায়েব হেসে বললেন রাধিকে মার কথা! যাক্ গে, তাহলে দরদাম সব ঠিক করে নাও। আমি উঠব। ঘর যাব। মেয়েটার অসুখ।

রাধা বলল, কার অসুখ? ছোট, না বড়র গো?

বড় এখানে কোথা? ছোটর। মিলির। হকসায়েব উঠে দাঁড়ালেন।...

তা হ্যাঁ গা, আপনার বড়ছেলের খবর পাচ্ছেন-টাচ্ছেন আজকাল? শুনলাম, চিঠিপত্র যাওয়া-আসা বন্ধ হয়ে গেছে আজকাল! যুদ্ধটুদ্ধ বাধবে নাকি।...

হকসায়েব বললেন, ছেলেটা আমার দুশমন, গো। কী অভাব ছিল যে এদেশে পোষাল না—চলে গেল একেবারে মুল্লুক ছেড়ে বেমুল্লুকে! তুমিই বলো রাধা, আমার যা আছে—তা ও সারা জীবন পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খেলেও কি ফুরুতো? কিন্তু শুনলে না। বললে, বড় চাকরি পাবে ওখানে। লেখাপড়া শিখল কি তাঁতের মাকু চালাবার জন্যে?...চলি মা। চন্দনবাবু, আসি।

রাধা হন্তদন্ত হয়ে উঠল।...ও সন্ধ্যে! বাবা, চা বলেছি যে!

চা পরে একদিন খাবো।...বলে হকসায়েব চলে গেলেন।

চন্দন দেখল, উনি রিকশো ডেকে চলে যাচ্ছেন। রিকশোটা চোখের আড়াল হলে সে কুণ্ঠিত মুখে বলল, থাক্ চা খাব না। এখুনি খেয়ে এলাম। কত কী লাগবে তাহলে?

রাধা কান করল না। ভিতরের দিকে এগিয়ে বলল, এখনও কেটলি চাপাস নি? ওরে মুখপুড়ি মেয়ে! দেখছ, দেখছ কান্ড?...বাবু, বসুন না একটুখানি। পরিচয় তো ভালমত হল না। বসুন বসুন।

একটু পরেই সে ভিতর থেকে চায়ের কাপ হাতে বেরিয়ে এল। নিজের জায়গায় বসে মিষ্টি হেসে বলল, এসেছেন কোথায়? কী করা হয়? আগে কোথায় ছিলেন বাবু?

চন্দন বলল, জিয়াগঞ্জে বাড়ি। এখানে—

এটুকু শুনেই রাধা লাফিয়ে উঠল।...জিয়াগঞ্জ! বাবু আমি জিয়াগঞ্জের মেয়ে।

তাই নাকি! কোন পাড়ায় বাড়ি ছিল?

রাধা একটু হাসল। কপালে সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়েছে। বলল, সে মনে নেই। তিন বছরের মেয়ের সে কথা কি মনে থাকে বাবু? কলকাতায় নিয়ে গেল মা। কলকাতা ছাড়লাম, তখন আমার বয়স আর কত হবে? বারো-তেরোর বেশি নয়। মা মারা গেল। কেউ রইল না মাথার ওপর। এক দূর সম্পর্কের দাদা খবর পেয়ে উদ্ধার করলে নরক থেকে।

চন্দন ওর মুখে নরক শব্দটা শুনে মুখ তুলে তাকাল। রাধা সামনের পথটা দেখছে। স্থির দৃষ্টি।

...দাদা আনলে বহরমপুর ঘাটে। রাধার ঘাটে। রাধা এসে বসল রাধার ঘাটে। সে অনেক কথা বাবু। দুঃখের দিন কেউ মনে আনতে চায় না—ভুলে থাকতে চেষ্টা করে। তবু দুঃখের দিনগুলোই মনে পাকাপাকি বেঁচে থাকে। সুখের কথা চেষ্টা করেও মনে পড়ে না। তাই না বাবু?

চন্দন মাথা দোলাল।

যাক্‌গে। এখানে কী করছেন এখন?

এই হকসায়েবদের নতুন কোম্পানিতে ম্যানেজার হয়ে এসেছি।

ওমা! তাই বলুন!

পরেশ মজুমদারকে চেনেন?

রাধা রহস্যময় ভঙ্গীতে মাথা নেড়ে বলল. খুব চিনি।

উনিও জিয়াগঞ্জের লোক।

ও মা আমার কী হবে!. .রাধা অকারণ খুশীতে ফেটে পড়ল—নাকি সবটাই তার অভিনয়। ..তা, পরেশবাবু কেউ হন বুঝি?

হ্যাঁ, দূর সম্পর্কের দাদা।...ইচ্ছে করেই এই মিথ্যেটা বলল চন্দন। কিন্তু এর পিছনে কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

রাধা বলল, তাহলে তো আর কথাই নেই। আসুন কাল থেকে। কটা নাগাদ আসবেন, বলুন। দরের জন্যে কথা নেই। পরেশবাবু যা বলে দেবেন, তাই হবে। ওরে বাবা, আপনার মতো বাঁধা মানুষ পাওয়া আমার ভাগ্যি, বাঁবু।... ও সন্ধ্যে, রতনা এল রে?...

রাস্তায় আসতেই একেবারে হৃদয় ঠাকুরের মুখোমুখি। তার হাতে তেলের বোতল. একটা পেতলের সরা। দাঁড়িয়ে আছে একেবারে মুণ্ডুহীন এককাণ্ড গাছের মত। অনড়। স্পন্দনহীন। চন্দন বলল, কী ঠাকুর! এখানে কী করছ?

হৃদয় ঠাকুর দু'পা এগিয়ে যথারীতি আকাশে চোখ তুলে ভ্রূ কুঁচকে বলল, ওই বেশ্যা মাগীর ওখানে গিয়েছিলেন। ছিঃ! ছাঃ! থুঃ! ওই রাধার ঘাটের পচা মড়া খানকি! স্যার, আপনার ইজ্জত গেছে। হুঁ-উ—আর নেই।

চন্দনের একটু ধমক দিতে ইচ্ছে করল। কিন্তু দিল না। হাঁটতে হাঁটতে বলল, বেচুবাবু থাকলে বলো আমি পরেশদার বাড়ি গেছি।

চন্দনের পথ আটকে হৃদয় বলল, জানেন? ও মাগী ভাতারকে বিষ দিয়ে মেরেছিল? হাজতে গিয়েছিল? ঘাটের হোটেল উঠে গিয়েছিল ক'মাসের জন্যে—সে-খবর রাখেন? জানেন, ও এখন শঙ্কর ড্রাইভারের 'রাখনি' (রক্ষিতা)?

চন্দন বিরক্ত হয়ে বলল, ঠাকুর—নিজের কাজে যাও।

সে এগিয়ে গেল হনহন করে। মনে হল, এ সব কথার মূলে সত্যতা যাই থাক, তার সামনে এমনি করে বলাটা লোকটার স্পর্ধা ছাড়া কিছু নয়। পিছনে তখনও হৃদয় ঘোঁত ঘোঁত করছে।...

দরজা খুলে দিল লতু। চন্দন বলল, তোমার মা কেমন আছে?

লতু শুধু হাসল। বারান্দা থেকে স্নেহধারা বলল, ওর মাকে তো বিশ্বযুদ্ধ নির্বাসন দিয়েছিল...বাকি ছিলে তুমি। তুমিও দিলে।...পরক্ষণে হাসল সে।...এস। রুমা কই?

চন্দন বলল, রুমা কই, আমি কেমন করে জানব?

স্নেহধারা বলল, বারে! তাকেই তো পাঠিয়েছি তোমাকে ডাকতে। দেখা হয়নি?

ছয়

একটু চমকে উঠেছিল চন্দন। বুকের ভিতর মৃদু শিহরন অনুভব করেছিল।

স্নেহবউদি তাকে ডেকেছেন বলে নয়, রুমা তাকে ডাকতে গেছে বলে। নিজেকে এ-চমক আব অস্বস্তিকর শিহরনের কারণ খুঁজছিল সে। স্নেহধারা অনর্গল কথা বলছিল—তার কানে যাচ্ছিল না কিছু। কেন এটা হচ্ছে? সে ভাবছিল। লতু বা ইনতুকে হাইওয়ের দিকে পারতপক্ষে যেতে দ্যায় না স্নেহ-ধারা। কাজেই রুমাই যাবে—সেটা খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। এবং রুমার এই যাওয়াটার মধ্যে চন্দনের একটা গভীর অথচ অস্বস্তিকর আনন্দ জড়িয়ে রয়েছে যেন। প্রায় এক সপ্তাহের বেশি সে এখানে এসেছে। এর মধ্যে কোনদিন অবশ্য রুমাকে তার আস্তানায় পাবার আশা সে করেনি। এটা ভাবেও নি। এখন মনে হচ্ছে, রুমা তার ওখানে গেলে এবং কীভাবে সে কাজ করছে, কী কাজ করছে, কেমন ভাবে খাচ্ছে দাচ্ছে-শুচ্ছে খোঁজখবর নিলে ভারী ভালো লাগত। এমন কি সামান্য দুঃখমেশানো অনুযোগও তার মনে এসে গেল, এখনও তো সে বিদেশী—কেন যায়নি রুমা—এত দিন? রাস্তায় হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে সদ্যচেনা লোকও কিছু সঙ্গ দ্যায়, অকারণ কথাবার্তা বলে, এবং সে তো নিছক ভদ্রতার ব্যাপার। রুমাও তাই করেছে। চন্দন নিজের মনের অন্ধকার দিকটায় তাকিয়ে শব্দহীন প্রশ্ন ছুঁড়ে মারল—তাহলে কি সে রুমার প্রতি কোন অভাবিত প্রত্যাশা লালন করে বসে আছে নিজের অজানাতে?

স্মৃতির যতটুকু আপাতত দেখা যাচ্ছে, সেটুকুতে চোখ রাখল সে। তার সঙ্গে রুমার বয়সের তফাত কমপক্ষে আট থেকে দশ বছর তো বটেই।..হুঁ, দশই বলা যায়। বি-কম পাশ করল যখন, তখন তো তার বয়স কুড়ি পেরোচ্ছে। তখন সময়টা ছিল বর্ষা। গঙ্গার জলের রঙ বদলে গাঢ় গেরুয়া হয়ে উঠেছিল। ঘাটের পাশের আকন্দ আর পেত্নীঝোপগুলো ডুবে গিয়েছিল। ঘাটবাবু তেওয়ারীজীর আট-চালাটা বটগাছের নিচে উঠে এসেছিল। কূলে কূলে ভরা গঙ্গার ওপারে আজিমগঞ্জ স্টেশন থেকে ছেড়ে যাওয়া ট্রেনের তীব্র হুইসল প্রতিধ্বনিত হ'ত দ্বিগুণ জোরে। আর সেবার ভরা গঙ্গায় সাঁতার দিতে দিতে চন্দন লক্ষ্য করেছিল, রুমা তার ফ্রক খুলে গা মুছছে না। শুধু তাই নয়, সে ডাকছেও না চন্দনকে—চাঁদুদা! গা মুছিয়ে দিয়ে যাও। রুমার অনাগত যৌবনের বীজ থেকে অঙ্কুরোদগম ঘটেছিল ঠিক সেই সময়। সেদিনও একটু অস্বস্তি জেগেছিল তার মধ্যে। একটা আবছা বেড়া যেন দেখা যাচ্ছে—তার ওদিকে রুমার খোলামেলা প্রান্তরটা নিষিদ্ধ ঘোষিত হচ্ছে। পিঠ ফিরিয়ে রুমা চুল থেকে জল ঝাড়ছিল। উঠে এসেছিল চন্দন। হঠাৎ অকারণে তার চুল ধরে মাথাটা ঘুরিয়ে দিয়ে বলেছিল, এই! খবরদার চাঁদু বলবিনে! সোজা মাঝ-গঙ্গায় ছুঁড়ে দেব বলছি। চানুদা বলতে পারো না?

রুমা চেঁচামেচি করছিল।...আঃ লাগছে, লাগছে!...তার এ-প্রতিবাদের মধ্যে

একটা নতুন ব্যাপার ছিল সেদিন। সে ক্রমাগত ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিল। পরক্ষণে চন্দনও টের পেয়ে গিয়েছিল এটা রুমার যেন আত্মরক্ষার চেষ্টা। এবং নিজের দেহকে নারীদেহ বলে চিনে ফেলেছে। তাই একটু লজ্জা পেয়েছিল সে।

আরও একদিন অভ্যাসমতো তাকে দু'হাতে জড়িয়ে শূন্যে তুলতে গিয়ে তার আঙুলে একটা নতুন নরম স্পর্শের স্বাদ জড়িয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিল সে। খুব শীগগির বুক দেখা দিয়েছিল রুমার।

এ সব কাণ্ড বারেবারে ঘটেছে। পারুল বিরক্ত হয়ে বলেছে, আঃ! কী হচ্ছে! ওকে জ্বালাতন করিস কেন চানু? তোর বুদ্ধিশুদ্ধি আর হবে না? ও আর কচি খুকীটি হয়ে নেই, মনে রাখিস।

বাইরের লোকেরা তাকে চাঁদু বলত—আজও বলে। বাড়ির লোকেরা বলে চানু। চাঁদু শব্দে কী যেন ঠাট্টা মাখা রয়েছে—এত বিশ্রী লাগে। স্নেহবউদি প্রথম প্রথম চাঁদু বলত—পরে হয়তো রুমার দেখাদেখি চানু বলতে শিখেছিল। কিন্তু রুমা—ভারী দুষ্টু চঞ্চল সে, ইচ্ছে করেই মাঝে মাঝে অপ্রীতিকর চাঁদু শব্দটা ব্যবহাব করে বসত। চন্দনের খুব রাগ হ'ত। কিন্তু রুমার দেহ-মনের সেই নতুন যুগটা শুরু হলে আর দৈহিক নির্যাতন করা সম্ভব ছিল না তার পক্ষে। গায়ে হাত দিতেও তার অস্বস্তি হ'ত। অগত্যা মুখের কথায় রাগ ঝাড়া ছাড়া উপায় ছিল না।

এবারে সে লক্ষ্য করছে—এরা দুই বোনে তাকে পুরো নাম ধরেই ডাকছে। এ বুঝি তার বয়সের সম্মান দেওয়া। অথচ রুমা আজ চাঁদুদা বলে ডাকলে তার খারাপ লাগবে না। এবং চানুদা বললে তো খুবই ভাল লাগবে। লক্ষ্য করার মতো ব্যাপার, রুমার যে ছোট্ট দেহটা একদা সে পুতুল হিসেবে ব্যবহার করেছিল নিঃসঙ্কোচে—রুমা ক্রমাগত দিনে দিনে যত কিশোরী হয়ে উঠছিল, তার সেই দেহ আর অমন করে নিঃসঙ্কোচে ছোঁওয়া যেত না, অথচ সেটা তখনও তার আয়ত্তের বাইরে চলে যায়নি।

আজ এসে দেখল, সে রুমার কাছে পুরো বহিরাগত। রুমার দেহের কথা ভাবতেও দারুণ লজ্জা-সংকোচ ও পাপবোধ হুড়মুড় করে এসে পড়েছে। অথচ কী অদ্ভুত ব্যাপার, রুমার রক্তমাংসহাড়ে গড়া ওই দেহের প্রত্যেকটি জায়গার প্রতিটি সেণ্টিমিটার তার পুরো মুখস্থ। রুমার ডান উরুর কালো কালো পাঁচড়ার দাগ, দুটি স্তনের মাঝে তিল দুটো (ভারী আশ্চর্য এটা), পিঠের দিকে শিরদাঁড়ার নিচে যে তিনকোণা হাড়টা অর্থাৎ 'পিকচঞ্চু অস্থি'—সেটা গোটাটা হালকা নীল রঙের, আর বগলে একটা ফোড়ার দাগ—এই রকম অনেক কিছু এখনও তার চোখের সামনে স্পষ্ট। চোখ বুজলে সেই ন্যাংটা মেয়েটাকে দেখতে পায়। এবং আজ এইটেই যেন বড় অস্বস্তিকর। ভীষণ কৌতূহল-উদ্রেককারী। অথচ কেমন যেন কোন সরকারী এলাকার মতো—যার চৌহদ্দিটি তারকাঁটায় আকীর্ণ, গেটের মাথায় লেখা আছে: প্রবেশ নিষিদ্ধ। আইনত দণ্ডনীয়। আর দণ্ডনীয় বলেই যেন, এখন এই মুহূর্তে, স্নেহবউদির অনর্গল বাক্যবুহের মাঝে নিরাপদে বসে থাকতে থাকতে, তার ভীষণ সাধ জাগল রুমার দেহের সেই সুপরিচিত দাগগুলো দেখতে। দাগগুলো কি মিলিয়ে গেছে? ক্রমাগত যোগান পাওয়া অঢেল রক্ত-

মাংসমেদ আর লালিত্যের নিপুণ কারিগরি কি তাদের মুছে ফেলতে পেরেছে পুরোপুরি? না মুছলে সে যেন কিছু কলংকের প্রতীক হয়ে থাকবে। সৌন্দর্যের মাঝখানে কিছু খুঁত থেকে যাবে। দেখতে তো বটেই—শুনতেও খারাপ লাগে যে রুমার পাঁচড়া বা ফোড়া হয়েছিল। তাই না? অবশ্য তিল দুটোর কথা আলাদা। কিংবা পাছার ওই তেকোণা হাড়ের নীলচে রঙটার কথাও। কিন্তু ভীষণ কৌতূহল হচ্ছে দেখতে। আচ্ছা, রুমাকে যদি বলা যায় কথাটা—সে কি দেখাতে পারবে এখন? নির্ঘাৎ পারবে না। এই দেখাতে না-পারাটাও বেশ অদ্ভুত মানুষের জীবনে। মানুষের সমাজের সম্ভবত এই সব আইন। সেই আইন কম বয়স থেকে মানুষদের শেখানো হয় ক্রমাগত এবং তারা নির্দ্বিধায় মেনে চলে। কিন্তু না মানলেই বা কী ঘটতে পারে? যদি না মানে রুমা, মানে না চন্দন?...হিমহিম সন্ধ্যায় তার শরীর ঘেমে উঠল। অদ্ভুত একটা উত্তেজনা লক্ষ্য করল নিজের মধ্যে। সে জানল, অনবরত ফিসফিস করে কে ভিতরের অন্ধকার থেকে আইন-ভাঙার প্ররোচনা দিচ্ছিল। এবং ভিতরের অন্ধকারে একটা হুড়োমস্তি উপদ্রব শুরু হয়েছিল।—যা তার রক্তকে গরম ও পরিশ্রমী করে তুলেছে।

স্নেহবউদির কথা শোনা গেল।...তা বলো তো ভাই, আমি কী করি? তুমিই বলো শুনি!

থতমত খেয়ে চন্দন বলল, হ্যাঁ—তাই তো!

স্নেহধারা বলল, তাই তো বললে চলবে না চন্দন। তুমি আমার মায়ের পেটের ভায়ের মতো। কখনো তোমাকে পর ভাবিনি—আজও ভাবিনে। তোমাকে কাছে পেয়ে আজ আমার ভাঙা হাড় জোড়া লেগেছে। তুমিই একটা পথ বাতলে দাও।

চন্দন শুকনো হেসে বলল, আমি কী পথ বাতলাবো?

স্নেহধারা মুখ ফিরিয়ে কান্না চেপে বলল, তাহলে তুমিও বলছ আমি বিষ খাব, নয়তো গলায় দড়ি দেব?

চন্দন আঁতকে উঠে হন্তদন্ত বলল, না, না! সে কথা কে বলতে পারে তোমাকে!

কথা কেড়ে স্নেহধারা বলল, পারে না কেন? খুব পারে। সোজাসুজি না হয় বলে না—ইশারাতে বলে?

চন্দন হেসে উঠল।...যাঃ! কে বলে? পরেশদা তো?

স্নেহধারা বলল, তোমার পরেশদা বলতে যাবে কেন? বারে! তাহলে যে ওর ক্ষতি হবে। আমি ওর কথা শুনে মরব—আর এমন নিরুপদ্রব বুড়িটি পাবে কোথায় যে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে কানামাছি খেলবে? আমি থাকাটাই তো ওর খাঁটি ঘিয়ের লেবেল।

চন্দন হাসতে লাগল। তারপর বলল, যাঃ যত ফালতু কথাবার্তা!

স্নেহধারা বোঁ করে ঘুরে বসল। ওর দিকে ঝুঁকে কুটিল ষড়যন্ত্রসংকুল চোখে ফিসফিস করে বলল, রুমা—আমার মায়ের পেটের বোন, বুঝেছ? যাকে তিন বছর বয়স থেকে মানুষ করছি, সেই রুমা এখন লায়েক হয়ে কলেজে পড়ে শিক্ষাদীক্ষা অর্জন করে আমার সর্বনাশ করার তালে আছে!...

চন্দন দারুণ আবেশ উত্তেজনা আর প্রতিবাদে তাকে থামিয়ে দিল—বউদি! কী বলছ? ছিঃ, এ-কথা তোমার মুখে শোভা পায় না!

যদিও স্নেহধারার কথাগুলো সে আদতে শোনেইনি, পটভূমিকাটা তার সবই অজানা, তবু সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল সঙ্গে সঙ্গে।

স্নেহধারা একটু সরে বলল, তুমি জানো। এই বাড়িটি ছাড়া আর আমার নামে কিছু নেই? বুঝতে পারছ, ওই লোকটার ভালমন্দ হঠাৎ কিছু একটা হয়ে গেলে আমি কী অবস্থায় পড়ব ছেলেমেয়ে নিয়ে? যা-কিছু করেছে—সব রুমার নামে করেছে। আর সেই জোরে আমার ছোট বোন হয়ে রুমা আমাকে ধমকায়। হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে বিছানায় ফেলে দ্যায়। এত সাহস সে পেল কোথায় বুঝতে পারছ না? লতুর বাবার সামনে রুমা আমাকে সেদিন যা অপমান করল, যদি মায়ের পেটের বোন না হ'ত—যদি ছেলেবেলায় ওই অনাথ বোনটাকে মায়ের মতো মানুষ না করতাম, আমি—আমি ওকে বঁটি দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে কাটতাম! হ্যাঁ—কাটতাম।...

হাঁফাতে হাঁফাতে সোজা বসল স্নেহধারা। ওর মুখের অর্ধেকটায় আলো পড়েছিল। ছায়ার মধ্যে থাকা চোখটা জন্তুর মত নীল জ্বলজ্বল করছে। অজানা ভয়ে চন্দনের বুকটা ধড়াস করে উঠল। সে দু-তিনটে মিনিট কথা বলতে পারল না। সিগ্রেট ধরিয়ে টানতে থাকল। বাইরের ঘরে ছেলেমেয়েদের পড়ার শোরগোল শোনা যাচ্ছে। দরজার ফাঁক দিয়ে সে দেখল এক বুড়ো ভদ্রলোক ওদের পড়াচ্ছেন। চন্দন অস্বস্তিতে অস্থির হচ্ছিল। বেশ তো ছিল—হঠাৎ আজ এখানে এসে পড়াটা ঠিক হয়নি। মনে হচ্ছে, এ বাড়িতে অনেক ফাটল আর সাপের উপদ্রব আছে। এটা একেবারেই ভাবতে পারেনি। আশ্চর্য! রুমার প্রতি তার দিদির এই মনোভাব এখন? রুমা কি এটা জানে? যদি না জানে তাহলে তো রুমার জানা দরকার এটা। বাইরে-বাইরে চমৎকার সংসার-যাত্রা দিনরাত্তির কাটানো গল্পগুজব—একটা আপনজনের মিষ্টি আবহাওয়ার গেরস্থালী, অথচ ভিতরে এই! পরেশদাও এটা কী জানে? চন্দনের দৃঢ় ধারণা হল—ওরা দুজনে কেউ ব্যাপারটা জানে না। জানা তো দূরের কথা, ভাবতে পারাও যে অসম্ভব। পরস্পর যে সম্পর্ক, যে করুণ দুঃখময় অতীতকাল, যে পটভূমি রয়েছে—তাতে এমন ঈর্ষা হিংসার আভাসও যে অকল্পনীয় মানুষের পক্ষে। কিন্তু স্নেহবৌদি মারাত্মক ভুল করছে। রুমা তার দিদিকে—তার মায়ের প্রতিমা এই মেয়েটিকে, ভুল করেও কি কোনদিন প্রবঞ্চনা করতে পারে? তাছাড়া ধুরন্ধর বুদ্ধিমান পরেশদা অত বোকা নয়। নাঃ—এটা স্নেহবউদিরই একটা দীনতাবোধ। একটা হীনমন্যতা। স্নেহবউদি তো এত নীচ মনের মেয়ে ছিল না! তাহলে কি সম্পদের সেই সনাতন যথ তার ভালো মনটাকে কবে বলি দিয়ে ফেলেছে!

সে স্নেহধারার দিক তাকাতে পারছিল না। এত ছোট হয়ে পড়েছে স্নেহ-বউদি! ভাবল, নাকি অবুঝ মেয়েমানুষের মন—বেশি লেখাপড়াও শেখার সুযোগ পায়নি, এ নিতান্ত সরল সংশয়। সংসারে তো এমন ঘটনা ঘটা অস্বাভাবিক নয়। তাই সে ভীত হয়ে পড়েছে। চন্দন মুখ ফিরিয়ে কথা বলতে গেল। আর দেখল, আলোয় থাকা চোখটায় জল চকচক করছে—স্নেহবৌদির গাল ভেসে যাচ্ছে। সে বলে উঠল, বউদি, বউদি! কী, হল কী তোমার? মিছিমিছি যাতা সব ভেবে খামকা মন খারাপ করছ কেন বল তো? আমি তো আছি—

আমি এখানেই থাকব। যদি এখানে নাও থাকি—যেখানেই থাকি না কেন, তুমি ভেবো না—কিছু ভেবো না বউদি, তোমার সব কিছুর দায়িত্ব আমার রইল। তুমি বিশ্বাস করো—

চন্দন ভাবাবেগে আপ্লুত হয়ে উঠেছিল। যেন রুমার প্রতি এ সংশয়-সন্দেহকে একটুও বরদাস্ত করতে পারছিল না। তার মনে হচ্ছিল—রুমা কাঠ-গড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার অব্যাহতি দরকার। বেচারা রুমা!

স্নেহধারা সঙ্গে সঙ্গে চোখ মুছল। উঠে দাঁড়িয়ে বলল, বসো আসছি। তোমার চা খাওয়া হয়নি ভুলে গিয়েছিলাম ভাই।

সে বেরিয়ে গেল। চন্দন একটু হালকা সুরে বলল, রুমা আমাকে হয়তো খুঁজে তোলপাড় করছে রূপপুর চটি। অবিশ্যি বেচুবাবুকে আমি খবর পাঠিয়ে এসেছি, এখানে আসছি বলে।

বারান্দায় এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে স্নেহধারা জবাব দিয়ে গেল, রুমা তোমাকে ডেকে দিয়ে কান্দী যাবার কথা। ও বেরোচ্ছিল—তাই বললাম—তবে একবার ডেকে দিয়ে যাস।

চন্দন বলল এখন সন্ধ্যাবেলা কান্দী কী? আজ কলেজ ছিল না? যায় নি?

দূর থেকে ফের জবাব এল—আজ রোববার না? কী কাজ আছে নাকি—তাই গেল। লায়েক হয়েছে। নিজের খুশিতে চলে। কে আটকাবে বলো?

চন্দন ধড়মড় করে দরজার কাছে গিয়ে বলল, ফিরবে কখন রুমা?

স্নেহধারা ততক্ষণে রান্নাঘরে ঢুকে গেছে। শুনতে পেল না কথাটা। পরক্ষণে চন্দন একটু সঙ্কোচ অনুভব করে সরে এল। আগের জায়গায় বসল। এটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছিল যেন। রুমার প্রসঙ্গে—অন্তত বউদির ওই সব শোনার পর ব্যস্ততা প্রকাশ করাটা তার অশোভন। সে সতর্ক হল। বউদির সামনে রুমার সঙ্গে বেশি মেলামেশাটা ঠিক হবে না। তাহলে বউদি তাকে আর বিশ্বাস করবে না। বিশ্বাস না করে অবশ্যি নিজেই ঠকবে। মেয়েরা বড় অদ্ভুত!

কিন্তু রুমা রাত্রি অব্দি কান্দীতে কী করতে গেল? সিনেমা দেখতে? ওর সাহস স্বীকার করতে হয় তাহলে। নাকি কারো সঙ্গে গেছে? সে পুরুষ, না মেয়ে? চন্দন ঘড়ি দেখল। এখন সাতটা প্রায়। কৃষ্ণপক্ষের রাত। যদি ছটার শোয়ে যায়, নটায় বেরোবে ছবিঘর থেকে। তারপর বাসে চাপবে। আধ-ঘণ্টা পরপর বাস আছে রাত দশটা অব্দি। এখানে পৌঁছতে আধঘণ্টা সময় যথেষ্ট। তার মানে সাড়ে নটা থেকে সাড়ে দশটা অব্দি বাসস্টপের কাছে অপেক্ষা করলে রুমাকে দেখাটা জরুরী নয়। কার সঙ্গে গিয়েছিল—সেইটে দেখাই জরুরী। সে যদি কোন ছেলে হয়, তাহলে কি দুঃখ পাবে চন্দন? চন্দন, তুমি কি দুঃখিত হবে তবে? নিজের দিকে তাকাল সে। কোন স্পষ্ট জবাব পেল না। রুমার পক্ষে এখন প্রেম করাটা আদৌ স্বাস্থ্যকর নয়। বিবেকসম্মত নয়। অশোভন। বিশেষ করে তার জামাইবাবু তার নামে অনেক সম্পত্তি রাখার পর থেকে রুমাকে আত্মরক্ষার ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন থাকা দরকার। আশ্চর্য লোক পরেশ মজুমদার! যেন তার অবোধ শালীটির চারপাশে ইতিমধ্যে যথেষ্ট

অলক্ষিত তারের বেড়া দিয়ে ফেলেছে—শুধু তাই নয়, তাতে মারাত্মক ইলেকট্রিসিটি চার্জ করে রেখেছে। যদিও কোথাও কোন বোর্ড দেওয়া নেইঃ সাবধান—ছুঁইলেই বিপদ। এগার হাজার ভোল্ট। এবং একটা মড়ার মুণ্ডুর নিচে দুটো আড়াআড়ি হাড়।

চন্দন আপন মনে হাসতে গিয়ে দেখল এই কৌতুককর কল্পনার দরুণ যে পরিচ্ছন্ন হাসির দরকার—তার পিছনে যথেষ্ট জোর নেই। সে রুমার বাস থেকে নামল দৃশ্যটা ভাবতে গিয়ে বিপন্ন বোধ করল। বউদির ঘরের ভিতরটা দেখতে থাকল। সুদৃশ্য খাটের ওপর সম্ভবত ফোমের গদী-নকশাকাটা রক্তলাল চাদর। চমৎকার খয়েরি বেডকভারটা পায়ের দিকে উল্টে গেছে বলে দেখা যাচ্ছে। ভাবতে কেমন লাগে—অত চড়া রঙ স্নেহধারার পছন্দ। কোণে মস্তো রুপোলি ফুলদানীতে একতোড়া প্লাস্টিকের ফুল। সত্যিকার ফুল রাখলেই পারে। বউদিরা এখানে ফুলবাগান করছে না কেন? ছোট্ট উঠোনটা সব পুরনো ভাঙাচোরা মোটরপার্টসে ভরতে। একটা লাউ কিংবা কুমড়াগাছ দেখেছিল মনে পড়েছে। সেটা টিউবওয়েলের পাশে। অনাদরে পাঁচিল বেয়ে উঠেছে। অথচ একদিন এক টুকরো মাটির জন্যে যেন মাথা খুঁড়ে মরত স্নেহবউদি। মনে হ'ত বাসার পাশে এক টুকরো জমি পেলে বউদি তার শ্রীহীন সংসারটাও ফুলেফলে ভরে তুলবে। চন্দন লক্ষ্য করল, ঘরটার দেয়ালভরা শুধু কালেণ্ডার আর কালেণ্ডার। সবগুলোতেই দেবদেবীর ছবি। সিঁদুরের ছোপ। একটা তাকে রাধাকৃষ্ণ যুগলমূর্তি। অন্যটায় সিদ্ধিদাতা গণেশ। রামকৃষ্ণ সারদামণি। বড় বড় দুটো লোহার আলমারির মাথাতেও অজস্র পুতুল—পুতুল বলা ভুল, প্রায় সবই প্রতিমা। একটা আলমারির কপাটজোড়া আয়না। উজ্জ্বল রড-লাইটের গায়ে পোকা থিকথিক করছে। কবে কালীপুজো গেছে—এখনও পোকা কেন? তার চেয়ারের পাশে একটা র‍্যাক। র‍্যাকে ঢাকনা দেওয়া কতকগুলো বাক্স। জিয়াগঞ্জের সংসারের সেই বাক্সগুলো সম্ভবত। তার সামনে কাঠের আলমারিতে কাচের ভিতর দেখা যাচ্ছে, একগাদা কাঁসার বাসন। কাঁসার বাসন আজকাল কেউ কেনে নাকি? নির্ঘাৎ বউদির সে আমলের লোভ ও সাধ এ ব্যাপারে প্ররোচনা দিয়েছিল। আলমারিটার মাথায় চারটে ছোট বড় পেতলের ঘড়া আর বালতি দেখেও খারাপ লাগল তার। এত বড় ঘরটা হাঁসফাঁস করছে এত সব জিনিসপত্রর চাপে। বউদিটার রুচিবোধ বদলায়নি। হয়তো বেশি লেখাপড়া জানলে বদলাত। ক্যালেণ্ডারের মাথায়-মাথায় সেই সুচেনা হাতের কাজগুলোও শোভা পাচ্ছে। বউদির হাতের কাজ সব। ফ্রেমগুলো বদলায়নি এখনও। মানাচ্ছে না এখানে। 'পতি পরম গুরু', দুটো হরিণ, একটা বাঘ, আল্পনা, ইত্যাদি ইত্যাদি। এগুলোর জোরে তখন মেয়ের বাবারা হবু বরের বাবার সামনে হাসিমুখে দাঁড়াতে সাহস পেত। আচ্ছা, বউদি এখনও গান করতে পারে না? খুব ভাল একটা না গাইলেও নেহাত মন্দ গাইত না। চন্দন খুঁজে দেখল মাথার কাছে প্রকাণ্ড রেডিও—আর তার পাশেই কালো ঢাকনা দেওয়া বাকসো। সম্ভবত বউদি প্রথম সুদিনে একটা ভাল হারমোনিয়াম কিনে ফেলেছিল। আগে ওটা না কিনে রেডিও কেনার কথা ভাবা যায় না। কারণ জিয়াগঞ্জের জীবনে যখন পরেশদা হারমোনিয়াম সারাত, একবার রায়চৌধুরী বাবুদের মেয়ের খুব চমৎকার একটা ফোল্ডিং বেলোওয়ালা

হারমোনিয়াম নিয়ে বউদির সঙ্গে পরেশদার জোর কথা কাটাকাটি হয়েছিল। ওরা যন্ত্রটা নিতে এসে দ্যাখে স্নেহধারা আসর জাঁকিয়ে পাড়ার মেয়েদের নিয়ে গান গাইছে। রায়চৌধুরী বাড়ির মেয়ে। সোজা শুনিয়ে দিল যা শোনাবার।... সারতে দিয়েছিলাম। অমনি করে বাসরের আসর জাগতে তো দিইনি। অত সাধ থাকলে কিনলেই পারেন একটা।... ব্যস! পরেশদা সবে বাড়ি ঢুকছে। কথাটা শুনেছিল। তারপর যা হবার হল।

স্নেহধারার দুঃখটা বহুদিন ছিল। শুকনো হেসে বলত, বাসরের আসর জাগার দিন অনেকেরই আসে—কিন্তু ভগবান সবাইকে তো আসল জিনিসটি দ্যায় না ভাই। ওই শাকচুন্নীর গলা আমিও শুনেছি। ফাংশনে গাইতে গিয়ে তো চিঁ চিঁ ছাড়া রা বেরোল না সেদিন। আমি গেরস্তঘরের বউ—নৈলে...।

নৈলে যা হবার ছিল তা অনুমান করা যায়। বউদির সে সাধ ফুরিয়ে গেছে কিনা জানতে ইচ্ছে করছিল। আজ স্নেহধারার আলনা-বাকসো ভরতি কাপড় গয়নাগাঁটি, চমৎকার হারমোনিয়াম। সে সেজেগুজে বাসরের আসর জমালে এবং জিয়াগঞ্জের মস্ত বড়লোক সেই রায়চৌধুরী বাড়ির মুখরা মেয়েটি অভাবিতভাবে এখানে এসে পড়লেও আর বুঝি পরম তৃপ্তির হাসি ঠোঁটে ফুটে উঠবে না। সময় সব সাধকে এমনি করে পরাস্ত করে ফেলে।...

স্নেহধারা এল এতক্ষণে।

ট্রে-ভরতি চায়ের কাপ, একটা বাটিতে গরমাগরম তেলেভাজা, কিছু লঙ্কা-ভাজা ও মুড়ি। এতক্ষণ বুঝি ওই সব করা হচ্ছিল। চন্দন বলল, আরে, এ সব কী!

স্নেহধারা এখন অন্য রকম। বেশ হাসিখুশি দেখাচ্ছে তাকে। একটু আগের সেই হিংসুটে চেহারার কথা ভাবতে পারা যায় না। আঁচলে কপালের দিকটা আলতো মুছে বসল। বলল, খাও। একেবারে আসা ছেড়ে দিলে তুমি। জানো, তোমার জন্যে প্রতিবেলা এক মুঠো বেশি চাল দিতে বলি গ্যাঁদাকে। নিত্যি ভাত তরকারি ফেলা যায়। কে খাবে? গ্যাঁদা ছোঁড়াটা তো লাটসায়েব। ও একবেলার খাবার অন্য বেলায় ছোঁয় না। বলে অসুখ হবে। আমি বলি...হাসতে হাসতে স্নেহধারা বলল, আমি বলি...হ্যাঁ রে বাঁদর! তুই যে বলিস...এক সময় পেটের জন্যে নাকি গলায় দড়ি দিতে গিয়েছিলি? তখন বলে কি জানো? বলে—মানুষ যখন যেমন। তখন তেমন। আজ যদি তাড়িয়ে দাও বউদি, ফের তাই হবে।

চন্দন একমুঠো মুড়ি তুলে দেখল হাত চবচব করছে। আলগোছে মুখে ফেলে দিয়ে ভাবল, শুধু তেলেভাজাটাই খাবে। তারপর বলল, ওকে পেলে কোথায়?

স্নেহধারা বলল, তোমার দাদা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছিল। তখন তোমার দাদা ট্রাক চালাত নিজেই। সাঁইথে থেকে আসছে রাত্রিবেলা। দ্যাখে ব্রীজের কাল-ভার্টের ওপর দিব্যি আদুড় গায়ে ঘুমোচ্ছে। দেখে মায়া হল। নিয়ে এল। তখন তো ছোট বাচ্চা। গলায় পৈতে ছিল। বামুনের ছেলে। মা-বাবা কেউ নেই। দূরসম্পর্কের দাদার বাড়ি ছিল। বলে—দাদা না বিয়ে করবে, আমার না ইয়ে হবে! বিয়ে আর ইয়ে।

জোরে হেসে উঠল স্নেহধারা। চন্দন বুঝল অনেক দিনের জমানো কথাগুলো বেরিয়ে যাওয়ায় সে হালকা হতে পেরেছে। চন্দন বলল, বউদি, আর গান করো না? হারমোনিয়াম তো রয়েছে দেখছি!

স্নেহধারার মুখটা পলকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, হ্যাঁ, শখ তো ছিলই ভাই। তবে মাঝে একবার অম্বলের অসুখ হল। তারপর সেটা যদি সারল তো একটার পর একটা আর বিরাম নেই। চেহারাখানাই দেখছ শুধু—ভেতরটা ফোঁপরা। আর আগের মতো খাটতে পারিনে। অবিশ্যি খাটবার দরকার হয়ও না। ওরা করে টরে।

স্নেহধারাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে চন্দন বলল, তাহলে একবার 'বাসরের আসর' জাগাও দিকি। জাঁকিয়ে বসি।

দুজনে হেসে উঠল। স্নেহধারা বলল, মনে আছে তোমার?...তারপর এগিয়ে গেল হালকা চঞ্চল পা ফেলে। চন্দন লক্ষ্য করল স্নেহবউদির চেহারা ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে এক বেমানান কিশোরী—সরল, বোকাসোকা, গেঁয়ো—সত্যিকার অবলা।

নিপুণ ভঙ্গীতে স্নেহধারা হারমোনিয়াম বের করছিল বাকসো থেকে। পরম যত্নে, সতর্কতায়, নিষ্ঠায়—যেন ছন্দপাত না ঘটে, তালে যেন ভুল হয় না।..

বাসস্টপের কাছে চুড়ির দোকানটা। পাণ্ডেজীর গল্পটা মনে পড়ল। কিন্তু চুড়িওয়ালী মেয়েটি চন্দনকে চিনতে পারবে কি? যদি নিজে থেকে না ডাকে, সে কী অছিলায় দোকানে ঢুকবে এবং বসে থাকবে তাই ভাবছিল। কোথাও না বসে রাস্তার ধারে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না। তখন রাত নটা পাঁচ বাজছে। চন্দন কাছে যেতে যেতে ঝাঁপ ফেলে দিল আলতা-রাণী। পাশে একটা চায়ের দোকান অবশ্য আছে। একদঙ্গল পাটের ব্যবসায়ী সেখানে ভনভন করছে। বসার তিলমাত্র জায়গা নেই। খাবারের দোকান আছে অনেকগুলো। জায়গা ছিল। কিন্তু কিছু না খেয়ে এমনি বসে থাকা ভাল দ্যাখায় না। চেনাচিনিটা হয়ে গেলে অবশ্য অন্য কথা। চন্দন নিজের আচরণের প্রতি অবাক হল। হঠাৎ সে যেন চোরের দলে ঢুকে পড়েছে।

কেন সে আড়াল থেকে রুমাকে লক্ষ্য করতে চায়? কেন তার এ সন্দিগ্ধতা? আড়ষ্ট হয়ে গেল সে। প্রশ্নগুলো তার জ্বলন্ত ইচ্ছার চারপাশে ওই সব আলো-মোহিত পোকামাকরের মতো খিকখিক করে উঠল। জ্বালাকর একটা অস্বস্তি তাকে অস্থির করল। নিজের ওপর রাগ হল তার। আর সেই সময় সামনে একটা বাস আসছে। দুটো হেডলাইটের দু'ফালি আলো ঝকমকে তলোয়ারের মতো এগিয়ে আসছে। দ্রুত রাস্তার এক পাশে সরে গেল চন্দন ছায়া ঘেঁষে দাঁড়াল। পরক্ষণে বাসটা তাকে পেরিয়ে যেতেই হনহন করে সে চলতে চলতে বাসার দিকে। একবারও পিছু ফিরে স্টপে থেমে যাওয়া বাসটা দেখবার সাহস পেল না। বাসার সামনে রাস্তার ওপর তিন চারটে ট্রাক দাঁড়িয়ে রয়েছে। ছায়ার মধ্যে কারা বসে জটলা করছিল। আগুন ধকধক করে উঠছিল সেই ভিড়ে—

কড়া কটু গন্ধ। ড্রাইভাররা গাঁজা টানছে। চন্দন যেতে যেতে হৃদয়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।...চাঁদু এবার নির্ঘাৎ ডুবেছে মা গঙ্গায়—মাইরি ভজুদা, তোর দিব্যি। আমি স্বচক্ষে দেখলাম, মাগী ওকে পটকে ফেলেছে। ইদিকে পরেশের শালীর সঙ্গে নাকি বে হচ্ছে সামনে মাসে—বেচুবাবু বলছিল। বড় ভাবনায় ফেলে দিলে হে! শালাকে বড্ড ভালবাসি কি না!

ভেবেছিল দৌড়ে গিয়ে একটা লাথি ঝাড়বে শুওরটার পাছায়—কিন্তু হঠাৎ শরীরটা অবশ লাগল। এ কি আনন্দের প্রচণ্ড উচ্ছ্বাস, নাকি সন্ত্রাসের ভীষণ আঘাত? প্রায় টলতে টলতে সে বারান্দায় উঠল। বেচুবাবু বলল, আসুন। এইমাত্র পাণ্ডেজী খোঁজ করছিলেন।

সাত

পরদিন সকালে পাণ্ডেজীর গদীর দিকে যাচ্ছিল চন্দন। রাস্তার পাশে একটা খাটিয়া পেতে হেমন্তর সকালটা আয়েসে উপভোগ করছে জনাকতক সর্দারজী। কেউ চা খাচ্ছে। কেউ দিললাগি করে হা-হা হাসছে। তাদেরই একজন চন্দনকে পরিষ্কার বাংলায় বলে উঠল, নমস্কার স্যার। কেমন আছেন?

লোকটির চেহারা দেখে সর্দারজীদের একজন মনে হয়। মাথায় ঝুঁটি, দাড়ি-গোঁফ আছে, হাতে যথারীতি কাঁকন। থমকে দাঁড়াল চন্দন। কেমন যেন চেনা-চেনা লাগছে মুখটা। সে বলল, আপনাকে ঠিক চিনতে পারলুম না।

লোকটা হাসতে হাসতে উঠে এল।...আমি ব্রজ—ব্রজমোহন। গঙ্গার ওপারে গাড়ি চালাতুম—মনে পড়ছে না স্যার?

চন্দনের আবছা মনে পড়ল। ক' বছর আগে বহরমপুর-জিয়াগঞ্জ রুটে একটা স্টেশনওয়াগন প্যাসেঞ্জার বইত বটে। তার ড্রাইভারের নামও ছিল ব্রজ—আলাপ-সালাপ ছিল সামান্য। কিন্তু সে তো অন্য লোক।

ব্রজ বলল, চেহারা বদলে ফেলেছি—বুঝলেন? এমনি শখ গেল সর্দারজী সাজতে। যাক গে, শুনলুম—আপনি রূপপুরে এসেছেন। কিন্তু দেখা হচ্ছিল না এ্যাদ্দিন। কেমন আছেন?

চন্দনের আরও কিছুটা মনে পড়ল। কনকপাড়ার রাজকমলবাবুর স্টেশন-ওয়াগন চালাত ব্রজ। ভারী আলাপী লোক ছিল সে। একবার যেন তার খাতির করে ভাড়া নেয় নি। মোঘেকে আসছিল সে—হ্যাঁ। লালবাগ থেকে। শীতের সময় ছিল সেটা। চন্দন বলল, ভাল আছি। আপনি এদিকে কবে থেকে ব্রজবাবু?

ব্রজ পানরাঙা দাঁত ও জিভ বের করে হাত জোড় করল।...আপনি-টাপনি বলা কেন স্যার? তখন কিন্তু তুমি বলতেন। ও লাইনে সবাই তাই বলত। বলবে না কেন? বাগদীর ছেলে—চালাতুম রিকশো। তার প্রমোশন হল মোটর ড্রাইভারীতে। হলে কী হবে? আমি কিন্তু মনে মনে যা ছিলুম, তাই থেকে গেলুম আজও। চলুন, চা খাওয়া যাক।

চন্দন ওর অন্তরঙ্গতায় মুগ্ধ হল। বলল, এখনও কি সেই গাড়িটাই চালাচ্ছেন?

ব্রজ ফের করজোড়ে বলল, তুমি বলুন স্যার—আগের মতো।

হেসে চন্দন পা বাড়াল।..রাজকমলবাবুর খবর কী?

ব্রজ বলল. ভালই। এ রুটে গত বছর পারমিট পেয়েছেন। আগের রুটটা তো ক্যানসেল হয়ে গিয়েছিল। আর বলবেন না। কত রকম খেলা চলে এ লাইনে।

সামনের চায়ের দোকানটা বেশ গোছানো ছিমছাম। রেস্তোঁরা বলাই ভালো। কারণ ছোট্ট সাইনবোর্ডে লেখা আছে 'স্যাঙ্গুভ্যালি রেষ্টুরেণ্ট'। ভিতরে তিন-চারটে টেবিলও আছে—সবুজ রেকসিনে মোড়া। চেয়ার আছে। বাইরের বেঞ্চে বসত যাচ্ছিল চন্দন। ব্রজ ভিতরে ঢুকে ডাকল, আসুন! খালি আছে।

ভিতরে ঢুকে চন্দন দেখল দুটো 'লেডিজ'ও রয়েছে পর্দা ঢাকা। কাউণ্টারে একজন লম্বাটে রোগা প্রৌঢ় ভদ্রলোক গম্ভীর মুখে বসে কাগজ পড়ছেন। এখানে ঢুকলে মনে হয় না যে সামান্য দূরেই বিশাল ধানের মাঠ রয়েছে। শহরের ঝলমলে আভিজাত্যের আদল সামনে এসে দাঁড়ায় তক্ষুনি। ফাঁকা টেবিলের সামনে মুখোমুখি বসে ব্রজ বলল, পরেশবাবুর কাছেই শুনেছিলুম—আপনি এসেছেন। সময় পাইনে একেবারে। দু বেলা দুটো করে আসা-যাওয়া ট্রিপ। সামলাতে প্রাণান্ত হই। গাড়ি ছাড়বার সময় চেহারাটা দেখলে না—হাঁ হয়ে যাবেন। দুধারে লোক, সামনে বনেটে লোক। এক ইঞ্চি ফাঁক পাই দেখবার—আন্দাজ করে গাড়ি চালাই। বাপস, দিনে দিনে যত গাড়ি বাড়ছে, ভিড়ও তত পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। নেই। ওই দেখুন না! ওই তো যাচ্ছে!

রাস্তায় একটা চলন্ত বাস দেখাল ব্রজ। বলল, এই সাত সকালেই এমন ভিড়। মাইরি স্যার, লোকে যেন আর এক জায়গায় চুপচাপ বসে থেকে সুখ পায় না। ছোটাছুটি গুঁতোগুঁতি—ফেট!...ব্রজ তেঁতো মুখে এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ফিক করে হাসল হঠাৎ।...ফ্যামিলি এনেছেন— না একা?

চন্দন বলল, একা।

ব্রজ সিগ্রেট বের করে এগিয়ে দিল।...খান। আপনাকে আমার খুব ভালো লাগত—তাই মনে ছিল। আসলে এই রকমই হয় স্যার। আপনি এজুকেটেড লোক—ভাল বুঝবেন। কোন কোন লোককে দেখে খুব আপনার জন মনে হয়। আপনাকে আমার মনে ছিল।...

সে গলা তুলে ফের বলল, সীতাংশুদা, দুটো চা। মামলেট দুটো।

চন্দন বলল, শুধু চা'ই হোক।

নাঃ, খান।.....ব্রজ চাপা গলায় বলল।.....শালা এ পাপের জায়গায় এসে মন খুলে কথা বলার লোক খুঁজে পাইনে। কী আনন্দ না হচ্ছে! জানেন স্যার? এখানে সব ব্যাটা চোর—সব্বাই গলাকাটা। পয়সা ছাড়া রূপপুরে কেউ কিছু চেনে না। আপনি নতুন লোক—জেনে রাখা ভালো। খুব সাবধানে থাকবেন স্যার।

চন্দন বলল, আপনি একা থাকেন, না ফ্যামিলি নিয়ে?

ব্রজ হাসল।...ফের আপনি বললেন? ঠিক আছে, বলুন। হ্যাঁ—ফ্যামিলি আছে। পাগল হয়েছেন? একা থাকলে একটা পয়সাও রাখতে পারতুম ভেবে-

ছেন? রূপপুর সেদিকে বড্ড সেয়ানা! পরে বুঝবেন সব। তা—হাতে সময় আছে? চলুন না, বাসাটা দেখে আসবেন। কাছেই।

চন্দন ঘড়ি দেখে বলল, পরে একদিন হবে। এখন পাণ্ডেজীর গদীতে যাব। একটু কাজ আছে।

কাউণ্টার থেকে প্রৌঢ় লোকটি অর্থাৎ সীতাংশুবাবু বললেন, ব্রজ, তোমার ফার্স্ট ট্রিপ কটায় হে? আমার ছোট মেয়েকে কদমতলায় নামিয়ে দিয়ে যেও।

ব্রজ বলল, সাড়ে দশটা। আগে থেকে ব্যাগফ্যাগ রেখে যেতে বলবেন।

চা-মামলেট এসে গেল। রীতিমতো কাঁটা-চামচ ছুরিও। চন্দন বলল, এখানে বাড়ি করেছেন, না বাসা?

বাড়ি?...ব্রজ চোখ বড় বড় করে বলল।...আমার বাড়ি হবে? রূপপুরে? কী যে বলেন, সবাই কি পরেশবাবু হতে পারে স্যার? কপাল—লাক্।

সীতাংশুবাবু হাসতে হাসতে বললেন, লাক না হাতি। আজে-বাজে করে পয়সা ওড়ালে কী হবে? তুমি তো ঈশ্বরের কৃপায় কম রোজগার করো না ব্রজ। দুজনেই রোজগার করো। সুরকিকলের পাশে এমন চমৎকার প্লটখানা জলের দামে বিক্রি হল—বললুম। নিলে না।

ব্রজ বলল, যখন বললেন—তখন যে আমার অবস্থা টাইট। সীতাংশুদা, আর খোঁজখবর থ্যাকলে বলবেন—চেষ্টা করা যাবে। স্যার, আলাপ করিয়ে দিই। আমাদের সীতাংশুদা—জায়গা জমির দরকার হলে রূপপুরে ইনি ছাড়া চলে না কারো। আর দাদা ইনি আমাদের পরেশবাবুর লোক।...

চন্দন নমস্কার করে বলল, আমার নাম চন্দন...

বাধা দিয়ে সীতাংশুবাবু বললেন, জানি। পরেশবাবু বলছিলেন। আপনার বাড়ির জন্যে জমি আমিই দেখছি। এ তো আনন্দের কথা। পরেশবাবুর কাছে সব শুনেছি চন্দনবাবু।

চন্দন কৌতূহলী হয়ে বলল, কী শুনেছেন?

খুক খুক করে একটু হাসলেন সীতাংশুবাবু।...ব্রজ, ইনি পরেশবাবুর পরম কুটুম্ব হচ্ছেন জানো তো হে? সেই যে ওঁর শালী রয়েছে—সেই মেয়েটি হে, কলেজে পড়ে। বড় আনন্দের কথা।

ব্রজ হাঁ করে তাকিয়ে ছিল। গোঁফ পাকিয়ে হেসে বলল, আরে ব্বাস! ভালো, ভালো। ভারি চমৎকার মেয়ে। কিন্তু কী কাণ্ড! আমি ভাবতুম এনার বিয়েটিয়ে হয়ে গেছে।

চন্দন আড়ষ্ট হয়ে উঠল। হঠাৎ স্নেহধারার মুখটা মনে পড়ল তার। আশ্চর্য! তলে তলে পরেশদা এত সব করেছেন, স্নেহবউদি একটুও জানে না। সে চাটুকু দ্রুত গিলে নিয়ে বলল, এখন উঠি ব্রজবাবু। পরে দেখা হবে।

ব্রজ বলল, উঠবেন? চলুন—আমিও একবার বাসায় যাব। চান-খাওয়াটা সেরে নিতে হবে। সাড়ে দশটায় ট্রিপ।

সীতাংশুবাবু বললেন, মাঝে মাঝে আসবেন চন্দনবাবু। আমার সঙ্গে আলাপ অবশ্য হত শিগগির। আপনার জন্যে ভালো জায়গা একটা পাচ্ছি—কিন্তু বড্ড দর হাঁকছে। মোমিনপুরের তোফাজ্জেল হাজির জায়গা। ইটখোলার কাছে

পুকুরটা দেখেছেন? রাস্তার ধারে বারো কাঠা জায়গা। পিছনে ফাঁকা—এক পাশে পুকুর। ইলেকট্রিক ফেসিলিটিও পাবেন। দেখা যাক্।

পথে এসে ব্রজ বলল, লোকটা জমিজায়গায় দালালী করে। ভীষণ কিপটে আর চালাক। ওই যে বললে, মেয়ে যাবে—তার মানে কি জানেন? খাতির। ভাড়া দেবে না। মালিকের গাড়ি—তার লোকসান হলে সেটা আমারই অধর্ম। অথচ শালা, কী যে হয় আমার—এরকম দরদস্তুরি করতে পারি নে। পয়সা সঙ্গে নিয়ে আসি নি, মলেও সঙ্গে যাবে না পয়সা।

পাশাপাশি হাঁটছিল দুজনে। খোলামেলায় উজ্জ্বল রোদে একটা প্রাণ-চঞ্চলতা পরিব্যাপ্ত রয়েছে চারপাশে। বাস লরী রিকসোর আনাগোনা চলেছে। দোকানে দোকানে ভিড় জমছে। হঠাৎ কোনও একটুখানি ফাঁকে আদিগন্ত ধান-ক্ষেতের পাশের ধূসর দিগন্ত রেখা চোখে পড়ছে যখন মনে পড়ে যায়, পৃথিবীটা খুব ছোট নয়। চন্দন বলল, আপনার বাসাটা কোথায়?

ব্রজ জবাব দিল, সামনেই।

ডাইনে বাঁয়ে এখানে রেশম তাঁতের আখড়া। রাস্তার ধারে সুতো ছড়িয়ে রেখেছে কাঠি পুঁতে। চরকি ঘোরাচ্ছে কম বয়সী ছেলে-মেয়েরা। হলুদ রেশমের সুতো ঝকমক করছে রোদে। একখানে সাইনবোর্ডে লেখা আছে—রূপপুর রেশমশিল্পী সমবায় লিমিটেড।

তারপর সুরকি কল, হার্ডওয়ার স্টোর্স, চালকলের বিশাল এলাকা। কালো কালো দুটো চিমনী থেকে ধোঁয়া উড়ছে। সিমেণ্ট বাঁধানো প্রসারিত চত্বরে মজুরনীরা রোদে ধান শুকোচ্ছে। এক প্রান্তে চমৎকার একেলে ছাঁদের বাংলো বাড়ির সামনে ঝকমকে কালো অ্যামবাসাডার গাড়ি।

সামনে কাছেই পাণ্ডেজীর গদী। ব্রজ বলল, আমি এখানেই থাকি। বাঁদিকে ওই পুকুর দেখছেন—বটগাছ, পাশে ওই জালির ঘরটা। ওই। দু কামরা ঘর—মাসে কুড়ি টাকা ভাড়া। কাঁচা ইঁটের দেয়াল। নিজের খরচায় পলেস্তারা আর চুনকাম করে নিয়েছি। একবার পায়ের ধুলো দিয়ে যান না! যাবেন—আর আসবেন।

অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাকে অনুসরণ কবল চন্দন। রাস্তা থেকে এগোলে পুকুর-পাড় দিয়ে সরু একফালি পায়েচলা পথ। পুকুরপাড়ে কলাবাগান। সবজী ক্ষেত। কাঁটার বেড়া। ভিতরে রাশভারী চেহারার একজন প্রৌঢ় খড়ম পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বেগুন গাছের গোড়ায় ঝুঁকে কী দেখছে। একটি মেয়ে জলের ধারে কলাগাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ঢিল ছুঁড়ে হাঁস তাড়াচ্ছে। এখানটায় এসে মনে হয় পুরো পাড়াগাঁ। জলের শব্দ, হাঁসের ডাক, গাছপালা, পাখ্-পাখালি, আলো-ছায়াময় কিছু ঘাসের জমি, নির্জনতা—অন্য সুর অন্য জীবন। পিছনের বিস্তৃত পটভূমিতে আকাশছোঁয়া ধানক্ষেত আর দূরের কুয়াশা।

ছোট্ট উঠোনে ঢুকে ব্রজ ডাকল, হাসি, ও হাসি, দ্যাখো কে এসেছেন!

ব্রজর বউ বেরিয়ে এল। বেশ ছিমছাম আঁটোসাঁটো চেহারা—স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। খুব সাজগোজের ঘটা নেই। কিন্তু উচ্ছলতা আছে চলাফেরায়। একটু থমকে দাঁড়াল সে।

ব্রজ বলল, আমাদের পরেশবাবুর ইয়ে—মানে সেই যে গো, তুমি বলছিলে আলাপ আছে—পরেশবাবুর শালী! ওনার সঙ্গে শিগ্‌গির বিয়ে হবে।

ওমা, তাই নাকি? ব্রজর বউ হাসি মুখে নমস্কার করল।...আসুন, আসুন।

চন্দন বলল আজ আসি ব্রজবাবু। পরে একদিন আসব'খন।

হাসি কম্বল বিছিয়ে দিল ক্ষিপ্রহাতে।..না, না। তা কী হয়? রুমিদি আমার কত চেনা। কী ভালো মেয়ে! আপনি বসুন।

চন্দন পা ঝুলিয়ে বসল। ব্রজ বলল, হঠাৎ আজ দেখা হয়ে গেল। আরে, এঁর সঙ্গে আমার অগে চেনা ছিল যে! জিয়াগঞ্জের লোক। ওদিকের রুটে থাকতে আলাপ। চন্দনবাবু, একবার লালবাগ পীরতলার কাছে গাড়ি ঠেলতে লাগিয়েছিলুম, মনে পড়ছে?

চন্দন বলল, কী জানি!

হাসি হেসে উঠল।...তোমার গলায় দড়ি জোটে না! রুমিদি শুনলে কী বলবে! ওর বরকে তুমি গাড়ি ঠেলতে লাগিয়েছিলে। আ ছি ছি!

ব্রজ বলল, যা কাল পড়েছে স্যার, আমরা দুজনেই রোজগার করছি। বুঝলেন? সীতাংশুদা ঠিকই বলছিল—বাড়ি একটা করতেই হবে। তাই কাজ জুটিয়ে দিলুম। অল্পসল্প লেখাপড়া জানে। হাসপাতালের কাজ। শিগগির নার্সের ট্রেনিং পেয়ে যাবে—তখন মাইনে আরও বাড়বে। তবে একটা অসুবিধে স্যার, নাইট ডিউটি। আমি ভাবছিলুম, এসে দেখব হয়তো ঘুমোচ্ছে।...

হাসি বলল, অভ্যেস হয়ে গেছে। প্রথম-প্রথম কষ্ট হত। বসুন, আসছি। ওগো, তুমি শোন।

চন্দন টের পেয়ে বলল, আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না। আমার তাড়া আছে। ব্রজবাবু, আজ উঠি। কেমন?

হাসি হন্তদন্ত হয়ে বলল, না না, তা কি হয়? রুমিদি আমাকে গাল দেবে। আপনার অসম্মান করছি শুনলে—

চন্দন শুকনো হেসে বলল, শোনাচ্ছে কে? তাছাড়া—এখনও কিছু ঠিক নেই। আচ্ছা, আসি।

হাসি হাসিমুখে নমস্কার করে বলল, এবার যখন আসবেন দুজনেই আসবেন।

ব্রজ পিছনে কিছু দূর এসে এগিয়ে দিয়ে গেল। বলল, আবার আসবেন স্যার। বউকে তো দেখলেন। মানুষ হিসেবে খুব ভালোই। তবে—যাক্‌গে। আপনার দেরী করিয়ে দিলুম। আচ্ছা, নমস্কার স্যার।...

রাস্তায় এসে চন্দন একটু দাঁড়াল। মুহূর্তের জন্যে তার মনে হল—আচ্ছা, রুমা কি এসব জানে? মনে হয়, সে কিছুই জানে না। যখন জানতে পারবে, তখন সে কী ভাববে?

অস্বস্তিতে আড়ষ্ট হল সে। রাগ হল পরেশদার ওপর। এর কোন মানে হয়? চন্দনের বাবা-মা বেঁচে আছেন—তাঁদের মতামতের ব্যাপার আছে, এদিকে রুমা আর তার দিদি স্নেহধারার মতামতের খুবই মূল্য থাকতে পারে। অথচ

পরেশদা রাজ্যশুদ্ধ সব রটিয়ে তাকে যেন একটা তামাশার পাত্র করে তুললেন॥ পরেশদা কলকাতা থেকে ফিরলেই এর একটা ফয়সালা করে ফেলতে হবে।

পাণ্ডেজী বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দেখে হাত তুলে ডাকলেন। সারবন্দী কয়েকটা বড় বড় ঘর, টানা বারান্দা, মধ্যিখানে গেটমতো। ভিতরের প্রশস্ত উঠোনে অজস্র তেলের পিপে। ভাঙা গাড়ির সরঞ্জাম। আবার কিছু ফুল গাছও রয়েছে। ওপরে দোতলায় পুব কোণায় একটা ঘর।

গেট দিয়ে দুজনে ঢুকল। কুলিরা পিপে গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে ভিতরের উঠোনে। এক পাশে টিনের গুদামও দেখতে পেল চন্দন। একজন সামান্য খোলভূষিওলা পাণ্ডেজী আজ এতদিন পরে এসবের মালিক হয়েছেন!

ভিতরের বারান্দায় অজস্র স্তূপীকৃত বস্তাভর্তি মালপত্র। শ্বাসরোধকারী কেমন অদ্ভুত সব গন্ধ—লঙ্কা, সরষের তেল, খোল কিংবা রবিখন্দের। খোলা সিঁড়ি বেয়ে দুজনে ওপরে উঠল। লম্বা টানা প্রশস্ত ছাদ—এক প্রান্তে এক-খানা ঘর। ছাদে দাঁড়িয়ে সারা রূপপুর নজরে পড়ে। ভারী সুন্দর লাগল সে দৃশ্য। পরিব্যাপ্ত প্রাণচঞ্চলতা সেখানে। তালা খুলতে খুলতে পাণ্ডেজী বল-লেন, কেমন লাগছে চন্দনবাবু?

চন্দন বলল, অপূর্ব!

পাণ্ডেজী বললেন, হাঁ। হামি দেখি। এখানে বৈঠ করে রূপপুর চীটকে দেখি। বাবুজী, রূপপুরকে হামি কী বলি জানেন? হামারি বহু রূপকুমারী!

হাসতে লাগলেন পাণ্ডেজী।...আসুন। রোদ লাগবে গায়ে। ভিতরে বসি।

এঘরে পাণ্ডেজী একা থাকেন। ঘরের ভিতরটা দেখে অবাক হল চন্দন। দড়ির খাটিয়ার ওপর সামান্য একটা গুটানো বিছানা। মেঝেয় এক কোণে একটি কেরোসিন কুকার আর দু-চারটে তৈজসপত্র। খাটিয়ার নিচে একটা টিনের সুট-কেস —রঙচটা, জীর্ণ। দড়িতে ঝুলছে কিছু কাপড়চোপড়, গামছা। ব্যস, ব্যক্তি-গত জীবনযাপনের জন্যে যা কিছু জরুরী আসবাব—তা এটুকুই।

খাটিয়ার বিছানাটা সযত্নে বিছিয়ে পাণ্ডেজী বললেন, বসুন—আরাম করে বসুন চন্দনবাবু। হামি চায় বানাই।

যেভাবে পাণ্ডেজী কুকার জ্বাললেন এবং কেটলি চাপিয়ে দিলেন—দেখে মনে হল লোকটি সব কিছুতে দারুণ নিষ্ঠাবান—অতিমাত্রায় সতর্ক। নিজের হাতেই সম্ভবত সব কাজকর্ম করেন। এমন লোকের উন্নতি না হয়ে পারে না। চন্দন বলল, কাল সন্ধ্যায় আমার খোঁজ করেছিলেন শুনলাম।

পাণ্ডেজী উঠে এসে পাশে বসলেন।...হাঁ, একবার গেলাম ওখানে, তো আপ-নার কথা ভি শুধোলাম। তেমন জরুর কিছু না।

চন্দন বলল, একবার পরেশদার বাড়ি গিয়েছিলুম।

হেসে উঠলেন পাণ্ডেজী।...যাবেন, আলবাৎ যাবেন। তো কাল রাত্রে দেখ-লাম—তখন নও কি দশ বাজবে, ছোটি দিদি বাস থেকে নামল। আমার সঙ্গে খুব ভাব আছে তো! খুব আলাপ।...হাসতে হাসতে পাণ্ডেজী বললেন, তো শুধোলাম, এত রাত্রে কোথা যাওয়া হল তোমার? সিনেমা? তামাসা করলাম। খুব ভালো মেয়ে।

পাণ্ডেজীও কি রুমার সঙ্গে তার বিয়ের প্রসঙ্গ তুলতে চান? একটু বিরক্ত হল চন্দন। কিন্তু ততক্ষণে একটা তীব্র কৌতূহল—যা গত রাত্রে তাকে প্ররোচনা দিয়ে বাস স্ট্যাণ্ডের কাছে নিয়ে গিয়েছিল, ফের সাড়া দিয়েছে মনে। সে বলে ফেলল, রুমা বেশ সাহসী হয়ে গেছে দেখছি তো! একা সিনেমা গিয়েছিল রাত্রে?

পাণ্ডেজী কুকারের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, না। সাথে বাণীবাবুর ছেলে ছিল।

চমকে উঠল চন্দন। শুকনো গলায় বলল, সে কে?

চেনেন না? আলাপ হয় নি?...পাণ্ডেজী কেটলির ঢাকনা খুলে চা দিতে দিতে বললেন, বাণীবাবু হেডমাস্টার। ওর ছেলে। কলেজ পাস করে বেকার বসে আছে। তবে ছেলেটা ভালই। গান-বাজনায় বহুত ওস্তাদ। এখানে হামেশা কত রকম ফাংশান হয়—গান করে।

কিছুক্ষণ নীরবতা। চায়ের কাপে চামচের শব্দ। হাইওয়ের যানবাহনের শব্দ। আকাশভরা রূপপুরের সোনালি রোদ আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্যে—তারপর যেন ফের স্বাভাবিক হল। চন্দনের হাতে চায়ের কাপ। সে অন্যমনস্কতা কাটিয়ে চুমুক দিল। প্রসন্ন থাকার চেষ্টা করে বলল, চমৎকার চা করেন তো পাণ্ডেজী!

পাণ্ডেজী পাশে বসে বললেন, রূপপুর কেমন লাগছে চন্দনবাবু?

চন্দন মাথা দোলাল।...ভালই।

হাঁ—ভালো। মাথা ঠিক রাখলে পয়সা কামানোর এমন সুবিস্তা কোথাও নেই। তো একটা কথা বাবুজী।

পাণ্ডেজীকে চুপ করে যেতে দেখে চন্দন বলল, কী কথা?

কথা এই—কী, পরেশবাবু আপনাকে এনেছে। আপনি পরেশবাবুর লোক। হামি আপনার পর। কেমন কিনা?

চন্দন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

হামি শুনেছে, পরেশবাবুর শালী—ছোট দিদির সাথে আপনার বিভা হবে। বাত ইয়ে ভি ঠিক হ্যায়। খুব ভাল কথা আছে। লেকিন বাবুজী, যদি কিছু মনে না করেন...

চন্দন ছটফট করে বলল, না না। আপনি বলুন।

আপনি খুব সাদাসিদা মানুষ চন্দনবাবু। ঔর পরেশবাবু পাকা লোক। দয়া করে ওর কানে তুলবেন না কথাটা—আপনার ভালোর জন্যে বলছি। পরেশ-বাবুকে আপনি বিশওয়াস করবেন না।

চন্দন বলল, তার মানে?

পাণ্ডেজী চাপা গলায় বললেন, পরেশবাবু যো কুছ করেন, সব কোই মতলবকে লিয়ে করেন। এই যে আপনার সাথে শালীর বিভা দেবে, উসকা পিছেভি কোই মতলব আছে। শুধু এই কথাটা মনে রাখবেন, ব্যস!

কী মতলব আছে?

পাণ্ডেজী হেসে উঠলেন।...ক্যা মালুম! মনে হল, কুছু মতলব না থেকে পারে না। ও খুব সহজ লোক নয়, বাবুজী। কাজকাম করছেন, করুন—ভাবনা নেই। লেকিন, খুব সমঝসে—বুঝেশুনে করুন।

চন্দন একটু ভেবে বলল, হ্যাঁ—আরও একজন, মানে—হকসায়েবও বলছিলেন একথা। তবে আমার কী? জেনেশুনে কোন অন্যায় করব না। ব্যস, চুকে গেল।

হাঁ, তাই বলছি বাবুজী। যাক্, ছোড় দিন।...পাণ্ডেজী চায়ের কাপ দুটো ধুতে বাইরে বেরোলেন। ছাদের কোণে পাইপের মুখে বাঁধানো জায়গা। জলের বালতি রয়েছে সেখানে। সব ব্যবস্থা নিখুঁত।

চন্দন তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বলল, চলি পাণ্ডেজী। ভেবেছিলুম কোন জরুরী কাজের জন্য খুঁজছিলেন—তাই এসেছিলুম।

পাণ্ডেজী বললেন, আরে বসুন, বসুন। গপ্পসপ্প করা যাক্।

চন্দন বলল, না। বেচুবাবু অপেক্ষা করছেন এতক্ষণ। পরে আসব'খন। আজ আপনি ওদিকে যাবেন না?

যেতেও পারি।.. বলে কাপ দুটো ঘরে রেখে এলেন পাণ্ডেজী। তারপর নীচে অব্দি এগিয়ে দিলেন চন্দনকে।

একটা রিকসো করে ফিরল চন্দন। বাসায় এসে দেখল, রুমা তার জন্য অপেক্ষা করছে।

আট

আজকাল কী যে হয়েছে, রুমাকে মুখোমুখি দেখলেই মনে হয় চারপাশের জগতটা চকিতে বদলে গেল—একটা অস্থির সুখের আবেগ তোলপাড় করে উঠল বুকে! অথচ এ সবই নিজের কাছে লজ্জার ব্যাপার। চন্দন ঘরে ঢুকে বলল, কতক্ষণ?

রুমা খবরের কাগজে চোখ বুলোচ্ছিল। চোখ না তুলে বলল, এক্ষুনি। ঘর খুলে রেখে কোথায় গিয়েছিলে?

চন্দন বলল, হৃদয় আছে। কিছু হারাবে না।

রুমা একই ভঙ্গীতে বসে অস্ফুট বলল, হৃদয় আছে নাকি?...বলেই সে মুখ তুলে একটু হেসে উঠল।...আমার এক বন্ধু রাখী—সে বলে, আজকাল নাকি হৃদয় বলে কোন বস্তু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে নেই। শুধু বুদ্ধি আছে।

চন্দন কৌতুকে সায় দিল।...চমৎকার বলেছ। আমার বুদ্ধি নেই বলেই তো হৃদয় আছে। তারপর খবর কী বলো?

রুমা পায়ের ওপর পা তুলে দোলাতে দোলাতে বলল, বিনি খবরে বুঝি আসতে নেই?

কোনদিন তো আসোনি।

রক্ষে করো বাবা। এইসব গণ্ডগুলে জায়গায় যত কম আসি তত ভালো। জামাইবাবুটা যেন কী।...রুমা উঠে দাঁড়িয়ে ঘরের ভিতরটা দেখতে থাকল।... তোমার ঘরটা দেখতে এলুম। কী বিচ্ছিরি করে রেখেছো! লোক তো আছে। বলতে পারো না সাজিয়ে গুছিয়ে রাখতে?

চন্দন আড়চোখে দেখল দরজার ওপাশে বারান্দায় হৃদয় ওঁৎ পেতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার নিস্পন্দ ছায়াটা দেখা যাচ্ছিল পুরো। ইচ্ছে হল, তেড়ে ধমক লাগায়। কিন্তু তা না করে সে ডাকল, হৃদয়, একবার এদিকে এসো তো!

হৃদয় বাঘের মতো প্রায় লাফ দিয়ে চলে এল তক্ষুনি। তারপর দাঁত বের করে রুমার উদ্দেশ্যে মাথা দোলাল।...দিদি, ভালো তো? সব কুশল? মঙ্গল তো? হেঁ হেঁ—আমার আর থাকা! বলবেন না। হেঁ হেঁ...

রুমা ভ্রু কুঁচকে বলল, শোন। তুমি ওই হোটেলের মেয়েটাকে কী বলেছ?

মুহূর্তে হৃদয়ের মুখ ছাই হয়ে পড়ল।..আজ্ঞে দিদি? হোটেলের মেয়ে... মানে রাধাকে?

হ্যাঁ। কী যাতা সব বলেছ ওকে? কেন বলেছ?

চন্দন বলল, কী ব্যাপার রুমা?

রুমা জবাব দিল, শুনবে খন। অদ্ভুত লোক ' যাও, খবরদার কক্ষনো আর এসব রটাবে না।

হৃদয় চোখ কপালে তুলে কাঠ দাঁড়িয়ে রয়েছে। চন্দন বলল, কী বলেছ হৃদয়?

হৃদয় হুমড়ি খেয়ে চন্দনের পা ছোঁবার চেষ্টা করলে চন্দন সরে গেল। হৃদয় কাঁদো কাঁদো মুখে বলল, আজ্ঞে, বিশ্বাস করুন স্যর, কিচ্ছু বলিনি! আপনার পা ছুঁয়ে বলছি। আমি ব্রাহ্মণ সন্তান—আপনিও ব্রাহ্মণ সন্তান—

রুমা ধমকে উঠল ব্রাহ্মণসন্তান হয়ে হুট করতেই পা ধরতে লজ্জা করে না? থামো, জামাইবাবু আসুক। তোমার ব্যবস্থা হচ্ছে।

হৃদয় আর্তনাদ করে বলল, আপনার দিব্যি দিদি, কিছু বলিনি। চলুন, এক্ষুনি চলুন ও মাগীর কাছে!

চুপ, অসভ্য কোথাকার!...রুমা ফের ধমক দিল। তারপর চন্দনের উদ্দেশ্যে বলল, যত রাজ্যের স্ক্যাণ্ডাল ছড়াতে তোমার হৃদয়চন্দ্রের তুলনা নেই। আর লোকও বিশ্বাস করে বসে, আশ্চর্য!

চন্দন বলল, হৃদয়, তুমি এখন যাও।

হৃদয় নাক ঝাড়তে ঝাড়তে চলে গেল। রুমা জানালার বাইরে তাকিয়ে আছে। চন্দন তার কাছে গিয়ে বলল, ও কী বলেছে রাধাকে?

রুমা মুখ ফিরিয়ে একটু হাসল।...সে তোমার শুনতে নেই।

চন্দন বলল, বিয়েটিয়ের কথা—তাই না রুমা?

রুমা চোখে চোখে তাকিয়ে থেকে চোখ নামাল। তারপর এগিয়ে এসে বিছানায় বসে বলল, বেশ আনন্দে আসছিলুম তোমার এখানে। হঠাৎ এরা সব মাটি করে দিল। কী বিচ্ছিরি যে লাগছে। ফেট্! থাক্ গে, শোন। কাল দিদি তোমাকে ডেকে দিতে বলেছিল। রাস্তায় এসে দেখি, বাসটা ছেড়ে দিচ্ছে।

দৌড়ে গিয়ে উঠে পড়লুম। পরে কিন্তু ভীষণ খারাপ লাগল। দিদির কথাটা শুনলুম না।

চন্দন বলল, আমি গিয়েছিলুম—শুনেছ নিশ্চয়।

রুমা সে কথায় কান করল না। বলল, সারাপথ কিন্তু তোমার কথা ভাবছিলুম। তুমি এখানে এসেছ। কোথায় আছ, কেমন তোমার ঘর, দিনরাত্তির কী করো—এইসব ভাবনা। জিয়াগঞ্জে তোমার ঘরটা ছিল ভারি সুন্দর। জানলা দিয়ে গঙ্গা দেখা যেত। এখনও মাঝে-মাঝে দেখে আসতে ইচ্ছে করে।

চন্দন বলল, তাই বুঝি?

রুমা একটু হাসল।...জানো চন্দনদা—পরের ঘর যখন নিজের ঘর হয়ে ওঠে তখন খুব কষ্টের দিন এসে যায়? তোমার সেই ঘরটা এত বেশি নিজের মনে হত বলেই কতদিন যে এখানে এসে কষ্ট পেয়েছি। সেই জানালাটা মনে পড়েছে—তুমি উপুড় হয়ে শুয়ে আছ। আমি তোমার কোমরে পা দিয়ে নাচানাচি করছি।

চন্দন বলল, তুমি এত ভাবুক মেয়ে, তা তো জানতুম না রুমা।

রুমা বলল, ছেলেবেলাটাই আমার কাছে সুন্দর। বেশ ছিলুম তখন।

বর্তমানটা?

কী জানি কেমন—বুঝতেই পারিনে।

আচ্ছা রুমা?

উঁ?

কলেজ থেকে বেরিয়ে কী করবে?

দিদির ইচ্ছে, এম. এ. পড়ব কলকাতায় থেকে। জামাইবাবুর ইচ্ছে, তার সঙ্গে ব্যবসা করব।

তোমার ইচ্ছেটা কী?

হিসেব করে দেখিনি। মাঝে মাঝে মনে হয়, দুর! পড়াশোনা করে কী ডানা গজাবে? সব এত তেঁতো লাগে। আসলে এ জায়গাটাই আমার পছন্দ নয়। অন্য কোথাও চলে যেতে পারলে বেঁচে যেতুম।

আচ্ছা রুমা, তুমি জানো যে পরেশদা তোমার নামে অনেক সম্পত্তি রেখে-ছেন এখানে?

জানি বইকি।

আর...চন্দন একটু ইতস্তত করে বলল, আর পরেশদা একটা মতলব এঁটেছেন.....

রুমা কথা কেড়ে নিঃসঙ্কোচে বলল, বিয়ের কথা তো? হোটেলের মেয়েটা ডেকে সেসব কথাই তো শোনাচ্ছিল। তোমার হৃদয়ঠাকুর ওকে নাকি বলেছে।

চন্দন এ মুহূর্তে সেই বালিকা রুমাকে আবিষ্কার করল। সেই মুখ, সরলতা, আর অসহায়তা। তার একটু কষ্ট হল। বলল, তোমার খুব খারাপ লাগল নিশ্চয়?

রুমা মুখ নামাল। কয়েক মুহূর্ত কোন কথা বলল না! চন্দন হঠাৎ লক্ষ্য করল, তার চোখের নিচেটা ভিজে। রুমা কি কাঁদছে? চন্দন বলল, আরে, হল কী তোমার? রুমা! ছিঃ।

রুমা ধরা গলায় বলল, আমি এটা ভাবিনি—একটুও ভাবিনি।...পরক্ষণেই সে উঠে দাঁড়াল।

চন্দন বলল, ছেড়ে দাও! সে তো আমারই হাতে। আমিও এটা ভাবিনি—কল্পনাও করিনি। যাক্‌গে, বসো।

না—চলি।...রুমা পা বাড়াল।

চন্দন বলল, এজন্যেই কি এসেছিলে তুমি?

উঁহু, এমনি আসছিলুম। হোটেলের মেয়েটা হঠাৎ...আচ্ছা চলি।

বলে সেদিনের মতই রুমা দ্রুত চলে গেল। চন্দন কাঠ হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর টেবিলের দিকে এগোল। অনেক কাজ আছে। সব আজে-বাজে ভাবনা আশা-প্রত্যাশা-উদ্বেগ মন থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করা দরকার। এখানে তার আসল দরকার হচ্ছে মাসান্তে কিছু টাকা। জিয়াগঞ্জের সংসারটাই সবকিছুর চেয়ে বড়ো তার জীবনে।

ফাইল আর খাতাপত্রের ভিতর ডুবে চন্দন অসহায় আত্মরক্ষার চেষ্টা করল। কিন্তু টের পেল, সেই প্রসঙ্গটা বারবার তাকে আড়াল থেকে খোঁচা দিচ্ছে। মনে হচ্ছে, রুমার ওপর তার একটা জন্মগত দাবী আছে—রুমা যেন তাহার কাছে একটা উত্তরাধিকার-জাত সম্পত্তি। এ সম্পত্তি অন্যের হাতে চলে যাবে—সে তা কোনমতে সহ্য করতে পারবে না। অথচ সত্যি সত্যি যেন একটা ষড়যন্ত্র চলেছে।...

হৃদয় এল এতক্ষণে। পা টিপে টিপে সতর্কভাবে ঢুকে চাপা গলায় বলল, একটা কথা বলতে এলুম স্যার। ভুল বললে আমার মুণ্ডুটা মাটিতে রগড়ে দিন।

চন্দন মুখ তুলল।

ভয়ে বলি, কী নির্ভয়ে স্যার?

ওর ভঙ্গী দেখে হাসি পেল চন্দনের। এসব লোকের ওপর বেশিক্ষণ রাগ করে থাকা যায় না। সে বলল, নির্ভয়েই বলো না-শুনি।

হৃদয় একটু ঝুঁকে ফিসফিস করে বলল, আপনার দোহাই—বাবুর কানে তুলবেন না। আমাকে জ্ঞানশুদ্ধ মেরে দেবে। ওনার শালী—মানে রুমিদিদিমণি, বুঝলেন? রুমিদিদিমণির বে কেন লাগাচ্ছে জানেন? হেডমাস্টারমশায়ের ছেলের সঙ্গে ওনার.....

বেচুবাবু সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকে বললেন, চন্দনবাবু, এবেলা একবার প্রতাপ-পুর ঘুরে আসুন না! এক্ষুনি বাস পাবেন। সাহা ব্রাদার্সের ফাইলটা দেখে নিন। বড্ড ঝামেলা করছে ওরা। তিন মাস থেকে পেমেণ্ট স্টপ। মিষ্টিমুখ আর চলবে না। আপনি যান তো ভাই!

চন্দন বলল, যাচ্ছি। হৃদয় একটু দেরী করে রান্না চাপিও বরং।

হৃদয় বলল, ইয়েস স্যার।.....

সাড়ে দশটায় ব্রজর স্টেশনওয়াগন ছাড়ার কথা। বাস ফেল করে চন্দন ব্রজর গাড়িতেই যাবে ঠিক করল। রিকশোতেও যাওয়া যায়। কিন্তু সামনে বাতাস পড়বে।

ব্রজ রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে সিগ্রেট টানছিল। ফিটফাট চেহারা—প্যান্ট-শার্ট সদ্য কাচা। দাড়ি গোঁফ মাথার ঝুঁটি মিলিয়ে বেশ রাশভারি শিখ পাঞ্জাবী দেখাচ্ছে ওকে। চন্দন এগিয়ে বলল, এই যে ব্রজবাবু, সীট হবে একটা? প্রতাপপুর যেতে হচ্ছে হঠাৎ।

ব্রজ লাফিয়ে উঠল।...আলবাৎ হবে। মেধো, ও মেধো, শিগগির এদিকে আয় তো!

একটা ছোকরা গাড়ির এপাশে দাঁড়িয়ে তারস্বরে চেঁচাচ্ছিল, প্রতাপপুর-কালীতলা-বালিরঘাট! ওপাশে আরেকজন ভেঁপু বাজাচ্ছিল আর যাত্রী ডাকছিল।...ছাড়ছে ছাড়ছে, ছেড়ে গেল! গাড়ি অবশ্য ইতিমধ্যে প্রায় ঠাসা। এপাশের ছোকরাটি দৌড়ে এলে ব্রজ বলল, ফ্রন্ট সীটে কে আছে রে মেধো?

মেধো বলল, পেসেঞ্জার আছে।

কজন?

চারজন।

যাবে কোথায়?

বালিরঘাট।

দুজনকে পেছনে ঢোকা। আমার লোক আছে।

মেধো দৌড়ে চলে গেল। চন্দন বলল, সেকি! ওদের উঠিয়ে দেবেন নাকি?

ব্রজ পানরাঙা দাঁতে হাসল।...এ লাইনে ওটা হয়। প্যাসেঞ্জার বলে তো লাট নয় স্যার। গাড়িটা তো আমার। ফিরবেন কখন?

চন্দন বলল, ঠিক নেই।

ব্রজ হাতের চেটো থেকে চুন তুলে জিভে রাখল।...আমি ফিরতে—প্রায় দুটো। তার মানে প্রতাপপুরে পেঁছাচ্ছি একটা পঞ্চাশ-টঞ্চাশ! যদি ততক্ষণ থাকেন—জায়গাটা বলুন—ডেকে নেব।

চন্দন বলল, সাহা ব্রাদার্সের সামনে।

ঠিক আছে। আমি অলওয়েজ এ্যাট ইওর সারভিস স্যার।...ব্রজ চেঁচাল। —ওই রে মেধো, কী হল?

গাড়ির কাছে বচসা হচ্ছিল। দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে মেধো—দাঁত খিঁচোচ্ছে। চন্দন বিব্রত বোধ করল। বলল, থাক। আমি বরং রিকশো করে যাই ব্রজবাবু।

ব্রজ তার হাত ধরে টানল।...নো। চলে আসুন। দেখি কোন্ লাটের বেটা লাট সিংহাসনে বসে আছে।

মফঃস্বল লাইনের ব্যাপার চন্দন জানে। সে দেখল, ব্রজ গম্ভীর মুখে সামনের সীটের দুজন ভদ্রলোককে হুকুম দিল, মিনিট পাঁচেকের জন্যে পিছনে ঢুকতে হবে দাদা। তারপর গদী পাবেন ফের, ভয় নেই।

শৌখপ্রান্তের লোক দুটো গোমড়া মুখে নেমে এল। ব্রজ চন্দনের হাত ধরে ঠেলে দিল—যান, বসুন স্যার! ফেরার সময় খালি রাখব, ভাববেন না।

চন্দনকে বসতে হল। গাড়ির ভিতর ততক্ষণে কুমড়োঠাসা—পাদানীতে লোক দাঁড়াচ্ছে। মাথার ওপর মচমচ শব্দ হচ্ছে। তবু আওয়াজ চলেছে সমানে—প্রতাপপুর কালীতলা-বালিরঘাট। হর্ন বাজছে কানচমকানো। সেই সময় কে এসে চেঁচামেচি করে বলল, ঘড়ির কাঁটা উল্টোপাকে ঘুরোচ্ছে নাকি হে? কখন সাড়ে দশটা পার। ছাড়ো, শিগগির ছাড়ো!

ব্রজ তার সীটে বসে বলল, ছাড়ছি ভুজঙ্গদা—অত ব্যস্ত কেন?

লোকটা দাঁত খিঁচিয়ে এল।...সব প্যাসেঞ্জার কি তোমারই রেজেস্ট্রি করা নাকি? আমার ট্রিপের সময় হয়ে এল না? আভি ছোড়, জলদি ছোড়!

ব্রজ প্রথমে স্টীয়ারিং ছুঁয়ে মাথা নোয়াল। তারপর চাবি ঘুরিয়ে স্টার্ট দেবার চেষ্টা করে চন্দনকে বলল, আর বলবেন না স্যার। দুবেলা এই ঝগড়া-ঝাঁটি। সবাই ভাবে, সব প্যাসেঞ্জার ও মেরে দিলে বুঝি। জোর কম্পিটিশান। কিন্তু প্যাসেঞ্জার যে এদিকে বানের জলের মতো অফুরন্ত, পা রাখবারও জায়গা নেই—সে খেয়াল কার আছে?

স্টার্ট নিল না। ..মেধো, হাণ্ডিল লাগা রে! মাগী রাগ করেছে!

গাড়িটা এখনও চলছে—এটাই আশ্চর্য। লালবাগের রুটে অমন লঝ্‌ঝড়ে রাস্তায় যে এটা টিঁকে গেছে, তারিফ না করে পারা যায় না। রাজকমলবাবুর জীবনের তালে তাল মিলিয়ে এর গতি! চন্দন রাজকমলবাবুর কথা ভাবছিল। খামখেয়ালী এই লোকটা সারাজীবন সব খুইয়ে শুধুমাত্র এ গাড়িটাতে এসে ঠেকেছে। একসময় সে নিজেই থাকত গাড়ির সঙ্গে। এখন কী করছে সে কে জানে!

গাড়ি চলতে শুরু করলে চন্দন বলল, রাজকমলবাবুর খবর কী?

ব্রজ বলল, বাবু অনেকদিন থেকে অসুখে ভুগছেন যে! মাঝে মাঝে ট্রিপ কামাই করে আমাকেই যেতে হয় কনকপাড়া। পয়সাকড়ি বুঝিয়ে দিয়ে আসি। বড্ড কঠিন অসুখ স্যার—কী হবে কে জানে!

বাড়িতে কে আছে ওঁর?

বউ আর মেয়ে। মেয়ে তো বহরমপুরে পড়াশুনো করছে। এখন বলতে গেলে ওনার সংসারের দায়দায়িত্ব একরকম আমারই হাতে স্যার।...ব্রজ বাঁহাতে স্টীয়ারিং ধরে ডান হাতে সিগ্রেটের প্যাকেটটা এগিয়ে দিল।...খান। আর কয়েক মিনিটে পেঁছে দিচ্ছি। তা বাবুর কথা বলছিলুম। বাবুর ইচ্ছে ছিল, এখানেই চলে আসবেন। জায়গা কিনতেও বলেছিলেন। কনকপাড়ায় তো ভিটে ছাড়া আর কিছু রাখেননি। তার ওপর গণ্ডগ্রাম। কিন্তু সবই কপাল। হঠাৎ কঠিন অসুখে ধরল। হাসপাতালে থাকলেন ক'মাস। সারল কই?

চন্দন বলল, রাজকমলবাবুর সঙ্গে আমার খুব একটা আলাপ ছিল না। সেবার জিয়াগঞ্জে আলাপ হয়ে যায়। আমাদের শচীন অধিকারী—আপনি চেনেন না, শচীনবাবুর কী সম্পর্কে দাদা উনি। খুব খেয়ালী লোক-তাই না?

ব্রজ বলল, হ্যাঁ—ভীষণ খেয়ালী। সেবার হঠাৎ মাথায় ঝোঁক চাপল দেশের ভাল করতে হবে। ইলেকশনে দাঁড়ালেন। হেরে ফোঁত হয়ে গেলেন একেবারে।

পয়সাকে পয়সা গেল। গাড়িটাও যাবার দাখিল। অনেক কষ্টে বাঁচালুম। আসলে আমার রুজি বলে নয়, গাড়িটা নতুন থেকে চালাচ্ছি তো! খুব মায়া বসে গেছে। তা নৈলে তো কত সব ভালো-ভালো ডাক আসে, ডবল মাইনে—আমি বলি, দূর দূর! ওদিকে রাজকমলদাও আমাকে ছেলের মতো ভালোবাসেন। বলুন, তাঁকে এ অবস্থায় ফেলে যাওয়া কি উচিত হবে?

ঢালু পথের দুপাশে হলুদ হয়েওঠা ধানক্ষেত। দূরে বিলের জল ঝিকমিক করছে। রাস্তায় এখানে-ওখানে পীচ উঠে গেছে। ঝাঁকুনি খাচ্ছে গাড়িটা। ব্রজ কনট্রাকটারদের মুণ্ডুপাত করছে মাঝে মাঝে। গাড়ির ভিতর বাক্যালাপ সমানে চলেছে। কে কার ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে বসে আছে, তবু কারো ভ্রূক্ষেপ নেই। এসব লাইনে কালক্রমে এইরকম আসা-যাওয়া করার অভ্যাস হয়ে গেছে। একটা ব্রীজের কাছে গাড়ি দাঁড় করাল ব্রজ। ছোট্ট এক গাঁইট পাট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুটো লোক। ব্রজ মুখ বাড়িয়ে বলল, ব্যাপারীদা, আজ কিন্তু জায়গা দিতে পারছিনে।

লোকটার গায়ের রঙ আবলুস কাঠের মতো। কাঁচাপাকা বড় বড় টেড়িকরা চুল, জুলফি আর গোঁফ আছে একগুচ্ছের। গায়ে নীল হাফসার্ট, পরনে ধুতি—কাঁধে গামছা ঝুলছে। পকেট থেকে পানের কৌটা এগিয়ে পান খুলে হাসল। তোমার কোলেই বসব হে ব্রজ। ও মেধো, মালটার গতিক কর বাপ!

চন্দন হাঁ করে তাকিয়ে রইল। আর জায়গা কোথায়? যাত্রীরা ওপরে-নীচে চারদিক থেকে হইচই শুরু করেছে। প্রচণ্ড 'না না' শব্দে কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে। তবু তারই মধ্যে কেমন করে পাটের পাঁইটটা কোথায় সামলে দিল মেধো। ব্যাপারী হেঁকে বলল সাবধান দাদারা, আগুন ফেলবেন না। তারপর প্রায় ব্রজর কোলের ওপরই বসল। সামনে বনেটে পা ঝুলিয়ে সে বসে আছে। ব্রজর সামনে সত্যি-সত্যি কয়েক ইঞ্চি ফাঁক। অকুতোভয়ে সে স্টার্ট দিল ফের। আশ্চর্য, গাড়িটার আর 'হাণ্ডিল' মারার তর সইল না। মুহূর্তে জ্যান্ত হয়ে গড়গড় ঘড়-ঘড় শব্দে চলতে শুরু করল। ব্রজ চেঁচাল—ভেলকি, ভেলকি! ভানুমতীর খেলা!

ব্যাপারী চন্দনকে স্থির দৃষ্টে দেখছিল। বলল, মশায়কে নতুন মনে হচ্ছে, ইদিকে!

জবাব ব্রজ দিল।.....পরেশবাবুর কোম্পানীর লোক। ম্যানেজার হয়ে এসেছেন।

ব্যাপারী নমস্কার করল চন্দনকে।...ভালো ভালো। আমার নাম আজ্ঞে মনরুদ্দী ব্যাপারী। সামান্য পাটের কারবার করি। সকালে এক ট্রাক মাল পাঠিয়ে দিয়েছি। গাঁওয়াল সেরে ফিরছিলাম। হঠাৎ খানিক মাল পেয়ে গেলাম পথে। ছাড়লাম না।

চন্দন বুঝল মনিরুদ্দী ব্যাপারী যে এই সামান্য পাটটুকু নিয়ে ব্যবসা করে না—অর্থাৎ রীতিমতো একজন বড় কারবারী, তাই জানিয়ে দিচ্ছে। চন্দন বলল, বাড়ি কোথায় আপনার?

ব্রজ বলল, দাদার বাড়ির কথা শুধোবেন না স্যার! বাড়ি কি ওর একটা? তিনটে।

মনিরুদ্দী হই-হই করে উঠল, এই ব্রজ! মাইরি—ইয়ারকি করো না ভদ্রলোকের সামনে। স্যার, ওর কথা বিশ্বাস করবেন না।

ব্রজ সকৌতুকে বলল, আরে! সত্যি কথা বললে অমন চাঁ-ভ্যাঁ করো কেন দাদা? জানেন স্যার? দাদার আমার তিন পক্ষ। প্রথম পক্ষ দুনিগ্রামে—তিনিই আদি। দ্বিতীয় পক্ষ কাপাসডাঙ্গা—তৃতীয় হচ্ছে আমড়াতলা। তা দাদা, এখন ছোট বউদির বাড়ি হয়ে এলে?

মণিরুদ্দী সলজ্জ হেসে বলল, যাঃ। আমি মরছি নিজের জ্বালায়—মাথার ঘায়ে পাগল।

ব্রজ বলল, আরে হ্যাঁ, হ্যাঁ। পানের স্বাদেই বুঝেছি। এ শালা মন চনমনকরা পান, সে ছাড়া ব্রহ্মাণ্ডে বানায় সাধ্যি কার? দাদা, ওবেলা আমাকে দাওৎ করো, তোমার দিব্যি। অনেক দিন ছোটবউদির হাতে মুরগি খাইনি।

মনিরুদ্দী আপ্লুতস্বরে বলল, আসিস ও-বেলা। আসবি তো? নাকি শুধু মুখেই? ছোটবউকে বলব।

ব্রজ চেঁচিয়ে বলল, মেধো রে! দ্যাখ্ তো আওয়াজ দিচ্ছে কোন্ শালা।। . তারপর গাড়ি দাঁড় করাল সে।

এঞ্জিনের ওপর থেকে লোকগুলো লাফ দিয়ে নামল। মেধো ঢাকনা খুলে কিছুক্ষণ কী নাড়াচাড়ার পর বলল, কই, কিছু না।

ব্রজ স্টার্ট দেবার চেষ্টা করল। অদ্ভুত শব্দ উঠল। কিন্তু স্টার্ট নিল না। তখন মেধো 'হ্যাণ্ডিল' চালাল। অবশেষে চরম ডাক দিল ব্রজ-ভাইসকল! হাত লাগান পিছে। ঠেলতে হবে। ছাদের লোকগুলোর নামবার শব্দ হচ্ছিল। পিছনে সবাই ঠেলছে গাড়িটা। ব্রজ সমানে চেঁচাচ্ছে, বাঃ রে মজা! ভেলকিবাজি! ভেলকিবাজি! লাগ লাগ লাগ.....

ফের চলেছে ঝন-ঝন ঘড়-ঘড় সবজে রঙের স্টেশনওয়াগন।. .

প্রতাপপুর এসে গেল। ছোট্ট বাজার॥ গ্রামটা বেশ বড়ো! রাস্তার ধারেই সাহা ব্রাদার্সের দোকান॥ মুদিখানা তেলকল কয়লার আড়ত। চন্দন কোনোদিন এখানে আসেনি—আজ প্রথম। গাড়ি থেকে নামলে ব্রজ দেখিয়ে দিল—ওই যে।

চলে যাবার মুখে ফিরতি ট্রিপে জায়গা রাখবে সেকথা বলতে ভুলল না সে। সামান্য মিনিট-দশের গাড়িচড়া—এরই মধ্যে খিল ধরে গেছে পায়ে॥ একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল বটে। ব্রজ কতকাল ধরে দুবেলা এমনি করে গাড়ি চালাচ্ছে—কত কাল চালাবে। আশ্চর্য লাগে ভাবতে। তবু এতটুকু ক্লান্তি নেই। নিরুৎসাহ হয়ে পড়ে না। এই লঝ্‌ঝড় যন্ত্রটার মধ্যেই যেন তার জীবনের স্পন্দন-তার আত্মপ্রকাশ।

সাহা ব্রাদার্সের বারান্দায় উঠতে উঠতে চন্দন দেখল, তার মনটা হঠাৎ তেঁতো হয়ে উঠেছে। কী স্বপ্ন ছিল জীবনে তার। বিচিত্র একটা ছবি ভাসত মনে

কত নির্জন নিঃঝুম রাত্রে। দিক প্রসারী বিশাল যন্ত্রলোক, কিংবা আকাশে আকাশে মনে কত নির্জন নিঃঝুম রাত্রে। দিকপ্রসারী বিশাল যন্ত্রলোক, কিংবা আকাশে ছড়ানো উঁচু ইলেকট্রিক তার, নতুন দেশ গড়ে উঠছে দিকে দিকে, সমৃদ্ধ সুখী সেই ভারতবর্ষের বাসিন্দা সে। আর আজ তাকে তেজারতী কারবারের আড্ডায়, নুনের বস্তা তেলের পিপে কসমেটিকসের প্যাকেটের ভিড়ে শ্বাসরোধকারী টাকা-পয়সার আঁকজোকের মধ্যে ঘুরতে হচ্ছে। এমুহূর্তে রুমাও তার কাছে তুচ্ছ আর তেঁতো হয়ে পড়ল। মন ছটফট করে বলল, এখানে নয়, এখানে নয়!

নয়

চোখ বুজলে পরেশ মজুমদার একটা আলো দেখতে পায়। ঘুরঘুট্টি অন্ধকারের মধ্যিখানে এক চিলতে আলো। আলোটা তার দিকে এগিয়ে আসছে, নাকি সে যাচ্ছে আলোটার দিকে—ঠিক বোঝা যায় না। ওটা স্থির, সে গতিশীল—না কি সে স্থির ওটাই গতিশীল?

অনেকদিন আগে দুমকা থেকে আসবার পথে রাত্রিবেলা অন্ধকার মাঠে এই দৃশ্যটা দেখেছিল সে। তারপর মনের ভিতর যেন খোদাই হয়ে গেছে। চোখ বুজলে সেই দৃশ্য সে দ্যাখে। ঘুমোবার আগে তাই দেখছিল।

আগের সন্ধ্যায় কলকাতা ছেড়েছে। বেথুয়াডহরি পৌঁছতে রাত দুপুর। ফেলুবাবুর হোটেলে খাওয়া সেরেছে সদলবলে। বহরমপুর আসতে আসতে রাত প্রায় শেষ হয়ে এল। ব্রিজলাল ট্রান্সপোর্ট কিছু মাল নামিয়ে দিয়ে খাটিয়ায় ঘুমিয়ে নিল সকাল ন'টা অব্দি। প্রথম ওঠাল তাকে। বাবু, চা খেয়ে নিন।

পরেশ ধড়মড়ু করে উঠে বসল। চোখ জ্বালা করছে। গগলসটা পরে নিয়ে বলল, চা খেয়েই বেরোব। ওদের ডাক।

ওরা ততক্ষণে তৈরী। ট্রাকের খোলে তেরপল ঢাকা মালপত্তরের ওপর যথারীতি ঝিমুচ্ছে। এবার পঁচিশ মাইল নিজে ড্রাইভ করবে পরেশ মজুমদার। মাথা ঠাণ্ডা আছে। কিন্তু উদ্বেগ খুব কম নেই ভিতরে। ট্রাকডুবির ব্যাপারে ইনসিওরেন্সের লোক আসার কথা ছিল। চন্দন কী করল কে জানে! বেচুবাবুদের সে বিশ্বাস করে না।

গঙ্গার ব্রীজ থেকেই গতি বাড়াল গাড়ির। এখন পরেশ মজুমদার খুনীর চেয়েও সাংঘাতিক মানুষ। গতির নেশায় রক্ত গরম হয়ে উঠেছে তার। সকালের দিকে কিছুক্ষণ রাস্তায় ভিড় কম থাকে। একদমে রেলগেট পেরিয়ে ধু-ধু তেলকার বিলের মধ্যে দিয়ে উঁচু রাস্তায় গাঁ গাঁ করে ছুটেছে বিশাল নতুন ট্রাকটা। মাঝে মাঝে রিকশো এসে পড়ছে। বিকৃত মুখে চেঁচিয়ে উঠছে সে, এ্যাই শালা কুত্তার বাচ্চা! কটসুলের পাঞ্জাবির হাতা গুটোনো, চাদর কোমরে জড়ানো, চোখে প্রকাণ্ড গগলস, ঠোঁটে চুরুট—দুটো শ্যামলা রোমশ

বলিষ্ঠ হাতে স্টীয়ারিং ধরে আছে পরেশ মজুমদার। জীবন্তীর বাঁকে এসে খুব অল্পের জন্যে একটা গরুর গাড়িকে বাঁচিয়ে দিল। তখন প্রমথ বলল, এবার আমাকে দিন বাবু।

পরেশ ধমকাল, থাম বে! গাড়োয়ানী শেখাস নে আমাকে। সেই তো স্ট্র্যান্ড রোড থেকে বেরিয়েছিস সন্ধ্যাবেলা। ছ্যাকড়া গাড়ির মতো বহরমপুর আসতে রাত পুইয়ে দিলি! আবার বড় গলা করছিস।

পরক্ষণে হাসল সে।...সময় থাকলে দু-ঢোক খেয়ে নিতুম। তাহলে কেমন ভেলকির খেলা দেখতিস প্রমথ। বিনি রসে জমে না রে!

পিছনে আবছা গানের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। বরকত হাসিম অতুল কোঁরাসে গান ধরেছে। হাততালি দিচ্ছে তালে তালে। উদ্দাম বাতাসের ঝাপটানিতে পাশের তেরপল ফটফট শব্দ করছে। ফের এক সাইকেলআরোহী জোর বেঁচে গেল। জায়গাটার নাম বাঁকাসাঁকো। পরেশ মুখ বাড়িয়ে চেঁচাল একবার, এই খানকির বেটা!

লোকটা সাইকেল থেকে নেমে হাত নেড়ে কী চেঁচামেচি করছে। পরেশ হাসতে লাগল। পিছনে অনেক দূরে পড়ে গেল লোকটা। প্রমথ বলল, বাহাদুরপুরের নাড়ু ডাক্তার।

পরেশ চকিতে জিভ কেটে বলল, তাই নাকি? ছ্যা ছ্যা ছ্যা! শালা, মাথার ঠিক নেই আজ। পরে দেখা হলে ম্যানেজ করে নেবখ'ন। হ্যাঁ রে প্রমথ, ওই নাড়ুবাবুই একবার ট্রাকের ধাক্কায় পা ভেঙে ছমাস হাসপাতালে ছিল জানিস?

প্রমথ বলল, জানি। তবু আক্কেল হল কই? স্ল্যাব ছেড়ে চাকা নামলে যেন জাত যায় ওনাদের।

সামনে অনেকগুলো খড়বোঝাই গরুর গাড়ি আসছে। এও এক আপদ। ফের খিস্তিতে মুখ লাল হল পরেশের। কিন্তু বেশি বলা যাবে না। ওগুলো হাটপাড়ার গাড়ি। কুখ্যাত গ্রাম। ওখানে আণ্ডা-বাচ্চা সবাই নাকি খুনে বদমাস। রাস্তার ধারেই পড়বে গ্রামটা। গাড়ি চিনে রাখতে ওদের জুড়ি নেই। তারপর একদা আচমকা রাস্তায় ব্যারিকেড করে গাড়ি লুটে নেবে। পরেশ সামলে নিল। চাকা নামাল। এ রাস্তার সব ড্রাইভারই তা করে।

দুপাশে বিশাল সব গাছ। শিরিসই বেশী। অর্জুন বট অশ্বত্থও আছে। সমানে চলেছে দশবারো মাইল এইসব গাছপালার ভিড়, পথের ওপর আলো-ছায়ায় ঝালর। অন্যরকম নেশা ধরায় মনে। সবুজ গ্রাম, সোনালি আদিগন্ত ক্ষেত, ঝিলমিল বিল, রুপোলি নদী-কাঁদরের আঁকাবাঁকা রেখা। দূরের আকাশে বুনোহাঁস উড়ে যাওয়ার ছবি। পথের পাশে ধীরগামিনী কাঠকুড়োনি গরীব যুবতী। কান্দীকোর্টে মামলার জন্যে দ্রুত হেঁটে চলা গ্রাম্য মাতব্বর মানুষেরা। ঘুঘুধরা সাঁওতাল চলেছে হিজল বিলের দুর্গম বন-জঙ্গল এলাকায়। রণগ্রাম ব্রীজে উঠে গাড়ি থামাল পরেশ।...প্রমথ, দুটো ঘুঘু পাস নাকি দেখ তো বাবা।

প্রমথ নেমে গিয়ে ডাকল লোকটাকে। কাঁধে বাঁশের 'বাহক' বা 'বাঁক', দুপাশে নিমপাতা-ঢাকা মস্তো দুটো খাঁচা। একটার ওপর ফাঁদ। ফাঁদের কাঠিতে একটা পোষা ঘুঘু চুপচাপ বসে আছে। তার চোখদুটো কানা। তার ডাকে বুনোঘুঘু উড়ে আসে আর ফাঁদে পড়ে যায়।

পরেশ মুখ বাড়িয়ে রইল। লোকটা ইতিমধ্যে কিছু ধরে ফেলেছে। দরদস্তুর করছে। প্রমথ দুটো ঘুঘু হাতে নিয়ে এল।...বারো আনা করে চাচ্ছে। নেবেন?

টাকা দিল পরেশ। প্রমথ ঘুঘু দুটো ধরে নিজের জায়গায় বসল। প্রমথ বলল, কী কাঁপছে! প্রাণের মায়া একেই বলে।

গাড়ি স্টার্ট দিয়ে পরেশ বলল, এ বেলা ছোটবাবুর কাছে নেমতন্ন খাবো। বুঝলি প্রমথ? ঘুঘুর মাংস আর মুগের ডাল। ব্যস! বাড়ি এবেলা যাচ্ছিনে।

প্রমথ বলল, ছোটবাবু? বেচুবাবু তো নিরামিষ খান গো! ওনার দাদাও তাই।

পরেশ বলল, আবে বুদ্ধু! আমার ছোটবাবুকে চিনিস নে?

প্রমথ সলজ্জ হাসল।...চাঁদুবাবুর কথা বলছেন?

পরেশ ধমকাল।...চাঁদবাবু কী রে বেটা? চন্দনবাবু বলতে কী হয়?

প্রমথ বলল, চন্দনবাবু! কে জানে। সবাই তো চুদুবাবু বলছে।

কেউ বলবে না।...পরেশ একহাতে সাবধানে দেশলাই বের করে অদ্ভুত কায়দায় জ্বালাল। নিভে যাওয়া চুরুটটা ধরিয়ে নিল।...বেচারার বরাত! চাঁদু শুনলে ও রাগ করে—অথচ সবাই তাই বলে ডাকে। আচ্ছা প্রমথ, তোকে যে বললুম সেদিন—একটা ভালো ঠাকুর দেখে দে ওর রান্নার জন্যে। ভুলে গেছিস?

প্রমথ বলল, না। আমি তো দেখছিলুম লোক—হকসায়েব বললে যে উনি নাকি রাধার হোটেলে ব্যবস্থা করবেন। তাই...

পরেশ বলল, রাধার হোটেলে! পাগল, না মাথা খারাপ! গ্যাসট্রিক হয়ে মরবে না? হকসায়েবটা যে কী! বুঝতে পারিনে। ছেলেটার পিছনে যেন আঁঠার মতো লেগে রয়েছে। তুই লোক দ্যাখ প্রমথ। মেয়েছেলে হলেও আপত্তি নেই।...পরক্ষণে হাসল সে।...তবে বয়সটয়স একটু দেখবি। ভাইটির মুণ্ডু যেন না ঘুরে যায়।

প্রমথ বলল, বাবু, একটা কথা শুনছি ইদানীং। বলবো?

কী কথা?

ওনার নাকি বে দিচ্ছেন আপনার ইয়ের সঙ্গে?

পরেশ হো হো করে হাসল।...ইয়ের সঙ্গে কী বে? আমার শালীর সঙ্গে। চমৎকার মানাবে না? কী বলিস?

প্রমথ একটু ভেবে বলল, মানাবে চমৎকার। কিন্তু...

কিন্তু কী রে?

দিদিমণি তো এখনও পড়ছেন।

তা—পড়লে বুঝি বিয়ে করা যায় না? বিয়ে করেও পড়বে। আজকাল সিঁদুরপরা বিস্তর মেয়ে পড়াশোনা করছে। ওটা কথা নয়।

বিয়েটা হচ্ছে কবে?

পরেশ হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। শুধু বলল, উঁ?

শিগগির লাগাচ্ছেন তো?...বলে প্রমথ ঘুঘুদুটোর পিঠে হাত বুলোতে থাকল।

পরেশ ঘুঘুদুটোকে একবার দেখে নিয়ে বলল, ক' গ্রাম মাংস হবে রে? আড়াইশো হবে, কী বলিস? পাখির মাংস আমি কিন্তু আগে খেতুম না। ধরিয়েছিল কে জানিস প্রমথ? নুটুদার বউ। কী রাঁধে মাইরি! আজকাল বোধ হয় আর মাংসটাংস খায় না। বিধবারা কী খায় রে প্রমথ?

প্রমথ হেসে উঠল।...হবিষ্যি করে। তবে নুটুবাবুর বউয়ের কথা বলছেন, সে দিব্যি করে বলার সাধ্যি কার? বাবু, নুটুবাবুর বন্দুকটা নেবেন বলছিলেন—কী হল?

পরেশ অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল. ধুর! বন্দুক কী হবে! আমার শালা শয়তানের চাকাধরা হাত।

প্রমথ বলল, ও বন্দুক নেওয়া ঠিক না বাবু।

কেন?

কুলক্ষুণে। মালিকের প্রাণ নিয়েছে শালা।

হ্যাঁ। নুটুদা সুইসাইড করেছিল। ওই বন্দুকটা দিয়েই।

বাবু, কান্দীতে কাজ ছিল বলছিলেন যে! ওই যাঃ!

পরেশ ঠাহর করে দেখল কান্দী পেরিয়ে এসেছে কখন। ঢালু হয়ে গেছে পথ। ডাইনে বাঁয়ে রোডস ডিপার্টের এলাকা। বিস্তৃত কাঁটাতারঘেরা জায়গায় অজস্র ড্রাম, খোয়া, কংক্রিট স্ল্যাব আর পাইপ। তারপর শুরু হল উৎরাই। খাঁটি রাঢ় এলাকা এবার। অসমতল দিগন্তব্যাপী ধানের মাঠ—বৃক্ষ-বিরল। কোথাও বাঁজা ডাঙ্গা। তালগাছের সার। উঁচু পাড়ওয়ালা দীঘি বা পুকুর। কাজল জলে ফুলন্ত সবুজ দামের ঝালর। পরেশ বলল, থাক। ক্লান্ত লাগছে। পরে আসব'খন।

অনেকক্ষণ আর কথা বলল না সে। স্পীড বাড়িয়ে দিল ফের। দূরে রূপপুর দিগন্তে ভেসে উঠেছে। পীরের দীঘির জঙ্গলে সবুজ পতাকাটা দেখা যাচ্ছে। রাস্তার দুধারে সবুজ একটা বনাঞ্চল—সরকারী বনদপ্তরের অনেক যত্নে রচিত। এলাকায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ নাকি বাড়ছে বছরে বছরে। টিবির ওপর ফরেস্ট বাংলো—তার নিচের দিকে ছোট্ট একটা পার্ক।

হঠাৎ সশব্দে ব্রেক কষল পরেশ। বলল, প্রমথ, পাখি দুটো দে। তোরা এগো, আমি হেঁটেই যাচ্ছি।

গাড়ি থেকে নেমে সাবধানে পাখি দুটো নিল সে। চাদরটা কোমরে জড়ানো রইল। প্রমথ বলল, আপনার ব্যাগটা?

অফিসে রাখবি। বরং চন্দনকে দিবি। আর শোন্, সব মাল আমার গোডাউনে রাখবি। বরকত!

ওপর থেকে বরকত সাড়া দিল।...বাবু!

তোদের আজ ছুটি বাবা। বাড়ি গিয়ে ঘুমো সব। সন্ধ্যের দিকে একবার আসিস।

গাড়ি চলে গেল। কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল পরেশ। রাস্তা নির্জন কিছুক্ষণের জন্যে। বাঁহাতে পাখি দুটো ছটফট করছে। ডান হাতে চুরুটটা ফেলে দিল নয়ানজুলিতে। তারপর পা বাড়াল সে। অল্প একটুখানি কালভার্ট পাতা আছে গভীর নয়ানজুলিতে। পার্ক এবং বাংলোয় পৌঁছবার রাস্তা সেটা। সামনে ঘন শিশুগাছ সেগুন শালের তরুণ বন। তার ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াল পরেশ। একটু ইতস্তত করল।

পরক্ষণে হনহন করে হেঁটে গেল। পার্কের কোণে বুগানভিলিয়ার ঝোপের আড়ালে কংক্রিটের বেঞ্চ। সেখানে বসে আছে দুটিতে।

পরেশের পায়ের শব্দে চমকে উঠেছিল ওরা। পরেশ একমুহূর্ত সময় নিল ভারি গলায় বলল, এস।

একজন চুপচাপ বসে রইল। একজন উঠে এল। পরেশকে দেখেই সে পলকে পাংশু হয়ে উঠেছিল। অথচ এত ভয় পাবার কথা তার নয়। পরেশকে আদৌ ভয় পায় না সে। কোনদিনও পায় নি। কিন্তু পরেশের আচমকা এসে পড়াটা অভাবিত বলেই সে হয়তো ভয় পেল। শান্তভাবে নিঃশব্দে অনুসরণ করল তাকে। কালভার্ট পেরিয়ে দুজনে রাস্তায় নামল। চলতে থাকল— তবু কথা নেই।

একটু পরে পরেশ পাখি দুটো এগিয়ে বলল, সাবধানে ধরো। উড়ে যায় না যেন।

তারপর পকেট থেকে সিগ্রেট বের করে জ্বালাল সে। অন্য হাতে পাখি দুটো ঝটপট করছিল। একটু পরেই চুপ করে গেল তারা। পরেশ তখন ডাকল, রুমা!

উঁ!

আজ কলেজ নেই?

আছে।

ঘড়ি দেখে পরেশ বলল, আর কখন যাবে?

আমার ক্লাস আজ বারোটায়।

আচ্ছা রুমা—

কী?

খুব মুসড়ে পড়েছ মনে হচ্ছে!...পরেশ হাসবার চেষ্টা করল।...কেন? হঠাৎ তাল কেটে গেছে বলে?...অবশ্য আমি হঠাৎ দেখে ফেলেছিলুম তোমাকে।

রুমা আস্তে আস্তে বলল, গাড়ি কই? হেঁটে এলেন যে?

গাড়ি চলে গেছে। যাক্‌গে, তোমার দিদির খবর কী?

বাড়ি গিয়ে দেখুন না। আমি কী জানি!

তুমি আমার ওপর রাগ করেছ রুমা?

ফেট্!

আচ্ছা রুমা, তুমি কি শুনেছ যে আমি এক কাণ্ড করে ফেলেছি—মানে, তোমার আখের গুছিয়ে দিতে যাচ্ছি?...পরেশ স্মিত পরিহাসের সুরেই কথাটা বলল।

শুনেছি।

বাঃ লক্ষ্মী মেয়ে! তুমি—

আমি এখন পড়া ছাড়ব না।

ছাড়তে বলছে কে? যদ্দুর খুশি পড় না কেন! কিন্তু আমার যে একটা দায়দায়িত্ব আছে—সেটা ভুললে তো চলবে না ভাই।

রুমা চুপ করে থাকল।

এতদিন আমাকে তুমি মেনে চলেছ—আজ মেনে চললে কি খুব অসুবিধে হবে তোমার? তুমি এতদিন ধরে তো দেখছ আমাকে—কত ভীষণ কষ্টের মধ্যে বেঁচে থেকেছি। তারপর কিছু সুখস্বাচ্ছন্দ্য এল জীবনে। সেই কচি মেয়েটি থেকে আজ অব্দি আমার সংসারেব সুখদুঃখের অংশীদার তুমি, রুমা। আজ যদি তুমি আমার ইচ্ছের বাইরে পা বাড়াও, কষ্ট আমার হবে? নিশ্চয় হবে। অবশ্য তোমার স্বাধীন ইচ্ছের কথা আমি মানি। কিন্তু.....

বুঝতেই পারছিনে, কী বলছেন।.... রুমা হাসবার চেষ্টা কবল।

. পারছ। তুমি বোকা মেয়ে নও। রুমা, চন্দনও আমাদের সংসারের সঙ্গে জড়িয়ে থেকেছে সারাজীবন। ছেলেবেলা থেকেই। ঠিক তোমারই মতো। তবে তার সঙ্গে হয়তো রক্তের সম্পর্ক ছিল না।...একটু কেশে পরেশ ফের বলতে থাকল।...এখানে একটা কথা বলে রাখা অবশ্য উচিত। লোকে যতটা সংসারী আমাকে ভাবে, ঠিক ততটা কেন—আদতে আমি সংসারীই নই। বলবে, তাহলে এতসব করছি কেন? তোমাদের জন্য রুমা। তোমার দিদি, আমার ছেলেমেয়ে আর তুমি—তোমরা যাতে সুখেস্বাচ্ছন্দে থাকো, তার জন্যে এত আয়োজন। কারণ, আমার একার কাছে দারিদ্র্য দুঃখকষ্ট কোন ব্যাপারই নয় —একা ওসব আমি মুখ বুঁজে সইতে পারি। অথচ আমার সঙ্গে তোমরা জড়িয়ে পড়েছ বলে কেন দুঃখদুর্দশাগুলো সইবে? তাই যা কিছু করেছি, সবই তোমাদের জন্যে।

রুমা কোন কথা বলল না।

আমি আসলে গাড়োয়ান মানুষ রুমা। জন্ম-গাড়োয়ান। এক জায়গায় আমাব দাঁড়াতে ভালো লাগে না। আমাব অনেক কথা তুমি বা তোমার দিদিও জানে না। বলিনি। থাক্ সে কথা। তোমাদের কথায় আসি।

রুমা মৃদু ক্ষোভের সঙ্গে বলল, কী করেছি আমরা?

হাসল পরেশ।.....না, তেমন কিছু করনি। তোমার দিদির কথা ছেড়ে দাও। তুমি তো জানো, চিরদিন সে যার জন্যে শাপমন্যি করেছে, তা আজ পেয়ে গেছে। আমি সেদিক থেকে নিশ্চিন্ত। মনে আর অপরাধবোধ একটুও নেই। এখন তুমি—রুমা, তোমার ব্যাপারে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারলেই বেঁচে যেতুম।

কেন? নিশ্চিন্ত হতে বাধা কোথায়?

পাখি দুটো আবার ঝটপট করে উঠল। পরেশ বলল, সাবধানে ধরো, পালায় না যেন।

একটু চুপচাপ হাঁটল দুজনে। রূপপুর এসে পড়েছে। ইঁটখোলা বাঁদিকে, ডাইনে চুনের আড়ত। পরেশ বলল, তুমি আমাকে অমান্য করতে পারো। চন্দনের সঙ্গে তোমার একটা সম্পর্ক ছিল—তুমি হয়তো টের পেতে কিনা জানিনে, আমি আর তোমার দিদি বারবার বলাবলি করতুম কথাটা। সেই ইচ্ছেয় বাদ সেধো না লক্ষ্মীটি।

রুমা চাপা স্বরে বলল, আমাকে আগে বলেননি কেন?

আমি ভাবিনি যে তুমি আমার কথার বাইরে যাবে—তাই।

কে বাইরে গেছে?

রুমা, ছিঃ! কাঁদে না। চারপাশে লোক।

হ্যাঁ—চারপাশে লোক। আর জামাইবাবু তাঁর শালীকে জ্ঞান দিতে দিতে যাচ্ছেন। কেন আপনি এমন করে যেখানে-সেখানে যা তা বলবেন?

রুমা, আস্তে! কেলেংকারী করো না।

রুমা চুপচাপ হাঁটতে থাকল। গতি বাড়ল তার।

পরেশ বলল, বলার সময় নিশ্চয় এটা ছিল না। কিন্তু এতদিন যা আবছা কানে আসছিল, আজ তা প্রত্যক্ষ দেখে সত্যি বড় দুঃখ পেলাম রুমা। তাই বলে ফেললুম। তুমি ভুল করছ।

কী ভুল করছি?...রুমা যেন হাঁফাচ্ছে।

হেডমাস্টারমশায়ের ছেলেটিকে আমি জানি। সে শিক্ষিত ছেলে—কিন্তু বাউণ্ডুলে। তাছাড়া, তুমি রুমা—তুমি পরেশ মজুমদারের শালী, বাণীবাবুর মত শুচিবাইগ্রস্ত লোক তোমাকে ঘরের বউ করবে না কোনদিন।...পরেশ হো হো করে হেসে উঠল।

অসভ্যের মতো কথা বলবেন না তো!..রুমা গর্জে উঠল।

রাগ করো না। ওসব অমিত-টমিত ছেড়ে এবার একটুখানি তোমার ব্যবসাপত্তরের খোঁজখবরে এস, বুঝলে? আমি শালা যেভাবে আজকাল গাড়িতে ঘুরেছি—কবে খবর পাবে কোথায় রক্তারক্তি হয়ে পটল তুলে বসে আছি। তখন কী হবে শুনি? তোমার দিদি তো গবেট মুখ্যসুখ্য। টাকা গুণতেও জানে না। তুমি শিক্ষিতা মেয়ে—তোমাকেই তো তখন হাল ধরতে হবে কারবারের। হবে না? হিসেব করে বলো।

পেট্রোল পাম্পের কাছে ততক্ষণে পেঁছে গেছে ওরা। বেচুবাবু যথারীতি খাতাপত্তর নিয়ে বসে আছেন। ট্রাকটা খালাস হচ্ছে সামনে। চন্দন পেন্সিল হাতে দাঁড়িয়ে আছে গোডাউনের দরজায়। এদিকে চোখ নেই তার।

পরেশ বলল, আজ আর কলেজ যেতে হবে না। খুব বকাবকি করলুম। এবার এসো, একটু আদর করি। চন্দনেব ঘরে বসে গরম জিলিপি খাওয়া যাক্। তারপর বাড়িতে খবর পাঠাই যে আজ দুপুরে রুমা তার জামাইবাবু সহ চন্দনের কাছে নেমন্তন্ন খাচ্ছে। ঘুঘুর মাংস ভারি চমৎকার রুমা। কখনও তো খাওনি—আজ খেয়ে দ্যাখো।

পরেশ এগিয়ে গেল।...ছোটবাবু এসে গেছি হে!

চন্দন তাকে দেখে হাসল। বারান্দা থেকে নেমে এল সে।...হেঁটে এলেন যে?

পরেশ রুমাকে দেখিয়ে বলল, শালীর জন্য। উন্মনা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ফরেস্টে। বাউরি হওয়া না কী বলে যে ছাই! ও রুমা, এস শিগ্‌গির।

ছোটবাবুকে মালকাঁড় দ্যাখাও। চন্দন, আজ তোমার এখানে আমরা দুটিতে খাচ্ছি। হৃদয় হৃদে! ও ঠাকুর।

হৃদয় দৌড়ে এল।

পরেশ বলল, আজ তোমার বাবুর দুজন গেস্ট। ঘুঘুর মাংস হবে।

হৃদয় আকাশে চোখ তুলে উদ্বাহু নৃত্য করে বলল, তোফা!

রুমা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চন্দন ডাকল, কী হল রুমা? এস।

পরেশ বলল, রুমা এস। রোদ লাগছে না?

রুমা কোন কথা বলল না। হৃদয়ের বাড়ানো হাত দুটো লক্ষ্য করে পাখি দুটো ছুঁড়ে দিল। পরেশ হাঁ হাঁ করে উঠল, উড়ে যাবে, সর্বনাশ! কিন্তু উড়ল না পাখি দুটো। মাটিতে পড়ল হৃদয়ের হাত ফসকে। পড়েই রইল নিস্পন্দ।

মরে গেছে! সবাই হাঁ করে দেখছে পাখি দুটো। রুমার হাতের টিপুনিতে মরে গেছে। রুমা হনহন্ করে চলে গেল রাস্তায়। পরেশ গগলস খুলে রুমালে চোখ মুছতে থাকল।

দশ

জোর শীত পড়বে মনে হচ্ছে। বিকেল থেকে উত্তরের মাঠ পেরিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসতে শুরু করে। ব্লক আপিসের লম্বা ইউক্যালিপটাসে নাড়া দিতে দিতে তারপর হাইওয়েতে এসে পড়ে। দুধারের বাজার দোকানপাট ভিড়—সবখানে ঠাণ্ডা ছড়াতে ছড়াতে হাওয়াটা চলে যায় দক্ষিণের মাঠে। সন্ধ্যায় গাছগাছালির মাথায়-গায়ে টুপি আর আলোয়ানের মতো কুয়াশা জড়িয়ে যায়। আলোর বালবে পোকামাকড়ের ভিড় কমে গেছে। এইসব সন্ধ্যা আর রাতে হাইওয়েতে দাঁড়িয়ে রূপপুর চটিকে দেখলে মনে হয় কাচের ভিতর এক আজব শহর। লোকজন যেন ঝিমুচ্ছে। সব কিছু যেন দূরে চলে গেছে পরস্পর। চায়ের দোকানগুলোয় আশেপাশের গ্রাম থেকে আড্ডা দিতে আসা ছেলেছোকরাও শিগ্‌গির বাড়ি ফিরতে চায়। জায়গায় জায়গায় সাইকেলের গাদা—কোথাও মোটর সাইকেল ; একটা-একটা করে খালি হতে থাকে। কেউ পীচের পথে, কেউ শিশিরভেজা কাঁচা রাস্তা—কেউ বা স্রেফ সরু আলপথেই দুচাকা গড়িয়ে বাড়ি ফেরে। তাদের অনেকের হাতেই ট্রানজিসটার। অনেক রাতে নির্জন ধানের মাঠে বোম্বের গায়ক সগর্জনে গান গাইছে শুনলেও কোন ফসল পাহারাদার চাষা আজকাল চমকে ওঠে না। হয়তো তার মাঠের কুঁড়েতেই ঝুলছে একটা যন্ত্র কাঁচভাঙা হেরিকেনের পাশে।

এ অঞ্চলে শীতের প্রকোপ বরাবর একটু বেশি। রূপপুর ছাড়িয়ে—অর্থাৎ চালকল পেরিয়ে ফাঁকা মাঠ দুদিকে। অঘ্রান রাতের হাওয়া কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। পরেশ বলল, ফেরা যাক। তোমার ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে হে!

চন্দনের শীত করছিল, তা সত্যি। শার্টের ওপর হাত-কাটা সোয়েটার মাত্র। পায়েও মোজা নেই—স্লিপার। হাঁটতে হাঁটতে কথার ঝোঁকে বেশ দূরে আসা গেছে। সে আড়ষ্টভাবে বলল, হ্যাঁ—একটু শীত করছে এবার।

ওকে সিগ্রেট দিয়ে পরেশ নিজে একটা চুরুট ধরাল। দূর থেকে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে মাঠের দিকে কার ট্রানজিসটারের আওয়াজ। সাঁকোর ঘাঁটি—রূপপুর রাস্তায় দিগন্তে শিসিয়ে উঠছে মোটর গাড়ির আলো। পরেশ বলল, হ্যাঁ—যা বলছিলুম। তোমার বউদির একটা ভয় আছে, আমি জানি। খুব ভালভাবেই জানি। আসলে ব্যাপারটা কী হয়েছে, জানো? যখন কপাল-গুণে কিছু-কিছু পয়সাকড়ি আসতে লাগল, একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলুম॥ একেবারে আঙুল ফুলে কলাগাছ হচ্ছে, ভয় হবে না কেন? তাছাড়া আমি বেচুবাবুও নই—বাপুতি ধনসম্পত্তিও কিছু ছিল না। আবার সোর্স অফ্ ইনকাম যদি পুলিস জানতে চায়, জবাব কী দেব? তখন সব রুমার নামে গছালুম। এ দিয়ে পার না পাই, অন্তত সাময়িকভাবে মাথা তো বাঁচবে। পরে ভাবলুম, হয়তো ভুল হল।

চন্দন বলল, রুমার কাছ থেকে ফেরত নিন। কাগজপত্রেও সই দিলেই তো চুকে গেল।

পরেশ অন্যমনস্কভাবে বলল, হ্যাঁ—সে তো ঠিক। সইয়ের-ওয়াস্তা। কিন্তু এখনও সেদিন আসেনি ভাই। তোমার বউদির নামে কিংবা নিজের নামে যে নেব, তার সময় এখনও আসেনি। মাথার ওপর অনেক খাঁড়া ঝুলছে। ভয় হচ্ছে, তারপর যদি হঠাৎ ফেঁসে যাই—ওরা বিপদে পড়বে। চার-পাঁচটা কেস রয়েছে এনফোর্সমেণ্ট আবগারি আর আই বি'র। পিকিউলিয়ার সব চার্জ। তদন্ত শেষ হলেই ওরা ফাইনাল রিপোর্ট দেবে। তখন কোর্টে প্রকাশ্যে মামলা শুরু হবে। অনেক করে চাপা দিচ্ছি তো ফের গজিয়ে উঠছে। কেন গজাচ্ছে, একটু-একটু টের অবশ্য পাচ্ছি। আমার চারপাশে শত্রু, ভাই চন্দন। সরকারি লোকদের মুখ বন্ধ করেও করা যাচ্ছে না। আবগারির কেসটাই ধরো। গত বছর চাপা পড়ে গেল। নিশ্চিন্ত হলুম। হঠাৎ গত সেপ্টেম্বরে ফের মাথা চাড়া দিল। হরিবল ব্যাপার! একদণ্ড সুখেস্বস্তিতে থাকবার উপায় নেই। অবশ্য আমি জানি, কে এসব করছে। কে তলে-তলে খোঁচাচ্ছে।

চন্দন অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করল, কে?

অবাক হয়ো না। লোক চিনে রাখা তোমার খুবই দরকার। খোঁচাচ্ছে আমাদের বেচুবাবু।

কী আশ্চর্য!

পরেশদার চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে বলল, হ্যাঁ, সাপের সঙ্গে ঘর করছি। ইচ্ছে করেই করছি। আমার আলফা কনসার্ন গড়ার উদ্দেশ্য একটিই—তা হচ্ছে, ওদেরও দলে টানা। যাতে একা না ডুবি, ডুবতে হলে ওদের নিয়েই ডুবব।... হেসে উঠল সে।...ভাই চন্দন, এ রূপপুর এক আজব জায়গা। এখানে কোন সমাজ নেই, একতা নেই—সবাই সবার প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রত্যেকে প্রত্যেককে টিট করতে চায়। কেন চাইবে না? কারো সঙ্গে কারো তো বাপের জন্মে চেনাজানা ছিল না। সবে পনের বিশ বছর ধরে নানা জায়গার মড়া এসে এক ঘাটে জুটেছে। আর এসে অব্দি চলেছে জোর কমপিটিশান। কে কত বড় হবে, কে সবচেয়ে বেশি পয়সা করবে। এ শালা এক শয়তানের আখড়া। দুনিয়ার

যত শয়তান কপাল ফেরাতে এখানে চলে আসছে। আমিও তাদের একজন। তুমি নিশ্চয় টের পাচ্ছ এতদিনে?

চন্দন বলল, কী জানি! আমার তো অন্যরকম লাগে। আসা অব্দি যাদের-যাদের সঙ্গে চেনাজানা হয়েছে খারাপ মনে হচ্ছে না।

পরেশ আরও হেসে বলল, তুমি যোগীপুরুষ! কাদের কথা বলছ, আমি জানি। ব্রজ, কিংবা তার বউ, নয়তো পাণ্ডেজীর বেটি আলতারাণী—নয়তো ভালমানুষ হকসায়েব। আরে দূর দূর! ওরা রূপপুরের কে?

আরে পাণ্ডেজী?

পাণ্ডেজী! ওর মতো ঝানু চালাক মানুষ কোথাও দেখিনি। চন্দন পাণ্ডেজীকে ধোওয়া তুলসীপাতা মনে করো না। পয়সা চিনতে ওর জুটি নেই। বলবে, সৎপথে থেকে পয়সা করেছে। পাগল, পাগল! পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের বাজারে পাণ্ডেজী মানুষের অখাদ্য বেচেছে খাদ্যের দামে। এখনও সে-লাইন সমানে চলেছে। সোজা আঙুলে যেমন ঘি ওঠে না, সোজা পথে পয়সাও আসে না। ক্রমে ক্রমে টের পাবে সব।

চৌমাথা পেরিয়ে ওরা বাঁদিকে ঘুরল। বাজার এলাকা শুরু হয়েছে এখান থেকে। চন্দন বলল, আজ তাহলে বাড়িতে রাত কাটাচ্ছেন? বউটি খুব খুশি হবে কিন্তু।

পরেশ একটু হাসল।..কাটাব। বেচারা এখনও কথাটা যখন শোনে নি—আজ বলতে হবে। হাজার হোক, রুমার প্রকৃত গারজেন তো সে। কিন্তু আশ্চর্য! ইচ্ছে করেই চারদিকে এতটা রটালুম—ভাবলুম তোমার বউদির রিঅ্যাকশনটা কী দেখা যাক্। অথচ কিচ্ছু জানে না বলছ। এমন গবেট মেয়েরে বাবা! আমি তো অতশত খবর রাখিনে। হয়তো মেশেও না কারো সঙ্গে।

চন্দন বলল, আমারও তাই ধারণা। বউদি যেন এখানে একে মানিয়ে নিতে পারে নি এখনও। আগে অবশ্য...

পরেশ বাধা দিয়ে বলল, কী ছিল আগে? ও বরাবর ওইরকম একলষেঁড়ে মানুষ। জিয়াগঞ্জে তো তুমি দেখেছ—দরকার ছাড়া কারো সঙ্গে কথাই বলত না। হ্যাঁ, বলত—ঝগড়ার সূত্র পেলে।

চন্দন বলল, যাঃ। বউদি মোটেও ঝগড়াটে মেয়ে নয়।

নয়। কারণ একটুতেই কেঁদে ফেলে।...পরেশ হাসতে লাগল। তারপর দাঁড়িয়ে গেল।..চলো, চা খাওয়া যাক্। তারপর তুমি যাবে নিজের জায়গায়, আমি যাব.. ওহে সীতাংশুদা, চা খেতে যাচ্ছি।

'স্যাঙ্গুভ্যালি' রেস্তোরা থেকে সীতাংশুবাবু হাত তুলে ডাকছিল।...আসুন মজুমদারমশাই!

চন্দন হঠাৎ বলল, কিন্তু আমার তো কিছু শুনলেন না পরেশদা!

পরেশ মুখ ঘুরিয়ে বলল, তোমার কথা? কিসের?

আছে।

শুনব'খন। এস, খানিক আড্ডা দিই। আজ ছুটির হাওয়া লেগেছে হে!

দুজনে ভিতরে গিয়ে বসল। তিনটে টেবিল ঘিরে ক'জন যুবক বসে রয়েছে।

পর্দা সরিয়ে 'লেডিজে' ঢুকল পরেশ। যুবকেরা সিনেমাস্টার নিয়ে তুমুল তর্ক জুড়েছে। পরেশ বিকৃত মুখে চাপা মন্তব্য করল, গাধার বাচ্চারা!

সীতাংশুবাবু এসে দাঁড়াল।...কাল সকালেই যেতুম আপনার কাছে। হাজিসায়েব এসেছিলেন বিকেলে। রাজি করিয়েছি। সামনে ওনার মেয়ের বিয়ে। আপনি রেডি তো?

পরেশ বলল, সে হচ্ছে। এখন চা লাগান।

সীতাংশুবাবু চেঁচিয়ে বলল, ভুলু! দুটো স্পেশাল চা। আর কিছু দিতে বলি?

পরেশ চন্দনকে বলল, খাবে কিছু?

চন্দন মাথা দোলাল, নাঃ।

শুধু চা সীতাংশুবাবু।.. পরেশ চুরুটটা নিভিয়ে রাখল।

সীতাংশুবাবু বলল, চন্দনবাবু কেমন আছেন? আর তো এলেন না এদিকে।

পরেশ বলল, আলাপ হয়েছে চন্দনের সঙ্গে? বাঃ!

চন্দন মৃদু হাসল। সীতাংশু বলল, আলাপ না হয়ে যো আছে! রূপপুরে তো খাঁটি ভদ্রলোক বড় কম পায়ের ধুলো দেন—আমাদের ভাগ্যি। মজুমদার-মশাই, খুব ভাল কুটুম্ব পাচ্ছেন কিন্তু। সে আমি একপলকেই বুঝে গেছি। আজ না হয় জমির দালালী করছি, একসময় ঘটকালি করতুম যে!

পরেশ বলল, তাও বটে। ভাই সীতাংশুবাবু, তাহলে একটা দায়িত্ব নিতে হয় আপনাকে।

আলবাৎ নেব। বলুন।

শিগ্‌গির একবার জিয়াগঞ্জ ঘুরে আসবেন? নামঠিকানা সব দিচ্ছি। ছেলে লায়েক হয়েছে—কিন্তু মাথার ওপর মা বাবা বর্তমান।

সীতাংশু ব্যস্ত হয়ে বলল, বুঝেছি বুঝেছি। শুভস্য শীঘ্রং। বলেন তো কালই রওনা দেব। আগামীকাল বার ভালো, তিথি নক্ষত্রও ভালো। একটু আগে পাঁজি দেখছিলুম।

পরেশ ওর দিকে তাকিয়ে বলল, আগামীকাল? দেখুন—দিনক্ষণের ব্যাপার দেখেটেখে আপনিই ঠিক করুন।

চন্দন আড়ষ্ট কণ্ঠে বলল, পরেশদা! ওসব হবে। পরে হবে। আমার কথা আছে।

চা এসে গেল। পরেশ বলল, চা খাও। তুমি আমাদের ব্যাপারে নাক গলিও না। সীতাংশুদা, আমি ফাইনাল বললুম। ব্যাপারটা আমার মাথায় এসেছিল, কিন্তু ঠিক করতে পারছিলুম না—কে যাবে। আমিও যেতে পারতুম। কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা হয়নি বহুকাল। যাক্‌গে, মেঘ না চাইতে জল। আমার আবার দুটো দিন তাড়া আছে। ঘুরে আসুন—তারপর আমি নিজে যাব। সামনে বোশেখ নাগাদ সব চুকিয়ে ফেলতে হবে। রুমারও তখন লম্বা ছুটি।...

কতক্ষণ পরে ওরা বেরোল। পথে এসে পরেশ বলল, তাহলে তুমি এসো। আমি এগোই।

চন্দন ঠোঁট ফাঁক করল—কিন্তু কিছু বলতে পারল না। পরেশ এখন ভিন্ন মুডে আছে। এখন কিছু বলে লাভ হবে না—সে জানে। বড্ড জেদী লোক পরেশ।

চন্দন খুব আস্তে আস্তে নিজের বাসার দিকে চলল।.....

বাড়ির দিকে যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়াল পরেশ। অনেকদিন একটা জায়গায় যাওয়া হচ্ছে না। সংকোচও কিছুটা, সময়ও হয়ে ওঠে না। যাবে নাকি একবার? অবশ্য রাত্রিবেলা—শীতের দরুন লোকচলাচল কম ওদিকটায়। ব্লক এলাকার সুঁড়ি রাস্তা বড় পার্কটার পাশ দিয়ে—অন্যদিকে বড় বড় শিরিস অশোক দেবদারু গাছের জটলা। ঘন ছায়া জমে থাকে সেখানে। তারপর বাংলো প্যাটার্ন বাড়িটা—মাঠের ধারে। ওই নির্জন জায়গায় কী সাধে বাড়ি করেছিল নন্দী গ্রামের নুটুবাবু। তার শিকারের নেশা ছিল প্রচণ্ড।

নুটুবাবুর ট্রাক ছিল একটা। তখনও কোন ট্রান্সপোর্ট কোম্পানী এখানে গড়ে ওঠেনি। ওই ট্রাকটা এলাকার কারবারীদের ভাড়া খাটত। পরেশ নুটুবাবুর ড্রাইভার মজিদের অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে রূপপুরে ঢুকেছিল। মজিদ টেনে এনেছিল তাকে। তারপর মজিদ মারা গেল। তখন পরেশ হল নুটুবাবুর ট্রাকের ড্রাইভার। বাড়ির সামনে একটা গ্যারেজ ছিল এই শিরিস গাছের কাছে। সেখানেই থাকত পরেশ আর তার পরিবার। রুমা ওখান থেকেই স্কুলে ভর্তি হল। নুটুবাবুর বউ এত ভালবাসত ওদের! কতদিন পরে পরেশ বড় রাস্তার ধারে একটা বাসা নিল। গ্যারেজ ঘরের ঘুপটিতে কুলোচ্ছিল না। সে-বাসাতেও এসেছে নুটুবাবুর বউ। খোঁজখবর নিয়েছে বরাবর। পরেশের ভাগ্যের চাকা ঘুরছিল দ্রুত। নতুন বাড়িতে উঠে যাবার পরও নুটুবাবুর বউ গেছে দু'একবার। হঠাৎ নুটুবাবু বন্দুকের গুলিতে আত্মহত্যা করল। বছর পাঁচ আগের কথা। পরেশের মনটা মুষড়ে পড়ে সেসব পুরনো কথাগুলো ভাবলো। দেখতে দেখতে কোথায় চলে এল সে! এ পাঁচটা বছরে সে এত উঁচুতে চলে এসেছে সে পিছনের দিকটা বড় উদ্ভট মনে হয়।

তা—. নুটুবাবুর আত্মহত্যার পর থেকে তার বউ আর পরেশের বাড়ি একদিনও যায়নি। কিন্তু পরেশ এসেছে বরাবর। এসেছে, কিছু রটনাও হয়েছে রূপপুরে, নানা গুজব ছড়িয়েছে। স্নেহধারা মাথা ভেঙেছে—অবশেষে যেন হাল ছেড়ে দিয়ে চুপ করে গেছে। তবু মেয়েমানুষের মন, এখনও মাঝে মাঝে সে ফেটে পড়তে চায়। রুমা তাকে সামলায়। পরেশ আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে বাড়ি থেকে।

গাছতলায় নিচে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্তত করল পরেশ। হঠাৎ বুক কাঁপল তার। কেন সে এমন চোরের মত ওবাড়ি যাচ্ছে? দিনের বেলা সবার সামনে বুক ফুলিয়ে গেলেই বা কী! কারও তো সাধ্য নেই পরেশ মজুমদারের সামনে এসে বলে, কোথায় যাচ্ছ?

উঁচু বারান্দাওলা বাংলোধাঁচের বাড়িটার সামনে আলো জ্বলছে। লনের দুপাশে সুদৃশ্য ফুলগাছগুলো আজও তেমনি রয়ে গেছে। পরিচর্যার অভাব হয় না। ওদিকের মাঠের বেশ খানিকটা জমি আর পুকুর আছে নুটুবাবুর। তাই বাড়ির পিছনে একটা খামার রয়েছে!

বারান্দায় চেনে আটকানো কুকুরটা একবার ডেকেই চুপ করে গেল। পরেশ তার চেনা মানুষ। লনে পেঁছে থমকে দাঁড়াল সে। ভিতর থেকে আওয়াজ এল—কে এল, দ্যাখ্ তো বিলাস!

বিলাসবুড়ো ওদের পুরনো চাকর। বারান্দায় এসে পরেশকে দেখে নিয়ে মুখ ফিরিয়ে কর্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলল। পরেশবাবু। তারপর চলে গেল।

পরেশ জানে, বুড়োটা তাকে পছন্দ করে না। সে বারান্দায় উঠতে উঠতে ডাকল, বউদি আছো নাকি?

ভিতর থেকে সাড়া এল, এস।

এ্যালসেসিয়ানটা পরেশের পায়ে গা ঘষতে শুরু করেছে। পরেশ তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করল। কুকুরটা সমানে গরগর করতে থাকল। পর্দাটা ফাঁক হয়ে থাকায় ভিতরের আলোয় সুনন্দিতাকে দেখা যাচ্ছিল। নিবিষ্টমনে উল বুনছে সে। পরেশকে সে দেখছিল না এটা ঠিক—কিন্তু তার ঠোঁটের হাসির ঝিলিক পরেশ দেখতে পাচ্ছিল। সে ঘরে ঢুকে বলল, উল বুনছ! কার জন্যে?

হয়তো তোমারই!...বলে সুনন্দিতা হাসিভরা শান্ত মুখটা তুলল। কলকাতা থেকে কখন ফিরলে?

পরেশ সামনে বসে বলল, আজ সকালে। কলকাতা গেছি কেমন করে জানলে?

সুনন্দিতা বলল, জানতে পারি। আমার স্পাই আছে।

দুজনেই হো হো করে হেসে উঠল। তারপর পরেশ বলল, আমার পিছনে স্পাই লাগিয়ে কোন লাভ হবে না। কই সেই এ্যাশট্রেটা দাও। আরাম করে সিগ্রেট খাই। আর, কড়া করে কফি খাওয়াও তো আজ। শরীরটা কী রকম লাগছে যেন। ততক্ষণ আমি মৌজ করে গান শুনি।

উল রেখে হাসিমুখে সুনন্দিতা পাশের রেডিওর চাবি ঘোরাল।

পরেশ বলল, হাল্কা গান কোথায় বাজছে দ্যাখো। বরং সিলোন ধরো না!

চটুল সুরে গান বেজে উঠলে সুনন্দিতা বলল, ব্যাপার কী? তুমি তো ক্লাসিক গান-না হলে কানে আঙ্গুল দাও। আজ আবার কী হল শুনি? বউ পিটি দ্যায়নি তো?

পরেশ সিগ্রেট ধরাল। তারপর বলল, কী জানি—আজ কিন্তু ভালো লাগছিল না শালা। তাই চলে এলুম তোমার এখানে।

সুনন্দিতা সশব্যস্তে কিন্তু চপল স্বরে বলল, এখানে শালাফালা চলবে না। কতবার বলে দিয়েছি না? এখনও ড্রাইভারি চালটা ছাড়তে পারলে না—আশ্চর্য!

পারলুম কই? আমি—মাইরি বউদি, জন্ম-গাড়োয়ান! কী নেশা না ধরে গেল রূপপুরে এসে!...পরেশ শান্তভাবে বলতে লাগল।...বিশ্বাস করো। একটা রাত্তির কোথাও চুপচাপ শুয়ে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। কই, কফি বলো!

সুনন্দিতা যেতে যেতে বলল, আজ রাত কাটাবে কেমন করে?

পরেশ জবাব দিল, সেইজন্যেই-তো তোমার এখানে এসে গেলুম।

একা ঘরে কিছুক্ষণ চুপচুপ সিগ্রেট টানতে থাকল পরেশ। সে নটুবাবুর কথা ভাবছিল। এ ঘরের দেয়াল ভর্তি যা সব রয়েছে, একজন শিকারীর অস্তিত্ব ঘোষণার পক্ষে তা যথেষ্ট। জীবজন্তুর চামড়া বা মুণ্ড, শিকারী নটু-

বাবুর ছবি-সব মিলিয়ে যেন একটা সাংঘাতিক কিছু নিরন্তর ওঁৎ পেতে আছে এ ঘরে, যা গা ছমছমানির পক্ষে যথেষ্ট। তার ওপর নুটুবাবু আত্মহত্যা করে মরেছিলেন এ ঘরে নয় যদিও, এ বাড়িতো তো বটে। তাই একটা প্রাগৈতিহাসিক আবছা শক্তি যেন থমথম করে—অন্তত পরেশের তাই মনে হয়। মজার কথা, কোন তন্ময় মুহূর্তেও হঠাৎ তার চমক খেলে যায়। পিছনে এসে কেউ দাঁড়ায়নি তো? আজও পরেশের ধাঁধা গেল না যে নুটুবাবু গুলিটা ছুঁড়তে চেয়েছিলেন অন্য একজনকে লক্ষ্য করেই, এবং দুর্ভাগ্যবশত তা লাগল তাঁর নিজের মাথায়। তাই বটে! এইরকমই হয় সংসারে। আসল শত্রু হয়তো নিজের মধ্যেই রয়েছে।

সুনন্দিতা ফিরে এল। বলল, শ্যামাঠাকরুণ আজ সকাল সকাল চলে গেছে। কিছু খাবে?

পরেশ মুখ না তুলে জবাব দিল, না। শুধু কফি।

সুনন্দিতা বসে বলল, কিন্তু সত্যি গান শুনছ?

কেন?...একটু চমকে উঠল পরেশ।...নাঃ, শুনেছি তো। ভালো লাগছে। আচ্ছা, বউদি, ওরা সব আর আসে-টাসে না?

কারা?

নুটুদার ভাইপো-ভাইঝিরা!

নাঃ।...সুনন্দিতা হাসল।...আমি তো একঘরে হয়ে গেছি। জানো না তুমি?

পরেশ একটু চুপ করে থেকে বলল, তোমাদের মামলাটা তো এখনও চলছে।

চলছে। আবার শুনেছি, এবার নাকি জোর করে ধান তুলে নেবে। বিলাস গিয়েছিল নন্দীগ্রাম—শুনে এসেছে।

কী?...বলে পরেশ জ্বলজ্বলে চোখে তাকাল।

সুনন্দিতা হেসে বলল, তা তুমি চমকে উঠছ কেন? নেবে—আমার নেবে। তোমার কী? তুমি শক্তিমান মানুষ—তুমি আত্মরক্ষা করতে পারো। আমি যে অবলা!

পরেশ ভ্রু কুঁচকে বলল, কিন্তু তুমি তো কক্ষনো কিছু বলো না আমাকে!

বললে কী করতে? হ্যাঁ—করতে হয়তো। তোমার নাকি অনেক লোকজন আছে। কিন্তু তাতে আমার একদিক আটকাতে আরেকদিক..

হঠাৎ ওকে থামতে দেখে পরেশ বলল কী হত?

সুনন্দিতা অকারণে রেডিওর ভলুম বাড়িয়ে দিয়ে বলল, থাক ও কথা। আজ আমারও খুব খারাপ লাগছিল। বিকেলে ভাবলুম একবার ঘুরে আসি। হল না। অমিত আর তার বোন এল।

অমিত—মানে, হেডমাস্টারের ছেলে? সে আসে নাকি এখানে?

চমকে উঠলে যে!

নাঃ—এমনি।

সুনন্দিতা মুখ টিপে হাসল। তারপর বলল, অনেকদিন থেকে একটা কথা তোমাকে বলব ভাবছিলুম। তুমি রুমার নাকি বিয়ে লাগাচ্ছ শুনলুম? আজই বিলাস বলছিল। কোথায়?

পরেশ কোন জবাব ছিল না। অ্যাশট্রেতে ছাই ফেলতে থাকল।

এত শিগ্‌গির কেন ওর সর্বনাশ করছ? পাসটাস করুক। তাছাড়া এখন তো তোমার ক্ষমতা আছে। রুমা এম. এ পড়বে বলছিল।

রুমা আসে নাকি?

না। বললুম তো, সবার কাছে একঘরে হয়ে গেছি।

কী কথা বলবে বলছিলে একটু আগে? রেডিওটা কমিয়ে দাও তো!

সুনন্দিতা কমিয়ে দিল আওয়াজটা। তারপর স্থিরদৃষ্টে তাকাল ওর দিকে। বলল, শুনে আবার হইচই করে ফেলো না। নিজের কেলেংকারী তো যথেষ্ট বাড়িয়েছ—আবার...

কিসের কেলেংকারী? যাঃ!

আমার ধারণা অন্য কোথাও বিয়ে হলে রুমা সুখী হবে না।

পরেশ মুখ তুলে বলল, কোথায় সুখী হবে বলছ?

আমি স্পষ্ট কথা বলতে ভালবাসি—সে তুমি জানো। আমার মতে ওর বিয়েটা অমিতের সঙ্গে হলেই ভাল হয়। অবশ্য যদি এক্ষুনি বিয়ে দিতে চাও। ...সুনন্দিতা উঠে দাঁড়াল।.. জল হয়ে গেছে এতক্ষণ। আসছি।

সে চলে গেলে পরেশ ভ্রূ কুঁচকে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইল। শীত-ভাবটুকু চলে গিয়ে গরমের ভাব টের পেল সে শরীরের ভিতর দিকে। বুকের বোতাম খুলে দিল আনমনা হাতে। তারপর আপনমনে একটু হাসল। সুনন্দিতা তাহলে অমিতের সঙ্গে রুমার মেলামেশার খবর রাখে। রূপপুর চিটির আরও অনেকেও হয়তো রাখে। কিন্তু সে তো অসম্ভব ব্যাপার! রুমা আর চন্দনের প্রতি তার মনে একটা পুরনো প্রতিশ্রুতি ঠিক দলিলের মতোই সুরক্ষিত থেকে গেছে। এর অন্যথা হয় না—হতে পারে না।

ট্রে হাতে সুনন্দিতা এসে গেল তক্ষুণি।...অনেকদিন আমি কফি খাইনি। ভাগ্যিস তুমি এলে। একা কফি খেতে আমার ভালো লাগে না।

সে হাসল। কফি তৈরী করতে করতে ফের বলল, এবার কিন্তু খুব তাড়া-তাড়ি শীত পড়ে গেল। তাই না? আজই ভাবছিলুম—কদিন বাইরে কোথাও ঘুরে আসি। গাড়িফাড়ি তো তোমার কৃপায় পেয়েই যাব। পাব না?

পরেশ মাথা দোলাল।

কিন্তু...সুনন্দিতা বিকৃতমুখে বলল,...কিন্তু এদিকে আমার শিরে সংক্রান্তি। ফসল উঠতে শুরু করেছে। তার ওপর ওদের শাসানিও শুনতে পাচ্ছি। কেন যে বিষয়সম্পত্তি থাকে মানুষের!

পরেশ একটু হাসল।...না থাকলে তো চলে না। আমার, গ্যারেজবাসের জীবনটা তো স্বচক্ষে দেখছ। এবং তোমাদেরই গ্যারেজ ছিল সেটা।

সুনন্দিতা সেদিকে কান করল না। বলল, তোমার বউ জানলে কুরুক্ষেত্র করবে আজ। এতক্ষণ হয়তো টেলিগ্রামে পেশাঁছে গেছে। বাপস! কী জায়-গায় এসে জুটেছিলুম। সত্যি বলছি, আমার অন্য কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করছে। ব্যবস্থা করে দেবে? ধরো, বহরমপুর—কিংবা অগত্যা কান্দীতেই। সব বেচে দিয়ে চলে যাব।

পরেশ কফির কাপ তুলে নিয়ে বলল, জায়গা বদলালেই সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যায় না। নিজেকে বদলাতে পারবে তো?

সুনন্দিতা একটু ঝুঁকে এল। অস্ফুট প্রশ্ন করল, তার মানে?

মানে তুমি বোঝ না ?

না।

একটু চুপ করে থেকে পরেশ বলল, তুমি কি রেগে গেলে বউদি ?

সুনন্দিতার কণ্ঠস্বর একটু চাপা শোনাল। সে বলল, রাগ করতে কবে ভুলেছি। কিন্তু কী করব আমি বলতে পারো ? এই ভুতুড়ে বাড়িতে আর কতকাল এমন করে বাস করব ? কেন বাস করব ? কার জন্যে ? সম্পত্তি আগলাত যখ বসিয়ে রেখে গেছে যেন। নাঃ, এ অসহ্য লাগছে পরেশ। আমি আর পারছিনে। হাঁফিয়ে উঠেছি। কোন কোন রাতে ঘুম ভেঙে যায়—হঠাৎ চমকে উঠি। কেন এখানে শুয়ে আছি ? একা—কেউ কোথাও নেই। বাড়িটা আমার বুকের ওপর চেপে বসে আছে। বিশ্বাস করো, আমার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। রাগে দুঃখে-ঘেন্নায় জ্বলেপুড়ে মরি। নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু, কিন্তু তাও যে পারিনে ছাই! আমার বড্ড ভয় করে। এখনও যেন কত কাজ বাকি থেকে গেল জীবনে। কত সাধ—কত ইচ্ছে.

পরেশ হাত বাড়িয়ে ছুঁল ওকে। সশব্যস্তে বলল, আঃ চুপ করো। আরে, হল কী তোমার !

এগার

কিছুক্ষণের মধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়েছিল সুনন্দিতা। এটা সে পারে। তার ঠোঁট আর চিবুকের মাঝখানে সেই দৃঢ়তার চিহ্নটা আবার ফুটে উঠতে দেখল পরেশ। আর দিনে দিনে বেশ খানিকটা মুটিয়ে যাচ্ছে সুনন্দিতা। আপাতদৃষ্টে মনে হয় না, ওর ভিতরে কোন অসুখী-ভাব আছে। চোখের নিচে বাদামী ছোপগুলো স্পষ্ট হচ্ছে আস্তে আস্তে। সেটা অনিদ্রার দরুণ না হতেও পারে।

সুনন্দিতা খুব বড় ঘরের মেয়ে—পরেশ জানে। চেহারাতেও উচুঁ ঘরানার ছাপ উজ্জ্বল। কাশিমবাজারের এক হতমান বংশের এই দুলালীটিকে নুটুবাবু একরকম লুঠ করেই এনেছিল। ওর বাবা-মা এখন ছোটমেয়ের কাছে জব্বলপুরে আছেন। একমাত্র ভাই—নুটুবাবুর বন্ধু চীন-ভারত যুদ্ধে মারা যায়। সুনন্দিতা বিয়ের পর থেকেই ওদের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত।

পরেশ এখানে আসার পরই টের পেয়েছিল এ দম্পতি অসুখী। সুনন্দিতার জন্যে তার সমবেদনা ছিল বরাবর। মাতাল হয়ে নুটুবাবু বউর ওপর কম জুলুম করত না! পরেশ ড্রাইভারকে এসব হাঙ্গামা সামলাতে হত। নুটুবাবু গর্জন করত—খবর্দার পরেশ। তুমি আমার ড্রাইভার—তুমি শালা চাকরের বাচ্চা চাকর—কক্ষনো আমার ঘরে ঢুকবে না। গুলি মার দেগা হাম।...পরেশ জানত নুটুবাবু তাকে মনে মনে ভয় করে। তাই তার হাত থেকে গুলিভরা বন্দুক কেড়ে নিতেও পিছপা হত না সে। আর নুটুবাবু যখন ঘরে নেই, সুনন্দিতার সঙ্গে সে এঘরে আড্ডা দিত। সুনন্দিতার মনের অনেক খবর সে টের পেত। সত্যি বলতে কী, সুনন্দিতার দুর্বলতার পুরো সুযোগ পরেশ নিয়েছিল। তা না হলে সে আজও সামান্য ড্রাইভারই থেকে যেত। সুনন্দিতা স্পষ্ট বলত,

আমার ভবিষ্যত কী—তা তো বেশ জানি। ছেলেপুলেরও কোন আশা নেই। মাতালের পাল্লায় পড়ে শেষ বয়সে পথে-পথে ভিক্ষে করে বাঁচতে হবে। তার চেয়ে তুমি কিছু করে নাও পরেশ। তুমি দাঁড়াতে পারলে হয়তো আমিও পায়ের নিচে মাটি পাবার প্রত্যাশা রাখি।

হ্যাঁ, পরেশ কৃতজ্ঞ সুনন্দিতার কাছে। নুটুবাবু যে টাকা হয়তো মদে জুয়ার স্ফূর্তিতে কিংবা দূর দেশের জঙ্গলে-জঙ্গলে খামখেয়ালী শিকার অভিযানে খরচা করে উড়িয়ে দিত—সে টাকা সুনন্দিতার সহযোগিতায় পরেশের পকেটে গিয়ে ঢুকত। নুটুবাবু টের পেত কি-না কে জানে! তবে শেষদিকে পরেশকে সে যেন সন্দেহের চোখে দেখত। অবশ্য সেটা তার বউর ব্যাপারে—টাকা-পয়সার দরুন নয়। সুনন্দিতাকে সে বিশ্বাস করতে পারত না। সুনন্দিতা দেহে-মনে তাকে যেন নিরন্তর ঠকিয়েছে। নুটুবাবুর মনে অজস্র প্রতিদ্বন্দ্বী কাল্পনিক পুরুষের ছবি ছিল—যারা সুনন্দিতার দেহ-মনের সারাংশ মেরে দিচ্ছে। 'আর আমি শালা হ্যাংলা কুকুরের মতো একপাশে একটুকরো এঁটো হাড় কামড়াচ্ছি।' এই হল কিনা নুটুবাবুর অবিশ্রান্ত খেদোক্তি।

অথচ আগাগোড়া ব্যাপারটা অসত্য। পরেশ সুনন্দিতার কোন কোন দুর্বল মুহূর্তে বড়জোর তাকে নিছক ছুঁয়েছে মাত্র—তার বেশি কিছু কদাচ নয়। এমন কি একদিন সুনন্দিতা কী কথায় হাসতে হাসতে পরেশের গায়ের ওপর পড়েছিল- নির্জন ঘরে, তবু নয়। পরেশ খালি টাকা চিনত। বরাবর টাকা চিনে গেছে। যেন তার ওইটেই একটি নিষ্কাম সুতীব্র সাধনা।

আর আজ এতদিন পরে সে টাকার কথা ভুলে সুনন্দিতাকে দেখছিল। হ্যাঁ, আজই। এতদিন ধরে যে চারদিকে কত কেলেঙ্কারীর গুজব রটেছে, স্নেহধারার সঙ্গে কত কী হয়ে গেছে—তা ছিল মিথ্যাকে কেন্দ্র করে গড়া। আজ কিন্তু ভিতরে একটা অন্য ক্ষুধার উদ্রেক সে লক্ষ্য করল। তার শরীর শিরশির করে উঠল। কার সামনে সে বসে আছে? কার কাছে সে আনাগোনা করেছে এতদিন? তার মানবীসত্তার দিকে—রক্তমাংসের দিকে পরেশের চোখ পড়ল। মনে হল, খুব একটা ভুল করা গেছে। টাকা চেয়েছিল; কিন্তু টাকা একটা জিনিসকে তার আয়ত্তে আনতে দায়নি—এখনও দিল না। সেটার নাম স্বস্তি। আজ হঠাৎ কেমন করে টাকার প্রয়োজনও তুচ্ছ হয়ে পড়ল কে জানে! ক্লান্তি, ক্লান্তি এবং ক্লান্তি! ধাবমান গজনকারী একটা শক্তি তাকে অবিশ্রান্ত রাতের পর রাত তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। একটুও বিশ্রাম দ্যায় না। কিন্তু আজ বিশ্রামের দরকার। তার লোলুপ চোখ সুনন্দিতাকে বিশ্রামের আশ্রয় চেয়েছিল। এবং হঠকারী তীব্র আকর্ষণে সে দ্রুত উঠে গিয়ে সুনন্দিতার পাশে বসল। পিঠে হাত রাখল।

সুনন্দিতা ততক্ষণে অবশ্য সামলে নিয়েছিল নিজেকে। পরেশকে এভাবে কাছে দেখে সে খুব আস্তে বলল, বিলাস আছে। তুমি সরে বসো লক্ষীটি।

পরেশ সোফায় হেলান দিল। সুনন্দিতার পিঠ থেকে হাতটা তুলে সেই হাতে কফির কাপটা নিল। চুমুক দিতে থাকল।

সুনন্দিতা একটু সরে বলল, তুমি আমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে দিলে। জ্ঞানবাবুর মেয়ের জন্যে বুনছিলুম ওটা। বলেছি আজ রাতেই শেষ করে দেব। সক্কালে এলে গায়ে চাপিয়ে বাড়ি যাবে। দ্যাখো তো, এখন কী করি!

পরেশ বলল, জ্ঞানবাবুর মেয়ের সোয়েটারের অভাব নেই। যাদের অভাব আছে—তাদের দিও।

সুনন্দিতা ঘুরে বসল।...তোমার ধারণা যে গরীবদুঃখীদের জন্যে আমি কিছু দিইটিই নে? এই তো—এবার পুজোতেও কাপড় দিয়েছি। ইচ্ছে আছে ধানটান উঠলে কিছু কম্বল দেব।

পরেশ হাসল। ও দিয়ে কিছু হয় না। যাক্ গে। একটা কথা বলি। চলো না কোথাও কদিনের জন্যে ঘুরে আসা যাক্। যাবে? আমারও কেমন ভাল্লাগে না কিছু।

কে যাবে? তুমি? আমার সঙ্গে?

কেন? আপত্তি আছে তোমার? সেবার তো গিয়েছিলে মেসেঞ্জোর।

সে স্বামীর সঙ্গে গিয়েছিলাম।

তাও বটে।—বলে পরেশ চুপ করে রইল।

সুনন্দিতা বলল. আমি খুব পারি। তুমি পারবে না—তা দিব্যি কেটে বলতে পারি। ফিরে এলে বউ তোমাকে ঝাঁটাপেটা করে ছাড়বে না!

ফিরে না এলে কী হয়?

সুনন্দিতা ওর চোখের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে বলল. কী বললে?

কানে কি কম শুনছ আজকাল?

সুনন্দিতা উঠে দাঁড়াল। বলল, তুমি সাহসী মানুষ—তা জানি। কিন্তু সব জায়গায় তো শুধু সাহস দিয়ে কিছু করা যায় না। বসো আসছি।

পরেশ একটু আগে তার বলা কথাটার গুরুত্ব টের পেল সুনন্দিতা চলে যাবার পরই। চমকে উঠল। এবং অদ্ভূতভাবে ভালোও লাগল। ফিরে না এলে কী হয়? ঠিক এই কথাটাই কি সে বলে বসেছে? কী মানে হতে পারে এর? হতে পারে অনেক কিছুই। হাতের মুঠোয় অজানতে সাপ ধরে ফেলেছিল যেন। বিষদাঁতসুদ্ধ সাপের মাথাটা চেপে ধরে থাকতে তার এত ভাল লাগছে!

কিন্তু এখনও সময় হয়নি—দেবী আছে সে-সুসময় আসার। সংসারের ক্ষেত্রে অনেক বীজ সে বুনেছে পরিশ্রমী চাষার মতো। সেই ফসল—তার বউ-ছেলেমেয়ে টাকাপয়সা ঘরবাড়ি, সবকিছু মাঝে মাঝে দূর থেকে তাকিয়ে দেখতে বড় ভালো লাগে। অথচ সেখানেই সে নিজেকে সমাপ্ত দেখতে সুখী হয় না। আরো আছে—আরো কোন সংসার, বীজ এবং ফসল। আশ্চর্য লাগে পরেশের। একদিন ভালো খাওয়াপরা স্বচ্ছন্দ সচ্ছল জীবনযাপনকেই অনন্ত সুখের খনি মনে হত। আজ একটু করে তা সব বেস্বাদ লাগছে।

নাকি এই স্ববিরোধই তার স্বভাবে নিহিত? তাই সারা জীবনে বরাবর সে পেশা বদলাচ্ছে। এক কাজ থেকে অন্য কাজে ঝাঁপ দিয়েছে। নাকি পয়সা রোজগারটাই তার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না? ভাবা যায় না যে কী অক্লেশে এক-জন মানুষ হারমোনিয়াম মেরামত করতে করতে ইলেকট্রিক তারের দিকে কারি-গরি আঙুল বাড়াতে পারে এবং ফের কী সহজে মোটরগাড়ির স্টিয়ারিংটা ধরে ফেলে!

আর এখন! পরেশের হঠাৎ-হঠাৎ মনে হয়, কালক্রমে তার পায়ের নিচে কিংবা শরীরের কোথাও অদ্ভুত সব চাকা গজিয়েছে। তার অস্তিত্ব থেকে গতির গর্জন বাজছে। ধাবমান বিশাল ট্রাকের মতো তার সে অস্তিত্ব, এবং অবিশ্রান্ত

খুঁজে বেড়াচ্ছে একটা উপযুক্ত কঠিন কংক্রিটের হাইওয়ে—যে রাস্তার কোন শেষ নেই। সে মাঝে মাঝে চন্দনকে ঠাট্টার স্বরে বলে, দ্যাখো তো হে আমার হাঁটুর কাছটায় চাকার আঁকুর গজাচ্ছে নাকি? শালা ঠিক এইরকম মনে হয়। আস্ত গাড়ি হয়ে উঠছি যেন।...

পরেশের ভয় হল। এই ভীষণ গর্জনকারী গতিমান শক্তির ভারী চাকার নিচে স্নেহধারা—লতু-সনতুরা গুঁড়িয়ে পিসে খতম হয়ে যাবে না তো?

সুনন্দিতার কথা শোনা যাচ্ছিল কিচেনের দিকে। সে আসবার আগেই পরেশের চলে যেতে ইচ্ছে হল। পরেশের মনে উদ্দাম ঝড় এখন। শরীর অবশ লাগছে। যেন এইসব সময় বড় হঠকারী—ত্বরিতে অঘটন ঘটাতে পারে। অশান্তির আবহাওয়াটা ক্রমে খুব স্পষ্ট হতে লেগেছে। সে উঠে দাঁড়াল তক্ষুনি। আর কুকরটা তার সামনে এসে দাঁড়াল। জ্বলজ্বলে চোখে তাকে দেখতে থাকল। মনে হল. কুকুরটা তার অবস্থা টের পেয়ে গেছে। সে তাকে পালাতে দেবে না বলে সাবধানে পথ ঘিরে দাঁড়িয়ে গেছে।

ও কি! চলে যাচ্ছ নাকি?—সুনন্দিতা পিছন থেকে বলল। পরেশ ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখে হাসবার চেষ্টা করছিল। সুনন্দিতার মুখেচোখে এবং সারা দেহে ঝিলিক—যা কোন বিধবার পক্ষে ভারি অশ্লীল। অথচ সুনন্দিতাকে সেগুলো চমৎকার মানিয়ে যাচ্ছে। বৈধব্য তার মতো মেয়েকে মোটেও ছুঁতে পারেনি—পরেশের মনে হল।

পরেশ বলল, আসি। ঘুম পাচ্ছে। কদিন রাত জাগার ধকল যা গেল!

ঘুমোবে?...কেমন হাসল সুনন্দিতা।...আমি তো তোমার খাবার যোগাড় করে এলাম ওদিকে। হাঁস মারতে বললুম।

এত রাত্রে হাঁস মারতে বললে!—পরেশ আঁতকে উঠল।—তোমার মাথা খারাপ হয়েছে নাকি?

মাথা খারাপ তো তোমার! তাই আবোল তাবোল কী সব বলছিলে... সুনন্দিতা এগিয়ে এল টেবিলের দিকে। ড্রয়ার খুলে এক প্যাকেট তাস বের করে ফের বলল বেশী দেরী হবে না। মোটে তো সাড়ে আটটা! দশটার মধ্যে খাওয়া হবে। তারপর ঘুমোতে যেও। ততক্ষণ এসো তাস খেলি। নাকি লুডো খেলবে?

পরেশ ইতস্তত করে বলল, দুজনে কী তাস খেলব? না—আজ আসি। ঘুম পাচ্ছে।

সুনন্দিতা চটুল হেসে বলল, খুব ভয় পেয়ে গেলে—তাই না পরেশ?

ভয়? তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকিয়ে পরেশ জবাব দিল।—কী জানি! কিন্তু আমার মনে হচ্ছে ভয় তুমিই পেয়েছ। তাই.. ।

সুনন্দিতা পাখা বাড়িয়ে দিয়ে ওর হাত ধরে টানল।—ফেট॥ সবটাতেই জেদাজেদি তোমার। হাঁসটার কী হবে? এতক্ষণ বিলাস মুণ্ডু কেটে রক্তারক্তি করেছে। এস।

পশে অগত্যা বসল। বসে বলল, তুমি তাহলে এখনও পালন-টালন সুরু করনি?

কিসের পালন?

ওই যে হবিষ্যি নিরামিষ—অরি কী সব করেটরে।

সুনন্দিতা তাস শাফল করতে করতে বলল, গোড়া থেকেই করিনি—আর এতদিন পরে! আজেবাজে কথা ছাড়ো। খেলায় মন দাও।

দুজনে খেলার এই মজাটা পরেশই একদা শিখিয়ে দিয়েছিল সুনন্দিতাকে। প্রথমে চারখানা করে তাস নেবে দু'পক্ষ। একই রঙের নম্বর পরপর মিলিয়ে রাখার চেষ্টা করবে। বাকি তাসগুলো থেকে না দেখে একটা করে তুলবে—রং মিলিয়ে সেটা রাখবার হলে রাখবে নয়তো ফেলে দেবে। সবসময় হাতে কিন্তু চারটে তাসের বেশি থাকবে না। যখনই চারটে তাস একই রঙের পরপর নাম্বারে মিলে গেল, এক পয়েণ্ট পেল সে পক্ষ। আরও অনেক মজার খেলা পরেশ জানে। ম্যাজিকও জানে কতরকম। সুনন্দিতাকে দেখিয়ে তাক লাগিয়ে দিত। সুনন্দিতা শিখেও নিয়েছিল কিছু। যেসবদিন গেছে যেন স্বপ্নের মতো। তখন নুটুবাবু ঘরে নেই। পরেশ গাড়ি নিয়ে ফিরেছে দুপুরবেলা। স্নেহধারাকে লুকিয়ে এক ফাঁকে পরেশ এসে আড্ডা দিয়েছে ভিতরের ঘরে।

এই! আমাব পয়েণ্ট হল! সুনন্দিতা খিলখিল করে হেসে উঠল। সে হরতনের বিবি গোলাম দশ নয় দেখিয়ে দিল।

পরেশ তাস দেখাল। ইস্কাবনের দশ সাত ছয় হরতনের সাহেব। সে বলল, ঠিক কবতে পারছিলুম না কোন্ রঙটা সাজাবো। ইস্কাবন রাখছিলুম—হঠাৎ হরতনের সায়েবটা এসে গেল। ভাবলুম...

সুনন্দিতা বলল, কী ডাকাত বে বাবা! আমার সায়েব নিয়ে বসে আছ। এদিকে বিবি বেচারা কেঁদে সারা। হাসতে হাসতে সে গড়িয়ে পড়ল সোফায়।

এখনও 'পেসেন্স' খেল নাকি?—পবেশ আনমনে প্রশ্ন করল।

খেলি। একা আব কী করব? ভাগ্যিস শিখিয়েছিলে।

বইটই পড়লে পাবো।

ভাল্লাগেনা। পরেশ। ফেব পযেণ্ট মেরেছি! আজ কী কপাল আমার! সুনন্দিতা তাস মেলে ধরল।—দু' পয়েণ্ট। শেষে গোলমাল করো না কিন্তু।

পরেশ তাস তুলে বলল, ধ্যুৎ! কিচ্ছু মিলছে না।

আসলে তুমি মনই দিচ্ছ না খেলায়।

উঁ?

কী? হয়েছে কী তোমার, শুনি?

পরেশ বিপন্ন মানুষের মতো অসহায় মুখে জবাব দিতে যাচ্ছিল, হ্যাঁ—কিছু একটা হয়েছে—খুব গুরুতর—কিন্তু সেই সময় বিলাস বাইরে থেকে বলল, হয়ে গেছে মা। একবার আসুন এদিকে।

সুনন্দিতা বলল, বিলাসকা, লক্ষীটি! মাংস কেটে ধুয়ে রাখো না একটু আমি যাচ্ছি।

পবেশ একটু হেসে বলল, বুড়ো খেটে যায় আমাকে দেখে। তুমি যাবে তো যাও—নৈলে কী কাটতে কী কেটে বসবে।

সুনন্দিতা হঠাৎ লাফিয়ে এসে ওর হাত ধরল। —আরে! তুমিও তো চমৎকার রান্না করো। তাস থাক। চলো রান্না করবে।

পরেশ আড়ষ্টভাবে বলল, চলো!

সুনন্দিতা বয়স ফেলে পিছনে চলে গেছে যেন। পরেশ একটু অবাক হল। বেমানান লাগছে সুনন্দিতার এ উচ্ছ্বাস এ চপলতা। ক্রমশ তার অস্বস্তিটা বেড়ে

যাচ্ছে। অথচ সুনন্দিতাকে ছেড়ে চলে যাবার মত জোরও সে খুঁজে পাচ্ছে না॥ সে তাকে অনুসরণ করে কিচেনে ঢুকল। দেখল বিলাস মাংস কাটছে। মুখটা বিকৃত। ওদের দেখে সে বলল, বঁটিটা শান দিতে হবে। ধারটার নেই গো!..

লতু-মানতুরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। রুমা আজ পাশের ঘরে একা শুয়েছে। জামাইবাবু বাড়ি থাকলে সে দিদির ঘরে শোয় না। স্নেহধারা টেবিলঘড়ির দিকে তাকাল। রাত সাড়ে দশটা। পলকে ঘুমের আমেজ কেটে গেল তার। পরেশ এখনও ফেরেনি। সে বাইরে এসে দাঁড়াল। সামান্য আলোর ছটায় বাইরের ঘন কুয়াসা দেখা যাচ্ছে। শীত পড়েছে বেশ। নিঃঝুম হয়ে পড়েছে রূপপুর। আজ স্নেহধারার জেগে থাকবার প্রবল চেষ্টা—একটা সুন্দর আকাংখিত আনন্দের প্রস্তুতি চলেছিল মনে সন্ধ্যা থেকেই। পরেশের প্রতি অন্তত আজ একটুও অনুযোগ অভিযোগ মনে ছিল না। আহা, এখন বেচারা হয়তো সত্যি সত্যি ফুরসৎ পায় না—এত কাজের চাপ! করুণায় মমতায় দুঃখে স্নেহধারার মেয়েমন টলটল করছিল॥ যখন টাকা-পয়সা ছিল না, দারিদ্র্য আর হতাশায় ছিল সবকিছু হতশ্রী —তখন স্বামীকে সে নিবিড়ভাবে কাছে পেয়েছে। আজ টাকা-পয়সা আর সচ্ছলতা যখন এল তখন স্বামীকে যেন বেচে দিতে হল তাদের কাছে। অথচ সবগুলোই সে মেয়েহিসেবে পেতে চায়। টাকা-পয়সা স্বাচ্ছন্দ্য স্বামী—সব একসঙ্গেই তার দরকার। এ এক দুর্ভাগ্য স্নেহধারার যে পরেশ ক্রমাগত তার চোখের আড়ালে চলে যাচ্ছে। সেই গুরুতর শংকায় সে সবসময় আড়ষ্ট। হাসিখুশি থাকাটা তার নিজের কাছেই নিন্দনীয় হয়ে পড়ে।

স্নেহধারা অস্থিরভাবে প্রতীক্ষা করছিল। বারান্দায় সে থামের পাশে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। কেন এত দেরী হচ্ছে পরেশের? হাজার কথার তোলপাড় হতে থাকল তার মনে। কিছুক্ষণ পরে আর ধৈর্য ধরতে পারল না সে। গ্যাঁদাকে একবার পাঠাবে চন্দনের ওখানে? হয়তো তাসটাস খেলছে—কিংবা...

শিউরে উঠল স্নেহধারা। তার বুকের ভিতর কান্নার প্রবল চাপ ঠেলে উঠল। রান্নাঘরের পাশে ঘুপটি তিনদিক ঘেরা জায়গায় খাটিয়া পেতে গ্যাঁদা ঘুমোয়। সে ওকে চুপি চুপি ডাকল, গ্যাঁদা, ওরে! শুনছিস? গ্যাঁদা?

রুমা পাছে জানতে পারে, তাই সাবধানে সে ওকে জাগানোর চেষ্টা করছিল। কিন্তু এত ঘুম ছেলেটার! ঠিক মড়ার মতো নিস্পন্দ ঘুমোচ্ছে। গুঁতো-গুঁতিতেও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। চাপা গলায় কানের কাছে মুখ রেখে অনবরত ফিসফিস করে ডাকল স্নেহধারা। ছেলেটার গায়ে কেমন কটু গন্ধ। ভিতর-ভিতর এত নোংরা হয়ে থাকে ও স্নেহধারা জানত না। পুরু খসখসে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। এই কম্বলটা পরেশের ড্রাইভারি আমলের জিনিস। সেই পুরনো গন্ধটাও টের পাচ্ছিল স্নেহধারা। কেমন যেন কলকব্জার গন্ধ—স্মৃতির দিকটা কাঁপিয়ে দেওয়া। স্নেহধারা গ্যাঁদার চুল টেনে দিলে 'উ' শব্দ করে পাশ ফিরল মাত্র। জাগল না তবু। স্নেহধারা রেগে চাপা গলায় বলে উঠল, কী ঘুম বাপু! বাড়িতে একটা আপদ-বিপদ হলেই বা কী! চাদ্দিকে শত্রু—আর এই পুচকে দারোয়ান বসিয়ে যায় আগলাতে। হুঁ॥ আবার বলে কি না—গ্যাঁদা তো রইল! এই ছোঁড়া! উঠবি একবার?

দরজা খোলার শব্দে স্নেহধারা কাঠ হয়ে গেল। রুমা বেরিয়েছে। সে স্নেহধারাকে দেখে বলে উঠল, ওখানে কী করছ?

স্নেহধারা উঠে দাঁড়াল।...ছোঁড়াটা কী নোংরা হয়ে ঘুমোয় রে! বিছানায় হয়তো পেচ্ছাপও করে। ছিঃ, ওর হাতে আমরা খাচ্ছি!

রুমা শান্ত চোখে তাকিয়ে বলল, হঠাৎ আবার ওর পিছনে লাগলে কেন? জামাইবাবু আসেনি?

গম্ভীরমুখে স্নেহধারা জবাব দিল, না।

আসবে'খন। তুমি ঘুমোওগে না। আমি জেগে আছি। আসবে'খন।

স্নেহধারা তার ঘরের দিকে এগোল। কিন্তু দরজা অব্দি গিয়েই আর নিজেকে গোপন রাখতে পারল না। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, রুমা, এক কাজ করতে পারিস?

কী?

যে মানুষ—বলা যায় না। হঠাৎ আবার বায় চড়লে কোথায় গাড়ি নিয়ে চলে গেলেই হল। এদিকে কে খেল না-খেল কী ঘুমুল, সেদিকে কে খোঁজ রাখে—কেই বা ভাবে!

রুমা বলল, না না। আজ কোথাও যাবে না তো। বলে দিয়েছে। আমি জানি।

স্নেহধারা একটু রেগে উঠল। আমাব বুঝি ক্ষিদেটিদে নেই? রাত বারোটা বাজতে চলল, কারো খেয়াল আছে? এ্যাদ্দিন তো না-খেয়ে না-খেয়ে পিত্তি জ্বলিয়ে মেরেছে—এখনও সামনে ভাতের থালা নিয়ে উপোস করা। কী, পেয়েছে কী আমাকে?

রুমা একটু হাসল। বাবে! তুমি খেয়ে নিলেই পারো। খাচ্ছ না কেন?

যা বুঝিস নে, তা নিয়ে কথা বলতে আসিসনে। তুই শোগে যা।...স্নেহধারা আরো রেগে গেল এবার।

রুমা হাসতে হাসতে বলল, বড় মুসকিলে পড়া গেছে! এমন আদিখ্যেতা করে নাকি কেউ! স্বামী-স্ত্রী তো অনেক দেখেছি বাবা! তোমাদের মতো আর একটিও নেই। ফেট্।

স্নেহধারা আরও রাগতে গিয়ে হেসে ফেলল—কারণ রাগটা সাবধানে বাঁচিয়ে নিবাপদে শান্ত থাকাটাই তার আজ বাতের একান্ত ব্রত। সে হাসিতে ভরিয়ে তুলতে চেয়েছিল অনেক ব্যর্থ হতাশ রাতেব পর এই একটা রাতকে। তাই হেসে ফেলতে তার দেরী হল না। এবং সৎসাহসে, সে চাপা গলায় বলল, রুমা—চন্দনের ওখানে একবার খবর দেওয়া যায় না রে? এত দেরী হচ্ছে যখন, ঠিকই কিছু হ্যাঙগামা হয়েছে।

রুমা বলল, কী হবে আবার?

কী জানি! ওর তো আবার চারদিকে সব শত্তুর। এত দেরী তো হবার কথা না।

কিন্তু যাবে কে এখন? আমি বাবা পারব না বলে দিচ্ছি।...

রুমা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে স্নেহধারা কিছুক্ষণ গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর দাঁতে দাঁত চাপল সে। ঘরে ঢুকল। সাত-ব্যাটারি একটা টর্চ

আছে পরেশের। টর্চটা নিল সে। চাবির গোছাও নিল। নিঃশব্দে দরজায় তালা দিল। ভিতরে ছেলেমেয়েরা ঘুমোচ্ছে। ঘুমোক।

বাড়ির সদর দরজাতেও বুদ্ধি করে তালা আটকে দিল স্নেহধারা।..

মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল দুজনে। মাথার ওপর আদ্যিকালের সেই জাম-গাছটা। পায়ের মাটির ওপর একদা একটা গ্যারাজঘর ছিল—যেখানে ছিল এক-জন সামান্য ড্রাইভারের সংসার। এখানটায় বাড়ির সামনের আলো পৌঁছয় না। ঘন ছায়ার সঙ্গে অন্ধকার ওতপ্রোত হয়ে গেছে। ক'পা এগোলেই সরু রাস্তাটা। পরেশ বলল, তাহলে আসি।

সুনন্দিতা তার এত কাছে যে গায়েগায়ে ছোঁওয়াছুঁয়ি হচ্ছিল। সে সম্ভবত নিঃশব্দে হাসছিল। এইসব সময় মেয়েদের ভারি রহস্যময় লাগে। সে বলল, বেশ ভালো লাগল—অনেকদিন পরে। আসা তে ছেড়েই দিয়েছ।

এবার আসব। আমারও বেশ কাটল।

আচ্ছা পরেশ।

বলো।

সত্যি বলছি, একবার চলো না কদিন কোথাও ঘুরে আসি!

পরেশ হাসিল।...পরেশ মজুমদার খুব সাংঘাতিক লোক রূপপুরে—তা জানে তো? তার সঙ্গে কোথাও যেতে হলে সবাই অনেক ভেবেচিন্তে তবেই পা বাড়ায়। হ্যাঁ, একটা কথা। কদ্দিন থেকে মাথায় ছিল—বলা হচ্ছিল না। কথাটা সিরিয়াসলি বলছি—শোন। আমাদের নতুন কোম্পানী হয়েছে, শুনেছ?

শুনেছি। অমিত বলছিল।

এক কাজ করো। তুমি কোম্পানীর একটা মোটা শেয়ার নাও।

আমি? সুনন্দিতা হাসল।...অত টাকা কোথায়?

টাকার ভাবনা তোমার নেই। সে আমি মানেজ করব। শোন, কাল চন্দনকে পাঠাব তোমার কাছে। কাগজপত্র সব দেখেটেখে সই করে দেবে। নেকসট্ মিটিং-এ পাস করিয়ে নেব।

না, না! আমাকে ওসবে জড়ানো কেন? আমি মেয়ে—ওসব কী বুঝি?

পরেশ নিঃসঙ্কোচে সুনন্দিতার কাঁধে হাত রাখল। একটু হেসে বলল, বুঝতে দেরী হবে না। আমার এ কথাটা তোমাকে রাখতেই হবে কিন্তু! কারণ আছে, পরে বলব'খন। না—না। ভাববার কিছু নেই। তোমার সাহায্য আমার দরকার।

ঠিক সেই মুহূর্তে কুকুরটা গরগর করে উঠল আর তীব্র টর্চের আলো এসে পড়ল গাছপালার ফাঁক দিয়ে—রাস্তাটা থেকে। চকিতে দুজনে সরে দাঁড়াল। পরেশ ক'পা এগিয়ে গম্ভীর গলায় বলে উঠল, কে আলো ফেলছে রে? কে তুই?

এ পরেশ অন্য পরেশ। আলোটা স্থির। নেভেনি। পরেশ ক্ষেপে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল ফের, কোন শুওরের বাচ্চা? কথা বলছিস না কেন?

সে লাফ দিয়ে কাছে চলে গেল॥ টর্চটা কেড়ে নেবার মুহূর্তে তার পা থেকে মাথা অব্দি একটা চমক শিসিয়ে উঠল। পরেশ ফিসফিস করে বলল, তুমি!

স্নেহধারা চেরা গলায় চেঁচাল সঙ্গে সঙ্গে—ছোটলোক! ইতর! জানোয়ার!

ক্ষিপ্রহাতে ওর মুখ চেপে ধরে একটু ঘুরে পরেশ দেখল, সুনন্দিতা হাল্কা পায়ে লন পেরিয়ে বারান্দায় উঠছে। আর ও পাশে বিলাস দাঁড়িয়ে তাদের দেখছে। কুকুরটা সমানে গরগর করছে।

পরেশ স্নেহধারাকে টানতে টানতে রাস্তায় নিয়ে গেল। স্নেহধারা ছটফট করছিল। অব্যক্ত গোঙানি উঠছিল। পরেশ চাপা গলায় বলল, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে বিলু? এ তুমি কী করছ? চুপ চুপ! সব বলছি—শোন।

স্নেহধারা তাকে এবার দুহাতে খামচাতে শুরু করেছে। তার শ্বাসপ্রশ্বাস আর ফোঁপানির শব্দ উঠছে অন্ধকারে গাছপালার ভিতর। অন্ধকারে যেন দুটি প্রাগৈতিহাসিক জীবের ধ্বস্তাধস্তি চলছিল।

একটু পরেই সে স্নেহধারাকে তার হাত থেকে মাটিতে গড়িয়ে পড়তে দেখল। রাস্তার শক্ত খোয়ায় মুখ ঘষে স্নেহধারা গোঙাচ্ছিল। পরেশ হিসহিস করে বলল, যদি চুপচাপ আমার সঙ্গে না উঠে এস, আমি চলে যাব বলে দিচ্ছি। থাকো তুমি, এখানে পড়েই থাকো। আমি যাচ্ছি। বিলু! শেষবার বলছি, খিটকেল করো না।

কয়েক মিনিট অপেক্ষা করার পর সে হন-হন করে চলতে শুরু করল।

বারো

ব্রজ ডাকছিল, চন্দনবাবু, ও চন্দনবাবু! শুনুন, শুনুন।

সারবন্ধ দেবদারু গাছের নিচে শুকনো নয়নাজুলির মাটিতে বেদেরা এসে তাঁবু পেতেছে। গুটিকয় গাধা আর ঘোড়া রোদে দাঁড়িয়ে স্থির জিরোচ্ছে। বাচ্চারা রাস্তার ধারে জড়োকরা পাথরকুচি নিয়ে ছুটোছুটি করছে পাখি বা কাঠবিড়ালির পিছনে। ঘাগরা আর লম্বাহাতা রঙীন জামা পরে তিনটি কিশোরী চন্দনকে লক্ষ্য করে ফিসফিস করছে আর চোখে ঝিলিক তুলে হাসছে। চন্দন যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। নয়ানজুলির ওপাশে কিছু ফাঁকা শুকনো ঘাসের জমি—তারপর জ্ঞানবাবুর ধানভানা কল। অবিশ্রান্ত ধক-ধক আওয়াজ হচ্ছে। কয়েকটা গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে। কোনটা খালি, কোনটা বস্তাবোঝাই। গাঁয়ের চাষীরা এসেছে 'বাজারে' ধান ভানতে। বেদেদের তাঁবু পড়ার দরুন হাইওয়ে থেকে ধানভানা কলে পৌঁছবার রাস্তাটা হয়ে পড়েছে সংকীর্ণ। সে নিয়ে একটু আগে বচসা হচ্ছিল পরস্পর। এখনও থামেনি। কারণ, মাঝে মাঝে জ্ঞানবাবুর লোক এসে বেদেদের শাসিয়ে যাচ্ছে। এখন অবশ্য এ লোকগুলো আর গা করছিল না। রোদে হাত-পা ছড়িয়ে বসে বুড়ো সর্দার-গোছের লোকটা আলবোলা টানছে মৌজে। উনুনে রান্না চেপেছে খোলামেলা আকাশের নিচে। মেয়েরা লকড়ি কুড়িয়ে আনছে। শীতের ঝরেপড়া পাতা ঝাঁট দিয়ে জড়ো করছে। বেশ লাগে এই জীবনটা! যেন অন্তর্বিহীন স্বদেশ-পরিক্রমায় ওদের জীবন কেটে যায়। সে স্বদেশের কোন সংখ্যা নেই।

সেই সময় ব্রজর স্টেশন-ওয়াগনটা ঘরঘর করে এসে দাঁড়িয়ে গেছে। মুখ বাড়িয়ে ব্রজ ডাকছিল। চন্দন হাসিমুখে এগিয়ে গেল।...কী ব্যাপার ব্রজবাবু?

এই সাত সকালেই ওদিকে কোথায় গিয়েছিলেন গাড়ি নিয়ে? আজও বরযাত্রী বইতে নাকি?

ব্রজ হাসল। তারপর নেমে এসে বলল, আর বলবেন না। চান করিয়ে আনলুম মাগীকে। বরযাত্রীর কথা বলছেন—ওরে শালা! কাল একটা স্পেশাল ট্রিপ দিলুম গাঁয়ের দিকে। ব্যাটারা পান খেয়ে এনতার যেমন পিক ফেলেছে গাড়ির গায়ে তেমনি বমি—ওয়াক থু!...বিকট হেসে বলতে থাকল। বর যেমন, তেমনি কনে। ব্যাটাচ্ছেলে হয়তো সারাজীবন জলে-কাদায় শুওরের মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বেড়িয়েছে, এদিকে বিয়ে করতে যাবে—বৌ আনবে মোটর গাড়ি চেপে! মাইরি চন্দনবাবু...শালাদের এ সখের কোন মানে আছে বলুন? তোদের বাপ-ঠাকুর্দা কখনো 'হাওয়াগাড়ি' চোখেও দ্যাখেনি।

চন্দন বলল হাওয়াগাড়ি মানে?

ব্রজ জবাব দিল, মোটরগাড়িকে ওরা বলে হাওয়াগাড়ি। তুমুল ব্যাপার! আজকাল গাঁয়ের মুদ্দফরাসও বলে, বে করব হাওয়াগাড়ি চেপে। তো—আমিও শুওরের বাচ্চা বেজা কম যাইনে। যে শালারা, মৌজ করে লে। একবেলার রাজত্ব বই নয়। করে লে রাজত্ব।

চন্দন সিগ্রেট দিয়ে বলল, খুব মুড়ে আছেন মনে হচ্ছে।

ব্রজ চোখ নাচিয়ে বলল, কাল খাঁটি দিশি মাল দিয়েছিল দু'বোতল। কল্যাণগঞ্জের নাম শুনেছেন? বিলপারের গ্রাম। সেখানেই বরের শ্বশুরবাড়ি। জেতে আমার মতই ছোটলোক-টোটোলোক ওরা। অমন জিনিস এ ভু-ভারতে মেলে না চন্দনবাবু। বিলিতি হুইস্কিই বলুন, আর রাম-শ্যামই বলুন—কল্যাণগঞ্জের জুড়ি নেই। পাকা কলা আর গুড় থেকে এলাচ মিশিয়ে যা জিনিস করে, ওঃ!... জিভে চুকচুক শব্দ করল সে!...তবে কার কাছে কী বলছি! আপনি তো সাত্ত্বিক মানুষ স্যার। ওর মর্ম আপনি বুঝবেন না। অবশ্যি আপনার মজুমদার মশাই ভালো বোঝেন।

চন্দন বলল, বিয়ের মরশুম তাহলে বেশ ভালই কাটে আপনার।

ব্রজ বলল, আপনার আশীর্বাদ। আসলে কী হয়েছে জানেন স্যার? সবাই এ তল্লাটে জানতে পেরেছে ব্রজর জাতি-গোত্তর হাল-হদিস। এ্যাদ্দিন গাঁ গেরামের বাবু-সায়েবরাই বিয়ে-সাদীতে গাড়ির বায়না দিতেন। যেই আমি এলুম, তার মানে—আমি এককালের বেজা বাগদী—যত বাগদী কুনাই, ডোম, ছোটলোক গরীব-গুরবো মানুষ সবাই সাহস পেয়ে ভাবলে, হাজার হোক—আমাদেরই ঘরের ছেলে। যাই না একবার বেজোর কাছে। গাড়িটাও ছোট। ভাড়াটাড়া কমও লাগতে পারে। ব্যস, ওই বেড়ে গেল আমার পসার। ওদেরও তো সাধ আহ্লাদ আছে। কালের হাওয়ার বদল ঘটেছে যে। তাছাড়া ওরাও তো মানুষ বটে। বলুন, আমি কিছু অন্যায় করছি নাকি? নামমাত্র পয়সা নিই। বড়জোর তেলের খরচা আর সামান্য উপরি। আমার মালিকের বেইমানি করলেও চলে না। তবে হ্যাঁ—ওদের লোভ আমি বাড়িয়ে দিয়েছি বলতে পারেন। যে ঘুঁটেকুড়ুনি মেয়ে স্বপ্নেও ভাবেনি হাওয়াগাড়ি চেপে স্বামীর ঘরে যাবে, তার তাক লেগে যায়। লোভ বাড়ে। দাবী জন্মে যায় মনে মনে।

ব্রজ নিজের অজানতে একটা ব্যাপারে চন্দনের চোখ খুলে দিল যেন। হ্যাঁ—লোভ বাড়ছে, দাবী জন্মাচ্ছে নিচেতলার মানুষদের মনে। একটু একটু করে

দিনে দিনে ক্রমাগত এই হাইওয়েটা এনে ফেলেছে দূর-দূরান্তর থেকে সভ্যতার নানান শ্রেষ্ঠ ফসলের নমুনা। আর অবহেলিত অভাজন সামান্য মানুষেরা উসখুস করে উঠছে। চোখ ধেঁধে যাচ্ছে ওদের। ওরা টের পাচ্ছে, এতদিনের যে বাঁচা—তা ছিল দীনহীন নগণ্যতার, পশুর মতো বাঁচা। মানুষ নামটার যে বিশাল মহাভারত আছে, তার পাতা খুলে যাচ্ছে সময়ের হাওয়ার ঝাপটায় একটার পর একটা—ওরা চমকে উঠছে। আর এই নির্বোধ উদ্দাম হাওয়া বয়ে আসছে সম্মিলিত জীবনের বেগবতী মহানদীর প্রতীক এই কঠিন সংহত কংক্রিট হাইওয়ে দিয়ে। এই রাজপথটাকে এখন মানুষ জাতের মুক্তির মত লাগে।

দূরে ঢালু থেকে আবার চড়াইয়ে উঠে মিলিয়ে গেছে ধূসর দিগন্তে এই পথটা। দুধারে নবীন গাছপালার সবুজ সমান্তরাল দুটি রেখা॥ কুয়াশার নীলচে বিস্তার, মিষ্টি শান্ত হলুদ রোদ্দুর, দীর্ঘ পথ—সব মিলিয়ে একটা অবাধ সরল মুক্তির সুখ। চন্দন বলল, যাচ্ছিলুম স্কুল-হোস্টেলে। আমার এক পরিচিত মাস্টারমশাই থাকেন। আপনি তো এখন গ্যারেজে যাবেন ব্রজবাবু?

ব্রজ বলল, হ্যাঁ, উঠে আসুন—নামিয়ে দিয়ে যাব। নাকি—ব্রজ হঠাৎ চোখে ঝিলিক তুলে হাসল।—নাকি ছুঁড়িগুলোকে ডাকব—আলাপসালাপ করবেন? যা জিনিস সব—মিছরির ছুরি, মাইরি! ডাকব?

চন্দন অপ্রস্তুত কণ্ঠে বলল, না না। আমি সেজন্য দাঁড়াইনি।

ব্রজ হাসতে হাসতে বলল, দাঁড়িয়েছেন কী জন্যে—তা তো বলিনি স্যার। বলছি ডাকব নাকি?

না—চলুন।...বলে চন্দন যেন আত্মরক্ষার জন্যেই গাড়িতে উঠে বসল।

এত ভীতু লোক দিয়ে সংসার চলে না.. ব্রজও উঠল নিজের আসনে।...তবে যাই বলি স্যার, এরা সেদিকে বড্ড হুঁসিয়ার। খুব কড়া শাসন আছে। আমি ডাকলেই মেয়ে তিনটে ঠিকই আসত। পয়সাও চাইত। কিন্তু পুরুষগুলোও তক্ষুনি এসে দাঁড়াতে। প্রতি বছর ওরা বিহারের ওদিক থেকে আসে। ঠিক ওই জায়গায় তাঁবু পাতে। সপ্তাহটাক থেকে চলে যায়। পরের জায়গাটা কোথায় জানেন? কান্দী পেরিয়ে যে বড় পুকুরটা আছে—তার পাড়ে। আমি ভাব জমিয়ে ফেলি বরাবর। এবারও জমবে'খন।

গাড়ি চলতে থাকল। চন্দন বলল, বউদির খবর কী?

ভালই। আর তো গেলেন না স্যার।· ব্রজ বলল।...হ্যাঁ ভালোকথা! ভুলেই গিয়েছিলাম—পরেশবাবুর বাড়িতে কী সব গণ্ডগোল হয়েছে নাকি—হাসিই বলছিল। ও কোত্থেকে শুনেছে।

চন্দন চমকে উঠেছিল। বলল, গণ্ডগোল? কই—না তো!

ব্রজ বলল, কী-জানি! মেয়েদের কানপাতলা অভ্যেস। ছেড়ে দিন।

চন্দন কৌতূহলী হয়ে বলল, কী বলল, কী শুনেছেন বলুন তো?

কী যেন—মজুমদার মশাইয়ের স্ত্রী নাকি নুটুবাবুদের বাড়ি গিয়েছিলেন কবে কোন রাত্রিবেলা। ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল। বিলাস ওনাকে অজ্ঞান অবস্থায় বাড়ি পৌঁছে দেয়। মণ্টুর রিকশো ডেকে এনেছিল কিনা॥ মণ্টু বলেছে হাসিকে। তারপর ডাক্তার আনতে হয়েছিল রাত্রেই।

চন্দন রুদ্ধশ্বাসে বলল, তারপর?

'ব্রজ ওর দিকে তাকাল।...সে-কি! আপনি জানেন না কিছু?

না তো।

সে কী! পরেশবাবুকেও দেখছিনে কদিন থেকে। অবশ্যি, উনি তো ব্যস্ত মানুষ—সব সময় বাইরেই ঘোরেন। ব্রজ ব্রেক কষে বলল, আপনার জায়গা। যান—দেখা করে আসুন। আমি গাড়ি রেখে খেতে যাব।...এই মরেছে! ওরে, হ্যান্ডেল লাগা। মাগী গোঁ ধরেছে আবার।

চন্দন আচ্ছন্নভাবে নেমে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। ব্রজর গাড়ি চলে গেলে সে ভাবল, এক্ষুনি স্নেহবৌদির ওখানে একবার যাবে নাকি। কিন্তু দ্বিধা এল মনে। যদি সত্যি কিছু ঘটে থাকে, সে তো তাকে নিশ্চয় খবর পাঠাত ডাকতে। হয়তো পরেশ না বললেও তার হাবভাবে টের পেত কিছু ঘটেছে। কিন্তু তেমন কিছু লক্ষ্য করেনি পরেশের আচরণে। কলকাতা থেকে ফিরে সে রাতে পরেশের বাড়ি থাকার কথা। সকালে যখন অফিসে এল, বেশ হাসিখুসি স্বাভাবিক মানুষ। বাড়ির কথা চন্দন কিছু জিগ্যেস করেনি। করলেও কি পরেশদা কিছু বলত ওকে? সে অন্যজাতের মানুষ। বরাবর তো দেখে আসছে চন্দন।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কী ঘটেছিল, সেটা বোঝা গেল না। নুটুবাবুর কথা চন্দন শুনেছে। পরেশের উন্নতির মূলে সেই ভদ্রলোক, তাও চন্দন টের পেয়েছে। এমন কি তার আবছা ক্যান এসেছে নুটুবাবুর বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে পরেশের রহস্যময় সম্পর্কের কথাও। হকসাহেবকে ধরলে জানা যেতে পারে হয়তো। হকসাহেব অনেক কিছু জানেন।

চন্দন ভাবল, এক্ষুনি একবার স্নেহধারার খোঁজ নেওয়া দরকার। অজ্ঞান অবস্থায় নুটুবাবুর বাড়ি থেকে তাকে তুলে এনেছিল বলছে ব্রজ! ডাক্তার ডাকতেও হয়েছিল নাকি! কী কাণ্ড! এত সব ঘটে গেছে, অথচ তাকে কিছুই জানান হয়নি! তাহলে কি স্নেহধারা কোন কারণে রাগ করেছে তার ওপর? কেন রাগ করবে সে? রুমার সঙ্গে তার বিয়ের কথা কানে গেছে বলে?

এই কদিন চন্দনকে খুব ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। হয়তো স্নেহধারা তাকে খবর পাঠিয়েছিল, কেউ বলেনি। সে ছিল না দেখে লতু কিংবা মানতু ফিরে গেছে—এমনও হতে পারে।

রাজেন মাস্টারের কাছে পরে এলেও চলবে। চন্দন পা বাড়াল। তাকে ঘিরে ধরেছে একটা অদ্ভুত অস্বস্তি—অপরাধবোধ তার মধ্যে যতটা, ঠিক ততটাই অবহেলার দুঃখ। মনে মনে রাগও কম জমছে না পরেশের ওপর। কেন সে রুমার সঙ্গে তার বিয়ের কথা তুলে এ অনাছিষ্টি করে বসল! এখন ও বাড়ির দিকে পা বাড়াতেও যে রাজ্যের দ্বিধা সংকোচ, পায়ে জড়তা আসছে তার। রুমার মুখোমুখি হতেও আড়ষ্টতা জাগছে। সব সরলতা আর স্বাভাবিকতাকে নিষ্ঠুর-ভাবে খুন করে ফেলেছে পরেশ মজুমদার।

যাওয়া হলো না। রাজেন দেখতে পেয়েছিল তাকে। গেটের ভিতর উঁচু বারান্দায় রোদ পোয়াচ্ছিল কজন মাস্টারমশাই। রাজেন সেখান থেকে দৌড়ে এল।...হ্যালো চন্দনবাবু!

চন্দন দাঁড়াল।

আরে কী লোক আপনি! সেই কবে দেখা—তারপর আর পাত্তা নেই। আসুন, আসুন।

চন্দন কুণ্ঠিত মুখে বলল, আজ থাক রাজেনবাবু। পরে আসব'খন। খুব ব্যস্ত।

রাজেন তার হাত ধরে টানল।...কী যে বলেন। এই বিদেশে-বিভুঁয়ে একা পড়ে পড়ে চারদিক থেকে বেদম গুন্তা খাচ্ছি, মশাই। চেনা-জানা মানুষ নেই যে, একটু মন খুলে কথা বলব। জানেন কত সাবধানে কথা বলতে হয়—হিসেব করে মেপেজুপে? বাপস! একটা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান—সেখানেও দলাদলি পলিটিকস। ভেবেছিলুম, জিয়াগঞ্জ শহর জায়গা—সেখানে ওসব স্বাভাবিক। এখানে এলুম তো দেখি—ওরে বাবা, এ আবার তারও বাড়া। কী ডেঞ্জারাস জায়গা মশাই!

চন্দন শুকনো হেসে বলল, হ্যাঁ। রূপপুর তো সৃষ্টিছাড়া জায়গা নয়।

রাজেন বলল, আমার ঘরে আসুন। খেজুর পাটালি দিয়ে চা খাওয়াব।

চন্দন অসহায় দৃষ্টে তাকাল।

আসুন, আসুন। ভয় পাবার কিছু নেই—এখন আর আগের মতো রাজনীতি করিনে। স্রেফ সাহিত্য নিয়ে আছি।

দুজনে গেট পেরিয়ে হেঁটে গেল। লম্বা টানা বারান্দার শেষ প্রান্তে রাজেনের ঘর। ভিতরে ঢুকে অবাক হল চন্দন। শুধু অবাক নয়, চমকেও উঠল। বিছানায় চিৎ হয়ে একজন যুবক বই পড়ছে। এদের সাড়া পেয়ে সে বই সরাল মুখের ওপর থেকে। তারপর উঠে বসল। চন্দন ওকে চিনতে পেরেছিল। সামান্য দূর থেকে কদিন আগে দেখেছিল মাত্র—দেখিয়ে দিয়েছিলেন হকসাহেব। কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে নয়—ওটা হকসায়েবের অভ্যাস। রূপপুরের সব মানুষকে চিনিয়ে দেওয়ার এক উৎকট খেয়াল আছে ওঁর মাথায়। সেই খেয়ালের বশেই হকসায়েব বলছিলেন, ওই—ওই যে ছেলেটি যাচ্ছে, এ-তল্লাটে এতবড় গাইয়ে আর নেই চন্দনবাবু। দারুণ গুণী ছেলে। আমাদের বাণীবাবু হেডমাস্টারের বড় ছেলে। ডাকব নাকি? আলাপ করবেন? ও অমিত, বাবাজীবন!

চন্দন নিবৃত্ত করেছিল হকসায়েবকে। পাণ্ডেজীর কথাটা মনে পড়ে গিয়েছিল তার। রুমাকে ওর সঙ্গেই সে রাতে কান্দী থেকে ফিরতে দেখেছিলেন পাণ্ডেজী। সেই অমিত!

রাজেন বলল, আলাপ করিয়ে দিই। আমার বন্ধু অমিত—

হেডমাস্টার মশায়ের ছেলে। আর ইনি...

অমিত হাসিমুখে নমস্কার করে বলল, ওঁকে খুব চিনি।

চন্দন নিষ্পলক তাকিয়েছিল ওর দিকে। কী অপরূপ মুখশ্রী অমিতের! বয়স কত হতে পারে—পঁচিশের মধ্যেই সম্ভবত। চন্দনের চেয়ে বেশ ছোট। আর কিছু না—শুধু চেহারাটাই দেখছিল আপাতত। রুমার নির্বাচনে এতটুকু ভুল হয়নি। ধূসর রঙের হালকা খদ্দরের পাঞ্জাবী—পাজামা, বড়-বড় চুল, শিল্পীদের স্বভাবজাত পরিচ্ছন্ন হাসি মুখে—খুব ভালো লেগে গেল চন্দনের—কয়েক মুহূর্তেই। সে নিজের মধ্যে এতটুকু ঈর্ষাভাব আবিষ্কার করতে পারল না। বরং মনে হল রুমা যে সুন্দরের জগতে এতদিনে পা বাড়িয়েছে, রুমাকে সেখানে পৌঁছে দিতে তারও একটা বিশেষ দায়িত্ব থাকা উচিত।

চন্দন অন্তরঙ্গভাবে কাছাকাছি বসে বলল, আমিও যে ওঁকে চিনিনে ভাবছেন কেন রাজেনবাবু?

রাজেন বলল, তাই নাকি?

অমিত যেন চমকাল। পরক্ষণে হাসল একটু।...চন্দনবাবুর কথা অনেক শুনেছি অবশ্য। ইচ্ছে ছিল আলাপ করার।

চন্দন সরল মনে বলল, হ্যাঁ। রুমার আমি গারজেন ছিলুম একসময়।

রাজেন বলল, রুমা আবাব কে ?

অমিত মুখ ফেরাল। চন্দন বলল, সেই যে সেদিন আলাপ করিয়ে দিলুম—পরেশদার শালী। আপনার কী লেখা পড়ে ওর খুব ভাল লেগেছে, রাজেনবাবু। বলছিল।

রাজেন জিভ কেটে বলল, ষাঃ ' ও কিছু না। আচ্ছা বসুন—চায়ের যোগাড় করি।

সে চলে গেল। চা খাবার ইচ্ছে না থাকলেও চন্দন আপত্তি করল না। তার ভালো লাগছিল অমিতের সংগে আড্ডা দিতে। একটা অকারণ কৌতূহল প্রবল হয়ে উঠেছিল মনে। সেটা অমিত সম্পর্কেই। অমিত কী বা কে, তার দিনযাপন তার আশৈশব খুঁটিনাটি ইচ্ছে-অনিচ্ছে ভালো লাগা-না-লাগা বেড়ে ওঠা, তার বস্তুমাংসের স্বরূপ—অর্থাৎ অমিতের দেহ-মনের যে মিলিত অস্তিত্বের অখণ্ডতা, তা খুঁটিয়ে পরখ করতে অদ্ভুত সাধ জাগল চন্দনের। এই একটা কিম্ভুত হঠকারী ব্যাপার ঘটতে লাগল তার মনে। ঠিক যেভাবে আজও তার বেয়াড়া ইচ্ছে পেয়ে বসে রুমার উরুর পাঁচড়ার দাগ, নাভির তিল কিংবা শিরদাঁড়ার নিচে পিক-চঞ্চু তেকোণা হাড়ের নীলচে অংশটা দেখতে—সেইভাবেই অমিতের দেহটা দেখতে পেলে ভালো লাগত চন্দনের। হ্যাঁ, অমিতের দেহ ক্রমশ তার ইচ্ছের সামনে বিশাল হতে লাগল। এবং হঠকারিতার ঝোঁকে একটুও ইতস্তত না করে সে অমিতের কাঁধে হাত রেখে মৃদু কণ্ঠস্বরে বলল, আপনারা কি বরাবর রূপপুরের বাসিন্দা ?

অমিত যেন একটু সংকুচিত হয়েছিল। ওর মধ্যে কিশোরসুলভ একটা সলজ্জ ভংগী খেলা করছিল সারাক্ষণ। জবাবে সে বলল, নাঃ। বাবা আগে কীর্তিপুর স্কুলে ছিলেন। সেখানেই আমাদের বাড়ি। আমার জন্ম সেখানে।

এখানে কদ্দিন এসেছেন ?

বছর তিনেক মাত্র। স্কুল ফাইনাল কীর্তিপুরে হয়েছিল। তারপর বহরমপুর কলেজ। তারপর তো দু বছর চুপচাপ বসে আছি।...মুখ তুলে হাসল অমিত।

এখানে নিজের বাড়ি, নাকি...

অমিত জানলার দিকে ঘুরে বলল, না। ওই যে কোয়ার্টার। অবশ্যি বাড়ি করার ইচ্ছে আছে বাবার। সামনের বছর রিটায়ার করবেন। তখন তো নিজের বাড়ি চাই-ই একটা। কীর্তিপুরে আর ফেরার ইচ্ছা নেই। এ জায়গাটা তো বেশ ভালই। শিগ্‌গির কলেজও হয়ে যাচ্ছে শুনছি।

রুমার সংগে কদ্দিন আলাপ হয়েছে ?

অমিত মুখ তুলে নিষ্পলক তাকাল। চমক নয়, চন্দনের মনে হল—মুখটা পলকে নিষ্প্রভ আর বিপন্ন হয়ে উঠেছে। চোখ নামিয়ে জবাব দিল, খুব বেশি দিন না—এই তো গত পুজায়। ওদের বাড়ির সামনে পুজো হয়। ফাংশনে গাইতে গিয়েছিলুম—তখন।

চন্দন হেসে উঠল।...রুমা গাইতে পারে না। কিন্তু গানটান ভালবাসে খুব। আমিও ভীষণ বাসি-টাসি। রাজেনবাবু আসুক, চা খেতে খেতে শোনা যাবে। কী বলেন ?

অমিত একটু কেসে বলল, গলা একটু ধরে গেছে। ঠাণ্ডা লাগিয়েছি।

তাতে কী ? আমাকে পর ভাববেন না অমিতবাবু। রুমাকে জিগ্যেস করলেই জানতে পারবেন--আমার সঙ্গে ওদের সম্পর্কটা কেমন।

কথাটা শুনেই অমিত যেন ক্ষুব্ধ হল।...আপনি রুমা বা আমার ব্যাপারে কী ভেবেছেন জানিনে—আপনার সঙ্গে আমার এইমাত্র পরিচয় হল চন্দনবাবু, কিন্তু...

তাকে থামতে দেখে সকৌতুকে চন্দন বলল, কিন্তু কী ?

রাজেন এসে পড়ায় কথাটা চাপা রইল। রাজেন বলল, অমিত, এবার একটু স্ফূর্তি করা যাক। আমাদের মাননীয় অতিথির সম্মানে—জাস্ট এ সুইট সং ! সকালটাও আজ ভারি চমৎকার। হারমোনিয়াম দরকার নেই—খালি গলায়।

অমিত সশব্যস্তে বলল, না না। পরে হবে একদিন। গলাটা ভীষণ ধরে আছে। কাল রাত অব্দি ফাঁকায় ঘুরেছিলুম, ঠাণ্ডা লেগে গেছে।

রাজেন চোখ নাচিয়ে বলল, ব্যাপার কী ? এত ঘোরাঘুরি সন্দেহজনক ! একা নয় নিশ্চয়।

অমিত সলজ্জ হাসল।...যাঃ !

চালাকি করো না বাবা !...রাজেন ধমকে বলল।...নির্ঘাৎ তুমি সেই মেয়েটির সঙ্গে রাত জেগে ঘোরাঘুরি করেছ। সেই যে—সেই...কী নামটা যেন, ইয়েস—আমার স্মৃতির দাম লাখ টাকা—বলছি, প্রী—প্রীতিধারা ! রাইট ? কান্দী কলেজের ছাত্রী। ছিমছাম হালকা গড়ন...

চন্দন অক্লেশে বলল, ওরই ডাকনাম রুমা।

বলেন কী ! রাজেন হাঁ করে তাকাল।...আপনার পরেশবাবুর শালী ? ওরে হালুয়া ! আমার গল্প পড়ে ওর ভালো লেগেছে বলছিলেন না ? আমি যে ড্যাং-ড্যাং করে নাচব এবার। অমিত, আর পেঁয়াজি চলবে না। গলা খুলে ঝাড়ো-দিকি। আমি একদৌড়ে হিসি করে আসি...দৌড়ে দরজার কাছে গিয়ে সে দাঁড়াল। ঘুরে চাপাগলায় বলল ফের, ল্যাভেটরীতে আজ ছেলেরা কীসব লিখেছে, ভাবা যায় না। ভোরবেলা গিয়ে পণ্ডিতমশাই তো চেঁচামেচিতে হুলুস্থুল করে বসেছিলেন। অনেক করে সামলানো গেল। বেচারা সেকেলে মানুষ। নতুন এসেছেন এখানে। সবতাতেই হইচই লাগাচ্ছেন। ঢিপেভাঙ্গা গোপীনাথ-পুরের গেঁয়ো ইস্কুল আর রূপপুরের স্কুল—দুটোর তফাৎ বুঝতে দেরী হচ্ছে, কবে না ওঁকে নাকের জলে চোখের জলে করে বসে। বাপস, কী এঁঠেপাকা বিচ্ছু সব !...আরও চাপা গলায় রাজেন বলল, কী লিখেছে জানেন চন্দনবাবু ? যদু-স্যার গ্লাস রক্ষিতস্যার ডিভাইডেড বাই রমলা নন্দী। মিস নন্দী হলেন গার্লস স্কুলের টিচার। আর পারা যায় না।

সে চলে গেলে চন্দন হাসতে থাকল। তারপর বলল, রাজেনবাবু যখন জিয়াগঞ্জ স্কুলে ছিলেন, ছাত্রদের মধ্যে ভীষণ পপুলারিটি ছিল ওঁর। এখানে কেমন ?

অমিত অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল, ভালো। ছাত্ররা ভালোই বাসে।

আচ্ছা অমিতবাবু ?

এ্যাঁ ?

কিছু মনে না করলে একটা কথা বলি।

না, না। বলুন না।

রুমার সঙ্গে লাস্ট কখন আপনার দেখা হয়েছে ?

অমিত আগের মত সাদা মুখে তাকাল।...দেখা কাল সন্ধ্যায়। বাজারের ওদিকে যাচ্ছিলুম, তখন। কেন ?

অনেক দিন ওদের ওখানে যাইনি। খবরও রাখি নে—সময় পাইনে, এত ব্যস্ত থাকি। আচ্ছা অমিতবাবু, ওদের বাড়ির খবর কিছু জানেন ? রুমা বলে নি কিছু ?

অমিত মুখ নামিয়ে বলল, আমার সঙ্গে ওদের বাড়ির কথা কিছু হয় না কখনও। আর কই, বলেনি তো কিছু। কেন, কী হয়েছে ?

চন্দন সেকথার জবাব না দিয়ে বলল, রুমার মধ্যে কোন রকম পরিবর্তন লক্ষ্য করেন নি ?

না তো !

চন্দন এবার সোজা বলল, রুমার বিয়ের কথা শুনছেন ?

অমিত চমকে উঠল। পরক্ষণে সংযত হয়ে শান্তভাবে বলল, হ্যাঁ—শুনেছি।

কার কাছে ? নিশ্চয় রুমা বলেছে ?

হ্যাঁ।

কার সঙ্গে হচ্ছে, তাও নিশ্চয় শুনেছেন।

অমিত কেমন হাসল।...আপনার সঙ্গে। বেশ তো ভারি ভালো হবে ! রুমা বলছিল ..

সেই সময় রাজেন এসে গেল গুন-গুন করতে করতে।...অমিত, চা এসেছে। লাগাও এবার। জুতমতো একখানা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবে ? নাকি সেই ভজন-খানা হোক। সেদিন সকালে গাইছিলে--কী যেন...

চন্দন ছটফট করছে ততক্ষণে। রুমা বলছিল—কী বলছিল রুমা ? রুমা কী বলছিল ? এই কথাটা জানবার জন্যে এখন সে রাজেনকে খুন করতেও পারে। তার চারপাশে রৌদ্রোজ্জ্বল সম্ভাবনাময় পৃথিবী থরথর করে কাঁপতে লাগল। গুন গুন করে প্রথম কলিটা গেয়ে ওঠার পর অমিত গলা চড়া পর্দায় তুলে দিল। দূরের স্মৃতির মতো কিছু আবছা ছবি ভেসে এল। আর শীতকালের ঠাণ্ডা হাওয়া, রোদ, দিগন্তে কুয়াশার পুঞ্জ, পাখ-পাখালির ডাক, মাঝেমাঝে হাইওয়েতে ধাবমান গাড়িগুলোর চাপা নির্ঘোষ—সব মিলিয়ে যে অর্কেস্ট্রা, তার সঙ্গে একটি অচ্ছেদ্য অংশের মতো অমিতের ওই গান অমিত নামক একটি প্রতিদ্বন্দ্বী মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে ওতপ্রোত হচ্ছিল একটি সম্পূর্ণতায়—যা শুধু দুঃখিত করে। ক্রমাগত দুঃখিত এবং বিষন্ন করে। সেই বিষন্নতার নিচে চাপা পড়ে গেল রুমা কী বলছিল—তা জানবার প্রবল ইচ্ছেটা।...

একটু পরে খুব ভারি মন নিয়ে চন্দন উঠল। এখন তার একবার রুমার কাছে যেতে ইচ্ছে করছে। আজ কলেজের ছুটি নেই সম্ভবত। বাসস্ট্যান্ডের ওখানেই দেখা হতে পারে।

কিন্তু পথে হকসায়েবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। হকসায়েবকে সাইকেল চাপতে কোনদিন দ্যাখেনি। সে জন্যেও বটে—কৌতুকে, এবং ওঁকে দেখলেই

চন্দন মুহূর্তে যেন মুক্তির খোলা দরজা পেয়ে যায়—সে চেঁচিয়ে ডাকল, হকসায়েব, ও হকসায়েব !

হকসায়েব তক্ষুনি নামলেন সাইকেল থেকে। তারপর বললেন, আরে, আপনাকেই খুঁজে রূপপুর মাথায় করছি কখন থেকে। ওদের সাংঘাতিক সর্বনাশ হয়ে গেছে। পরেশবাবু কোথায় এ্যাকসিডেণ্ট করে এখন কান্দী হাসপাতালে আছেন। ওরা সব্বাই সেখানে গেছে। চলুন, শিগ্‌গির চলুন। শিশিরবাবুর জীপ রয়েছে ওখানে।

তেরো

জীপ থেকে নেমেই হাসপাতালের গেটের পাশে চোখ গেল চন্দনের। শিশিরবাবু আর হকসায়েব কোনদিকে না তাকিয়ে হনহন করে বারান্দায় গিয়ে উঠলেন। চন্দন একটু ইতস্তত করে দাঁড়াল। গেটের পাশেই বিশাল শিরিসগাছ। তার গোড়ায় ঘাসের ওপর বসে আছে স্নেহধারা। পাশে দাঁড়িয়ে আছে রুমা। স্নেহধারা নিস্পন্দ—রুক্ষ চেহারা, লাল শুকনো চোখ, পরনের শাড়িটা গায়ে এলোমেলো জড়ানো। স্থির তাকিয়ে সে হাসপাতালটাই দেখছে যেন। রুমার চোখ দুটোও লাল—কিন্তু ভিজে। রুমাল ঘষছে বার বার। চন্দনের পায়ের শব্দে স্নেহধারা মুখ ফেরাল না। রুমা তাকে দেখল। কাছে গিয়ে চন্দন ধরা গলায় ডাকল, বউদি !

স্নেহধারা তবু তাকাল না। শুধু বলল, এত দেরী করে এলে ?

চন্দন ব্যাকুল হয়ে বলল, আমি খবর পেয়েই চলে এসেছি, বউদি। কেমন আছে পরেশদা ? দেখে এসেছ ?

জবাবটা রুমা দিল।...দেখা করতে দিলে না। অপারেশন হচ্ছে বলল।

চন্দন বলল, আমি আসছি বউদি। কোন চিন্তা করো না। ঠিক হয়ে যাবে।

তারপর সে এগোল। বারান্দায় উঠতে গিয়ে জানল, রুমাও তাকে অনুসরণ করছে। রুমাকে সঙ্গ দেবার জন্যে সে দাঁড়াল। রুমা এসে বলল, ওরা মিথ্যে কষ্ট দিচ্ছে—জামাইবাবু বাঁচবে না ! আমি জানি।

চন্দন চমকে তাকাল ওর মুখের দিকে। এ মুহূর্তে কী নিষ্ঠুর আর নির্বিকার দেখাচ্ছে রুমাকে ! বারান্দার শেষ দিকের ঘরে হকসায়েব আর শিশিরবাবু একজন ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছেন দেখতে পেল চন্দন। সেইদিকে পা বাড়িয়ে চন্দন বলল, ওসব কথা বলতে নেই।

রুমা শ্বাসকষ্ট স্বরের বলল, তুমি জানো না—তাই বলছ। জামাইবাবু সুইসাইড করেছেন—ওরা কেউ জানে না।

চন্দন কোন কথা না বলে শিশিরবাবুদের কাছে গেল। হকসায়েব চন্দনের হাত ধরে একটু আড়ালে নিয়ে এসে বললেন, খুব সাংঘাতিক অবস্থা চন্দনবাবু। আর কোন আশা নাই। মাথায় চোট লেগেছে—খুলি ফেটে গেছে। নাক মুখ দিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। বন্ধ হচ্ছে না নাকি।

চন্দন বলল, দেখতে দিলে আপনাদের ?

নাঃ। বলছে, আধ ঘণ্টা দেরী হবে। সারজেনবাবু আমাদের চেনা লোক। এ্যাকসিডেণ্টটা কোথায় হয়েছে হকসায়েব ?

চৌরাস্তার মোড়ে—নদীর ব্রীজের কাছে। গাড়ি পড়ে গিয়েছিল নিচে। তাও পানিতে পড়লে হত। পড়েছে পাথরের ওপর। ধ্বসে যাবে বলে দু' ধারে পাথরের চাঙড় দেওয়া হয়েছে—সেখানে।...কানের কাছে মুখ এনে হকসায়েব আরও বললেন, মদে মাথার ঠিক ছিল না, বুঝলেন ? ওনারা বলছেন, খুব মদ খেয়েছিল পরেশবাবু। তবে প্রমথটা জোর বেঁচে গেছে। লাফিয়ে পড়েছিল আগেভাগে। পায়ে সামান্য লেগেছে। ও-ঘরে প্রমথ আছে—চলুন, ওর কাছে হাল-হদিস সব পাওয়া যাবে।

চন্দন বলল, রুমা, তুমি বউদির কাছে যাও। আমি এক্ষুণি আসছি।

রুমা কান করল না। ডাক্তারের সামনে গিয়ে বলল, একটিবার ওঁকে এখন দেখা যাবে না স্যার ?

ডাক্তার বললেন, এখন সম্ভব নয়। অপারেশন থিয়েটারে কাকেও ঢুকতে দেওয়া হয় না। কিছুক্ষণ দেরী করা ছাড়া উপায় নেই।

চন্দন বলল, রুমা—লক্ষ্মীটি ! তুমি বউদির কাছে যাও।

রুমা কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে চলে গেল। চন্দন লক্ষ্য করল, ঠোঁট কামড়ে কান্না সামলাতে প্রবল চেষ্টা করছে সে। আর তার ফলে হয়তো পরেশদার জন্যে নয়—রুমার কথা ভেবেই চন্দনের মনে হল সশব্দে কেঁদে ফেলতে পারলে আরাম পাওয়া যেত।

এইসব মফঃস্বল শহরের হাসপাতালের আবহাওয়ায় যেন প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুর স্বাদ জড়িয়ে আছে। ডেটলের গন্ধ, সারবন্ধ সাদা বিছানায় অপেক্ষমান শরীর গুলো পুতুলের মতো থার্মোমিটার পরীক্ষারত নার্স এবং তাদের এ্যাপ্রনপরা পরীমূর্তি, সাদা দেওয়াল—সব মিলিয়ে সমাধিস্থানের স্তব্ধতা—যার মধ্যে দাঁড়িয়ে বাইরের পৃথিবীটার প্রতি নেশা বেড়ে যায়। প্রমথ পায়ে ব্যাণ্ডেজ নিয়ে শুয়ে ছিল। এদের দেখে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। হকসায়েব পাশে বসে তাকে সান্ত্বনা দিতে ব্যস্ত হলেন। চন্দন বলল, গাড়ি কে ড্রাইভ করছিল প্রমথ ?

প্রমথ কাঁদতে কাঁদতে জবাব দিল, বাবু নিজে। কলকাতা থেকে বহরমপুরে পৌঁছেছি ভোরবেলা। সেই সাতসকালে বাবু মদ গিলতে বসল। এত বারণ করলুম, কানে নিল না। তেড়ে মারতে এল। তারপর সেই অবস্থায় গাড়ি নিজে ড্রাইভ করছিল। যত বলি, 'বাবু—আমাকে দিন—গাড়ি এদিক ওদিক করছে'—উনি চোখ রাঙালেন। খালি গাড়ি। তাতে স্পীড বাড়তে লাগল মিনিটে মিনিটে। হাটপাড়ায় একটা গরু চাপাও পড়ল।...একটু দম নিয়ে প্রমথ বলল, সেই সময় বাবু একটা মজার কথা বললেন। 'বুঝলি প্রমথ, আজ সত্যি সত্যি আমার গায়ে চাকা গজিয়েছে মনে হচ্ছে। প্রমথ, যদি গতিক খারাপ দেখিস, লাফ দিবি সঙ্গে সঙ্গে। আজ আমার মাথার ঠিক নেই রে।'...বললুম, 'তাহলে আমাকে দিন বাবু।' দিলেন না। মা মাসি তুলে গাল দিলেন। বার বার বলতে লাগলেন, 'প্রমথ, প্রমথ ! আমার এ কী হচ্ছে রে ! গায়ে চাকা ঘুরছে ! ইস্, কত বড় বড় চাকা রে প্রমথ !' বাবু আবোল তাবোল বকা সুরু করলেন। কান্দীতে থামাবার কথা ছিল। মনে করিয়ে দিলুম। আমলই দিলেন না। ঠিক

চড়াইয়ের মুখে—ব্রীজের এক রশি আগে থাকতে টের পেলুম, বাবুর হাত স্টিয়ারিঙে নেই। সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে স্টিয়ারিং ধরব ভাবলুম। কিন্তু ততক্ষণে দেখি গাড়ির চাকা স্ল্যাব থেকে নেমেছে। অমনি দরজা খুলে লাফ দিলুম। ভয়ঙ্কর শব্দ হল একটা। রাস্তা থেকে মুখ তুলে দেখি, চারপাশ থেকে লোকেরা দৌড়চ্ছে। গাড়ির পাত্তা নেই।...

শিশিরবাবু এসে গেছেন ইতিমধ্যে। সব শুনে বললেন, এ আমি জানতুম।

চন্দন প্রশ্ন করল, কী জানতেন শিশিরবাবু ?

শিশিরবাবু কোন জবাব দিলেন না। হকসায়েব বললেন, আমি প্রমথের কাছে একটু বসি। বাবা চন্দন, আপনি ওদিকে যান। মেয়েছেলে—হয়তো রান্নাকাটি করছে। ওনাদের একটুখানি দেখুন গিয়ে। শিশিরবাবু, তুমি ভাই দেখ—ওষুধপত্তর বাইরে থেকে কিছু লাগবে নাকি। রক্তও লাগতে পারে। কী বলছেন ডাক্তারবাবুরা ?

চন্দন বেরিয়ে এল। বারান্দা থেকে নেমে লন পেরিয়ে গেল দ্রুত। সবকিছু তার চোখে ঝাপসা হয়ে আসছিল।। হঠাৎ যেন সে এ বিরাট পৃথিবীতে একা আর অসহায় হয়ে পড়েছে। রুমা মুখ ফিরিয়ে চাপা কাঁদছে। স্নেহধারা কিন্তু স্থির—কেমন কঠোর রুক্ষ চেহারা তার। চন্দন কাছে গিয়ে বসে পড়ল ঘাসের ওপর। ডাকল, বউদি !

স্নেহধারা তাকাল মাত্র।

চন্দন মুখ নামিয়ে বলল, মনে সাহস রাখো বউদি। ভয় করো না।

স্নেহধারা বলল, কিসের ভয় ? আমার কিছু হয়নি—ঠিক আছি ঠাকুরপো। আমি...ঠিক আছি।

চন্দন আস্তে আস্তে বলল, সব শুনলুম প্রমথ ড্রাইভারের কাছে। মনে হল, পরেশদা ইচ্ছে করেই এ্যাকসিডেণ্টটা ঘটিয়েছেন।

রুমা নাক মুছে বলল, ইচ্ছে করেই—তা কে না জানে ! কিন্তু এই যদি মনে ছিল—কেন, কেন সে...কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।

স্নেহধারা বলল, রুমা, চুপ করো। কাঁদবার দিন পরে পাবে। আচ্ছা চন্দন এখন একবারও দূর থেকে দেখতে দেবে না আমাকে ?

চন্দন বলল, দিচ্ছে না। অপারেশন টেবিলে আছে।

স্নেহধারা স্বগতোক্তি করল, শুধু শুধু একবার একটা কথা জিগ্যেস করতুম ওকে। শুধু একটা কথা।

চন্দন বলল, হয়তো অজ্ঞান হয়ে আছেন।

শীতের বাতাস বইছিল ফাঁকা এই মাঠে। গাছপালার পাতা ঝরে পড়েছিল সর সর খর খর। আকাশজোড়া বিষন্নতার রঙটাই যেন নীল মনে হচ্ছিল—স্পষ্ট নীল নয়, একটু ধূসরতাও মিশে রয়েছে তাতে। তিনজনে চুপচাপ বসে রইল। অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। রুমা আবার একবার ঘুরে এল ওদিক থেকে। ততক্ষণও কোন কথা নেই। সব কথার ওপর পরেশের রক্তাক্ত প্রকাণ্ড শরীরটা যেন চেপে বসে আছে। একটা অদ্ভুত দৃশ্য ভাসছিল চন্দনের চোখে। একটা ওল্টানো ট্রাক—ঠিক ট্রাক নয়—মানুষ ! গায়ে তার চাকাগুলো ঘর ঘর করে সামনে ঘুরছে।

হকসায়েব বেরিয়ে এলেন এতক্ষণে। এদের কাছে বসে পড়লেন।...বুক বেঁধে শক্ত হোন মা, ভয় করবেন না। আমরা আছি। আমাকে বাবা বলে জানবেন। রুমা, মা!

রুমা তাকাল।

হঠাৎ কণ্ঠস্বর চাপা করলেন হকসাহেব।...বিশেষ করে তোমাকেই একটা কথা বলে রাখছি রুমা-মা। খুব সাবধান। চন্দনবাবু, তুমিও শুনে রাখো বাবা খবরদার! শিশির বাবু হোন, আর আমিই হই—কখনো কোন কাগজপত্রে সই করতে বললে সইটই করবে না। এ দুনিয়া বড় খারাপ জায়গা মা। সাবধান। আর দ্যাখো মা, দুনিয়ায় এখন বড় অন্ধকার। পাশের মানুষটিও চেনা যায় না—পর না আপন, বাতি থাকলে তো চিনবে গো। বাতি নাই। হ্যাঁ—বড় ঠেকে শিখেছি বাবা। তাই বলছি, খবরদার—কোনরকম কাগজের ধারেকাছে যাবেন না আপনারা। আল্লা পরেশবাবুর জান ফিরিয়ে দিন, মনে মনে মোনাজাত করছি। কিন্তু তার ইচ্ছার ওপর তো হাত নাই। কপালে যদি মউত লিখে থাকেন—হবে। বুক বাঁধতে হবে। আর দেখুন মা বউবিবি, আমাদের ধর্মে বলে—মউতের জন্যে শোক হারাম। শোক করলে তাঁর আত্মার কষ্ট হয়। একটা গল্প বলি, শুনুন। একমাত্র আদরের ছেলে গেছে মারা—বিধবা মায়ের। মা শোক করলেন না। বুক বেঁধে থাকলেন। কিছুদিন পরে মা দ্যাখেন, ছেলে এসে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। কথা বললেন দুজনে। কেমন আছ বাবা ওপারে?...না খুব শান্তিতে আছি মা।...তারপর ছেলে চলে গেল! অমনি মায়ের চোখে দু' ফোঁটা পানি ঝরল। পরদিন ছেলে তাকে দেখা দিল—সামান্য দেরীতে। মা বললেন, দেরী হল কেন বাবা? ছেলে বলল, মা, আজ আসবার সময় দেখি আমার নিচে পানি বইছে। তাই আসতে দেরী হল।...ছেলে চলে গেলে মা আবার কাঁদলেন। পরদিন আরও দেরী হল। ছেলে বলে, মা আজ আমাকে হাঁটু পানি ভেঙে আসতে হয়েছে। তারপর দিনে দিনে মায়ের কান্না বাড়ে—ছেলেরও আসতে দেরী হয়। একদিন ছেলে এসে বলল, আর পারছি না না, সাঁতার বানের পানি ভেঙে আর আসবার সাধ্য নাই। তারপর...

শিশিরবাবু বারান্দা থেকে হাত তুলে ডাকছিলেন, চন্দনবাবু!

চন্দন দৌড়ে গেল। হকসায়েব বললেন, আমিও যাই, মা আপনারা বসুন। তবে যা বললাম, মনে রাখবেন।

হকসায়েব চলে গেলে স্নেহধারা ডাকল, রুমা!

উঁ?

কিন্তু কিছু বলতে পারল না স্নেহধারা। বলবার সুযোগও পেল না। চন্দন দু' হাতে মুখ ঢেকে এগিয়ে আসছে এদিকে। হকসায়েব আর শিশিরবাবু বারান্দায় দ্রুত হেঁটে যাচ্ছেন। চন্দন কাছে এসে অস্বাভাবিক শান্ত বসরে বলল, বউদি, পরেশদা নেই।...

বিপদকে ভয় ততক্ষণ, যতক্ষণ সে ভবিষ্যতের মধ্যে অদৃশ্য। বিপদ এল—চরম বিপদই সেটা, মাথার ওপর থেকে ঝড়ে উড়ে গেল উন্মূল হয়ে বিশাল গাছ। অথচ দেখা গেল তবু বাঁচতে হয় এবং বেঁচে থাকা যায়। ভাগ্যান্বেষী পরেশ

মজুমদার নিজে মরল, কিন্তু তার সাজানো-গোছানো সংসার মরল না—সেই সংসারের সাধ-আশা-আকাংখারও ছেদ পড়ল না। বস্তুত, এই ধরনের স্বার্থ-পরতা মানুষের মধ্যে আছে বলেই তো মানুষের পৃথিবীর ধারাবাহিকতাটা অক্ষুন্ন আছে আজও।

স্নেহধারাকে দেখে অবাক হয়েছিল চন্দন। এত শান্ত ধীরস্থির আর বুদ্ধি-মতী হয়ে উঠতে পারে সে, কল্পনাও করেনি কোনদিন। সে টের পাচ্ছিল, এই অল্প শিক্ষিতা সাধারণ মেয়েটির মধ্য থেকে আস্তে আস্তে একটা ঘুমন্ত শক্তি জেগে উঠেছে। অথচ যার কাছে শক্তি ও সাহস আশা করা গিয়েছিল, সেই রুমা—সে দারুণ ভেঙ্গে পড়েছে। আশ্চর্য, পরেশ ওকে বাঘিনী বলেছিল!

এদিকে চন্দনের উৎকণ্ঠা নিজের ভবিষ্যতটা নিয়ে। এই উৎকণ্ঠাই তার মনে অজস্র ছবি আঁকছিল। ভয়ঙ্কর সব ছবি। পরেশের বীভৎস ক্ষতবিক্ষত দেহটা তার ভবিষ্যত জুড়ে আত্মপ্রকাশ করছিল সারাক্ষণ। হয় তাকে এখান থেকে পালাতে হবে, নয়তো শক্ত হাতে পরেশদার হালটা ধরতে হবে। লোকটা সবকিছু জট পাকিয়ে রেখে গেছে। যা কিছু করেছে—সবই এখন অন্ধকারে। হাতড়ে খুঁজে বের করা ছাড়া উপায় নেই।

হাসপাতাল থেকেই লাস নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বহরমপুরে গঙ্গা তীরের শ্মশানে। পাণ্ডেজী এসেছিলেন একটু দেরীতে। তিনিও ছিলেন সঙ্গে। হকসায়েব স্নেহধারা আর রুমাকে রূপপুরে নিয়ে গিয়েছিলেন। শিশিরবাবু, পাণ্ডেজী, চন্দন আর জনাকতক ড্রাইভার এ্যাসিস্ট্যাণ্ট মিলে ট্রাকে লাসটা নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। রূপপুর চটিতে তারপর কদিন ধরে শুধু ওই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার গল্প। সবাই জানে, মাতাল পরেশ মজুমদার অ্যাকসিডেণ্ট করে মেরেছে। শুধু স্নেহধারা গভীর রাতে বিড়বিড় করে কার উদ্দেশ্যে বলে, ডাইনি, রাক্ষসী! একটা খেয়েও সাধ মেটেনি—আবার আর একটা খেলি তুই?

এই কয়েকটা দিন চন্দন ও-বাড়ি গিয়ে রাত্রে থেকেছে। খেয়েছে। দিনে সে বাইরে-বাইরে কোম্পানীর কাজে কাটিয়েছে। কোম্পানী আপাতত চলেছে যথা-রীতি। পাণ্ডেজী এ ব্যাপারে হঠাৎ বেশ উৎসাহী হয়ে পড়েছেন। হকসায়েবও তাই। শুধু বেচুবাবুকে দেখলে চন্দনের কেমন চমক খেলে যায়। লোকটার চেহারা যেন ধূর্ত শেয়ালের মতো। ওদিকে হৃদয় ঠাকুরকে ছাড়িয়ে দিতে হল। অনেক পস্তে কান্নাকাটি করে বেচারা ফের শিশিরবাবুর গদীতে গিয়ে জুটল।...

রাত দশটা বেজে গিয়েছিল। চন্দন রুমাদের ওখানে যথারীতি শুতে যাচ্ছিল। রাস্তার ওপর হৃদয়ের সঙ্গে দেখা। হন্তদন্ত সে আসছে। একটু অবাক হতে হয়। এখন তার মৌতাতের সময়। চুপচাপ কোথাও সে ঝিমুবে—তা নয়, ব্যস্তবাগীশ লোকের মতো এই শীতের রাতে বেরিয়ে পড়েছে। একটা আস্ত কম্বলে তার শরীর ঢাকা। লম্বা লম্বা পা ফেলে সে আসছিল। চন্দনকে দেখে একগাল হেসে বলল, আপনার কাছেই যাচ্ছিলুম স্যার।

চন্দন দাঁড়াল।...কী ব্যাপার ঠাকুর?

হৃদয় এদিক-ওদিক তাকিয়ে আরও কাছে এগোল। রাস্তায় লোকজন প্রায় নেই-ই দোকানগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। অনেক পরে-পরে দু' চারটে ট্রাক চলে যাচ্ছে। লম্বা ল্যাম্পপোস্টের আলো ঘিরে কুয়াশা জমেছে। হৃদয় ফিক করে হেসে চাপা গলায় বলল, নতুন এক জায়গায় কাজ পাব-পাব হচ্ছে, বুঝলেন

স্যার ? পাকা কথা এখনও দিই নি। আপনার অনুমতি না নিয়ে কথা দেব না—কভি নেহি ! আমি এখনও মনে মনে আপনার আছি স্যার। আপনার আমি কেনা হয়ে গেছি।

চন্দন বিরক্ত হল। এই জন্যে সে তার কাছে আসছে ! চন্দন বলল, বেশ তো। তোমার যা খুশি, করবে।

হৃদয় বলল, কথাটা তা নয়। কদিন থেকে সেখানে যাওয়া-আসা করছি—ভাবগতিক না বুঝে হুট করে যেখানে সেখানে ঢুকে পড়া তো ঠিক নয়। তা, যখনই গেছি—একটা ব্যাপার চোখে পড়েছে। দু' চোখের দিব্যি স্যার, বিশ্বাস করুন। সেটা আপনাকে বলা উচিত। না বললে বেইমানী হয়। ওরে বাবা ! মজুমদার মশায়ের নুন খেয়েছি—আপনারও তো কম খাইনি !

চন্দন অধৈর্য হয়ে বলল, কী দেখেছ ?

হৃদয় আরও চাপা গলায় বলল, ও বাড়ি আপনি কখনও যাননি। এই মেয়েটা যা জিনিস, বাপস্ ! চেনেন না ?

কোন মেয়েটা ?

নুটুবাবুর বউ। কথায় বলে ছেনাল বুড়িয়ে কুটনি হয়—ও হচ্ছে তাই। এ ব্রাহ্মণ সন্তান ও-বাড়িতে কাজ করবে ভেবেছেন ? কভি নেহি।...শুনুন স্যার, কথাটা বলি। কিন্তু ভয়ে বলি' না নির্ভয়ে ?

চন্দন হেসে বলল, নির্ভয়েই বলো না।

মজুমদার মশায়ের শালী হলেন গে আপনার বাগদত্তা স্ত্রী ! আপনার দিব্যি স্যার, ওই মাগী ওনাকে নির্ঘাৎ নষ্ট করবে। একটু আগে ওখানে গিয়েছিলুম। নেশাটেশা করে গেলে পাছে রাগ করে, তাই এখনও কিছু টানি নি। স্বচক্ষে দেখলুম, রুমা দিদিমণি, নুটুবাবুর বউ আর আপনার গে বাণীবাবু হেডমাস্টারের ছেলে জাঁকিয়ে বসে তাস খেলছে। সে কী হাসাহাসি চলছে ! ধিক, শত ধিক !

চন্দন চমকে উঠেছিল। নুটুবাবুর বউ এবং পরেশ সম্পর্কে অনেক কথা সে ব্রজর বউ হাসির কাছে শুনেছে সেদিন। স্নেহধারার সে-রাত্রে ওখানে গিয়ে পড়াটাও বেশ রটে গিয়েছিল। তারপর পরেশের দুর্ঘটনা আর মৃত্যু। সব মিলিয়ে একটা যোগসূত্র অনুমান করেছিল সে। কিন্তু পরে এটা পরেশদার আত্মহত্যা বলে বিশ্বাস করার যুক্তি পায় নি।

রুমা ওখানে প্রায়ই অমিতের সঙ্গে আড্ডা দেয় ? খুব অবাক লাগল। অবিশ্বাস্য মনে হল। পরেশদার মৃত্যুতে স্নেহধারা বরং ভেঙে পড়েনি—শক্ত হয়েছে। ছেলেমেয়েদের মানুষ করার দায়িত্ব, সংসারের দায়িত্ব—এখন তো তার নিজেরই। যথার্থ মায়ের মত শক্তিমতী হতে পেরেছে সে। ওদিকে চন্দন রুমার ভাবভঙ্গী দেখে ভেবেছিল রুমাই ভেঙে পড়েছে। কলেজ যায় না। কেমন উদাসীন হয়ে পড়েছে সে। বিশেষ কথা বলে না। সব সময় কাঁদে লুকিয়ে-লুকিয়ে।

অথচ রুমার ভিতরের চেহারা এই। এখনও সে সমানে প্রেম চালিয়ে যাচ্ছে অমিতের সঙ্গে ! অবিশ্বাস্য লাগল কথাটা। হয়তো কোন দরকারে রুমা আজ ওখানে গিয়ে পড়েছিল—ঘটনাচক্রে অমিত ওখানে এসেছিল। তার ফলে—

চন্দন কড়া স্বরে বলল, যাও ঠাকুর—তোমার নেশার সময় বয়ে যাচ্ছে।

হৃদয় দমল না। বলল, এখনও গেলে দেখতে পাবেন। চলুন না, আমার সঙ্গে চলুন। স্যার, আপনি কী স্যার! আজ বাদে কাল যার আপনার সঙ্গে বে হবে—

আচমকা চন্দন ওর গালে চড় মেরে বসল।

হৃদয় গালে হাত চেপে ধরে একটুখানি মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সশব্দে কেঁদে বলল, মারলেন! আমাকে আপনি মারলেন! আমাকে চড় মারলেন আপনি?

চন্দন ফের চড় তুলে বলল, এক্ষুনি চলে না গেলে আবার মারব। গেট আউট, গেট আউট রাস্কেল কোথাকার!

হৃদয় রুখে বলল, এটা গরমেণ্টের রাজপথ। আমি দাঁড়িয়ে থাকব। ইস্, ভাবি আমার রূপপুরের নতুন লাট এসেছেন গো! পরেশ মজুমদার একটাই হয়! হুঁ। যাবে—অমনি চাকা উল্টে উচ্ছন্নে চলে যাবে।

সে তক্ষুনি হনহন করে উল্টো দিকে চলে গেল। যতদূর গেল, বিড় বিড় করে আরও কী সব বলতে বলতে গেল। হয়তো গাঁজাখোরটা মা-মাসি তুলে গাল দিতে দিতে যাচ্ছে। চন্দনের ইচ্ছে হল—আরেকবার ওকে চড় কষাতে না পারলে গায়ের ঝাল যাবে না।

কিছুক্ষণ নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে থাকার পর তার সম্বিত এল। এ কী করল সে! মেরে বসল ওকে? কেন তার এত রাগ হল? না—এমন হঠকারী মেজাজ তো চন্দনের ছিল না। একটা তুচ্ছ জড়বুদ্ধি গাঁজাখোর মানুষকে এমনি করে চড় মারা নিশ্চয় খুব সোজা কাজ। কিন্তু এ কাজ চন্দনের নয়। সে অনুশোচনায় আক্রান্ত হল কিছুক্ষণের জন্যে। কিন্তু মাথার ভেতর দিকটা এই ঠাণ্ডার মধ্যে যেন আগুন জেবলেছে। শরীর কাঁপছে। অবিকল পরেশদার মতো তার গায়ে চাকা গজাচ্ছে যেন। একটা নিষ্ফল ক্রোধে দুর্বার গতিতে কোথাও ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে। স্তব্ধতার মধ্যে কোথায় গোঁ গোঁ ঘর-ঘর শব্দ হচ্ছে।

ঠোঁট কামড়ে ধরে সে একটুখানি ইতস্তত করল। চারদিকে তাকাল হতাশভাবে। দূরে বিশাল বটগাছের নিচে দেহাতি গাড়োয়ানেরা আগুন জেবলে বসে রয়েছে। আর কোথায় কোন লোক নেই। দিগন্তে মাঝে মাঝে দূরের গাড়ির হেড লাইটের সুতীব্র ঝলকানি। রাতের দিকেই দূরগামী ট্রাকগুলো হাইওয়েকে নির্ঘোষে ভরিয়ে তোলে। তার সময় হয়ে এল এবার। ঘর-বাড়ির ফাঁকে গাছপালা ঘিরে চাপ চাপ কুয়াশা জমে গেছে। সেই কুয়াশার ভিতব বাতি জবলছে ম্লান। কতকটা ঝোঁকের বশে সে এগোল। একটা কিছু করা দরকার—মনে হল তার। একটা অসহায় পরিবারের অরক্ষণীয়া মেয়ে রুমা—তার নামে অনেকটা সম্পত্তি আর ব্যাঙ্ক এ্যাকাউণ্ট রয়েছে, ওই পরিবারটার প্রকৃত দায়িত্ব তো রুমার কাছেই জিম্মা! অথচ রুমা অশোভনভাবে এইসব করে চলেছে—এইসব প্রেম-ভালবাসার খেলা! তাছাড়া, সবাই জানে—নুটুবাবুর বউর সাহচর্যেই পরেশের যত উন্নতির শুরু। সেই নুটুবাবুর বউয়ের হাতে পড়ে যাওয়া আজ রুমার পক্ষে মঙ্গলজনক নয়। খাঁটি গারজেনের মত—একদা যেমন জিয়াগঞ্জে বালিকা রুমাকে শাসন করত নির্দ্বিধায়—তেমনিভাবে শাসন করার তাগিদে চন্দন হেঁটে যাচ্ছিল।

নুটুবাবুর বাড়িটা সে একদিন দূর থেকে দেখেছিল মাত্র। পরেশই তাকে দেখিয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, ওই যে ওখানটায় আমার শ্বশুর—এবং শেষও বটে। 'শেষ' কথাটা পরেশের ভাগ্যে ফলে গেছে।

ডাইনে ঘুরে সরু এবড়োখেবড়ো পথ ধরে একটু এগোতেই গাছের জটলা, দুপাশে ভাঙা মোটর গাড়ি দাঁড় করানো আছে ওখানটায়। কিছু বড় বড় ড্রামও জড়ো করা রয়েছে। বাংলা প্যাটার্ণ বাড়িটার। বেশ নির্জন জায়গা। ওধারে দিগন্তবিস্তৃত মাঠ—সেখানে অন্ধকার। গাছের নিচে দাঁড়িয়ে সে আলো দেখতে পাচ্ছিল ঘরের। উঁচু বারান্দার ওপর দরজাটা বন্ধ—কিন্তু ঘুলঘুলি দিয়ে আলোর ছটা আসছে। পা বাড়াতেই আচমকা একটা কুকুর কোথায় গরগর করে উঠল। থমকে দাঁড়াল চন্দন। পরক্ষণে টর্চের আলো পড়ল তার গায়ে। ভারি গলায় কে বলল, কে ওখানে ?

আর লুকোচুরির মানে হয় না। চন্দন সাড়া দিল—আমি। তারপর বারান্দার দিকে সপ্রতিভ ভঙ্গিতে এগিয়ে গেলো।

বিলাস বারান্দা থেকে বলছিল, এদিকে একবার আসুন গো ! এক ভদ্রলোক এয়েছেন।

সুনন্দিতা বেবোল দরজা খুলে।·· বারান্দায় আলো নেভাল কে ? অত করে বলেছি—সারারাত আলো জেলে রাখবে, কানে যায় না কেন ?

বিলাস বলল, জ্বালাই তো ছিল। আমি শুতে গেলাম, তখনও ছিল। তাহলে ওনারা দুষ্টমি করে নিভিয়ে দিয়ে গেছেন। গত রাত্তিরেও তো তাই করেছিলেন।

সুনন্দিতা ওপাশে গিয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বালাল। তারপর চন্দনকে তীক্ষ্ন দৃষ্টে লক্ষ্য করে বলল, কোত্থেকে আসছেন ?

চন্দন একটু কেসে বলল, আমি—মানে রুমাদের কোম্পানীতে থাকি। আমার নাম চন্দন—

কথা কেড়ে সুনন্দিতা বলল, আরে, আসুন, আসুন ! কী ব্যাপার ? ভেতরে আসুন।

ইয়ে– রুমা এসেছিল এখানে ? ওর দিদি খুঁজছিল।

হ্যাঁ। এই তো এক্ষুনি চলে গেল। দেখা হয়নি পথে ?

না তো !

সুনন্দিতা একটু ভেবে বলল, তাহলে সম্ভবত ওরা স্কুলের দিকে হয়ে গেছে।

চন্দন হঠাৎ একটু রূঢ় স্বরে প্রশ্ন করে বসল, ওরা কে ?

সুনন্দিতা হেসে উঠল। বলল, অমিতও ছিল এখানে। অমিতকে চেনেন না ?

চিনি।

তাহলে অমিতের ওখান হয়ে বাড়ি ফিরেছে এতক্ষণ। বসবেন না ?

না, চলি।

বলে চন্দন ঘুরে পা বাড়াল। সুনন্দিতা বারান্দা থেকে বলল, অত ব্যস্ত হবার কোন কারণ নেই। রুমা খুব স্মার্ট মেয়ে। ওর সাহস আছে—ভাববেন না। হারিয়ে যাবার মেয়ে নয়।

কথাগুলো চন্দনের কানে বিঁধে যাচ্ছিল তীক্ষ্ণতায়। সে হন হন করে এগোল। বড় রাস্তায় উঠে খুব দ্রুত হেঁটে স্কুলের এলাকা লক্ষ্য করে সে চলতে থাকল। কিছু দূরে গিয়ে অল্প আলো আর কুয়াশায় অস্পষ্ট দুটো মানুষ দেখতে পেল সে। যেন হাত ধরাধরি করে চলছে।

আরও কাছে এগিয়ে যেতে পারত, রুমাকে পরেশের মতো ধমক দিতে পারত —কিন্তু কিছুই করা গেল না। ঠাণ্ডায় আড়ষ্ট চন্দন নিজের বাসার দিকে চলল। আজ ও-বাড়ি শুতে যাবে না সে।

চোদ্দ

সেদিন দুপুরে যে অমিতকে এত ভালো লেগেছিল, আজ রাতে তাকে মনে মনে একশো চাবুক মেরে নিজেরই ক্লান্তি এল। আর চন্দন দেখল, অমিত তার চাবুক খেয়েও অনর্গল হেসে যাচ্ছে। অদ্ভুত-অদ্ভুত সব দৃশ্য কল্পনা করল সে। রুমা বুকের তিলটা অমিতকে দেখাচ্ছে। কিম্বা রুমা-অমিতের জড়াজড়ি দেহ অন্ধকারের স্রোতে ভাসতে ভাসতে চলে আসছে। সিগারেটের পর সিগারেট খেয়ে সব ভুলতে এবং ঘুমোতে চাইল চন্দন। তবু—ঘুম এল না। বাইরে শীতের ঝিমধরা রাত মাঝে মাঝে কাঁপিয়ে দিল ভারি ট্রাকের ঘর-ঘর শব্দ। পাশের ঘরে হীরুবাবুর কাশি শোনা যাচ্ছিল। তারপর বেচুবাবুর ঘুমজড়ানো কণ্ঠস্বর —রাতে সিগ্রেট না খেলেই পারেন! চন্দনের ইচ্ছে হল বাকি রাতটুকু ওদের সঙ্গে গল্প করে কাটালে রেহাই পাওয়া যেত। ঝোঁকের বশে উঠে বসল সে। ঘরের ভিতরটায় ওম আছে। দরজা খুলতেই ওমটা নষ্ট হয়ে গেল। কুয়াশার মধ্যে চাঁদ বাঁজা-ডাঙার তালগাছগুলোর মাথা ছুঁয়েছে। রাধার হোটেলে এখনও আলো জ্বলছে। আবছা কথাবার্তার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কালো কালো ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটা। ফিকে জ্যোৎস্নায় হাইওয়ের শিশিরভেজা বুকটা দেখতে দেখতে হঠাৎ চন্দনের মনে হল পরেশ মজুমদারের জায়গাটা সে দখল করলেও করতে পারে। ঠাণ্ডা স্থির ওই রাস্তা তাকে অদ্ভুত আশাবাদী করে ফেলল ক্রমশ। কোম্পানীটা তো উঠেই যাচ্ছে। যাক্। সামনের সপ্তায় পেট্রোল পাম্প ছেড়ে বেচুবাবুদের চলে যাবার কথা। ওরা পরেশের ঝামেলার মধ্যে থাকতে কেউ রাজি নয়। সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে। এখন যে-যার দিকে পালাতে চায়। ওরা পালাক। চন্দন একা চালিয়ে যাবে।

আর তক্ষুনি মনে পড়ল, এখন এখানে যা-কিছু সবই তো রুমার সম্পত্তি! ফের রুমা আর অমিত তার মগজে উড়ে এসে ঢুকল। জ্বালা শুরু হল। নাঃ, তার কিছু সাজে না। তাকে সকালেই চলে যেতে হবে রূপপুর ছেড়ে। নিজের কোন অধিকারই সে আর খুঁজে পেল না। তার সব অধিকারের সনদ পরেশ মজুমদারের রক্তে কালো হয়ে ঢাকা পড়েছে আর অকেজো হয়ে গেছে।

রাগে তেঁতো হয়ে সে দরজা বন্ধ করে আলো জ্বালল। নিজের জিনিসপত্র গোছাতে শুরু করল। আর এক মুহূর্তও এখানে নয়। কেন থাকবে—কার জন্যে থাকবে? স্নেহধারাও এক অদ্ভুত মেয়ে। কই, আজ রাতে যে সে শুতে

বা খেতে গেল না, ডাকতে পাঠাল না তো তাকে ? রুমার ওপর স্নেহধারার যে সংশয় তা পরেশের মৃত্যুর পরই সম্ভবত উবে গেছে। হাজার হোক মায়ের পেটের বোন—পর তো নয়। হয়তো স্নেহধারা অমিতকেই রুমার বর হিসেবে মনে মনে ঠিক করে রেখেছে। আর সে-কারণেই রুমার বিয়ের ব্যাপারে চন্দন সম্পর্কে এত জেনেশুনেও সে চুপচাপ ছিল এতদিন! তাছাড়া সবচেয়ে ভাববার কথা—পরেশের মৃত্যুর পর স্নেহধারা রাতারাতি বদলে অন্য মানুষ হয়ে উঠেছে। তার স্থৈর্য সাহস আর অবিচল থাকার ক্ষমতা দেখে অবাক হয়েছে চন্দন। শক্ত হাতে হাল ধরতে স্নেহধারা যেন তৈরী। চন্দনের মনে পড়ল, গত দুদিন ধরে স্নেহধারা তার স্বামীর কারবার সম্পর্কে খুঁটিয়ে জেনে নিতে চাচ্ছিল। হক-সায়েবকেও ডেকে পাঠিয়েছিল।

অভিমানে মন আরও অস্থির হল চন্দনের। চন্দন চলে গেলেও আর পরোয়া নেই স্নেহধারার। কারণ হকসায়েব আছে। বেশ তো—আমি কে তোমাদের! পর ছাড়া আপন নই।...চন্দন মনে মনে কথাগুলো বলে তক্তাপোষের নিচে থেকে তার বাকসোটা টেনে সাবধানে বের করল। পিছনে আরেকটা বড় বাক্সো আছে। সেটায় পরেশের কী-সব জরুরী কাগজপত্র থাকে। হঠাৎ মনে পড়ল, পরেশ একদিন ঠাট্টার ছলে তাকে বলেছিল যদি কোনদিন পথে এ্যাক্সিডেণ্ট হয়ে মারা পড়ি ওটা খুলে দেখিস চাঁদু। কিন্তু খবরদার, কারো সামনে নয়।...

চন্দন বলেছিল, কী আছে ওতে ?

পরেশ মাথা দুলিয়ে রহস্যময় ভঙ্গীতে হেসেছিল। কোন জবাব দ্যায়নি।

পরেশের চাবির গোছা চন্দনের কাছে আছে। সে খুব সাবধানে বাকসোটা টেনে বের করল। তারপর খুলল। কয়েকটা ফাইল। একটা মোটা বাঁধানো খাতা। একগুচ্ছের আলগা কাগজপত্তর। তারপর একটা ভাঁজ করা পুরনো হলদে-হয়ে-ওঠা খবরের কাগজ। তার নিচে পরেশের একটা লংকোট। এটা নতুন বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু শীতেও তো কোনদিন গায়ে দিতে দেখেনি তাকে। কোটটা তুলতেই চন্দন চমকে উঠল। বুকে হাতুড়ি পড়তে থাকল। নিজের চোখ দুটো কয়েক মুহূর্তের জন্যে পর হয়ে গেল।

থাকে থাকে লাল-সাদা ডুরে সুতোয় বাঁধা নোটের বাণ্ডিল। কিছু দশ কিছু একশো টাকার নোট। এত টাকা, এত!

এত টাকা এখানে কেন ? ব্যাঙ্কে রাখেনি কেন পরেশ মজুমদার ? একটা ঝড় এসে গেল কোত্থেকে। এ-টাকার খবর আজ আর কেউ জানে না। এর মালিক হতে পারে চন্দন। কোন বাধা নেই। কোন হিসেব নেই। এর জন্যে কোন ট্যাক্স দিতে হবে না সরকারকে। কাঁপন্ত হাতে খুব তাড়াতাড়ি গুণে নিল চন্দন। সব শুদ্ধ আঠারোটা বাণ্ডিল—তার মানে যোগফল দাঁড়াবে প্রায় লাখ টাকার কাছাকাছি। খুঁটিয়ে হিসেব করতে ভয় পেল সে। জীবনে এত টাকা একসঙ্গে সে দ্যাখেনি। কোথায় পেত এতটাকা পরেশ মজুমদার ?

শরীর অসম্ভব ভারি হয়ে পড়ল তার। ভারি হাতে বাকসোয় সব আগের মতো রেখে সে মেঝেয় বসে সিগ্রেট টানতে থাকল। তাকে কেন্দ্র করে সেই ঝড়টা ঘুরপাক খাচ্ছে। মূলশুদ্ধ উপড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করছে মুহুর্মুহু। কিন্তু খুব শান্তভাবে সে একটু একটু দুলতে থাকল শুধু।...

সকালে—সবে সূর্য উঠেছে, দরজায় ভালো করে তালা এঁটে চন্দন রাধার হোটেলে গেল। রোদে তখনও তাপ ফোটেনি। রাধা শশব্যস্তে বলল, কী ভাগ্যি! আসুন, আসুন চন্দনবাবু।

একটা চেয়ার বাইরে রোদে বের করে দিল সে। কনকনে হাওয়া দিচ্ছে। সামনে ফাঁকা হাইওয়ে। শিরিসগাছের তলায় আগুন জেবলে একদল লোক বসে আছে। চন্দন একবার সামান্য দূরে রাস্তার ওপারে নিজের ঘরটা দেখে নিয়ে বসল। বলল, কাল সারারাত আলো জ্বলছিল হোটেলে ব্যাপার কী রাধাদি?

রাধা বাঁকা ঠোঁটে জবাব দিল, আর বলবেন না ছোটবাবু। সময় নেই, অসময় নেই, এসে সব জ্বালাতন। ক্ষিদে পেয়েছে, ভাত খাব। সবে তন্দ্রামত এয়েছি, এক ডানপিটে এসে হুলস্থুল বাধাল কাল রাত্তিরে। আমার মরণ আছে? মা-গঙ্গার ধারে গিয়েও আবার সরে এসে জুড়ে বসল কোথায়—সেটা দেখুন ছোটবাবু।

রাধা হাসতে লাগল। চন্দন বলল, কে এসেছিল? শংকর নাকি?

শংকর শব্দটা শুনে রাধার মুহূর্তকাল চমক খেলল যেন! সে বলল, ওকে চেনেন নাকি ছোটবাবু?

খুব চিনি।...চন্দন একটু হেসে বলল।. তাছাড়া রাতদুপুরে তোমাকে জ্বালানোর সাহস আর কোন ড্রাইভারের থাকবে!

রাধা হেসে গড়িয়ে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে।...রাত্তিরে আলুভাতে রান্না করে গরম গরম খাওয়ালুম মিন্সেকে। খেয়েদেয়ে তখন বলছে কী জানেন? সেই যে কথায় বলে খেতে পেলে শুতে চায়!

চন্দন বলল, শুতে চাইল বুঝি?

রাধা সকৌতুকে আঙুল তুলে ভিতরটা দেখিয়ে দিল নিঃশব্দে। দুটো টেবিল এক জায়গা করে তার ওপর আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে কে ঘুমোচ্ছে। চন্দন লক্ষ্য করল ওর পাশের জায়গাটায় সম্ভবত কেউ শুয়েছিল—এখনও ফাঁকা পড়ে আছে। মনে হল, ওই ফাঁকাটায় যেন রাধার শরীরের একটা ছাপ এখনও টাটকা লেগে রয়েছে। হৃদয় অন্তত বাজে কথা বলার পাত্র নয় বলে মনে হচ্ছে। চন্দন মুখ ফিরিয়ে হাসল। অন্য সময় হলে রাধাকে সে বেশ কিছুটা ঘৃণা করত। তার হাতে কিছু খাবার কথা ভাবতেও পারত না। বিশেষ করে এখনও রাধার দেহটা হয়তো অশুচি হয়ে আছে। অথচ চন্দনের মনটা হঠাৎ সকালে এত ওপরে ভেসে আছে যে কোন শুচিতা অশুচিতা ভালোমন্দ ব্যাপার তার নাগাল পাচ্ছে না। নিজের মধ্যে একটা নতুন শক্তির কঠিন স্পর্শ প্রতিমুহূর্ত সে অনুভব করছে।

রাধা বলল, বসুন। চা করতে বলি। আমার খাওয়া হয়নি। অ সন্ধে, মা সন্ধ্যামণি!

সে ডাকতে ডাকতে ভিতরে চলে গেল। একটু পরে ফিরে এসে বলল, তা ছোটবাবু, তারপর তো আর ইদিকমুখো হলেন না। একটা শুভ খবর শুনছিলুম তার কী হল?

চন্দন বলল, কিসের?

রাধা প্রশ্নটা আমল না দিয়ে বলল, ওরে ব্বাস! একদিন কী কাণ্ড হয়েছে জানেন না? দিদিমণি যাচ্ছিলেন সামনে দিয়ে—যেই ডেকে বলেছি...

বাধা দিয়ে চন্দন বলল, শুনেছি।

রাধা আবার চেঁচাল, সন্ধ্যা রে! তারপর চন্দনের কাছে এসে চাপা গলায় বলল, বড়বাবু থাকলে কথা ছিল না। কিন্তু আমি বলি কী ছোটবাবু, কাজটা শিগগির চুকিয়ে ফেলুন। এখন বলতে গেলে ওনাদের মাথার ওপর আপনি ছাড়া তো কেউ নেই। দেরী না করাই ভালো। কথায় বলে, বিষবিরিক্ষি চিনলেই গোড়া শুদ্ধ উপরে দিতে হয়। বেশি বাড়তে দেবেন না।

চন্দন তাকাল। হঠাৎ তার ইচ্ছে করল এই ধুমসি মেয়েটাকে—হৃদয়কে যেমন মেরে বসেছিল, তেমনি এক চড় কষে মারে। সিগ্রেট বের করে ঠোঁটে রাখল সে। ধরাতে ভাল লাগল না। সারারাত সিগ্রেট খেয়ে গলা জ্বালা করছে।

রাধা একটা কিছু আঁচ করে সংগে সংগে প্রসংগ বদলাল।...তা খাওয়াদাওয়া হচ্ছে কোথা ছোটবাবু? আমার বাবা যে সেদিন বলে গেলেন তার কী হল? হৃদেকে তো ছেড়ে দিয়েছেন!

'আমার বাবা' মানে হকসায়েব। চন্দন বলল, সেজন্যেই এলুম রাধাদি। আজ থেকে এখানেই খাবো। কিছু অ্যাডভ্যান্স দিয়ে যাচ্ছি।

সে পকেটে হাত ভরতে রাধা জিভ কেটে হন্তদন্ত করজোড়ে বলল, ছি-ছি! ও কী কথা! আপনার মতো মানুষকে সেবা করব, ধন্য হব—আগাম আপনি রাখুন ছোটবাবু। আপনার যা ইচ্ছে মাসকাবারে দেবেন। সন্ধ্যা, চা হল?

একটি কিশোরী ঝকমকে চমৎকার সুদৃশ্য নকসাকাটা ট্রেতে এক কাপ চা আর বিস্কুট এনে সামনে ধরল। বোঝা গেল রাধা হোটেলওয়ালি ছোটবাবুর সম্মানে এ-ব্যবস্থা করেছে। কিন্তু একি নিছক একজন মাসকাবারি ভদ্রলোক খদ্দের ধরার ফাঁদ মাত্র?

মেয়েটি ফিরে গিয়ে গেলাসে রাধার জন্যে চা এনে দিল। চন্দনের সামনে মাটিতে বসে রাধা চা খেতে থাকল। একটু পরে সে বলল, ছোটবাবু?

উঁ?

পরেশবাবুর শুনেছি বিস্তর কাঁচাপয়সা এর-ওর কাছে রাখা ছিল। খোঁজ-খবর পেলেন তো সেগুলোর?

চন্দন চমকে উঠেছিল। বাইরের কনকনে হাওয়াটা তার ভিতরে ঢুকে সারা দেহ নিঃসাড় করে ফেলল কয়েক মুহূর্ত। সে অস্ফুট কণ্ঠে বলল, কে বলল?

রাধা রহস্যময় ভঙ্গীতে মাথা দোলাল।...আমার বাবা বলছিলেন।

হকসায়েব?

আবার কে? উনি পরেশবাবুর জোটের একজন কিনা। তাছাড়া বড়বাবু ওনাকেই বিশ্বাস করতেন—আর কাকেও তো নয়। শুনলুম অনেক কাঁচা টাকা বেচুবাবুকে উনি রাখতে দিয়ে কলকাতা গেলেন—তারপর তো এ্যাক্সিডেন্ট হল। বেচুবাবুকে শুধোবেন তো কথাটা।

চন্দন কঠিন স্বরে বলল, হকসায়েব শুধোননি কেন?

রাধা একটু হাসল।...বাস্ রে। ওনার সে সাহস আছে? তাছাড়া উনি শুধোবার কে? কেন—আপনাকে বাবা কিছু বলেন নি?

না তো!

রাধা একটু ভেবে বলল, তাহলে বলবেন। কাল দুপুরবেলা কথায় কথায় হঠাৎ বলছিলেন বাবা। আমি ছাড়া তো মনের কথা কারো সংগে ভাঙেন না। ভাঙবেন কার কাছে বলুন? রূপপুর বড় সাংঘাতিক জায়গা।

হঠাৎ ইচ্ছে হল, এক্ষুনি হকসায়েবের গাঁয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে ব্যাপারটা জেনে নেয়। কিন্তু শরীর আর মন কেমন অবশ হয়ে পড়ছিল চন্দনের। পরেশ মজুমদার তাব টাকা সামলাতে পারছিল না। আশ্চর্য লাগে। ঢাকা সে বাড়িতে স্নেহধারার কাছে রাখলেও তো পারত। বেচুবাবু আর কোনমতে পাত্তা দেবে না—সেটা বোঝা সহজ। কিন্তু জেনেশুনে অমন বোকামি কেন করল পরেশদা? চন্দনেব কাছে রাখলেও পারত—রাখেনি। এমন কি ওই বাকসোটার মধ্যে অত টাকা রেখেছে, তাও পরিষ্কার বলেনি চন্দনকে! না—অবশ্য এটা চন্দনের প্রতি অবিশ্বাস মোটেও নয়, সেটা অভাবনীয়। আসলে চন্দনকে সে আনাড়ি বা ছেলেমানুষ ভেবেছিল। কিন্তু ভাবতে খারাপ লাগে, হকসায়েব তো চন্দনকে কিছু বলেন নি!

রোদ সামান্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। হোটেলের ভিতর রাধার লোকেরা ব্যস্ত হচ্ছে তার মৃদু সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল। শংকর ড্রাইভার তখনও কাঠ হয়ে ঘুমোচ্ছে। কাপ রেখে চন্দন উঠে দাঁড়াল। স্নেহধারার ওখানে যেতে হবে...

হাঁটতে হাঁটতে এগোল সে। স্নেহধারার সঙ্গে কী নিয়ে কথা বলবে, স্পষ্ট ভেবে নেওয়া তার দরকাব ছিল। অথচ কিছু মাথায় আসে না। আড়ষ্ট প্রতিটি পা ফেলার সঙ্গে সে শুধু অনুভব কবছিল, সে বদলে গেছে অনেকখানি।

বাঁক নেবার সময় দূর থেকে কে তাকে ডাকছিল। থমকে দাঁড়াল চন্দন। ব্রজ ড্রাইভার একটা লম্বা কোট পরে এদিকে এগিয়ে আসছে।

ব্রজ এসে বলল, কদিন ছিলুম না স্যার। আপনাদের বড় বিপদ গেল এখানে—ওখানে আমারও গেল একটা। রাজকমলদা মারা গেছেন। সে নিয়ে খুব ভোগান্তি হল। বহরমপুর হাসপাতালে নিয়ে এসেছিলুম। সেখানেই চোখ বুজলেন। এ একরকম ভালই হল। খুব কষ্ট পাচ্ছিলেন তো!

ব্রজ সিগ্রেট বের করে ফের বলল, নিন স্যার। যা ঠাণ্ডা পড়েছে ভাবা যায় না' এদিকে গাড়িটার অবস্থাও বাবুর মতন প্রায়—হাসপাতালে দিয়েছি কাল। যে কদিন ছিলুম না, ট্রিপ তো কামাই হলে চলে না। ব্যাটা নেতাকে জিম্মা দিয়ে কনকপাড়া গিয়েছিলুম। এসে দেখি, এই অবস্থা করে দিয়েছে। যাক্ গে—পরেশবাবুর হালহদিস সব শুনলুম। ও আমি জানতুম স্যার, নির্ঘাৎ জানতুম। কবে দেখবেন এই ব্রজগোপাল দাসও মাথা ভেঙে পড়ে আছে নয়ানজুলিতে। আমাদের হাতে কালের চাকা স্যার, এ হতেই হবে। বেদের মরণ যে সাপের হাতেই হয়!

সিগ্রেটটা নিয়ে চন্দন বলল, তাই কদিন দেখিনি আপনাকে।

ব্রজ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, এক মস্তো ঝামেলা কাঁধে পড়ল চন্দনবাবু। ওদিকে বউদি আর তার মেয়েকে নিয়ে কী করা যায় ভাবছি। কনকপাড়ায় থাকতে চাইছে না। বলছে, রূপপুরে ঘরটর দেখে দাও ব্রজ। এখানে নির্বান্ধব জায়গায় টিঁকতে পারব না। সে না হয় নিয়ে এলুম এখানে। কিন্তু রাজকমলদা দেনায় চুর হয়েছিলেন যে ওদিকে! ইলেকসান করতে গিয়ে ঝোঁকের মাথায় একগুচ্ছের দেনা করেছিলেন। তারা এখন ঝেঁকে ধরেছে বউদিকে। মাঠে যা জমিজমা ছিল, এমনকি বাড়িটা পর্যন্ত বন্ধকী কবলা হয়ে আছে। সে সব আর উদ্ধার করা অসম্ভব। নীট সম্পত্তির মধ্যে এখন শুধু এই গাড়িটা। বউদি

বলছে, ওটা বেচে দাও—আর চালানো যাবে না। মাসে গড়ে আড়াই থেকে তিনশো টাকা লেগে যাচ্ছে মেরামতি খরচায়। বুঝুন ব্যাপার। আমি গেলুম স্যার।

বলতে বলতে হঠাৎ ব্রজ কণ্ঠস্বর চাপা করল! মুখে কৌতুক ঝিলিক দিল। বলল, একেই বলে কপাল। পরেশ মজুমদার আর ব্রজ। ওনার ভাগ্যে জুটে-ছিলেন নুটুবাবু—আমার রাজকমলবাবু। নুটুবাবুর বউ মজুমদারমশাইকে লাল করে দিয়েছিল। আর আমার বেলা? শালা একেবারে উল্টো! খিক খিক করে হেসে উঠল সে।

চন্দন বলল, পরে দেখা হবে। চলি এখন।

ব্রজ বলল, মজুমদারবাড়ি যাচ্ছেন? আসুন। আজ সারাদিন আমার ছুটি দুপুরে আপনার আপিসে যাবখ'ন।

সে চলে গেল। চন্দন স্নেহধারার বাড়ির দিকে চলতে থাকল। আবার তার মনে ঝড়টা এসে পড়ল। রুমা—রুমা তার সামনে একটা অশ্লীলতম দৃশ্যের মতো ভেসে আসছিল—আর তত সে ক্ষেপে উঠেছিল মুহুর্মুহু।

কিন্তু দরজা খুলে দিল সেই রুমাই।

খুলে দিয়ে একপাশে দাঁড়াল। তার দিকে চন্দন তাকায়নি। সে হনহন করে উঠোনে এগিয়ে ডাকল, বউদি'

স্নেহধারা রান্নাঘর থেকে শান্তভাবে বেরিয়ে এসে বলল, রাতে এলে না। সারা রাত কান করে ছিলুম। ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?

চন্দন গম্ভীর মুখে বলল, হ্যাঁ।

স্নেহধারা বারান্দার তক্তপোষে রোদে বসে বলল, কাল রাতে হকসায়েব এসে-ছিলেন। তোমার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ বসে থাকলেন। অনেক জরুরী কথা ছিল। বললেন, যাবার পথে তোমার ওখানে খোঁজ করবেন।

চন্দন বলল, কই, যায়নি তো!

রুমা বারান্দার থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বলল, গেলেও তোমার দেখা পেতেন না।

চন্দন ঘুরল না ওর দিকে। আস্তে বলল, কেন পেতেন না? ছিলুম।

রুমা বলল, ছিলে না। অত রাত্রেতে কোথায় বেরিয়েছিলে?

চন্দন বাঁকা ঠোঁটে বলল, তুমি গিয়েছিলে নাকি?

রুমা অনায়াসে জবাব দিল, হ্যাঁ। ওখান দিয়ে আসছিলুম। দেখলুম তোমার ঘরের দরজা বন্ধ। তারপর দেখলুম, তোমার মত কে একজন অনেকটা দূরে আসছে। আমরা—আমি আর দাঁড়াইনি। যা ঠাণ্ডা পড়েছিল রাত্রিবেলা।

স্নেহধারা বলল, হ্যাঁ, ঠাণ্ডা পুইয়ে এবার জ্বর ধরিয়ে বসে থাকো। কলেজ কামাই হোক—সামনে একজামিন।

রুমা বলল, সে এখনও দেরী আছে অনেক। তবে জ্বর এসে যাচ্ছে নির্ঘাৎ। সকাল থেকে রোদ বড্ড মিষ্টি লাগছে যে! সতু, থার্মোমিটারটা নিয়ে আয় তো, ক' ডিগ্রি হল দেখি।

স্নেহধারা কড়া মুখে বলল, জ্বরফর হলে তো বাঁচি। ঘরবন্দী হয়ে পড়ে থাকিস। দিন-রাত্রি অতবড় মেয়ে টোটো করে ঘুরে বেড়ানো—এতটুকু ভয়ডর নেই। মাথায় তুলে দিয়ে কেটে পড়েছে—আমি কী করব?

রুমা নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল! চন্দন বলল, আমার কিছু কথা আছে বউদি। সেজন্যে সক্কালবেলা চলে এলুম।

স্নেহধারা চাপা গলায় এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, কথা আমারও আছে। বলি বলি করে বলা হয়নি। তাছাড়া, আরও অনেক কারণ ছিল। চলো, আমার ঘরে গিয়ে বসি। গ্যাদা, ও গ্যাঁদা! চায়ের জল চাপা।

স্নেহধারার পরনে বিধবার শাদা পোষাক চোখ সওয়া হয়ে গেছে এতদিনে। এমনি করে আরও অনেকদিনের মতো তাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে কথা বলার ডাকে আজ তবু একটা পার্থক্য টের পাচ্ছিল চন্দন। সেইসব দিনে স্নেহধারা ছিল সধবা, অথচ তার ডাকে থাকত একটা যেন গভীর অসহায়তা। আজ আছে প্রশান্ত শক্তি আর সাহস। এগুলো পেলো কোথায় স্নেহধারা? কোথায় পায় মেয়েরা?

বিছানার নরম গদীতে পা তুলে বসল চন্দন। স্নেহধারা কি এখনও এই বিছানায় শোয়? কৃচ্ছ্রসাধন করে না? পরে জেনে নেবে'খন। কিছু খুঁটিনাটি অদ্ভুত কৌতূহল মাথায় এসে গেল চন্দনের।

স্নেহধারা চাপা গলায় বলল, হকসায়েব তোমাকে কিছু বলবেন—আমি ওসব তোমাদের কোম্পানীর কথা কিছু বুঝিনে। ও ঝামেলা চুকিয়ে দেওয়া ভালো। আমার কথা হল—তোমার আর রুমার সম্পর্কে।

চন্দন মুখ তুলল। স্নেহধারা মিটিমিটি হাসছিল। চন্দন বলল, ও কথা থাক।

স্নেহধারা বলল, ভাই চাঁদু—আমাকে বিশ্বাস করো, সব জেনেও আমি এ্যাদ্দিন তোমাকে এ নিয়ে কিছু বলিনি—কেন বলিনি জানো? কিছু মনে করো না ভাই—তোমার বাবা-মাকে তো আমি চিনি। এদিকে তুমি যা ছেলে, বাবা-মার অমতে কিছু করতে পারবে না- আমার ধারণা হত। তোমার দাদা যখন কথাটা বলেছিলেন, আমি উড়িয়ে দিয়েছিলুম। যাঃ সে কি হয়? তারপর টনিত আর গা করলেন না—আমিও মাথায় আনলুম না। রুমার বিয়ে একদিন দিতেই হবে। তবে এখনও তো ওর পড়া শেষ হয়নি। তাছাড়া এম. এ. পড়ার ওর খুব ইচ্ছে। এসব ভেবে ঠিক করেছিলুম চন্দন তো আছেই—সময় আসুক, তারপর সব হবে। কিন্তু হঠাৎ এই অপঘাত ঘটে গেল। কদিন থেকে মনে মনে কেবলই ভেবেছি লোকটার যা ইচ্ছে ছিল—তা হবে নাই বা কেন? সে আর যাই করুক, তার বউ ছেলেমেয়েদের পথে তো ভাসিয়ে যায়নি। সারাজীবন হেসে খেলে বাঁচবার মতো রেখে তো গেছে।

চন্দন তাকাল।

স্নেহধারা কণ্ঠস্বর আরও চাপা করে বলল, তোমাকে আমি লুকোবো না। রুমার ওপর আমার খুব ভয়ও ছিল। তোমার দাদা বেঁচে থাকলে হয়তো ভয়টাও বাঁচত। আজ আর আমার ভয় নেই ওর জন্যে। তোমার দাদা অনেকগুলো টাকা রুমার কাছে রেখেছিল। রুমা কাল রাত্রে সেগুলো দিয়েছে আমাকে। সে অনেক টাকা, ভাই—অনেক! এখন কথা হচ্ছে—অত টাকা কাছে রাখতেও ভয় করে। তুমি বলো, ওগুলো কিভাবে রাখব। ব্যাঙ্কে রাখব ভেবেছিলুম, রুমা নিষেধ করল। ওর নামে তো অনেক সব গোলমাল আছে। সরকার বাজেয়াপ্ত করে ফেলতে পারে নাকি।

টাকা! একটা আশ্চর্য জিনিস। চন্দন ভাবল। টাকা সব উল্টোপাল্টা করে ফেলে। মানুষকে বদলে দিতে পারে মূলশুদ্ধ। এই পরেশ মজুমদারের বউকে—এই চন্দনকে অনেকটা বদলে দিয়েছে। পরেশ এত সব টাকা না রেখে গেলে ব্যাপারগুলো অন্যরকম হয়ে যেত। চন্দন একটু কেসে বলল, টাকা এখন থাক। আর কাকেও বলোনি তো?

স্নেহধারা মাথা দোলাল। বলল, পাগল হয়েছ তুমি? একে ভয়ে কাঁপছি।

ভয়ের কী?·· চন্দন বলল। থাক না। দরকার মতো খরচা করো। আচ্ছা বউদি, পরেশদার নিজের ট্রাকটা শিগগির গ্যারেজ থেকে এসে যাচ্ছে। আমি বলছিলুম কোম্পানী উঠে যাচ্ছে, যাক। ওই গাড়িটা নিয়ে অর্ডার সাপ্লাই কারবার চালিয়ে গেলে কেমন হয়? পেট্রোল পাম্পটা তো রইলই। আমি দেখা-শুনো যেমন করছি, করব।

স্নেহধারা বলল, তোমার যা খুশি করো—আমার কোন আপত্তি নেই।

চন্দন বলল, কিন্তু তোমাদের পক্ষ থেকে একজন থাকা দরকার। শুধু হীরু বাঘ দিয়ে কাজ হবে না।

স্নেহধারা হেসে উঠল।···কে থাকবে? লতুরা বড় হোক। আমি তো কিছুই বুঝিনে।

কেন? রুমা রুমা পাম্পে গিয়ে বসুক সকালসন্ধে—তাহলেই হবে।

স্নেহধারা বড় বড় চোখে বলল, রুমা? পারবে?

কেন পারবে না? পড়াশুনা যা করার—ওখানে বসেই করবে। রুমা, ও রুমা!

রুমা এল পাশের ঘর থেকে। তার পিছনে গাঁদা—ট্রেতে চা আর তেলে-ভাজা। ট্রেটা স্নেহধারা সযত্নে হাঁটুর ওপর নিয়ে বলল, রুমা—তুই পাম্পে গিয়ে দুবেলা থাকবি আজ থেকে। বারোভূতে সব লুটে নিচ্ছে—চাঁদু একা কোনদিক দেখবে।

রুমা মুখ ঘুরিয়ে বলল, পাগল! বরং তোমরা আমার বদলে একজন রাখো কাকেও। আমিও তো তাই ভেবেছি—আরো একজন লোক দরকার। যাকে বিশ্বাস করা যাবে।

স্নেহধারা বলল, কোথায় পাবি তেমন লোক?

রুমা ভেংচি কেটে বলল, কোথায় পাবি? কত শিক্ষিত ছেলে ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াচ্ছে। আমি দেব একজন। ভীষণ বিশ্বাসী—কোয়ালিফায়েড। কাজ তার দরকারও।

স্নেহধারা প্রশ্ন করল, কাকে দিবি শুনি? কে সে?

রুমা বলল, অমিতকে চেনো না? পরক্ষণে সে চলে গেল।

স্নেহধারা থমথমে মুখে চন্দনের দিকে তাকাল। চন্দনের মুখটা লাল। সে নিঃশব্দে চা খাচ্ছে।

একটু পরে স্নেহধারা খুব আস্তে বলল, অমিতকে তুমি চেনো না চাঁদু? এখানকার হেডমাস্টারমশায়ের ছেলে। গান টান গায়।

চন্দন হাসবার চেষ্টা করে বলল, চিনি। পরিচয় হয়েছে একদিন। তা রুমা মন্দ বলেনি। ভালই হবে।

স্নেহধারার মুখে একটা কঠিনতা ফুটে উঠেছিল আস্তে আস্তে। সে তীক্ষ্ণদৃষ্টে বাইরের দিকে তাকিয়ে বলল, না।

কেন না? চন্দন হালকা স্বরে—যেন ওকে তাতিয়ে দিতেই প্রশ্নটা করল।

স্নেহধারা বলল, এ কথার জবাব আমি দিতে পারতুম—দেব না। এ্যাদ্দিন এখানে থেকেও তোমার জানা উচিত ছিল—এত আত্মভোলা ছেলে তুমি তো নও চাঁদু।

জানি। বলে চন্দন মুখ নিচু করল। কাপটা রেখে দিল।

স্নেহধারার মুখ থেকে সেই কঠিনতাটা যায়নি। সে গলা নামিয়ে বলল, তোমার দাদা যদি রুমার ওপর বরাবর কঠিন হত, কিছুতেই এসব ঘটত না। লাই দিয়ে দিয়ে মাথায় তুলে গেছে—এখন নামাতে হিমসিম খেতে হবে। কিন্তু আমি নামাবই। যা হয় না—হতে পারে না, সম্ভব নয়—

কেন নয়, শুনি। চন্দন বাধা দিয়ে একটু হাসল।

স্নেহধারা সোজা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিল, তোমাকে পর করতে আমি পারব না।

চন্দন আরও হাসতে গিয়ে দেখল, সে নিজের অজানতে রেগে লাল হয়ে আছে। অস্ফুটকণ্ঠে সে বলল, যা ছিলুম বা যা আছি, তার বেশি আর আপন করে লাভ কী বউদি?

স্নেহধারা কী বলতে যাচ্ছিল, লতু এসে চাপা গলায় বলল, মা, মাসি কাঁদছে ওঘরে। দেখবে এস।

তুই দ্যাখগে যা। স্নেহধারা খেঁকিয়ে উঠল।...আদিখ্যেতা দেখে বাঁচিনে। সেই এতটুকু থেকে জ্বালাতে শুরু করেছে আজও কি রেহাই দেবে ভাবছ? কেন হঠাৎ কান্নার হল কী শুনি?

চন্দন উঠে দাঁড়াল। তারপর স্নেহধারার দিকে না তাকিয়েই বেরোল। পাশের ঘরে ঢুকে সে দেখল, রুমা উপুড় হয়ে বালিশের কোণ আঁকড়ে ধরে নিঃশব্দে কাঁদছে। হঠাৎ তার কান্নাকাটির কারণ কী, খুঁজে পাচ্ছিল না চন্দন। রুমা কি আড়ালে দাঁড়িয়ে কথা শুনছিল এতক্ষণ? সে ভেবেছিল, হাসিতে মুড়ে কিছু সান্ত্বনা আর প্রতিশ্রুতি দেবে রুমাকে—আশ্বস্ত করবে। কিন্তু সেই চাপা রাগটা তার মধ্যে দুলে উঠল। ফুলে উঠল আস্তে আস্তে। চন্দন একটু দাঁড়িয়ে থেকে চলে এল। বারান্দায় এসে দেখল স্নেহধারা তখনও সেখানে চুপ-চাপ কঠিন মুখে বসে আছে।

চন্দন বলল, বউদি, আমি যাই। স্নেহধারা কোন জবাব দিল না। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে চন্দন বেরিয়ে এল। পথে নেমে সেই টাকাভরা কালো বাক্সোটার কথা মনে পড়তেই এখানে যা ঘটেছে, মুহূর্তে ভুলে গিয়ে সে খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে থাকল।

পনেরো

শীত ফুরোতে-না-ফুরোতে পাণ্ডেজীর গদীর পিছনে বিশাল শিমুল গাছটা লালে লাল হয়ে উঠেছে। পিছনের মাঠে জায়গায় জায়গায় কয়েক পোঁচ সবুজ

চৈতালি চোখে পড়েছে। ওটা জ্ঞানবাবুদের ফার্ম। সারাদিন পামপিং মেসিনের ধকধক আওয়াজ শোনা যায়। হাইওয়ের গাছে গাছে হলুদ ঝরন্ত পাতার গা ঘেঁষে কচি সবুজ পাতা মুখিয়ে উঠেছে। পীরের দীঘির পাশে সারকাসের মরশুমী তাঁবু পড়েছে। রূপপুরে এখন ভিড় বাড়ার দিন। পীরের থানে মেলা বসেছে। প্রায় সারাটি রাত হাইওয়ে মানুষের পায়ের শব্দে চঞ্চল হয়ে থাকে। বাস-ট্রাকের হর্ন বাজে ঘনঘন। মাথার ওপর জলহাঁসের পাখনার শব্দ হয়। এইসব নতুন চঞ্চলতা রূপপুর চটিকে ভালো লাগানোর পক্ষে যথেষ্ট। গ্রাম-নগরী এখন কিছুদিন ঝুমুর মেয়ের মতো নাগরী হয়ে ওঠে।

সেই সময় একদিন ব্রজ কাঁচুমাচু মুখে চন্দনের কাছে এল।...কেমন আছেন স্যার? অনেকদিন থেকে ভাবছিলুম যাই-যাই, আসা হয় না। আর আজকাল যা ব্যস্ত লোক আপনি, দেখা পাব—এ আশাও থাকে না!

চন্দন ব্রজকে খুঁটিয়ে দেখছিল। কী ঘটেছে ব্রজর? কেমন সিঁটিয়ে যাওয়া চেহারা। অযত্নের ছাপ সারা শরীরে। প্যান্ট-শার্ট অসম্ভব ঢিলে দেখাচ্ছে। সবচেয়ে মজার কথা চুলগুলো চুড়োবাঁধা নেই—সন্ন্যেসীদের মতো পিঠের দিকে ঝুলছে।

ব্রজ বসে ফের বলল, একটা সিগ্রেট দিন।

চন্দন সিগ্রেট দিয়ে বলল, কী খবর বলুন? আর তো আপনার গাড়িটা দেখি না।

রুটপারমিট ক্যানসেল হয়ে গেছে।.. ব্রজ বলল।...গাড়িটা সারানো গেল না। অনেক টাকার দরকার। এখন বউদি বলছেন বেচে দিতে। কে কিনবে বলুন? লোহালক্কড়ের দামে ঝেড়ে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই। শিশিরবাবুদের কাছে গিয়েছিলুম। ওনাদের আবার ভীষণ গরজ। সেকেলে মডেলের স্টেশন-ওয়াগন—ও হাতীর খরচা জোগাতে রাজী নন। বললেন—ব্রজ, বরং তুমি আমাদের গাড়ি চালাতে চাইলে বলো। ভালো মাইনে দেব।

চন্দন বলল, সে মন্দ প্রস্তাব নয়। রাজী হলেন না কেন? ওঁরা তো ভালই দেনটেন শুনেছি।

ম্লান হাসল ব্রজ।...ভালোমন্দ যাই হোক, গাড়িটা আমার অনেক বছরের সঙ্গী চন্দনবাবু। ওকে মরতে দিতে মন চায় না। সে আমি বোঝাতে পারব না স্যার। টাটকা তেজী গাড়ি অনেক হয়তো পাব। গাঁক গাঁক করে এক দমে হাজার মাইল দৌড়ে যাবে। কিন্তু সে অন্য জিনিস! মাঝপথে ফাঁকা মাঠে যদি না বিগড়ে গেল, গাছতলায় দাঁড়িয়ে ওকে দেখতে দেখতে সিগ্রেট খেতে না পেলুম, তো কিসের সুখ স্যার? সে আমি বোঝাতে পারব না। বরং ছেড়ে দেব ড্রাইভারি। হাসি বলছিল, পথে পথে ঘোরার চেয়ে বিনি রিস্কে একটা দোকান খুলে বসো স্টেশনারি। মজুমদার মশায় তল্লাটে যা ভয় ঢুকিয়ে দিয়ে গেছেন না। সবাই এখনও তাই নিয়ে ভেবে সারা।

চেষ্টা করে জোরে হাসতে লাগল ব্রজ। বলল, তা হাসিই আবার বলল আপনার কথা।

চন্দন তাকাল। আমার কথা মানে?

ব্রজ একটু গম্ভীর হল।...ও কোত্থেকে শুনেছে আপনি নাকি নিজে স্বাধীনভাবে কাজকারবার করবেন। তাই আমিও ভাবলুম, গাড়িটার ব্যাপারে

একটা রিস্ক আপনি যদি নিতে পারেন--চেষ্টা করা যাক্। অনেক দিনের আলাপ আপনার সঙ্গে। আচ্ছা স্যার, আপনাদের কোম্পানীটা তো উঠে গেছে -তাই না ?

চন্দন একটু চুপ করে থেকে বলল, হ্যাঁ। এখন তো শুধু এই পাম্পটা নিয়ে আছি। আমার বিরক্তি ধরে গেছে। ভালো লাগছে না। তাছাড়া—...হাসল সে।...মেয়েরা মালিক হলে যা হয়। তবে যে তলে তলে ভীষণ ঠকাচ্ছি !

ব্রজ মাথা নেড়ে বল, না-না। সবাই তা নয়। রাজকমলদার স্ত্রীর অবশ্যি মতিগতি আমি ভালো টের পাই নি। সময় বা পেলুম কোথায় ? তবে মজুমদারমশায়ের স্ত্রী শুনেছি ভীষণ ভালো মানুষ। কেন ? সে রকম কিছু টের পাচ্ছেন নাকি ?

চন্দন দুম করে বলে দিল।...পাচ্ছি বইকি। এমনি-এমনি বলছি নাকি ? আপনাকে সব কথা বলতে আমার আপত্তি নেই ব্রজবাবু। পাম্পটার কাগজে-কলমে মালিক পরেশদার শালী। কিন্তু...

ব্রজ বলল, আরে, কী মুসকিল ! ভুলেই গেছলুম কথাটা। আপনাদের সেই শুভ কাজের কন্দুর কী হল ?

চন্দন শুকনো হাসল।...নাঃ ! এখন বিয়ে-টিয়ে আমার পোষাবে না। দিদি-বোনটোন সব আছে, ভাইটাই আছে—অনেকে ঝামেলা কাঁধে আছে ব্রজবাবু। ওটা আমি নাকচ করে দিয়েছি।

ব্রজ মাথা দোলাল।...উঁহু। কাজটা ঠিক হয় নি স্যার। ওনাদের মাথার ওপর পুরুষ মানুষ একজন দরকার ছিল। আপনার চেয়ে যোগ্য আর কে আছে।

থাকতে পারে। আমি ছাড়া যোগ্য কেউ নেই--এটা ঠিক নয় ব্রজবাবু। যাক্ গে, কথা শুনুন। পাণ্ডেজী আমাকে কিছুদিন থেকে বলছেন—স্বাধীন-ভাবে একটা কিছু করতে। বউদির সঙ্গে যদি বা পোষাত, হকসায়েব তা হতে দেবেন না। হকসায়েব উড়ে এসে জুড়ে বসে ওদের মুরুব্বী হয়ে গেছেন। তাঁর পরামর্শেই বউদি ওঠে বসে। দেখে শুনে আমার খুব খারাপ লাগছিল। তাছাড়া মাসের শেষে নিজের হাতে মাইনে নিতেও সংকোচ হয় আমার। ওদিকে...চন্দন গলাটা চাপা করল।...হীরুবাবু কী বিশ্রী লোক ভাবা যায় না। মিথ্যে কী সব লাগিয়ে আসে মাঝে মাঝে। আগের মতো আর বিশ্বাস করতে পারছে না। এ অবস্থায় আমি কী করি বলুন ?

ব্রজ নিরাশ মুখে বলল, সেও একটা কথা। আমার কপালটা আসলে এ্যাদ্দিনে সত্যি ভেঙেছে চন্দনবাবু। ভেবেছিলুম, গাড়িটা যদি আপনারা নেন, তাহলে নতুন করে রুটে পারমিট করিয়ে নিতে আমার অসুবিধে ছিল না। আমার লোক আছে। আর সারানোর খরচা এসটিমেট করে দেখেছি—হাজার তিনেক লাগতে পারে। তাহলে এখন ক' বছর নিশ্চিন্ত।

চন্দন বলল, কী দামে বেচতে চান আপনার মালিক ?

ব্রজ তাকাল। দু' চোখে একটা চাঞ্চল্য খেলা করছে। বলল, নেবেন আপনারা চন্দনবাবু ? খুব বেশী দিতে হবে না। বউদির হাজার পাঁচ মতো দরকার আপাতত। মেয়ের বিয়ে লাগিয়েছেন। তারপর উনি শিলঙে দাদার

কাছে চলে যাবেন। আমাকে বিশ্বাস করুন ঠকবেন না। গাড়িটা খাঁটি বিলিতি জিনিষ। সারালে এখনও হেসে-খেলে পঞ্চাশ বছর চলে যাবে—তাতে কোন ভুল নেই।

চন্দন বলল, কাউকেও এখন বলবেন না। আমিই নেব। রুট-পারমিটের দায়িত্ব কিন্তু আপনার।

ব্রজ সোৎসাহে হাত বাড়াল। সিগ্রেট দিন স্যার। আপনার ভালো হবে। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করবেন। উঃ, আমি শেষ হয়ে গিয়েছিলুম। রাতের পর রাত একটুও ঘুমোতে পারি নি। জানেন স্যার? একটুখানি চোখে ঘোর লাগলেই স্বপ্ন দেখতুম খালি। ওই গাড়িটার স্বপ্ন। সবুজ রঙে জেল্লা ঠিকরে বেরোচ্ছে। নাচতে নাচতে চলেছে উঠন্ত ছুকরীর মতো। আমার—আমার কী যে হত চন্দনবাবু! চটকা ঘুম ভেঙ্গে যখন টের পেতুম, ওটা স্বপ্ন —বিশ্বাস করুন আমি কাঁদতুম। চুপিচুপি কাঁদতুম একা। ভোরবেলা হাসি হাসপাতালের ডিউটি সেরে ডাকত। তারপর...

চন্দন বলল, চেপে যান। হকসায়েব আসছেন।

সামনে রাস্তায় রিকশো থেকে হকসায়েবকে নামতে দেখা যাচ্ছিল। চন্দন একটুখানি গম্ভীর হল। ব্রজ পা দুটো নাচাচ্ছিল। হকসায়েব এসে বললেন, আরে এক কান্ড! রাধিকের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। শংকরকে মেরেছে না কী করেছে, খোদায় মালুম, কিছু বুঝতে পারলুম না। শংকর বলেছে কী এক কড়াই তরকারিতে থুথু ফেলে দিয়েছে! ছি ছি, এ কি মানুষের কাজ? এত করে রাধিকেকে বলি, মা—বয়স হয়েছে, এখন ওসব দুষ্টুকে প্রশ্রয় দিও না। পস্তাবে। কানেই নেয় না। এবার নাও, ঠেলা সামলাও।

ব্রজ হন্তদন্ত হল। কী মুসকিল! তাই কখন থেকে কানে চেঁচামেচি আসছিল! শালা শংকরটার বড্ড বাড় বেড়েছে দেখছি। বড় দেমাগ শালার। ছ্যা, ছ্যা, পাঁচটা ভদ্রলোক খায়-টায়—তাতে থুথু দিলে! মাতলামির জায়গা পায় নি!

চন্দন হাসতে হাসতে বলল, সর্বনাশ! আমিও তো খাই।

ব্রজ পলকে উঠে দাঁড়াল।...ও শালাকে আজ আমি মারব।

হকসায়েব উদ্বিগ্ন মুখে বললেন, এই ব্রজ! বাবা ব্রজ! ছেড়ে দে ও-সব মাতাল টাতালের কান্ড! তুই চুপচাপ বস দিকি বাবা। ওরা যা খুশি করুক, তোর কী?

চন্দনকে অবাক করে ব্রজ দৌড়ে বেরিয়ে গেল। হকসায়েব তাকে আটকাতে পারলেন না। চন্দন বলতে পারছিল না, ব্রজর হঠাৎ কী হল? সে উঠে দরজায় গেল। ব্রজকে ডাকবে ভাবল। কিন্তু ব্রজ তখন রাস্তা পেরিয়ে প্রায় দৌড়চ্ছে।

চন্দন ঘুরে হকসায়েবকে বলল, ব্রজ এত ক্ষেপল কেন হকসায়েব?

হকসায়েব তেঁতো মুখে জবাব দিলেন, এ লাইনের ড্রাইভারদের কারবারই এ রকম চন্দনবাবু। ভিতর-ভিতর কার সঙ্গে কী থাকে হঠাৎ ফেটে বেরিয়ে পড়ে। এ কি নতুন দেখছি? খরা আসতে দিন, তখন রোজ সন্ধ্যাবেলা ড্রাইভারদের মাথা ফাটাফাটি দেখবেন। তখন ডোমকুনাইরা সব তালগাছে তাড়ি লাগাবে। ব্যাটারা তাই খাবে আর মারামারি করবে। গতবার পাঞ্জাবী-

দের সঙ্গে বাঙ্গালীদের লেগেছিল। সে এক কাণ্ড। শেষ অব্দি পরেশবাবু গিয়ে মিটমাট করে দিলেন।

চন্দন আরও উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, হকসায়েব, আপনি বরং যান। আমিও যাচ্ছি। এই সামান্য ব্যাপারে মারামারির কী আছে!

হকসায়েব গুম হয়ে বললেন, রাধিকের শিক্ষে হোক—আর শংকরটারও শিক্ষে হোক না। আমি বলে-বলে হদ্দ হয়ে গেছি। ছাড়ুন।

রাধার হোটেলের সামনে ছোটখাটো ভিড় জমেছে। ব্রজকে দেখা গেল আলখেল্লা কোটটা খুলে একজনের হাতে দিচ্ছে। শংকর চেঁচাচ্ছে, আবে শালা ষণ্ঠি! আমার হাণ্ডিল কাঁহা বে? ব্রজ আরও চড়ায় চেঁচিয়ে উঠল, আও বে হাণ্ডিলকা বাচ্চা! শালা ঢ্যামনা!

তারপর দুজনকে পরস্পরের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে দেখা গেল। চন্দনের বুক ঢিপ-ঢিপ করছিল। একটু আগের ব্রজ আর এই ব্রজ—দু'জনের মধ্যে এত তফাত সে বিশ্বাস করতে পারছিল না। কিন্তু ব্রজর কী রাগ ছিল শংকরের ওপরে যে গায়ে পড়ে এমন মারামারি করতে গেল? চন্দন দেখল, ব্রজ শংকরকে চিত করে ফেলে বুকের ওপর বসে গেছে। রাধা—এলোমেলো চুল, কোমরে আঁচল জড়ানো, ব্রজর সোয়েটারটা ধরে প্রাণপণে টানছে। সোয়েটারটা ব্রজব লম্বা চুলে আটকে যাচ্ছে। সেই সময় আরো ক'জন ব্রজকে গিয়ে ধরল। ব্রজ উঠে দাঁড়াল। শংকর তখনও চিত হয়ে পড়ে আছে। ব্রজ একটু পিছিয়ে আসতেই শংকর হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ব্রজর ওপর। ব্রজ হয়তো অপ্রস্তুত ছিল। টাল সামলাতে না পেরে সে ড্রেনের মধ্যে পড়ে গেল। সেই ফাঁকে লম্বা চুল খামচে ধরে শংকর চেরা গলায় চেঁচাল, আবে ষণ্ঠি, তুই কোথায় বে! আন মেরা হাণ্ডিল!

এক প্রান্তে একটি হাফপ্যাণ্ট পরা কিশোর দু-হাতে চোখ মুছছিল এতক্ষণ। এবার সে দৌড়ে অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রাকটার দিকে গেল। ব্রজ নোংরা থেকে ওঠবার প্রচণ্ড চেষ্টা করছে। কিন্তু শংকর তার চুল ধরে বুকে একটা হাঁটুর চাপ দেওয়ার ফলে সে বেকায়দায় পড়ে গেছে। এ সময় সেই কিশোরটি সত্যি সত্যি একটা হাণ্ডিল নিয়ে দৌড়ে এল।

আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না চন্দন। হকসায়েব যাবেন না যাবেন না বলে চেঁচালেও সে এক দৌড়ে রণস্থলে গিয়ে হাজির হল। ভিড়ের লোকগুলো হাসছে আর প্রাণভরে মজাটা উপভোগ করছে। চন্দন ভীষণ জোরে চেঁচিয়ে উঠল, এই শুয়োরের বাচ্চারা!

তারপর একটানে শংকরকে ছাড়িয়ে নিল। ব্রজও উঠে দাঁড়াল। ভিড়টা যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে। পরেশ মজুমদারের গদীর ছোটবাবুকে তারা নিরীহ ভদ্রলোক বলেই জানত। তার এ মূর্তি দেখেই হয়তো সবাই তাজ্জব হয়েছিল।

শংকর চন্দনের মুখের দিকে তাকিয়ে আড়ষ্ট হয়েছে। রাধা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছে এবার। শংকরের হাত ধরে টেনে তফাতে আনছিল চন্দন। হঠাৎ ব্রজ ইতিমধ্যে কখন ষণ্ঠির হাত থেকে হাণ্ডিলটা কেড়ে নিয়েছে, সে লক্ষ্য করে নি। আচমকা হাণ্ডিলটা শংকরের মাথার পিছনে মেরে বসল সে। শংকর বাপ্‌ রে বলে উবুড় হয়ে পড়ে গেল।

চন্দন ঘুরে ব্রজর দিকে এগোতেই ব্রজ প্রায় দৌড়ে পালিয়ে গেল।

রক্তে চুল ভিজে যাচ্ছে শংকরের। এতক্ষণে রক্ত দেখে সবাই চেঁচিয়ে উঠল, ধর, ধর! খুন করে পালাল!

রাধা শংকরের মাথায় নিজের আঁচলটা চেপে ধরে ভাঙ্গা গলায় কেঁদে উঠল, ওরে আমার কী সর্বনাশ হল রে!

চন্দন অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সে সামনের লোকটাকে ব্যস্তভাবে বলল, একটা রিকশা দেখুন তো। শিগগির! হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

রিকশো কাছেই ছিল। অজ্ঞান হয়ে গেছে শংকর। ধরাধরি করে রিকশোয় তুলে দিল সবাই মিলে। রাধা শংকরকে ধরে বসে রইল। রিকশোটা হাসপাতালের দিকে এগোতে থাকল। চন্দন পা বাড়াচ্ছিল। হঠাৎ তক্তাপোষের নিচের সেই কালো বাকসোটার কথা মনে পড়ামাত্র সে লম্বা পায়ে রাস্তা পেরিয়ে এল। এসে দেখল, হকসাহেব চুপচাপ বসে আছেন। চন্দনের চমক খেলে গেল। হকসায়েব কি ইতিমধ্যে তক্তাপোষের নিচেটা দেখে নিয়েছেন?

দেখলেই বা কী! বাকসে কী আছে, কেমন করে জানবেন। ওটা চন্দনের মনের ভুল। সে একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, ব্রজটা সাংঘাতিক। জানতুম না তো!

হকসায়েব বললেন, ওই কুকুর চণ্ডালীর মধ্যে মানুষ যায় কখনও?

চন্দন বলল, ব্রজ শংকরেব মাথায় মেরেছে। মরে যাবে কিনা কে জানে। হাসপাতালে তো পাঠিয়ে দিলুম।

এ প্রসঙ্গে আর কোন কথা বলার ইচ্ছে সম্ভবত হকসায়েবের নেই। একটু চুপ করে থেকে হঠাৎ নড়ে উঠলেন। বললেন, হ্যাঁ—যে জন্যে এলুম। একবার মজুমদার বাড়ি যেতে হবে চন্দনবাবু। বিশেষ কথা আছে। বউবিবি আপনাকে খবর পাঠায় নি?

চন্দন মাথা দোলাল।...কই না তো। কী ব্যাপার?

সে কী! আমার কাছে কাল সন্ধেবেলা লোক পাঠিয়েছিলেন।

আমি কিছু জানি নে।

হকসায়েব পকেট থেকে পানের কৌটো বের করে বললেন, হয়তো লোক আপনার কাছেও পাঠিয়েছিল—আপনার দেখা পায় নি। যাক্ গে, চলুন। ওদিকে একটুখানি গোলমাল লেগেছে। পরেশবাবু হাজার জায়গায় ফ্যাসাদ বাধিয়ে রেখে গেছেন। মেয়েদের ওপর যত ঝামেলা। এ-সব সামলায় কে এখন? আপনিও এ লাইনে নতুন মানুষ।

পান গালে পুরে হকসায়েব বললেন, নুটুবাবুর বউ বলেছে—পরেশবাবু নাকি হাত চিঠিতে ওনার কাছে কবে পনের হাজার টাকা নিয়েছেন সর্বমোট। সুদ ধরলে হাজার বিশ-বাইশ হয়। সুদ নেবেন না। নগদটা দিতে হবে। বুঝুন কাণ্ড!

সে কী! চন্দন অবাক হল।...হাতচিঠিগুলো দেখিয়েছে?

হ্যাঁ—আমি দেখেছি। পরেশবাবুর সই আমি চিনি। সবচেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপার—প্রত্যেকটি কাগজে সাক্ষীর দস্তখত করেছেন বেচুবাবু আর বিলাস! বিলাস হচ্ছে ওনাদের চাকর।

বউদি কী বলেছেন?

সেই বলাবলি নিয়েই আলোচনা হবে, চলুন।

চন্দন গুম হয়ে বলল, কিন্তু আশ্চর্য—আমাকে তো কিছু বলেন নি বউদি!

হকসায়েব একটু হাসলেন।...বলত। আপনি তো ইদানীং ও-বাড়ি যাওয়া ছেড়েই দিয়েছেন এক রকম।

চন্দন চুপ করে গেল। হকসায়েব উঠে দাঁড়ালেন। ডাকলেন, হীরুবাবু! ও হীরুদা! আমার সঙ্গে ছোটবাবু একবার বেরোচ্ছেন। এদিকে আসুন।

চন্দন বলল, থাক। তালা-চাবি দিয়ে যাচ্ছি এ ঘরে।

হাত নাড়ালেন হকসায়েব।...কিছু দরকার নেই। হীরুদা বড় বিশ্বাসী মানুষ। আর কীই বা আছে আপনার ঘরে?...হেসে উঠলেন জোর।...পয়সা-কড়ি জমানোর মতো মানুষ আপনি নন চন্দনবাবু। আর জমবেই বা কোত্থেকে! পরেশবাবু থাকলে কথা ছিল। চলুন। হীরুদা, কই এলে?

চন্দন হীরুবাবুকে আমল না দিয়ে তালা দিল দরজায়। চাবিটা পকেটে রেখে পা বাড়াল। তার পা উঠছিল না ও-বাড়ির দিকে যেতে। তবু যেতে হবে—এটাই বড্ড খারাপ লাগে। রাস্তায় এসে হঠাৎ তার মনে হল রুমার কথা। রুমাকে অনেকদিন দ্যাখেনি। রুমার মধ্যে কিছুদিন জর হয়েছিল নাকি। সে যায়নি। অমিত নাকি আজকাল ও-বাড়ি আসা-যাওয়া করে। ভালোই তো! কোয়ালিফায়েড গুণী ছেলে—রূপবান!

এরপর প্রতিটি পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে রুমাদের বাড়ির পথের মাটি গরম হয়ে উঠছিল যেন। তার ভিতরেও সেই তাপ পৌঁছে যেতে থাকল। দাঁতে দাঁত চেপে বসে যাচ্ছিল তার। সারা শরীর অব্যক্ত তৃষ্ণায় ছটফট করছে। দূরের এক ছোট্ট শহরের প্রান্তপ্রবাহিনী কালো জলের নদীটা মনে পড়ছে। মনে পড়ছে, সেই গহন ও গভীর শান্ত ধারা থেকে কবে তার হাতে ভেসে এসে ধরা পড়েছিল একটা রুপোলি মাছ। এখন সে চঞ্চল আর এত প্রাণবন্ত যে ছটফট করে পালিয়ে গেল হাত থেকে। ধরে রাখা গেল না। রাগে দুঃখে চন্দন আড়ষ্ট হচ্ছিল। তবু যেতে হচ্ছে। এটা ঠিক নয়—এটা ঠিক নয়! পাণ্ডেজী অসম্ভব ধূর্ত মানুষ। তিনি বলেছেন, ইয়ে ঠিক নেহী চন্দনবাবু। বেওকুফির জন্যে পরে আফশোস করবেন। হাঁ—আমি বলছি চন্দনবাবু। ঝুট-মুট আশা করবেন না। রুমা লড়কির বিভা হবে আরেকজনের সাথে—আমি শুনেছি। সব খবর আমি রাখি। আপনি জানেন না, হেডমাস্টারের বাড়ি আজকাল পরেশবাবুর স্ত্রী আনাগোনা করেন। বিভা ওখানেই হবে। ঔরৎ লোকের বুদ্ধিশুদ্ধি এইরকমই হয়, বাবুজী। ছোড় দিন। বরং নিজে কিছু করুন। পুঁজি নেই—তো আমি পুঁজি দিচ্ছি। বলুন, কত চান? আমার গদিতে আপনার মাল পৌঁছে দেবে—স্রেফ তেলের দাম দেবেন। ব্যস!...

কিন্তু এই কারবারী স্থূলজীবনই কি সে চেয়েছিল? শুধু টাকার জন্যে বেঁচে থাকা—টাকার স্বপ্নে টাকার ভাবনায় লিপ্ত থাকা! অথচ পালানোর পথটা দিনে দিনে সংকুচিত হয়ে যাচ্ছে।

নুটুবাবুর বউ সামান্য মেয়ে নয়, চন্দনবাবু।...হকসায়েব বলে উঠলেন।... সবাই বলে ও নিজে স্বামীকে খুন করেছিল। সত্যিমিথ্যে খোদা জানেন। কিন্তু ওকে কিছু বিশ্বাস নেই। এ্যাদ্দিন পরেশবাবু থাকতে টাকা চেয়েছিল আর পরেশবাবু দ্যায়নি—এটা কি বিশ্বাস করবার মত কথা? পরেশবাবুর

টাকা ডাইনবাঁয়ে রাখা ছিল। বিশ-বাইশ কেন, দু-চার লাখও উনি হাজির করতে পারতেন। অথচ...এ কী কাণ্ড, দেখুন।

চন্দন কোন জবাব দিল না।

দরজা খুলে দিল গ্যাঁদা। এদের দেখে বলল, বউদি এক্ষুনি বেরিয়েছে।

হকসায়েব বলেন, তাহলে ?

চন্দন বলল, পরে আসব'খন।

হকসায়েব গ্যাঁদাকে বললেন, দুপুরের দিকে আবার আসব'খন। বাবা গেদু, বউবিবিকে বলিস, আমরা এসেছিলুম। চলুন চন্দনবাবু।

চন্দন ঘুরল। পা বাড়াল। সেই সময় পিছন থেকে রুমা ডাকল, চন্দনদা, চলে যাচ্ছ কেন ? এস।

রক্ত ছলাৎ করে উঠেছিল চন্দনের। সে একইদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে গেছে॥ হকসায়েব বললেন, তাহলে আপনি গিয়ে গল্পসল্প করুন। আমি একবার জ্ঞানবাবুর ওখানে যাই। কাজ আছে॥ বরং বউবিবি এলে খবর দেবেন।

হকসায়েব চলে গেলেন। চন্দন আস্তে আস্তে দরজার দিকে ঘুরল। দেখল, রুমা উঠোনে দাঁড়িয়ে আছে। মুখে স্মিত হাসি। মুহূর্তে চন্দনের ভিতরা একটা খুসির বিহ্বলতা টলমল করে উঠল। সে বাড়ি ঢুকল।

রুমার ঘরে গিয়ে সপ্রতিভভাবে বসল সে। বিছানায় একরাশ বইপত্তর। রুমা জানালার ধারে পা ঝুলিয়ে বসে বলল, তুমি ভীষণ রাগতে পারো তো আজকাল ! আমি কিন্তু আর চেষ্টা করেও রাগতে পারিনে। কেঁদে ফেলি ঠিক আগের মতো।

মানতু আর সনতু উঁকি দিচ্ছিল দরজায়। রুমা ধমক দিয়ে বলল, এখানে কী রে ! যা—পড় গিয়ে। ওরা চলে গেল।

গ্যাঁদা ওদিক থেকে চেঁচিয়ে বলল, আজও কলেজ যাবে না নাকি ? বেলা হয়ে গেল যে।

রুমা উঠে গিয়ে দরজা থেকে জবাব দিল, তুই আমার গারজেন নাকি রে ? নিজের কাজ কর্।

আওয়াজ এল—বেশ, আজও কামাই করো। বউদি এসে বকবে। আমার কী।

হাসতে হাসতে রুমা সরে এসে একেবারে চন্দনের কাছ ঘেঁষে বিছানায় বসে বলল, আমার গারজেনের সংখ্যা দিনে-দিনে বেড়ে যাচ্ছে। কী কপাল !...আরে ! কথা বলছ না যে তুমি ! মৌনব্রত পালনের জন্যে নিশ্চয় ডাকিনি !

চন্দন একটা বই তুলে পাতা ওলটাচ্ছিল। বলল, কী বলব ?

বইটা কেড়ে নিল রুমা। তারপর নিঃসঙ্কোচে চন্দনের কাঁধে হাত রেখে ফিসফিস করে বলল, আহা, চাঁদু আমার রাগ করেছে রে !...পরক্ষণে খিলখিল করে হাসি।

তাকে নিয়ে কি তামাসা করছে রুমা ? চন্দন ওর মুখের দিকে তাকাল॥ খুব আস্তে বলল, ছেলেমানুষীর বয়স আর তোমার নেই, রুমা।

রুমা বলল, চাঁদু বললুম বলে ভীষণ অপমানিত হলে বুঝি ! ফেট, তুমি কী ! রূপপুরের গদীওয়ালাদের দলে পড়ে তুমিও আস্ত গদীওলা হয়ে গেছ। কই, কেমন ভুঁড়ি বাগিয়েছে নাকি দেখি !

বলে সে চন্দনের সোয়েটার টানাটানি করতে সুরু করল। কেন এমন করছে রুমা? তাকে কি সে এই ছেলেমানুষীতে ভুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে চাচ্ছে? রাগ করবে, না অপমানিত বোধ করবে, নাকি সহজ মনে এটা নেবে, ঠিক করতে পারছিল না চন্দন। সে শুধু বলল, নাঃ, ভুঁড়ি আমার হবে না।

রুমা ওর পেটটা টিপে দিয়ে বলল, হয়েছে মনে মনে হচ্ছে। হবে না আবার ' টাকার সঙ্গে বাস করলে ভুঁড়ি হয়। জামাইবাবুর বেলা তো দেখেছি। কেমন করে দিনে দিনে ইঞ্চিইঞ্চি করে বাড়ছিল। বুড়ো বয়স অব্দি বাঁচলে দিদির বরাতে গিরিগোবর্ধন ধারণ করা ছিল।···হঠাৎ জিভ কাটল!. .এই মা। গারজেনের সামনে কী অশ্লীলতা করে ফেলছি! আজ আমার মাথার ঠিক নেই!

চন্দন নিজের শরীরে রুমাকে অনুভব করছিল। এ কি সুখ? শরীরের সুখ—নাকি মনের! মনে তো জ্বালা—ঘৃণা, অথচ শরীরে একটা চঞ্চলতার স্রোত বইছে। সে আস্তে আস্তে রুমার হাতটা নামিয়ে দিল কাঁধ থেকে। রুমা তবু তার দুটো হাতই ধরে ফেলল। নিজের কোলের ওপর নিয়ে বলল, এখনও তোমার রাগ পড়েনি? ঠিক আছে—উপুড় হয়ে শোও। কোমরে পা রেখে নাচানাচি করছি আগের মতো।

চন্দনের শরীরের কোষে কোষে অনেক কথা—অনেক ক্ষুধার্ত কথা মাছির মতো ভনভন করে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। স্মৃতির অজস্র মড়ার ওপর বসে থাকা মাছিগুলোর বিরক্তিকর ওড়াউড়ি। তার ইচ্ছে করল বয়সের উজোনে ছুটে গিয়ে —এখন যেমন রুমা চলে যেতে পেরেছে—সেই আগের সব ঘটনার ঘরে হানা দ্যায়। খামচে খুবলে তুলে নিয়ে আসে সব সকাল দুপুর বিকেল আর গঙ্গার জলে চিত সাঁতার দেওয়া তরুণ শরীরের ওপর একটা বালিকাশরীর '

আর দুরন্ত হঠকারিতায় চন্দন রুমার দু-কাঁধে হাত রেখে তাকাল চোখের দিকে। কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক পরস্পরকে অনুভব করল যেন। তারপর ছেড়ে দিল চন্দন। মুখ নামিয়ে বলল, কলেজ কামাই করছ কেন?

এমনি। ভাল্লাগে না।

কেন?

জানিনে। রুমাও মুখ নামিয়েছে। আঙুল খুঁটছে।

রুমা '

উ?

কিন্তু কী বলবে ভেবে পেল না চন্দন। চুপ করে গেল।

রুমা মুখ তুলে বলল, কী?

কিছু না।

আমি জানি, কী বলবে।

উঁহু—থাক।

চন্দন হাসবার চেষ্টা করে বলল, তুমি কিছুই জানো না রুমা—সব তোমার নিজের বানানো। তোমার ওপর কোন দাবী নেই আমার। কারণ, তোমার সঙ্গে আমার বয়সের অনেক তফাৎ। কোন দাবীই শোভা পায় না। পরেশদা ভুল করেছিলেন।

বয়সের কথা কেন তুলছ? আর জামাইবাবুর কথাই বা কেন? ফেল! ওসব আমি ভাবছি নাকি এখন?···রুমার কপালে যেন দুঃখের ভাঁজ স্পষ্ট হল।

তবে কী ভাবছ ?

ভাবছি, তুমি কেন একবারও...

ওকে চুপ করতে দেখে চন্দন একটু ঝুঁকে বলল, কেন একবারও ? কী রুমা ?

রুমা সোজাসুজি তাকিয়ে বলল, কেন তুমি একবারও জোর করতে পারলে না ?

জোর করতে ? তোমাকে ? চন্দন প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। কিসের জোর শুনি ? গায়ের জোর ? জোর করব কেন ? কী পাবার জন্যে রুমা ?

রুমা উঠে দাঁড়াল। চেঁচিও না। আসছি—বসো। বলে বেরিয়ে গেল সে।

ষোল

চন্দন চা খেতে খেতে স্নেহধারা ফিরল রিকশো চেপে। উত্তেজিত দেখাচ্ছিল তাকে। দরজার কাছে থেকে তাকে বলতে শোনা গেল, ছেনাল ! বেশ্যা ! আমি যেচে পড়ে গেলুম, আর আমাকে ছোটলোকের মতো অপমান করলে। বলে কিনা —আমায় নিয়েই তোমাদের জমিদারী। কার টাকায় বড়লোক হয়েছ—তাই বললে, বুঝলি রুমা ?

রুমা বলল, তখন অমন করে বারণ করলুম শুনলে না। এখন আর চেঁচাচ্ছ কেন ? ওঘরে চন্দনদা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছে—আর সিন ক্রিয়েট করো না !

চন্দন এসেছে নাকি ?· স্নেহধারা হাঁফাতে হাঁফাতে এগোচ্ছিল।...আর হক-সায়েব ? হকসায়েব আসেন নি ?

এসেছিলেন। তুমি নেই শুনে চলে গেলেন।...রুমা তার পিছন পিছন এল।

স্নেহধারা এ ঘরে ঢুকেই চন্দনকে দেখে বলল, এই যে চাঁদু ! তোমার যে পাত্তাই পাইনে। মরেছি না বেঁচে আছি, একবার দেখে যাবে তো ! তোমারও রূপপুরের বাতাস লেগেছে দেখছি।

চন্দন কুণ্ঠিতভাবে হাসল। না। মানে—সময় পাইনি। তাছাড়া··

বাধা দিয়ে স্নেহধারা বলল, কেন তুমি আসো না—সে আমি জানি। তোমার এখন নিজের কত কজ বেড়েছে। বাড়বে বইকি। নিজের ইচ্ছেমতো কাজ করবে। আমরা তোমার কে ভাই।

চন্দনের ভিতরটা শুকিয়ে গেল। স্নেহধারা কী বলতে চায় তাকে ? কতটুকু জেনেছে তার ? সে গম্ভীর হয়ে বলল, পরের কথায় যদি নিজে থেকেই আমাকে পর করে দাও, আমি কী করব বলো বউদি ? তাছাড়া তোমার এ্যাডভাইসারের তো আর অভাব নেই।

কিসের অভাব নেই ?...স্নেহধারা তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকাল।

রুমা হাসতে হাসতে বলল, দিদি কথাটার মানে জানে না। স্রেফ মাতৃভাষায় বুঝিয়ে দাও না যে তোমার হকসাহেব থাকতে বেচারা চন্দনবাবুর কী দরকার।

হঠাৎ চোখের সামনে একজন বয়স্ক গুরুগম্ভীর মানুষের কাপড় ফস করে

খুলে তাকে ন্যাংটা দেখলে লজ্জা পেতে হয়। মুখ ঘুরিয়ে নিতে হয়। অবশ্য এক্ষেত্রে রুমাই দুষ্টু হাতে এটা করে বসল। তার ফলে স্নেহধারা আর চন্দন অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছিল কয়েক মুহূর্ত। তারপরে স্নেহধারা কিন্তু রেগে গেল। রুমার উদ্দেশ্যে ঝাঁঝাল স্বরে বলে উঠল, তুই কী বুঝবি মাথার ওপর কি ঝড় চলেছে! ওদিকে ওই বেশ্যার জুলুম—এদিকে পেট্রোল পাম্পটা বারোভূতে লুটেপুটে খাচ্ছে কী না কে জানে! এইসব নাবালক ছেলেমেয়ে নিয়ে এবার পথে বসলে শত্রুদের মুখে হাসি ফুটবে।

চন্দন তাকিয়ে ছিল স্নেহধারার মুখের দিকে। কথাটা শেষ হলে সে আস্তে বলল, পেট্রোল পাম্প বারোভূতে লুটে খাচ্ছে কে বলল বউদি?

স্নেহধারা অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, আমি তোমাকে বলছিনে ভাই। বুঝতে তো পারছি।

কী বুঝতে পারছ, বউদি?

চন্দন জবাব শোনার জন্যে একটুখানি কান করে থাকল। কিন্তু স্নেহধারা কিছু বলল না। রুমা টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছে। লতু দরজার কপাটে পিঠ দিয়ে একটু একটু দুলছে। স্নেহধারা মুখ ফিরিয়ে কাঠ হয়ে বসে আছে জানালার ধারের চেয়ারটায়। রান্নাঘর থেকে লঙ্কা ফোড়নের ঝাঁঝ ভেসে আসছে। ছ্যাঁক ছ্যাঁক শব্দ হচ্ছে। বাইরে কাকের ডাক—মাঝে মাঝে আবছা ভারি ট্রাকের চাকা গড়িয়ে যাওয়া ঘরঘর আওয়াজ—কে কাকে ডেকে হন্যে হল কোথায়।

চন্দন উঠে দাঁড়াল।...তোমাদের কাজ আমি ছেড়ে দিলুম বউদি।

স্নেহধারা ঘুরে বলল, ছেড়ে দিলে মানে?

আমার পোষাবে না। তোমাদের হকসায়েবকে কিংবা—বলতো হীরুবাবুকেই সব বুঝিয়ে দিচ্ছি। আজই। কিংবা তুমিও আসতে পারো—রুমাকেও নিয়ে এস। তুমি না বুঝলে সে বুঝতে পারবে। কত টাকা আমি মেরেছি—সেও জানা যাবে।

বলেই চন্দন বেরিয়ে পড়ল। বারান্দা থেকে নামবার সময় সে স্নেহধারার ফুঁপিয়ে ওঠা শুনতে পেল। অসংলগ্ন কি সব বলছে স্নেহধারা। সদর দরজার কাছে আসতেই রুমা ডাকল তাকে—চন্দনদা!

দাঁড়াল চন্দন। রুমা দৌড়ে কাছে এসে বলল, এটা কী হচ্ছে!

কী হবে?

দিদির ওপর মিছিমিছি রাগছ কেন?

মিছিমিছি?

তা বইকি। ওর অত বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। যে-যা বলে বিশ্বাস করে বসে। মাথা খারাপ করো না এর জন্যে—আমি ওকে ঠিক করে দেব।

চন্দন একটু সহজ হয়ে বলল, কিন্তু তবু অসুবিধে আছে। আমার নিজেরও ঝামেলা আছে। মায়ের অবস্থা ভাল না। দিদি বাইরে চাকরী পেয়ে চলে যাচ্ছে। ওদের দেখাশোনা করার লোকি নেই।

রুমা পা বাড়িয়ে বলল, বেশ তো—ওঁদের নিয়ে এসো এখানে।

চন্দনের হাসি পেল।...ও সব সংসারী ব্যাপারে তোমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। তাছাড়া তোমাদেরও তো ঝামেলা এখন কম নয়। ট্রাকটা ভাড়া

খাটিয়ে খরচা ওঠে না। শিশিরবাবুদের কমলা ট্রান্সপোর্ট জোর কমপিটিশান চালিয়ে যাচ্ছে। জ্ঞানবাবুরাও ট্রাক কিনেছে দুটো। তোমাদের ট্রাক প্রায়ই গ্যারেজে পড়ে থাকে আজকাল। পেট্রোল পাম্প শিশিরবাবুরাও বসাচ্ছে। জায়গা কিনেছে কোথায়। এগুলো তোমরা ভাববে না—শুধু ভাববে যে…

রুমা বলল—চলো—তোমার মাথাটা ঠাণ্ডা করে দিই।

আমার মাথা ঠাণ্ডা আছে।…চন্দন দরজা থেকে রাস্তায় নামল।

পিছনে স্নেহধারার ডাক শোনা গেল, রুমা কোথায় যাচ্ছিস ?

আসছি। তুমি চুপচাপ বসো তো।

শোন। এই কাগজগুলো দ্যাখ।

আসছি বলছি।

না। এক্ষুনি আয়। স্নেহধারার কণ্ঠস্বর কর্কশ শোনাল।

রুমা গোঁ ধরে বলল, বাজে বকো না। আসছি।.. তারপর চলতে শুরু করল চন্দনের আগে-আগে। পিছনে স্নেহধারার রুমা ডাকটা বেশ কয়েকবার শোনা গেল। শেষ ডাকটা চড়ায় উঠে বেলুনের মতো করে ফ্যাঁস করে তুবড়ে গেল যেন।

ছোট রাস্তাটায় চুপচাপ হেঁটে যাচ্ছিল দুজনে। একটা বাড়ি থেকে রুমার বয়সী একটি মেয়ে বই হাতে বেরোচ্ছিল। রুমাকে দেখে সে চোখ নাচাল মাত্র। রুমা বুড়ো আঙুল নাড়ল।

হাইওয়ের মুখে চন্দন থমকে দাঁড়াল। রিকশোয় হাসপাতাল থেকে রাধা শংকরকে নিয়ে ফিরছে। শংকরের মাথায় ব্যাণ্ডেজ। রাধা দুহাতে তাকে জড়িয়ে ধরে বসে আছে। চন্দনকে দেখামাত্র রাধা রিকশাওয়ালাকে বলল, এই দাঁড়া—দাঁড়া একটুখানি। ছোটবাবু, ও চন্দনবাবু!

চন্দন এগিয়ে গেল।…এক্ষুনি ছেড়ে দিলে যে!

শংকর হাসছে।…ফাস্টএড দিয়ে ছাড়লে! শংকরের হেডের দাম আছে স্যার। তবে বেজার বাজার এবার গরম না করে ছাড়ব না। আমি কথা দিলুম স্যার—আপনার দিব্যি।

রাধা ধমকাল। থাম মিনসে! তখন তো কোঁৎকা খেয়ে চোখ উল্টে পড়েছিলি। রাধাকে লোকে মন্দ বলে—রাধা না থাকলে এ লাইনের ড্রাইভার মিনসেদের হাঁড়ির হাল হয়ে যাবে। কোথা-কোথা সব মাগছেলেপুলে ফেলে এখানে রয়েছে। আমি না থাকলে কে দেখত তোদের শুনি? ও ছোটবাবু আসুন কথা আছে। বেজার নামে থানায় কাগজ-কলমে ঠুকে দিতেই হবে। খুব বাড় বেড়েছে ওর। এতকাল জানাইনি—শুধু আপনার খাতিরে! আপনি যা বলবেন, তাই হবে ছোটবাবু। যদি মরেই যেত লোকটা!

চন্দন বলল, ঠিক আছে। যাব'খন! ওকে সাবধানে রেখো।

রিকশোটা চলে গেলে রুমা বলল, মারামারি হয়েছে নাকি?

হুঁ।

রুমা হাসল। বলল বাঃ, এরই মধ্যে রূপপুরের জামাইবাবুর জায়গা দখল করে ফেলেছ তাহলে! জানো, ড্রাইভারদের মধ্যে যত মারামারি হত এখানে—সব কিছুরই জজ হতেন জামাইবাবু।

চন্দন বলল, আচ্ছা রুমা তুমি জানো—পরেশদার সঙ্গে নুটুবাবুর বউয়ের কী ব্যাপার ছিল ?

রুমা একটু চুপ করে থেকে বলল, জানি। ভীষণ ধরনের প্রেমট্রেম ছিল। তবে যাকে বলে অচরিতার্থ ভালবাসা। সেই থেকেই নাকি জিঘাংসা জন্মায়। সুনন্দিতাদি এখন মনের ঝাল মেটাচ্ছে দিদির ওপর।

আর তোমার সঙ্গে তো দিব্যি ভাব ওঁর !...চন্দন কথাটা বলেই রুমার দিকে তাকাল তীক্ষ্ণদৃষ্টে।

রুমা অপ্রস্তুত হল না।...আমার সঙ্গে সবার ভাব। এই তো মজা। কারণ টাকা-পয়সা সংসার-টংসারের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই নেই।

তুমি তো প্রায়ই ওখানে যাও ?

যাই। মানে যেতুম। তবে ইদানীং আর যাইনে।

কেন ? টাকার দাবী করছে বলে ?

উঁহু। মেয়েটা জঘন্য।

তার মানে ?

রুমা আস্তে হাঁটছিল। এবার দাঁড়াল। বলল, তোমাকে বলা যায়। লুকোনোর মতো কথা তো নয়। আমি ওখানে যেতুম—ছেলেবেলা থেকে—মানে যদ্দিন এখানে এসেছি—ওদের ওখানেই তো অনেক দিন থাকতে হয়েছিল। খুব ভালবাসত সুনন্দিতাদি। জামা-কাপড় কিনে দিত এক সময়। নতুন বাড়িতে আসার পরও দিদিকে লুকিয়ে গেছি কতদিন। ইদানীং আরেকজনও আমার সঙ্গে যেত। সুনন্দিতাদির সঙ্গে ওদের ফ্যামিলির খুব ভাব আছে তো।

অমিত ?

হুঁ। কিন্তু এক সময় লক্ষ্য করলুম আমরা গেলেই সুনন্দিতাদি আমাদের ঘরে রেখে হুট করে বেরিয়ে যায়। বিলাসকে ডেকে নিয়ে যায়। বলে যায়, তোমার গল্প কর। আমি না আসা অব্দি পালিও না। চুরি হয়ে যাবে। তার-পর অনেক দেরীতে ফিরে বলত—কী, কেমন জমল ? প্রথম প্রথম বুঝতে পারিনি। পরে বুঝলুম ও কী বলতে চায়। অমিত তো ভীষণ রেগে গেল। আমিও। কী ভেবেছে ? আসলে কি জানো চন্দনদা, ও সেকেলে মেয়ে। সেক্স ছাড়া কিছু বোঝে না তো ! আমরা যে ও সবের সুযোগ খুঁজছি নে মোটেও—রুমা চটুল হাসল হঠাৎ।...এই ফের গুরুজনের সামনে অশ্লীলতা হল !

চন্দন বলল, যাঃ !

রুমা বলে চলল, আসলে ওই সেকেলে ধিঙ্গিগুলো আমাদের বুঝতে পারে না। কোন ছেলের সঙ্গে কোন মেয়ের বন্ধুত্ব মানেই ওদের চোখে ইয়ে। অথচ আমাদের কাছে তো এটা কিস্যু না—স্রেফ ডালভাত।

অমিতের সঙ্গে তোমার কি ডালভাতেরই ব্যাপার ?

রুমা একটু চমকাল যেন। তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল। পা বাড়াল দ্রুত। বলল, ফেট ! ও কথা ছাড়ো। তোমার মাথা ঠাণ্ডা করি।

চন্দন প্রসঙ্গটা ছাড়ল না। বলল, স্রেফ ডালভাত তো বরাবর ভালো লাগে না। তাই পরে একটু আমিষ ঝোলঝোল এসেই যায়। এটাই নিয়ম রুমা—জীব জগতের আইন।

তুমি আমার গারজেন। যা বলবে, শুনে যাব। কারণ এটাও প্রচলিত নিয়ম।...রুমা হেসে ফেলল।

চন্দন আরও এগোল। বলল, অমিতকে তুমি কেমন ভালবাসো, রুমা?

তার মানে?

কথাটার জবাব দাও।

জবাব নেই।

আমাকে গারজেন স্বীকার করেছ কিন্তু। গারজেন জবাবটা চাচ্ছে—তার দরকার এটা।

কারো সঙ্গে কাকেও ভাল লাগে। এ ছাড়া আর কিছু আসে না আমার।

শুধু এই?

এই।

তখন বললে, কেন আমি জোর করিনে। জোর করলে তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

করব বই কি!...খিলখিল করে হেসে উঠল রুমা।

রুমা!

চেঁচিও না—পথে এত লোক যাচ্ছে।

চন্দন ক্ষিপ্র হাতে সিগারেট বের করল। ধরিয়ে নিল। চারপাশে সব কিছু কাঁপতে কাঁপতে ক্রমশ সরে যাচ্ছে কোথায়। এ কি তার আনন্দ? না—আনন্দ তো অন্য রকম ব্যাপার। এটা বিষের যন্ত্রণা। এর সঙ্গে গভীর দুঃখের বিস্বাদ। আজ দিনটা কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। এ কি রুমার দূরে সরে নিরাপদ জায়গায় দাঁড়ানো, নাকি সত্যি সত্যি কাছে আসা—একেবারে রক্তের ভিতর কষ্টদায়ী অনুপ্রবেশ? হঠাৎ হনহন করে চলার গতি বাড়িয়ে দিল সে।

বাসার সামনে এসে বলল, এস—তোমাকেই হিসেব বুঝিয়ে দিই। তুমি বুঝতে পারবে। হকসায়েবকেও ডেকে পাঠাচ্ছি। জ্ঞানবাবুর গদীতে থাকার কথা। হীরুবাবু, শুনুন!

রুমা ওর হাত ধরে টানল। অমন চেঁচাচ্ছ কেন? কী, হল কী তোমার?

হাতটা এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিল চন্দন। তাড়াতাড়ি দরজার তালা খুলে সে ঘরে ঢুকল। ব্যস্তভাবে ফাইল খাতাপত্র নামাতে থাকল র‍্যাক থেকে। তারপর ডাকল, রুমা এস, দেখে যাও। বিশ্বাস যদি না হয় হীরুবাবু শিগগির আসুন!

রুমা নিচে দাঁড়িয়ে আছে তখনও। হীরুবাবু দৌড়ে এল কাঁচঘর থেকে। ফরিদ শম্ভু কাঠ হয়ে দাঁড়াল পাম্পের সামনে। সবাই টের পেয়ে গেছে একটা কিছু ঘটছে। অস্বাভাবিক আর বিশ্রী।

হীরুবাবু বলল, কী হল চন্দনবাবু?

আপনি সব বুঝে নিন। ক্যাশবই আপটু ডেট করা আছে। ক্যাশ তো আপনার কাছে।

আহা, ব্যাপারটা কী বলবেন তো খুলে?

আমি চাকরী ছেড়ে দিলুম।...বলে চন্দন বিছানার নিচে থেকে আগের রাতে লিখে-রাখা রেজিগনেশন চিঠিটা বের করে হীরুবাবুর হাতে দিল। তারপর

দরজায় মুখ বাড়িয়ে বলল, ফরিদ! শিগগির জ্ঞানবাবুর গদী থেকে হকসায়েবকে ডেকে নিয়ে আয়।

ফরিদ ইতস্তত করছে দেখে সে গর্জাল।...চাবকে পিঠের ছাল তুলে দেব এক্ষুনি। যা বলছি, কর!

ফরিদ ভয় পেয়ে দৌড়ে চলে গেল। রুমা একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। স্লিপারে পাথর কুচি সরাচ্ছে—মুখটা মাটির দিকে। হীরুবাবু ডাকল, রুমা! একবার ভেতরে এসো না মা। এসব কী হচ্ছে! কী কাণ্ড! মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বুঝিনে।

চন্দন চেঁচিয়ে উঠল। শাট আপ ওল্ড ফুল! বোঝেন না? ন্যাকা। কত টাকা আমি মেরেছি? বলুন এক্ষুনি—কত টাকা আমি আত্মসাৎ করেছি?

হীরুবাবু ঘাবড়ে গিয়ে থতমত হয়ে বলল, আহা-হা! কে—কে এসব বলেছে? ছি-ছি-ছি!

চন্দন বিছানাটা গোছাতে থাকল। একটা বড় সুটকেস আর এ্যাটাচিকেস টেনে নিল তক্তাপোষের নীচে থেকে। আলনা থেকে জামা-প্যাণ্ট তোয়ালে টেনে বিছানার সঙ্গে জড়াল। জানালার কাছে রাখা সাবান টুথব্রাস সেফটি-রেজারগুলোও কাগজে মুড়ে ফেলল। বালিশের নিচে রাখল। তারপর ডাকল, শম্ভু! দ্যাখ তো বাইরে কোথায় লুঙ্গিটা মেলে-দেওয়া আছে।

রুমা তখনও একই ভঙ্গীতে স্তব্ধ। শম্ভু এক দৌড়ে লুঙ্গিটা এনে দিল। সব গুছিয়ে চন্দন বাইরে এল।...রুমা, যদি পরে কিছু গোলমাল ধরা পড়ে-আমি দায়ী থাকলুম সেজন্যে। আশা করি তেমন কিছু নেই। থাকতে পারেও না। হকসায়েবের জন্যে আর আমি অপেক্ষা করতে পারছি নে।

সে একলাফে রাস্তার ধারে গিয়ে ডাকল, এই রিকশো! রিকশো!

একটা রিকশো এগিয়ে এল কাছে। চন্দন পাগল হয়ে গেছে যেন। তার ভঙ্গীতে পাগলামির মতো উদ্ভটতা। জিনিসপত্র তুলে রিকশোয় লাফ দিয়ে বসল সে। তারপর বলল, চলি হীরুবাবু। অন্যায় কিছু বললে ক্ষমা করবেন। .. চলো, বাস স্টেশন।

হকসায়েব দৌড়ে আসছেন দেখা গেল। চলন্ত রিকশোর সামনে দু হাত তুলে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, কী হয়েছে কী চন্দনবাবু?

চন্দন দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল, কিচ্ছু হয় নি। আমি চলে যাচ্ছি। সব রয়েছে—বুঝে নিন গে। রিকশো, চলো। বাস ফেল করব।

রিকশোর হ্যাণ্ডেলটা ধরে হকসায়েব বললেন, সবুর। রোখ বাবা।...চন্দন-বাবু, মাথা হঠাৎ গরম হয়ে গেল কেন, বলুন তো? ছি, ছি, এ কি কাজের কথা? আজ ওনাদের চারদিকে দুষমণ—আপনি কিনা ওনাদের নিজের লোক—এ দুঃসময়ে এমন করে চলে যাচ্ছেন?

আমিও ওদের দুষমণ কি না—তাই যাচ্ছি।

পানরাঙা জিভ কেটে হকসায়েব হাসলেন।...আহা হা হা! একী কথা! কে বলেছে আপনি দুষমণ? রাগটা করছেন কার ওপর? অবুঝ মেয়েছেলে—কথায় বলে, বারো হাত কাপড়েও মেয়েমানুষ ন্যাংটো।

চন্দন ব্যঙ্গ করে বলল, আপনিও তো হকসায়েব কম মানুষ নন। আপনাকেও আমার চেনা হয়ে গেছে। আপনিই তো ওদের চোখে আমাকে অবিশ্বাসী করে তুলেছেন। অস্বীকার করতে পারেন?

হকসায়েবের মুখটা লাল হয়ে উঠল।...একটু সমঝে বলবেন চন্দনবাবু। এ হক বড় সহজে রাগে না। তল্লাটের কেউ এক তিল বদনাম দিতে পারবে না যে আমি কথা লাগিয়ে বেড়াই! ওই বদনামে আমার বড্ড রাগ হয়—দুঃখ হয়।

আপনি বলেন নি বউদিকে যে আমি নিজের নামে আলাদা কারবার করছি এখানে?

হ্যাঁ, বলেছি।...হকসায়েব জোরের সঙ্গে বললেন। সে কি মিথ্যে চন্দন-বাবু? বলুন, পাণ্ডেজীর সঙ্গে কী কথা হয়েছে আপনার? সব খবর এ হক বুড়োর কানে আসে।

চন্দন গজগজ করে বলল, আপনার সঙ্গে তর্ক করার সময় নেই আমার। সেজন্যেই তো সম্পর্ক চুকিয়ে চলে এলুম। রিকশো চালাও।

সামনে দাঁড়িয়ে হকসায়েব বললেন, সবুর বাবা।...পরক্ষণে রিকশোওলার দিকে তাকিয়ে কপালে রোদ আড়াল করতে হাত রেখে বলে উঠলেন, আরে, মুকুন্দ না? তুমি এ লাইনে কবে থেকে? কী কাণ্ড! কার রিকশো এটা?

মুকুন্দ রিকশোওলা হাসল। গামছাটা কোমরে ফতুয়ার ওপর বাঁধতে বাঁধতে বলল, নিজেই কিনলুম বাপজান। দশ কাঠা ছিল আর বাকি—তাই বেচে কিনলুম। বেচুবাবুরা তো বিশ্বাস করে একখানা বাইতে দিলেন না। ভাবলেন মুকুন্দ বেচে পালিয়ে যাবে দেশ ছেড়ে। ইদিকে আপনিও আশা দিয়ে রাখলেন।

হকসায়েব বললেন, হ্যাঁ—কিনব খানকতক। তবে সদ্য ধানটান উঠল—দর পাচ্ছিনে। ওদিকে রেশনের কারবারে তো এক গুচ্ছের লোকসান...

চন্দন গম্ভীর গলায় বলল, আমার দেরী হচ্ছে হকসায়েব।

হকসায়েবের এতক্ষণে যেন চন্দনকে মনে পড়ল।...চন্দনবাবু, আপনি বোধ হয় ভুল করলেন গো! এসময় ওনাদের ছেড়ে যাওয়া ঠিক হল না'

কেন? আপনি তো আছেন।

তা—থাকতে হবে বই কি। ওই আমার কাজ চন্দনবাবু। দুনিয়ার অনাথ এতিম লোক নিয়েই আমি থাকি—আপনি আমার কিছু জানেন না। যাক্ গে, রিকশো ঘোরান। বাবা মুকুন্দ, ঘোরা।

না। তুমি বাস স্টেশনে চলো।

চন্দনবাবু।

ক্ষমা করবেন হকসায়েব—যদি কিছু অন্যায় করে থাকি।

সামনে থেকে সরে হঠাৎ খিক খিক করে হেসে উঠলেন হকসায়েব।...রূপপুরে সবাই আসে—এখান থেকে কারো যাওয়া হয় না। তবে আপনি দেখুন, যেতে পারেন নাকি! এখানকার মাটিতে পরেশবাবুদের মতন বিস্তর লোক টাকা পুঁতে গেছো গো' এ মাটির ওপর যে পাখানি ফেলেছে, সেই মুখ নামিয়ে গন্ধ শুঁকেছে। আপনার মতনই সবায় এখানে একদিন এসেছিল চন্দনবাবু। যান, আসুন। আমার সাধ্য কি আপনাকে বাধা দিতে পারি? যে পারত—সেও...

রিকশো গড়াচ্ছিল। হকসায়েব ডাকতে ডাকতে এগোলেন—রুমা, ও মাজননী! শোন-শোন, যেও না। জরুরী কথা আছে।

চন্দন মুখ ঘুরিয়ে দেখল, রুমা হন-হন করে রাস্তা পেরিয়ে যাচ্ছে।...

বাসস্টেশনে এসে আচমকা সব রাগ পড়ে গেল চন্দনের। আচ্ছন্ন চোখে সে দূরে—অনেক দূরে পেট্রোল পাম্পটার দিকে তাকাল। একটা মায়া। এখনও হাতছানি দিচ্ছে। কেন এ হঠকারিতা করে ফেলল সে?

সামনে একটা বাস দাঁড়িয়ে আছে। আধ ঘণ্টা দেরী আছে ছাড়তে। দু পকেটে হাত পুরে ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগ্রেট ধরে একটু পায়চারী করল সে। সত্যি সত্যি চলে যাবে জিয়াগঞ্জে? হকসায়েব বলল যে, এখান থেকে কারো নাকি যাওয়া হয় না। কেন হবে না যাওয়া? সে যেতে পা বাড়িয়েছে তো!

কিন্তু একটার পর একটা বিরাট 'কিন্তু' এসে সামনে দাঁড়াচ্ছে নিরন্তর। আর রুমা কেন তাকে ওকথা বলল? কেন অমন করে বলল? চন্দনের বয়স খুব কম হয় নি। তার সেই বয়সের বড় অপমান করে বসল যেন রুমা।

স্যার, স্যার! এই যে! এখানে।

ব্রজ মাথাআদ্দি মাফলার জড়িয়ে একটা চায়ের দোকান থেকে বেরিয়েছে। তাকে ডাকছে। চন্দন পাল্টা ডাকল তাকে। ব্রজ দৌড়ে এল। তারপর জিনিস-পত্র দেখে চমকে উঠল।...কোথায় যাচ্ছেন হঠাৎ?

ম্লান হাসল চন্দন।...জিয়াগঞ্জ।

বাড়ী যাচ্ছেন? তা এসব সঙ্গে কেন? কবে আসছেন?

আর আসছিনে ব্রজবাবু। চাকরী ছেড়ে দিলুম।

এ্যাঁ...ব্রজর জিভ বেরিয়ে গেল।

হ্যাঁ সত্যি।

ব্রজ লাফিয়ে এসে ওর দু হাত ধরে ফেলল, যাঃ কী যে বলেন' আমি—আমি যে মারা পড়ে যাব স্যার। সর্বনাশ! তা হয় না—ওরে বাবা! হঠাৎ কী হল?

ভাববেন না—আপনার গাড়ি আমি নেব।

না—না স্যার। যাবেন কেন?...ব্রজ ছটফট করতে থাকল।. .আপনার যাওয়া হবে না স্যার। জানেন, শালা শংকরকে মারলুম কেন আজ? ও রাধাকে বলেছিল—ছোটবাবুর সঙ্গে তোর অত ঢলাঢলি কিসের? কেন তুই হারামজাদী ওকে আলাদা যত্ন করে খাওয়াবি? সব্বাই তোর খদ্দের—সব্বাই সমান।

চন্দন অবাক হল। আমার সঙ্গে ঢলাঢলি? রাধার? কে এসব বলে।

বলছি কী তবে! শালা শংকর বলে। চলুন। এক্ষুনি রাধিকের কাছে চলুন, রাধা কথায়-কথায় আমাকে বলে ফেলেছিল। আপনি লজ্জা পাবেন বলে কানে তুলি নি আপনার। সেই রাগ আজ ঝেড়ে দিয়েছি!

চন্দন সিগ্রেট দিল ওকে।...ছেড়ে দিন।

কিন্তু আপনার যাওয়া হবে না স্যার। চলুন, এক্ষুনি চলুন আমার বাসায়। জিনিসপত্র রেখে চলুন হাটুবাবুর গ্যারেজে। গাড়ীটা চোখেটোখে দেখে সব ঠিক করবেন। শুভস্য শীঘ্রং।

চন্দন একটু ভাবল। হকসায়েবের কথাটা কানে এখনও ভাসছে।

ব্রজ টানল ওকে।...কী কী পার্টস লাগবে, চোখে না দেখে এস্টিমেট করা ঠিক নয়। কী কিনছেন—যাচাই করে নিতে হবে না? এদিকে এতক্ষণ আমি বসে জল্পনা-কল্পনা করছি—আর আপনি কেটে পড়ছেন? এই রিকশো! এদিকে এস। এই জিনিসগুলো আমার বাসায় পেঁাছে দাও। চার আনা পাবে দাদু—ব্রজর খাতির। দেখো, 'পড়েটড়ে যায় না!

চন্দন বলল, কিন্তু...

রাখুন আপনার কিন্তু স্যার। 'আপনার জন্য জেলখাটার কাজ করে বসলুম। আর আপনি আমাকে ফেলে পালাবেন? হাসি আছে বাসায়। এত খুঁসি হবে—ভাবা যায় না! রিকশো আগে এগোতো। আমরা ধীরেসুস্থে যাচ্ছি। আর বউদিকে বলিস, জিয়াগঞ্জের স্যার এবেলা খাবেন।

রিকশোর জিনিসপত্তর চাপানো সারা। শুধু এ্যাটাচি কেসটা হাতে নিল চন্দন।

সতের

হাটুবাবুর গ্যারেজ থেকে যেদিন নতুন রং করা গাড়িটা বেরিয়ে আসে, সম্ভবত রূপপুরে বসন্তের হাওয়া বইতে শুরু করেছিল। ব্রজর সে কী কানফাটানো চিৎকার—আ রে মেরে রূপপুরবালি। আরররররর ছরছরাছর্ নাচনেবালি! প্রিং প্রিং হর্ণ বাজায় আর সিটে বসে পাছা ঠুকে নাচে ব্রজ ড্রাইভার। বিকট চ্যাঁচায় সে—চলো রে বিবিজান। উররররর্ ঝকমক শাড়ি ঠোঁটে পান। হেই যানেবানে লোক! বেজোর পিয়ারি ক্ষেপেছে হে ক্ষেপেছে!

হাইওয়ে দিয়ে জোরে ছুটছে স্টেশন ওয়াগানটা। ব্রজর চেঁচানি শুনে দুপাশে লোক জমে যাচ্ছে। গাড়িটার আষ্টেপিষ্টে রকমারি ফুলের ঝালর—যেন বিয়ের গাড়ি। আর সারাদুপুর মদও গিলেছে ব্রজ। চাপতে যাবার সময় তো রীতিমতো টলছিল। কিন্তু দুটো পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বলে নিয়েছে—ব্রজর পা টলে স্যার, হাত টলে না।

টলে না তা বোঝা যাচ্ছিল ক্রমশ। পড়ন্ত বেলায় মেলার ভিড় বাড়ে হাইওয়েতে। প্রতিমুহূর্তে চন্দন ভাবছিল এক্ষুনি একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। অথচ ঘটছে না। গরুর গাড়ি, রিকশো, ট্রাক, বাস আর পায়েচলাদের পাশ কাটিয়ে যেভাবে এগোচ্ছে, ব্রজকে বাহাদুরি দিতে হয়।

কিন্তু লজ্জায় পড়ে গেছে চন্দন। সে. আড়ষ্ট হয়ে ব্রজর বাঁয়ে নিজেকে কতকটা গোপন করেই বসেছে। এত হৈ-চৈ চেঁচামেচি আর পাগলামি শুরু করবে ব্রজ, সে ভাবতেই পারেনি। রুমাদের পেট্রোল পাম্পের সামনে আসতেই সে সিগ্রেট ধরানোর ছলে মাথা নিচু করেছিল। পরে মাথা তুলে পিছনে একবার দেখে নিয়েছে। হকসায়েব আর কারা যেন বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু কোন মেয়ে সেখানে ছিল না তা নিশ্চিত।

গাড়িটার চলার শক্তি যাচাই করতে গিয়ে ব্রজর মাথায় এত সব খেলে গেছে। গোড়ায় চন্দনের মৃদু আপত্তি শুনে সে একগাল হেসে বলে দিয়েছে—পাবলিসিটি

চাই স্যার, পাবলিসিটি! এখন মেলার মরশুম। রাস্তার লোক রাজ্য জুড়ে খবর ছড়াবে বুঝলেন না?

আসল উদ্দেশ্য যেন তা নয় ব্রজর। গাড়ি অচল হলে যারা ওকে ঠাট্টা কিংবা গাড়িটা সচল থাকতেও যারা রজতকে ব্যংগ-বিদ্রূপ করেছে—সবার চোখের সামনে এমনি করে ব্রজ তার শোধ তুলছে সম্ভবত। সে কখনও এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে—কখনো একেবারে ছেড়ে দিয়ে প্রচণ্ড চেঁচিয়ে সবার দৃষ্টি টানছে গাড়িটার দিকে। ছড়া কাটছে। গান গাচ্ছে। সীটে ধুপধাপ পাছা ঠুকছে আর কোমর দোলানোর চেষ্টা করছে।

চৌমাথার কাছে এসে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষল সে। আশ্চর্য হাত ব্রজর। গোল ছোট পার্কে ঘাসের ওপর প্রতিদিনের মতো আড্ডা দিচ্ছিল একদল ছেলে। ব্রজ হাত বাড়িয়ে ডাকল- কাম অন, কাম অন মাই ইয়ং ফ্রেন্ডস।

তারা লাফিয়ে উঠল। তারপর হুল্লোড় করে দৌড়ে এল রেলিং ডিঙিয়ে। আরে ব্বাস! এ যে ব্রজদার সেই রূপকুমারী···আরে, রূপকুমারী আজ ফুল-কুমারী হয়ে গেছে। এই ব্রজদা। ছাদে চাপব মাইরি! ব্রজদা, ও ব্রজদা, এ যে ময়ূরপংখী নাও ব্রজদা'

ছাদে মচমচ শব্দ হচ্ছিল। চন্দন উদ্বিগ্ন ভাবে বলল, আহা, ভেতরে জায়গা আছে! ব্রজ চোখ টিপল। ছাদে হুল্লোড় হচ্ছে। গান ধরেছে ওরা। আরো কারা সব দৌড়ে এল চারপাশ থেকে। এখানে চারদিকেই দোকান—চারটে রাস্তায় ছড়ানো': সামনেটায় হাইওয়ে বেরিয়ে গেছে। দুতিন মিনিটের মধ্যে গাড়ির ভিতর-বাইরে গাদাগাদি ভিড়। চন্দনের একটুও ভালো লাগছে না। ব্রজদার ওপর রাগ হচ্ছে। কিন্তু ব্রজ নির্বিকার হাসছে আর হেঁড়ে গলায় গান ধরেছে। গাড়ি ফের স্টার্ট দিয়ে সে মুখটা চন্দনের দিকে ঘুরিয়ে চোখে ঝিলিক তুলল। চাপা গলায় বলল, এইবার বুঝব কেমন হয়েছে—বুঝলেন স্যার? ওপরচাপ আর ভিতরচাপ সামলে বিবিজান নাচেন, জানবেন অলরাইট। নযতো ফের ওষুধ খাওয়াতে হবে।

হ্যাঁ—এ চাপ এখন সামলে নিলেও মাসটাক পরে বিবিজানের কি হবে, সেটা বলা কঠিন। চন্দন ভাবছিল। এ যাবৎ তৈরী শ্রেষ্ঠতম শক্তিশালী গাড়ির পক্ষেও রূপপুর রুটের এই ধকল সামলাতেই কিছুদিনেই হাঁপানি দেখা দেবে—তা বোঝা যাচ্ছে। রাজকমলবাবুর বউ কম দুঃখে এমন একটা আয়ের রাস্তা ছাড়েনি।

গাড়িও কিন্তু ব্রজর মতো বেপরোয়া। সমানে চলেছে আবার। ওপরে ছেলেগুলো সত্যি সত্যি নাচছে। মচমচানি বাড়তে সেটা বোঝা গেল। উদ্দাম হাওয়ার ঝাঁক এল ফাঁকা মাঠে পেঁছলে। ঢালু হয়ে নেমে গেছে পথ। দুধারে বড় গাছপালা নেই। শূন্য খয়েরি বাঁজা ভাঙা আর পিঙ্গল বিকেলের মাঠ। কোথাও কোন সবুজ নেই এদিকটায়। ধূ ধূ প্রান্তরের দিগন্তে সূর্যটা লাল হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ-হঠাৎ কোথাও একটা বাঁজা ডাঙার নিঃসঙ্গ বিশাল শিমুলের লাল ফুল দেখে মনে হয় এই কঠিন রুক্ষতাকেও বসন্তকাল মনে রেখেছিল।

তিন মাইল নেমে একটা বিলাঞ্চলের শুরু। দুপাশে বাবলা বন। বিকেল ফুরিয়ে এল। একটা শান্ত ধূসরতা নেমে আসতে থাকল মাঠের ওপর। আর সেই ধূসরতাকে বিশ্রীভাবে ফোঁড়াফুড়ি করে মাঝে মাঝে ট্রাক-বাসের খর হেড-

লাইট শিসিয়ে উঠল। ব্রজ চেঁচাচ্ছে—তফাৎ যাও, তফাৎ যাও! ছাদের ওপর সেই কথাটা কেড়ে নিয়ে ওরাও গর্জে উঠছে—তফাৎ যাও, তফাৎ যাও! সামনের ট্রাকটা চাকা নামিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। পাঞ্জাবী ড্রাইভার মুখ বার করে দেখছে। পিছনে একদঙ্গল কুলিকামিন লোক কী বুঝেছে কে জানে, হইচই করে সায় দিল যেন—কালো হয়ে আসা আকাশের পটে কতকগুলো হাত জোরে নড়তে থাকল। একটা বাসের পাশ কাটিয়ে যাবার সময় কানে এল—বেজা মলো রে! ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায়! বাসের এ্যাসিসট্যান্ট বাসের গায়ে থাপ্পড় মেরে বলল, ঠিক হ্যায়, ঠিক হ্যায়! আর চেনা ড্রাইভার দেখে ব্রজ পিছনের সেই বাসটার উদ্দেশ্যে চেঁচাল একবার—কান্তদা দেখা হবে হে!

দূরে আলোর ফুটকি জ্বলজ্বল করছে। আন্দি বাজার। আবার কী? এবার ফেরা যাক। চন্দন ডাকল, ব্রজদা!

ব্রজ মুখ ফেরাল।...দাদা বললেন! আপনিও? উরে ব্বাস! পরক্ষণে বিকট চেঁচিয়ে উঠল—হেই? রূপপুর যানেবালে!

ব্রেক কষে অন্ধকার পথে দাঁড়িয়ে গেছে গাড়িটা। সবাই সিগ্রেট জ্বালছে। হল্লার বিরতি নেই। চন্দন দেখল দক্ষিণ-পশ্চিমে বাঁকা চাঁদ উঠেছে। তার নিচে সমুদ্রের মতো ছড়ানো অন্ধকার। এই তো শুরু। গাড়ি ব্যাক করে সাবধানে ঘোরাচ্ছে ব্রজ। ছাদের ওপর থেকে কে আওয়াজ দিচ্ছে—ব্যস ব্যস ঠিক হ্যায়! রাস্তা এখানে পাশের জমির প্রায় সমতল। শুকনো নয়ানজুলি আর রাস্তার মধ্যে ঘাসের জমি।...ঠিক আছে, ঠিক আছে! ব্যস! আর নয়—গর্তে পড়বে। ঠিক হ্যায়, রোখকে গাড়ি ঘুরে রূপপুরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছে। তারপর চলতে থাকল। অমনি দ্বিগুণ বেড়ে উঠল হল্লা। সামনে হেডলাইট আবার। দূর হটো, দূর হটো! ব্রজ হেঁড়ে গলায় গান ধরেছে—দূর হটো, দূর হটো এ গাড়িবালে, রূপকুমারী চলল ঘর।

ফেরার পথে হাওয়া আরও বেড়েছে। একটু একটু ঠাণ্ডার ছোঁয়া আছে। পাদানী থেকে একটা লোক উঁকি মেরে চন্দনকে বলল, নমস্কার স্যার!

চিনতে পেরে চন্দন বলল, ব্যাপারী না? এতক্ষণ লক্ষ্যই করিনি। কখন চাপলেন আপনি?

চৌমাথায় স্যার।

ভিতরে এসে বসুন। এখানে জায়গা আছে।

সামনের দিকে চন্দনের পাশে তিনজন (এ লাইনের হিসেবে) বসে যাওয়া যায়। কেউ চন্দনের পাশে এসে বসেনি অথচ জায়গা ছিল। চন্দনের প্রতি রূপপুরের মানুষের সমীহ আছে—সেই প্রমাণ কি? খুসি মনে চন্দন ফের ডাকল চলে আসুন না।

মনিরুদ্দিন ব্যাপারী ভিতরে এল সাবধানে। তার চুলে ফুলেল তেলের কড়া গন্ধ। গায়ে নীল ফুলশার্ট, পরণে ধুতি, পায়ে বুটজুতো, গলায় মাফলার। ঠোঁটদুটো টুকটুকে লাল। বেজোদা, ভানুমতীর খেল দেখিয়ে দিলে হে! বহুত আচ্ছা!

ব্যাপারীদা?...ব্রজ চন্দনের বুকের কাছ দিয়ে থাঁবড়া মতো বাঁ-হাতটা বাড়িয়ে দিল।...ধুস্ শালা! তুমিও আছো, তা বলতে হয় এতক্ষণ!

পিছনে কোরাসে ফিল্মের গান গাইছে ওরা—অথবা গাইবার চেষ্টা করছে। নানা পর্দার গলা। সবাই স্ফূর্তিতে টালমাটাল। পাশের পাদানীতে কারা সারাক্ষণ হাসছে আর হাসছে। ব্রজ আওয়াজ তুলে বলল, কাল ছোটবিবিকে নিয়ে বহরমপুর চলো ব্যাপারীদা? স্যারের সামনেই বলছি, ওনার ভাড়া নেব না। মাইরি—দিব্যি।...

মনিরুদ্দীন ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করে হেসে বলল, তাই যাব হে, যাব। স্যার, আগে থেকে বলে রাখছি—একদিন গাঁয়ে আপনার গাড়িটা দিতে হবে।

কী ব্যাপার? চন্দন বলল।...নিশ্চয় দেব। গাড়ি তো আপনাদেরই।

আমার শালার বিয়ে! রাস্তা কাঁচা হলেও এখন শুখনো খটখটে। ব্রজ তো চেনেই।

যাবে চন্দন। এই তো নতুন জীবনের শুরু। অতর্কিতে এসে পড়েছে এদিকে। এও একটা অদ্ভুত জীবন—গতির ছন্দে বাঁধা—কিছু প্রচণ্ডতা নেই, কেমন যেন শান্ত স্বচ্ছন্দ হালকা একটা সুর। মেঠো পথে ধুলো উড়িয়ে চলবে তার সবুজ স্টেশনওয়াগন। গাড়ির মধ্যে বর আর কনে। ফুলের ঝালর। টোপর। কত সব মুখ, কত মানুষ।

চৌমাথায় ফিরে এল গাড়ি। বাজারের আলো চারপাশে। গাড়ি থেকে শেষ হল্লা চূড়ান্ত আওয়াজ দিয়ে ফেটে পড়ল। ধুপধাপ মচ-মচ নেমে যাচ্ছে সব। চলি বেজোদা, চলি স্যার। বেজো, কাল পুশুলে যাচ্ছি—সীট রেখো। ড্রাইভারদার সামনে সীট চাই কাল। ফরেস্ট বাংলোর কাছে উঠব। ব্রজদা...বেজোদা...ব্রজভাই! কতরকম। আর, স্যার—বুক ফুলিয়ে চালান গাড়ি, আমরা আছি।...ছোটবাবু নমস্কার—চললুম। দেখা হবে। স্যার, আপনার গাড়ির অক্ষয় পরমায়ু হোক। আর কেউ বাসে চাপবে না—সব আপনার ওপর, হে...হে...হে!

গাড়ি খালি হলে চন্দন বললে, পাশে কোথাও রেখে চলুন এবার চা খেয়ে নিই।

ব্রজ স্টিয়ারিংয়ের ওপর ঝুঁকে চুপচাপ ছিল কয়েক মিনিট। মুখ তুলে সোজা হল।...একটা স্বপ্নের মধ্যে কেটে গেল, তাই না স্যার? উঃ, আমার কী যে হচ্ছে!...সে দুহাত বাড়িয়ে চন্দনের পাদুটো ছোঁবার চেষ্টা করে কপালে ঠেকাল। চন্দন পা সরিয়ে নিয়েছে।...আপনি আমার জন্ম-জন্ম...

কী ব্রজদা?

কিছু না। গাড়ি সাইড করি।

বাস-স্ট্যাণ্ডের এক প্রান্তে ফাঁকা জায়গা দেখে গাড়ি রাখল ব্রজ। তারপর দুজনে নামল। ব্রজ আর টলছে না। চন্দন আড়ামোড়া ছেড়ে বলল, সাংগুভ্যালিতেই বসি চলুন।

ওভি ঠিক হ্যায়!...ব্রজ অনুসরণ করল তাকে। আঙুলে চাবির রিং আলোয় ঝিকমিক করে কাঁপছে। রিনঝিন দুলেদুলে বাজছে। গুনগুন করে গান গাইছে সে।

একটু চমকাল চন্দন। হকসায়েব দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা বলছে—স্টেশনারি দোকানটার সামনে—পরক্ষণে মুখটা গম্ভীর করল সে। উঁচু রাখল। পাশ কাটিয়ে এগোল।

কিন্তু গায়েপড়া ব্রজ এদিকে ডেকে ফেলেছে—হকসায়েব স্যার, এই যে, নমস্কার! আরে, এতক্ষণ রূপপুরে কী কাণ্ড হল—ছিলেন কোথায় গো? এ্যাঁ! ওই দেখুন—আমার রূপকুমারী বিবিজান গোর থেকে ঘুরে এসেছে। দোওয়া করুন।

হকসায়েব ঘুরে দাঁড়ালেন।...ব্রজ কেমন আছো? হ্যাঁ রে বাবা, হ্যাঁ—সব শুনেছি। তোমার মালিক কই? এ যে দিনে দুপুরে কেরামতী তেলেছমাতী (যাদু) বাবা ব্রজগোপাল।

মালিক ততক্ষণে হনহন করে সীতাংশুবাবুর চায়ের দোকানে ঢুকে পড়েছে।

ব্রজ ফিরে এলে সে বলল, ব্রজদা, হকসায়েবের সঙ্গে গাড়ি নিয়ে কী কথা হল?

ব্রজ হাসল। তাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে এবার। রুমালে মুখ মুছে বলল, হকসায়েব খুব খুসি। এ লাইনে সবাই খুসি হবে স্যার। হবে না কেন বলুন? ব্রজর মতো মজা দেবেটা কে বলুন? ওহে সীতাংশুদা, দেখতে পাচ্ছ তো?

সীতাংশুবাবু এগিয়ে এল কাউণ্টার থেকে। বলল সব শুনলুম চন্দনবাবু। ভালো ভালো। ব্রজর একটা গতিক হল অবশেষে। ও কার কাছে না সাধা-সাধি করেছে! যাক গে, ট্রায়াল কেমন হল হে ব্রজ?

ব্রজ সোল্লাসে বলল, আরে স্বাস! হার্ট-লাংস্ অব্দি বদলে গেছে! বিবি জানের নবযৌবনের শুরু, সীতাংশুদা!

ভিড় আছে টেবিলে। লেডিজগুলোর পর্দা পড়ে আছে। ঝকমকে পা দেখা যাচ্ছে—স্লিপারের সঙ্গে চপ্পল—নানারকম। চন্দন বলল, গাড়িটা তো নিলুম। আপনাদের আশীর্বাদ, সীতাংশুবাবু। দেখা যাক, নতুন ভেনচার—কী হয়।

হবে, হবে। এ লাইনে আঙুল ফুলে কলাগাছ হয় চন্দনবাবু। শুধু একটু-খানি ইয়ে চাই! ওরে নৃপতি, এদিকে চা আন। কিছু খাবেন চন্দনবাবু?

ব্রজ বলল, আমি অনেক খাব দাদা। তবে চা বিনিদুধে।...

সীতাংশুবাবু চলে যাচ্ছিল, চন্দন ডাকল—শুনুন।...চাপা গলায় সে বলল, সেই জায়গাটার কথা বলেছিলেন—

আরে, সে তো আর আপনারা এলেনই না। শুনেছি কোন মারোয়াড়ি এসে কথা বলে গেছে। হাজিসায়েবকে তাহলে ধরতে হয়।

কালই ধরুন না।

বললে নিশ্চয় ধরব। ওই তো আমার কাজ।...সীতাংশুবাবু ঝুঁকে এল। আর চন্দনবাবু। ওটার কী হল? পরেশবাবুর ভাগ্যে যা ছিল, ঘটে গেল। তাবলে অসমাপ্ত কাজটা সমাপ্ত করতে দেরী হচ্ছে কেন? যাব নাকি ওনার স্ত্রীর কাছে? আমি ভাবছিলুম, এ্যাদ্দিন শোক-দুখ সামলাতে গেল।

নাঃ। চন্দন হাসল।...ওটা ফেঁসে গেছে।

ফেঁসে গেছে? কে ফাঁসাল?

ব্রজ বলে উঠল, আরে ছাড়ুন দাদা! ওসব একেলে মেয়েদের নিয়ে স্যার বিপদে পড়বেন নাকি? পথেঘাটে প্রেম করে বেড়ায় যারা—ছোঃ!

সীতাংশুবাবু হো-হো করে হেসে উঠল।...ব্রজর মুখে রাখঢাক নেই।

চন্দন বিকৃতমুখে বলল, ও মেয়ে আমার চলবে না সীতাংশুবাবু।

তবে বলুন—অন্য মেয়ে দিচ্ছি। ওর চেয়ে রূপসী—উচ্চবংশ, পয়সাকড়ি আছে।

সে হবে। আগে জায়গাটা করে দিন শিগগির। চোতমাসের শেষেই বাড়িটা করার ইচ্ছে। জিয়াগঞ্জে ওদের খুব অসুবিধে হচ্ছে। দেখাশুনা করতে পারিনে—দূরে পড়ে আছি।

কালই দেখছি। তবে—অন্যটাও ভেবে দেখবেন। ভালো পাত্রী হাতে আছে।

ব্রজ শুধোল, এখানে ভালো পাত্রী আবার কে সীতাংশুদা ?

আছে, আছে। বলব'খন। আগে তোমার স্যারকে ঠিক করো।.. বলে সীতাংশুবাবু কাউণ্টারে চলে গেল।..

একটু পরে বেরোল দুজনে। অত উত্তেজনার পর ব্রজর ক্লান্তি স্বাভাবিক। কিন্তু চন্দন তো উত্তেজিত হয়নি মোটে। তবু তাকেও এত ক্লান্তি পেয়ে বসছে কেন ? সে চুল খামচে ধরে সেই স্টেশনারী দোকানটার দিকে তাকাল। হক-সায়েবকে দেখতে পেল না। গাড়ির কাছে এসে সাবধানে চারিদিক লক্ষ্য করল। দেখল না। গাড়িতে ঢুকে বলল, আমাকে পাণ্ডেজীর গদীতে নামিয়ে দিয়ে গাড়ি নিয়ে যান। আমি পরে যাচ্ছি।

ব্রজ স্টার্ট দিয়ে বলল, আজ গাড়ি আমার বাসার সামনে রাখব স্যার। কাল থেকে গ্যারেজে দেব।

বাইরে ফাঁকায় কোথা রাখবেন ?

ব্রজ হাসল।...আজ বউ ছেড়ে বিবিজানের সঙ্গে শোব—কিছু মনে করবেন না স্যার।

চন্দন হেসে উঠল।

গাড়ি চলতে শুরু করলে ব্রজ ডাকল, স্যার !

বলুন।

মাঝে মাঝে বেজা বেয়াদবি করবে। কানে নেবেন না।

নেব না।

মাঝে মাঝে হয়তো উল্টে আপনাকেই ধমকাব। রাজকমলদাকেও ধমকাতুম। কিছু মনে করবেন না।

বেশ তো।

ব্রজ গুনগুনিয়ে উঠল। সামনে বাঁ দিকে পাণ্ডেজীর গদী। ব্রেক কষে সে বলল, বেশি দেরী করবেন না। হাসিকে আজ হাসপাতাল যেতে বারণ করেছি। দুচারজন বন্ধুবান্ধব বেজার আছে স্যার—তাদের খেতে বলেছি। শিগগির ফিরবেন কিন্তু। এ লাইনে যখন এলেন, চেনাজানা থাকা দরকার। হঠাৎ শালা ব্রজ পটল তুললেও আপনার গাড়িকে তো গড়াতে হবে।

চন্দন ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, আরে—গাড়ির আসল মালিক তো আপনি।

ব্রজ বিকট চেঁচিয়ে উঠল—হেই রূপপুর যানেবালে !.....

পাণ্ডেজী নিচে দাঁড়িয়েছিলেন। চন্দনকে দেখে বললেন, আসুন, আসুন ! আপনার কথাই ভাবছিলুম। তখন তো দেখলুম, খুব—একদম হল্লা করে চলেছেন...

নাঃ। ওরা চেঁচাচ্ছিল। ব্রজর পাগলামি।

চলুন, ওপরে যাই।

ওপরে খোলা ছাদে একটা সতরঞ্জি বিছিয়ে দিলেন পাণ্ডেজী। বসে বললেন, তো ঠিক লাইনসে এসে গেলেন চন্দনবাবু। আভি তো বিয়ের মরশুম সুরু হচ্ছে, খুব চাহিদা হবে। দিনে দোনো ট্রিপ, ব্যস। আর ব্রজও খুব সাচ্চা লোক। ওকে বিশওয়াস করা যায়।

চন্দন বলল, অ্যাসিস্ট্যান্ট কাকেও রাখছি নে অবশ্যি। নিজে থাকব ওর সঙ্গে।

রুট-পারমিট মিলেছে?

হ্যাঁ। আগের রুটেই।

তো ব্যস। মজাসে চালিয়ে যান।

পাণ্ডেজী, একটা এজেন্সি পাইয়ে দেবেন—বলছিলেন।

জরুর। পঁচ্চিশ পারসেণ্ট ডিপজিট সিরফ্। ব্যস! রুপেয়া না থাকলে আমার কাছে লিন।

সে কিছু আছে, পাণ্ডেজী। সে জন্যে ভাববেন না।

হঠাৎ একটু ঝুঁকে চাপা হেসে পাণ্ডেজী বললেন, সে আমি অনেক আগে টের পেয়েছি চন্দনবাবু। পরেশবাবুকে আমি ভাল জানত।...তারপর ফিসফিস করে বললেন, কেতনা মিলা হ্যায় আপকো?

শিউরে উঠল চন্দন। অদূরে রাস্তার শালকাঠের পোস্ট থেকে সামান্য আলোর ছটা এসে ছাদে অস্পষ্ট আলো পড়েছে। পাণ্ডেজীর চোখ দুটো জ্বলছে যেন। হঠাৎ এক মুহূর্ত লোকটাকে অসম্ভব ধূর্ত মনে হল। বুক ঢিপ ঢিপ করে উঠল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে অবশ হয়ে পড়ল। আড়ষ্টভাবে শুধু বলল, তার মানে?

খিকখিক করে হাসলেন পাণ্ডেজী।...আমি জানি বেচুবাবুর কাছে ছিল তিশ হাজার। এক চালানের পুরা টাকা। লেকিন, সাঁইথিয়ার তিন ট্রাক মালের হিসেব আমার ছিল। উন্নিশ জানুয়ারি মাল পঁহুছ গেল। তেইশ রোজ সেগুলো গেল বর্ডারের দিকে। মনে পড়ছে চন্দনবাবু? আমি আপনার সাথে গল্প করছিলুম—পরেশবাবু এসে গেলেন। আমি টাকার গন্ধ পাই, চন্দনবাবু। পরেশবাবুর সাথে সেদিন কমসে কম দো লাখ থাকবার কথা। তো...

চন্দন তেঁতো হয়ে বলল, ওসব কিছু জানি নে। ছেড়ে দিন।

হাঁ—ছেড়ে তো দেবই। ঠিক হ্যায়, ছেড়ে দিলুম। চা খাবেন?

নাঃ।

তবে মেঠাই খান।

না। আমি যাই, পাণ্ডেজী। কথাটা মনে রাখবেন।

চন্দনবাবু!

বলুন।

রাগ করবেন না আমার ওপর। পরেশবাবুর টাকা যার যার কাছে ছিল, এখন তাদেরই হয়ে গেল। কে দাবী করতে পারবে বলুন? তো এক বাত, চন্দনবাবু, নুটুবাবুর জেনানা বহুৎ ঝামেলা করছে ওনাদের। হুকসায়েব বলছিলেন।

তা আমি কী করতে পারি?

হঠাৎ পাণ্ডেজী ওর একটা হাতে হাত দিলেন।...চন্দনবাবু, টাকা সবাই কামায়। কিন্তু বড়া দিল সবার থাকে না। বেচুকে বললুম, ওনারা জেনানা লোক—ঝামেলা হচ্ছে। তো তুমি ফয়সালা করে দাও। বেচু রাগ করল। আমি বলি—চন্দনবাবু আপনি এখন ওটার ফায়সালা করে দিন। যদি কুছ রুপেয়া লাগে দিয়ে দিন।

চন্দন হাসবার চেষ্টা করে বলল, আমি কোত্থেকে দেব? সে তো অনেক টাকার ব্যাপার। তবে বউদিরাও তো এখন প্রচুর টাকার মালিক। পরেশদা ওদের দিয়ে গেছে, জানেন না?

জানি। রুমাকে নিয়ে পরেশবাবুর স্ত্রী এসেছিলেন। বলেছেন—কিছু টাকা আছে। তবে সে সামান্য টাকা। আপনি একটু কোশিশ করুন। আপনি সিকিটা দিন। বেচুকে আবার ধরছি। হকসায়েব আর আমি দুজনেই বলছি। শিশির-বাবুও কথা দিয়েছেন—ভাইকে দেখবেন।

চন্দন এক নিশ্বাসে বলে দিল, ঠিক আছে—দেব।

পরক্ষণে তার ভিতরটা রাগে থমথম করতে থাকল। ভয়ও হল তার। পাণ্ডেজী কী ঘড়েল মানুষ! পরেশের সব গতিবিধি—সব রোজগারের হিসেব যেন তার শ্যেনচক্ষু এড়াতে পারে নি কোনদিন। চন্দন এখানে যা কিছু করবে, তাও তার চতুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টির আড়ালে হয়তো থাকবে না। একে এড়িয়ে থাকাই সঙ্গত। এজেন্সি সে নেবে না। শুধু গাড়ি নিয়েই চলুক।

ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করবেন চন্দনবাবু।...পাণ্ডেজী বললেন।

চন্দনের বলতে ইচ্ছে হল, এতো ঈশ্বর-বিশ্বাসী ধর্মভীরু লোক তুমি পাণ্ডেজী, তা তুমিই সব দেনাটা শোধ করে দাও না? বলতে পারল না সে। আর এক মুহূর্তও এখানে বসে থাকতে ইচ্ছে করছিল না তার। সে উঠে দাঁড়াল। ...তাই হবে, এখন আসি। যখন দরকার হবে। বলে পাঠাবেন আমি দিয়ে দেব।

পাণ্ডেজী রাস্তা অব্দি সঙ্গে এলেন।...রাগ করলেন না তো চন্দনবাবু? রাগ করবেন না। কারবারী লোকের রাগ করা ঠিক নয়। চামড়া শক্ত থাকা চাই।

থাকবে।...বলে চন্দন চলে এল।

হাঁটতে হাঁটতে আগাগোড়া সবটা ভাবল সে। কী চমৎকার সহজভাবে পাণ্ডেজী তাকে প্রায় ন্যাংটো করে দেখে নিলেন আসলে! কী বোকা সে, এত বোকা! এর চেয়ে ইলেকট্রিক মিস্তিরি হয়ে থাকাই তার উচিত ছিল। কেন সে চড়া সুরে প্রতিবাদ করে বলল না যে পরেশ মজুমদারের কালো টাকার একটু-খানিও সে পায় নি? ওটা তার দুর্বলতা। তাকে আরও চতুর আর নির্বিকার হতে হবে। শক্তিমান হতে হবে। দয়ামায়া-করুণা-ভালোবাসা এই সব জিনিস-গুলো থেকে দূরে থাকতে হবে। বিবেককে পুরো খতম করা দরকার তার।

তা যদি না পারে, তাহলে এক্ষুনি এ্যাটাসি কেস আর গাড়িটা নিয়ে স্নেহ-ধারার কছে যাওয়া উচিত। সব ওদের ফিরিয়ে দিয়ে সোজা জিয়াগঞ্জ ফিরে যাওয়া উচিত।

রুমাকে মনে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হয়ে গেল তার ঔচিত্যবোধ-টুকু। এত রাগ, এত ঘৃণা যে একটা অতটুকু মেয়ের ওপর কারো হতে পারে,

ভাবতেও পারে নি কোনদিন। ইচ্ছে করে বা চেষ্টা করে আর কোন মতে সহজ থাকা যাচ্ছে না। খালি মনে হচ্ছে, রুমা—রুমা তার অস্তিত্বকে, তার মানুষের জীবনটাকে ভীষণ অপমান করেছে। এর যে কোন ধরনের প্রতিশোধ তার চাই-ই।

ভিড়ের ভিতর হেঁটে সে অনেক দূর এগোল অন্যমনস্কভাবে। ডাইনে ব্রজর বাসার রাস্তা। বাঁদিকে এখানটা কিছু ফাঁকা—গাছপালা আছে পিছনটায়। তারই ওদিকে নুটুবাবুর বাড়িটা। মাথার ভিতর একটা অদ্ভুত ইচ্ছে সুড় সুড় করে উঠল। সুনন্দিতার কাছে গিয়ে জানতে ইচ্ছে হল, সত্যি সত্যি কত টাকা পরেশ ওর কাছে দেনা করেছে। কিংবা এ শুধু সুনন্দিতার একটা খেলা! মৃত প্রেমিকের স্ত্রীকে নিয়ে অদ্ভুত তামাসার খেলা করছে না তো মহিলাটি? ব্যাপারটার মধ্যে একটা অসংগতি লক্ষ্য করেছে চন্দন। পরেশ তার সব দেনাপাওনার খবর চন্দনকে বরাবর দিয়েছে। ওটা যদি সত্যি হয়, তাহলে অন্তত চন্দনের কাছে লুকোনর কী দরকার ছিল পরেশের? তাছাড়া—এত লাখো লাখো টাকা দু-পাশে যে জড়ো করে বাস করেছে, তার পক্ষে সুনন্দিতার ওই সামান্য টাকা দিয়ে দেওয়া সম্ভব হয় নি কেন? গোলমাল কোথাও একটা আছে। সম্ভবত পরেশের সই-গুলো জাল। এ বেচুবাবুরই কোন চক্রান্ত। সুনন্দিতার সঙ্গে বেচুবাবুর কোন গোপন সম্পর্ক নেই তো? সম্ভবত নেই। থাকলে কারো না কারো কাছে তার আভাস পাওয়া যেত।

গাছপালার ভিতর থেকে আলো দেখা যাচ্ছিল। তারপর কুকুরের গর্জন শোনা গেল যথারীতি। বিলাস বলে উঠল, কে ওখানে?

চন্দন সাড়া দিয়ে বলল, আমি—ওঁর সঙ্গে একটু দেখা করব।

পর্দা তুলে সুনন্দিতা বেরোল।...কে এল বিলাসকা?

চন্দন এগিয়ে নমস্কার করল।

সুনন্দিতা যেন কয়েক মুহূর্ত দেখে নিল তাকে। তারপর বলল, ও, আপনি। আসুন, আসুন! ভেতরেই আসুন।

বিলাস কুকুরটা টানতে টানতে ওদিকে কোথায় নিয়ে গেল। চন্দন ভিতরে ঢুকে সোফায় বসল। তারপর বলল, অনেক দিন থেকে আসব ভাবি, আসা হয় না। পরেশদার মুখে আপনার কত কথা শুনেছি।

সুনন্দিতা একটা ভ্রু আশ্চর্য ভঙ্গীতে তুলে বলল, আমার কথা! তাই নাকি? কী কথা?

হ্যাঁ। সে অনেক। আপনাদের এখানেই তো পরেশদা থাকতেন। সেই সব গল্প।

বলুন, চা—না কফি?

হঠাৎ এই পরিবেশ আর সুনন্দিতার কণ্ঠস্বর মিলে একটা হালকা খুশির আমেজ এসে গেল চন্দনের মনে। সে বলল, কফি। আপনি একা একা তাস খেলেন দেখছি।

মৃদু হাসল সুনন্দিতা।...খেলি। সময় কাটাই।

একা কী খেলেন?

সরমা, কফির জল।...বলে সুনন্দিতা খোলা চুলের গোছা পিঠে সরিয়ে নিল।... পেসেন্স খেলি। আপনার পরেশদার শিক্ষা। তবে মাঝে মাঝে জুটিও পেয়ে যাই।

চন্দন চটুল স্বরে বলল, রুমা এখনও আসে নাকি ?

কে, রুমা ?...সুনন্দিতা হেসে উঠল। তারপর মাথা দোলাল!...আর আসে না। রাগ হয়েছে! ওর দিদির ওপর মামলা করতে যাচ্ছি যে।

শুনেছি। অবশ্যি, আপনি হয়তো জানেন—আমি ওদের ওখানে নেই এখন।

জানি বইকি। সব কানে আসে। ব্রজর গাড়ি কিনেছেন। ব্রজর বাসায় বাস করছেন। আরও জানি...

ওকে থমকে যেতে দেখে চন্দন বলল, আর ?

আসুন, তাস খেলি। তেমন কোন জরুরী দরকার নেই নিশ্চয় ?

তা নেই। কিন্তু দু'জনে কী খেলব ?

আছে—শিখিয়ে দিচ্ছি।...সুনন্দিতা তাস গোছাতে সুরু করল।

মহিলাটি সুস্থ মস্তিষ্কের তো ? নাকি ছিটগ্রস্ত ? চন্দন দারুন অবাক হয়ে গেল। নতুন আলাপ সবে—আর এরই মধ্যে নিঃসংকোচে তাস খেলার আমন্ত্রণ ! সে একটু দ্বিধায় পড়ে গেল। অথচ এত ভালো লাগছিল সুনন্দিতাকে। যেন কতদিনের চেনাজানা—অনেক বার দেখা আর আলাপ—মুখের প্রতিটি রেখা বা দেহের প্রতিটি ভাঁজ এত চেনা লাগে।

সুনন্দিতা যেন টের পেয়েই বলল, আমার কাছে যে আসে—তাকেই তাস খেলতে হয় চন্দনবাবু। এ আমার হবি—ভীষণ বদঅভ্যাস। তাছাড়া আর কী করব। পরক্ষণে একটু হাসল সে। ফের বলল, অবশ্যি আমার কাছে কেউ আর আসেই না আজকাল। আমি খুব খারাপ মেয়ে কিনা। এই যে আপনি এসেছেন—কেন এসেছেন বেশ বুঝেছি—তবে সে সব পরে হচ্ছে। এখন খেলা। আর কিছু নয়। আপত্তি না থাকলে রেডিওটা খুলে দিই ?

চন্দনের ভিতরটা দারুণ অস্বস্তিতে শিরশির করে উঠল।

আঠারো

অনেক রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল চন্দনের। কয়েক মিনিট আচ্ছন্নভাবে পড়ে থাকল সে। ঘরের ভিতর ঘুরঘুট্টে অন্ধকার। জানলা বন্ধ করল কে ? বাইরে হ্যাজাগ জ্বলছিল মনে পড়ছে। শোবার পর কতক্ষণ সেটার একটানা শোঁ শোঁ আওয়াজ শোনা গেছে। এখন আওয়াজটা বন্ধ। রাতের গভীর স্তব্ধতা সব-দিকে। বাড়ির বাইরে গাড়িটা রেখে তার ছাদে চিত হয়ে ঘুমোচ্ছে ব্রজ। আজ বেঘোরে ঘুমোবার কথা তার। ব্রজর ছ-সাত জন ড্রাইভার বন্ধুর নেমতন্ন ছিল। চন্দন সুনন্দিতার বাড়ি থেকে আসতে একটু দেরী হয়েছিল। খাওয়া-দাওয়া শেষ হতে রাত বারোটা বেজে গিয়েছিল। তারপর সকলকে বিদায় দিয়ে চন্দন শুয়েছে। সুনন্দিতার কথা ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। শরীরটা বেশ ক্লান্ত লাগছিল আজ। সেই ক্লান্তির মধ্যে সুনন্দিতাকে ভাবছিল সে—টের পাচ্ছিল ওই বাংলোবাড়ি থেকে একটা তীব্র কামনা নিয়ে ফিরেছে। দারুণ 'সেকসি' গড়ন সুনন্দিতার। ওকে খুব সহজে একবার চুমু খাওয়া যায় না কি ? অনেক চাপা বাসনা-কামনার ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়া সাংঘাতিক একটা মেয়ে —মানে ওই ভদ্রমহিলা। ভিতরটা গরগর করছিল কতক্ষণ। বাইরে হ্যাজাগের

গর্জন যেন তারই শরীর-ফাটানো একটা চাপা চিৎকার—এবং ঘুমের ভিতরও সেটা বয়ে নিয়ে গেছে সে। আর দেখেছে, সুনন্দিতার বদলে, রুমা তার গা ঘেঁষে শুয়ে আছে। গঙ্গার ধারে বালিয়াড়ির ওপর ঝোপঝাড়, পায়ের নিচে জল, চান্দিকে কত সব লোক! তবু জন্তুর মতন যৌনতা তাদের ওপর বসে আছে—এইসব উদ্ভট ব্যাপার। কিন্তু প্রথমে স্বপ্ন—তারপর ঘুমটা ভাঙ্গার পর কয়েক মিনিট স্বপ্নের স্মৃতি অন্ধকারে চাপা পড়ে গেল। শুধু মনে পড়ল, জানলা বন্ধ ছিল না। দরজাটা ছিল তো? নাকি ভুলে গিয়েছিল বন্ধ করতে? সর্বনাশ!

পরক্ষণে চমকে উঠল সে। তার বুকের ওপর একটা কী পড়ল। সাপ? সে নড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তক্তাপোষটা মচমচ করে উঠল। তারপরই টের পেল, কে একজন তার পাশে শুয়ে আছে। অস্ফুট কণ্ঠে বলে উঠল, কে? অমনি একটা হাত তার ঠোঁটের ওপর নেমে এল। ক্ষীণ মিঠে শব্দ বাজল—চুড়ি কিংবা বালার। তারপর স্পষ্ট একটা নারীশরীর তার গায়ে ঘন হল। নগ্ন স্তনের চাপ টের পেল চন্দন। একটা শ্বাস প্রশ্বাসের গন্ধ তাকে মুহূর্তে অবশ করে ফেলল।

দুহাতে শরীরটা টেনে নিল চন্দন। উদ্দাম ঝড় এসে পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। অন্ধকার ভিজিয়ে দিল প্রবল ধরনের বৃষ্টি। শরীরে কী অলৌকিকতা নিয়ে মানুষ বাস করে, এই প্রথম স্পষ্টভাবে জানতে পারছিল সে। যে অলৌকিকতা সব লৌকিক আচারবিচার নিয়মনিষ্ঠাকে পলকে লাথি মেরে তাড়ায়।

কতক্ষণ পরে চন্দন উঠল। অন্যজনও উঠল। চন্দন যখন দরজার কাছে, তখন সে হয়তো দ্রুত কাপড়চোপড় ঠিকঠাক করতে ব্যস্ত। অবাক হয়ে চন্দন টের পেল, দরজাটা বন্ধ করতেই ভুলে গিয়েছিল আদতে। ঘরে অতসব নগদ টাকা! কী মারাত্মক ভুল হয়ে গিয়েছিল!

বাইরে বেরিয়ে মনে হল, মারাত্মক ভুল কিছু নয়। একটা সুন্দর চান্স মাত্র। কিন্তু আশ্চর্য, এসব একটুও ভাবেনি সে। ব্রজর হাসিখুসি চালাক-চতুর মুখরা বউটির চাহনিতে বা শরীরের কোথাও এইসব ব্যাপার লেখা ছিল না তো! হয়তো ছিলও—চন্দন লক্ষ্য করেনি। নিজের সম্পর্কে মনে মনে সাফাই দিল সে—আমি লম্পট নই—কিন্তু পুরুষমানুষ নিশ্চয়।

হাসি বেরিয়ে এসে তার কাঁধে হাত রাখল। ফিসফিস করে বলল, রাগ করোনি তো?

চন্দন অন্ধকার বারান্দায় দুহাতে ওকে জড়িয়ে চুমু খেল।...মোটেও না। তোমাকে এত ভালো লাগল।

জানো? আমিও প্রথমে ভাবিনি তুমি—

কী?

মানে—ভেবেছিলুম তুমি কী চেঁচামেচি করে বসবে। কিন্তু বিশ্বাস করো, আজ আমি আর থাকতে পারিনি। প্রতি রাতে তোমার কাছে আসার জন্যে ছটফট করেছি—দরজা বন্ধ! সাহসও হয়নি—লজ্জা করত। আজ হঠাৎ দেখি দরজা খোলা। কী বেআক্কেলে মানুষ রে বাবা! হাসি ফিসফিসিয়ে হাসল।

বোঝা যাচ্ছিল, ওর মতো খুসি এখন আর এ পৃথিবীতে কেউ নয়। নিশ্চয় এসব অভ্যাস এ মেয়ের বরাবর আছে। অর্ধশিক্ষিতা নাগরী মেয়ে—প্রেম-ভালবাসা কোন ব্যাপারই নয়। বেচারা ব্রজ! চন্দন আরেকবার চুমু খেল ওকে। তারপর আদর করে বলল, চুপচাপ এবার শুয়ে পড়গে যাও। ও জেগে যেতে পারে।

হাসি ঘন হয়ে বলল, তোমার মাথা খারাপ। রোদ গায়ে না পড়লে নেশা ভাঙবে না।

হাসি?

উঁঃ?

আজ তোমার এই নতুন? নাকি···

যাঃ! তোমার বুকে হাত দিয়ে বলছি—বিশ্বাস করো। তোমাকে দেখে অব্দি আমার মাথার ঠিক ছিল না। কতবার তোমাকে ইসারা দিতুম, বুঝতেই পারতে না। তুমি যেন কী।

হাসি, তোমাকে এর জন্যে টাকাপয়সা দিতে হবে না তো? না হবে?

হাসি ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল। পরক্ষণে সরে এসে বলল, তোমার অনেক টাকা আছে জানি। কিন্তু আমার যে অনেক ক্ষিদে আছে ছোটবাবু। আমার জীবনটা যে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছে। আমাকে তুমি বুঝবে না। ওই মাতাল হিজড়ে লোকটার ঘর করতে এসে আমার সাধ-আকাঙ্ক্ষা সব যেতে বসেছে।

চন্দন আরও আদর দিয়ে ওর কান্না ভাবটা থামিয়ে দিতে চাইল। তারপর উঠোনে নামল। হাসিও নিঃশব্দে নেমে খিড়কি দরজাটা খুলে ঘাটের দিকে চলে গেল।

চন্দন বেরোল সদর দরজায়। গাড়ির ওপর নাক ডাকছে ব্রজর। শালা মাতাল! করুণা নয়—কেমন ঘৃণা হল লোকটাকে। ওর অতৃপ্ত বউটার খাঁকতি মেটানোর যেন দায়িত্ব পড়ে গেছে চন্দনের। কিন্তু কোন কোন সময় অবশ্য যৌনতার খোলা দরজায় অনেক ক্লান্তি দুঃখ হতাশা আর ঘৃণা বেরিয়ে পালায়। এখন বেশ হালকা লাগছে নিজেকে। যৌবনের দিনগুলো কী ব্যর্থ, কী বাজে! কোন মেয়ে ছিল না, কামনা-বাসনাকে এড়িয়ে হাঁটত, এই ধারাবাহিক বোকামির কোন মানে হয় না। এখন মনে হচ্ছে, রুমাকে কোনদিন কোন সুযোগে আক্রমণ করে বসলেই বা কী ক্ষতি ছিল? অন্তত পস্তানির হাত থেকে বাঁচা যেত। রুমা হয়তো আপত্তি করত না—কারণ সে বলেছিল, তুমি তো কখনও জোর করতে পারলে না! যাক গে—সে সুযোগ চলে গেছে।

তবে এ মন্দ হল না। হাসি—মেয়ে হিসাবে মন্দ নয়, মানে—শারীরিক দিক থেকে। তারপর সুনন্দিতা—অবশ্য সুনন্দিতা হল কি না 'ভদ্রমহিলা'। অনেক সব প্যাঁচালো ব্যাপার থাকে এদের। দেহের কাছে পৌঁছতে বিস্তর হাঙ্গামা—অনেক সেন্টিমেন্টাল কাজকারবার করতে হয়। অতসব ধকল সইবে না আর—যখন হাসি নামে একটা দারুণ যৌবন বড় সহজে মিলে গেল?

নিজের মনে হেসে সে একবার ব্রজকে শালা সম্বোধনে ডাকবে ভাবল। কিন্তু ডাকল না। পরনে ডোরাকাটা আন্ডারপ্যান্ট খালি গা চন্দনের। গা শিরশির করছে ঠান্ডায়। শেষ রাতে বেশ ঠান্ডা পড়ে এখনও। আকাশ ঝকমক করছে। এত নক্ষত্র থাকে আকাশে কোন রাতে লক্ষ্য করা হয়নি। বড় রাস্তা থেকে গাড়ি

চলার আওয়াজ আসছে। ব্রজর নাক সমানে ডেকে চলেছে। সেই সময় হাসি এল বেরিয়ে। তেমনি চাপা গলায় বলল সে, মাতালের কাণ্ড! একটুও শীত করে না—আশ্চর্য লাগে! খালি গেঞ্জি গায়ে শিশিরের মধ্যে ঘুমোচ্ছে দ্যাখো না!

পাদানীতে উঠে তড়াক করে ছাদে চাপল সে। একটা চাদর চাপিয়ে দিতে দিতে ফের বলল, ঘরে শুলেই পারে। নিমুনি ধরলে তখন দেখবে কে? আমি বাবা হাসপাতাল ছেড়ে তোমার মাথার কাছে রাত জাগতে পারব না বলে দিচ্ছি।

ব্রজর সাড়া নেই।

নেমে এসে ভীষণ ফিসফিসিয়ে চন্দনকে বলল, বলছিলুম না? ওই অভ্যেস। তুলে নিচে ফেলে দাও না—মাটিতে পড়েও নাক ডাকবে। এস।

দরজা বন্ধ করে উঠোন পেরিয়ে দুজনে বারান্দায় উঠল। চন্দন বলল, রাত শেষ হয়ে এল। ভালো ঘুম হয়নি। কাল আমার এ লাইনে প্রথম দিন। একটু ঘুমিয়ে নিই ফের।

হাসি ওর হাত ধরে বলল, নাঃ, আর ঘুমোয় না। চলো, তোমার কাছে খানিক শুয়ে থাকি।

আঁতকে উঠল চন্দন। না, না,। আর নয়। হাসি, কথা শোন। ও জেগে যেতে পারে।

তুমি পুরুষ না মেয়ে? হিসহিস করে হাসছে ব্রজ ড্রাইভারের বউ।...তোমার ঘর থেকে আমার ঘরে যাবার দরজাটা খুলে রাখলেই হবে। কোন অসুবিধে নেই। চলো।

চন্দনের ঠাণ্ডা ভাবটা উবে গেছে। এই আসঙ্গমত্তা বাঘিনীকে এবার তার ভয় লাগছে। সবটুকু পুরুষরক্ত পান না করে যেন সে নিষ্কৃতি দেবে না। তাকে টানতে-টানতে ঘরে নিয়ে যাচ্ছে সে। দরজা নিঃশব্দে বন্ধ করার পর ভারি অন্ধকারটা চেপে বসল এবার। চন্দন খুব ভয়ে ভয়ে গেল। ব্রজড্রাইভারের বউ তার বুকের ওপর থেকে আবার বলল, তোমাকে আমি সহজে ছেড়ে দেব না। আমার ভীষণ—ভীষণ ক্ষিদে, তা জানো না? ইচ্ছে করে পৃথিবী সুদ্ধ গিলে খাই।

কতক্ষণ—কতঘণ্টা স্যাঁতসেঁতে পুরু একটা অন্ধকারের মধ্যে হাঁসফাঁস করার পর বাইরে ভোরের আলো ফুটেছে, হিসেব নেই। লোকে পাশে মেয়ে নিয়ে ঘুমোয় কেমন করে কে জানে। তারপর ব্রজর ডাকাডাকি শুনেছে। চমকে উঠে দেখেছে, হাসি তাকে আঁকড়ে ধরে ঘুমোচ্ছে এতক্ষণ। এতটুকু ভয় নেই মেয়েটার! ওকে খোঁচাখুঁচি করে জাগিয়ে দিতে বেশ সময় লাগল। ব্রজ সমানে ধাক্কা দিচ্ছে সদর-দরজায় আর চেঁচাচ্ছে, হাসি, হাসি! এই মাগী! বোঝা যায়, ভীষণ রেগে গেছে লোকটা।

হাসি হাসছিল। নিঃশব্দে হাসছিল আর সাড়িটা নতুন করে পরছিল? যতক্ষণ না পরা হল, চন্দন কাঠ হয়ে শুয়ে রইল। এ ঘর থেকে ও-ঘরে যাওয়ার দরজাটা এদিক থেকে খোলা যায়। মনে পড়ল, ও-ঘরে এই দরজাটার ওপর একটা কাপড়রাখা আলনা আছে।

তার ফাঁক দিয়ে হাসি গলে গেলে এবং তার চোখের ঝিলিকটা মনে রেখে

চন্দন দরজাটা সাবধানে আগের মতোই আটকে দিল। তারপর বারান্দার দিকের দরজা খুলে বেরোল। সাড়া দিয়ে বলল, খুলছি ব্রজদা।

ব্রজ চন্দনকে দেখে হেসে উঠল, আপনাকে গাল দিইনি স্যার—আমার বউকে দিচ্ছিলুম। রাগ করেন নি তো?

চন্দনও হাসল। ব্রজ বারান্দায় উঠে হাসির ঘরের দরজায় দাঁড়াতেই সেটা খুলে গেল। হাসি চোখ কচলাচ্ছে। বলল, অনেককাল পরে একটা রাত্তির ঘুমোতে পেলাম, তো তোমার চেঁচামেচি। আমার কপালটাই এমন।

ব্রজ হাস্যকর ভঙ্গীতে আড়মোড়া দিয়ে হাই তুলে এ্যাটেনসেন হয়ে দাঁড়াল। স্যার, আজ বেড টি হবার আশা নেই আপনার। কারণ, আগেই উঠে পড়েছেন। তো ইয়ে—হাসি!

হুঁ। বলো।...হাসি দু'হাত তুলে চুল বাঁধছিল। দাঁতে সাড়ির পাড় কামড়ানো। ভোরের আধফোটা আলোয় এবার ওকে দেখে চন্দনের এদিকে মনটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছে। হাসি এত সুন্দরী আর স্বাস্থ্যবতী মেয়ে! অন্ধকারে তার স্বাদটুকু যা নেওয়া হয়েছিল, এখন মনে হচ্ছে—তা যথেষ্ট নয়। আরও অনেক কিছু দিতে পারত এই মেয়েটা—যদি একটা আলো থাকত তখন।

আমরা এ বেলা খেয়ে বেরোচ্ছিনে।...ব্রজ বলল। কী বলেন স্যার। দেরী হয়ে যাবে। ঠিকঠাক নটায় ট্রিপ দেব। একেবারে কাঁটায় কাঁটায়। 'সাইতে'র প্রথম দিন। ঘুম ভাঙতেই জোড়া শালিক একেবারে মাথার কাছে এসে বসেছে—

হাসি ভুরু কুঁচকে বলল, ঘুম ভেঙে কার ভাগ্যে জোড়াশালিক—কার ভাগ্যে চোখরাঙানি।

ব্রজ জিভ কেটে চন্দনের দিকে ঘুরে বলল, আমি ওকে চোখ রাঙিয়েছি স্যার?

চালাকি করো না। অতক্ষণ গালগুলো কাকে দেওয়া হচ্ছিল—ছোটবাবুই বলুন।...হাসি বেরিয়ে এল ঝাঁঝের সাথে। খুব মাগীছাগী করা হল। এখন সাধুর মতো মুখ করে দাঁড়ানো। নিত্যনিত্যি অমন গালমন্দ আমার সয় না।

ব্রজ আরেকটা হাই তুলে ঘড় ঘড় করে বলল, আমি শালা সাধুটাধু নই। যাও, শিগগির 'ঘাট সেরে' (প্রাতঃকৃত্য করে) এসো। আমি একদৌড়ে কিছু নিয়ে আসি বাজার থেকে। স্যার, মুখটুক ধুয়ে পোষাক পরে রেডি হয়ে নিন।

চন্দন আকাশ দেখে বলল, এক্ষুনি! সূর্যই ওঠেনি।

উঠবে। বলে ব্রজ গুনগুন করতে করতে ঘরে ঢুকল।

হাসি চন্দনের দিকে চোখের ঝিলিক তুলে খিড়কির ঘাটে চলে গেল। তার ঠোঁটে একটা চাপা হাসি সারাক্ষণ যেন লুকিয়ে ছিল—সেটা ঘাটের দিকে নিয়ে গেল সে। আর এতক্ষণে চন্দনের মনটা হঠাৎ তেঁতো হয়ে গেল। আজ রাতটা তার জীবনে এত অভাবিত আর নতুন—এত নতুন আর গা-ঘিনঘিন করা—আগাগোড়া সবটা এত জঘন্য যে এক্ষুনি কোথাও চিরকালের মতো পালাতে পারলে বেঁচে যায়। নিজের স্বভাবচরিত্রের দিকে খুব অবাক হয়ে তাকাল সে। পরক্ষণে মনে পড়ল সুনন্দিতার কথা—গায়েপড়া ভাবসাব, তার হাসি, চন্দনের অজানতে চন্দনের দিকে তাকিয়ে থাকা! তবে কি বিষটা ওখান থেকেই বয়ে এনেছিল মনে? সেই বিষের কয়েকটি ফোঁটা এই হতভাগা ড্রাইভারটার জীবনে

অবশেষে সংক্রামিত হয়ে গেল সম্ভবত। কী এর ভবিষ্যৎ? কতদূর নিয়ে যাবে তাকে আজ রাতের ওই সব ঘটনাবলী?

বাইরে গিয়ে কিছুক্ষণ গাড়িটার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। গাড়িটা যেন প্রাণীর মতো তার দিকে তাকিয়ে আছে। একটা খুশি ওটার মসৃণ নতুন বার্নিশকরা বডিতে ভোরের আলোয় ঠিকরে পড়ছে। গাড়ির ওপর হাত রাখল সে। কী ভীষণ ঠাণ্ডা! ব্রজ একে আদর করে বিবিজান বলে, দিলপিয়ারি বলে। শুধু এই রাতে নয়—প্রতিটি রাত এর ভিতরে কিংবা ছাদে শুয়ে সে রাত কাটিয়েছে নাকি—এখনও কাটাবে। কী পায় ব্রজ এর কাছে? অথচ জীবন্ত সতেজ টাটকা একটি মেয়ের মাংস এবং আত্মা সর্বগ্রাসী ক্ষিদে নিয়ে ধড়ফড় করে ওদিকে। কতক্ষণ শূন্যদৃষ্টে গাড়িটা দেখতে থাকল সে।

ব্রজ ডাকছিল, স্যার, ছোটবাবু!

চন্দন সাড়া দিল। তারপর বাড়ি ঢুকল। ব্রজ উঠোনে টিউবেলের পাশে দাঁত ব্রাস করছে। হাসি বারান্দায় কুকার জেবলে কেটলি চাপিয়েছে। চন্দনের তাকাতে ভয় করছিল ওর দিকে—পাছে সেই চাপা হাসি আর চোখের ঝিলিকটা দেখতে পায়। ঘরে ঢুকে অভ্যাসমতো কালো সুটকেসটা দ্রুত খুলে একবার দেখে নিল চন্দন। সব ঠিক আছে। ব্রাশ পেস্ট নিয়ে বেরলো। চকিত চোখে—নিজের অজানতেই হাসির দিকে তাকাল। হ্যাঁ—হাসি হাসছে। চোখে সেই মারাত্মক আলোটা! হাসি আজ তৃপ্ত—সার্থকতার স্বাদে ওর মাংস আর রক্ত আবিষ্ট—ওর জীবনটা হয়তো এখন গোপনে গান হয়ে বাজছে। যা ওই বোকা ব্রজ ড্রাইভার একটুও টের পাবে না।

এরই মধ্যে শাড়িটাও বদলানো হয়েছে হাসির। উঠোনে আলতারং কয়েক-ফালি রোদ্দুর এসে পড়ছে। চারদিকে অজস্র পাখি ডাকছে। পাঁচিলের ওপর একটা ইন্ডিকুটুম উড়ে এসে বসল। পাশের বাড়ির মোরগটা ক্যাঁ ক্যাঁ করে চেঁচিয়ে উঠল। ব্রজ খিকখিক করে হেসে চাপা গলায় বলল, ওই মালটার ওপর দারুণ লোভ আছে। কবে মেরে দেব—দেখবেন। তবে এখন নয়—গ্রীষ্ম-কাল আসুক। তাড়ির দিন না এলে ও জিনিস জমবে না।

হাসি চোখ পাকিয়ে বলল, এই তো সাধুমানুষের নমুনা। সক্কালবেলা পরের মোরগ মারার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

আমি শালা সাধুটাধু নই।...ঠিক আগের মতই ব্রজ জবাব দিল। তার-পর প্রায় দৌড়ে ব্রাশ সাবান নিয়ে ঘরে ঢুকল।

চন্দন মুখ ধুচ্ছিল। সেই সময় শুনল হাসি তাকে ডাকছে। ছোটবাবু! বেশ গলা চড়িয়েই ডাকছে হাসি।

উঁ?

উঁ নয় মশাই। তাকান এদিকে। তাকান না!

চন্দন একটু ঘুরে বলল, তাকাচ্ছি।

যে-রুটে যাবেন, সেই পথেই পড়বে জায়গাটা। ওকে বলে বলে হন্যে হয়েছি। কান করে না। তাই আপনাকে ভার দিচ্ছি। পারবেন না?

পারব। বলো।

সোনাডাঙ্গা—নামটা মনে থাকবে তো? নদীর ব্রীজ বেরিয়ে তারপর সোনা-ডাঙ্গা। পুকুর আছে দেখবেন—বটগাছ আছে। তারপর বাড়িটা—মাটির বাড়ি

কিন্তু। গিয়ে শুধু বলবেন, তোমার বোন তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে না। চিঠি পেয়েছে। হাসির মুখটা কেমন গম্ভীর হয়ে গেল।

চন্দন বলল, তোমার দিদি আছে নাকি ওখানে?—বলেই সে লক্ষ্য করল—অন্যদিনের মতো বউদি কথাটা জুড়তে পারছে না। একটু অস্বস্তি হল তার।

আছে। আমরা দু বোন চার ভাই। খুব বড়ো সংসারের মেয়ে ছিলুম ছোটবাবু। ভাইগুলোর একজন মাত্র বেঁচে আছে—বাকি সবাই মারা গেছে। একজন সাপের কামড়ে, দুজন জ্বরজ্বারিতে। যে বেঁচে আছে, সে থেকেও নেই। কলকাতায় কী কাজটাজ করে। বাড়ি আসে না। শুনেছি, সেখানেই বিয়ে-টিয়ে করেছে। আর দিদি বাপের ভিটে আগলাচ্ছে একা।—হাসি একবার নাকটা মুছে নিল।

ব্রজ ঘর থেকে বলল, জানেন স্যার? আমার ভায়রামশাই ঘরজামাই।—সে হাসতে লাগল সকৌতুকে।—যদিও সম্পত্তি বলতে শুধু ভিটেটুকুন সার।

হাসি ঝাঁঝ দিয়ে বলল, ওকে ঘরজামাই বলে না। তখন তুমিই যদি গিয়ে ফাঁকা ভিটেতে বসতে, তুমিই বাড়িটা পেতে-টেতে। আজ তাহলে ভাড়াবাড়িতে থাকতে হত না। কে আর মামলা করতে যেত তোমার সঙ্গে?

সেই জন্যেই তো যাইনি।—ব্রজ বেরোল সেজেগুজে। পরিপাটি চুল বেঁধেছে। কড়া ইস্তিরিকরা প্যান্ট, হাওয়াই শার্ট, পায়ে চকচকে কাবলী চপ্পল। এতক্ষণ জুতো-দুটোয় বুরুশ ঘষছিল। হাতের কালি মুছতে থাকল ন্যাকড়া দিয়ে। তার-পর বলল, চা দিয়েছ কেটলিতে? আমি একদৌড়ে বাজার থেকে কিছু নিয়ে আসি।

সে সত্যি শব্দ তুলে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। চন্দনও সেজেগুজে বারান্দায় এল। দেখল হাসি ভুরু কুঁচকে টিউবেলটার দিকে তাকিয়ে আছে। চন্দন হাল্কা স্বরে বলল, কী! মন খারাপ হল নাকি? হঠাৎ ছেলেবেলার কথা ভাবলে আমারও ওইরকম লাগে।

হাসি হঠাৎ ঘুরে সেই নিলাজ নায়িকামূর্তি ধরল—প্রায় চোখের একটি পলকেই। চপল হেসে বলল, সত্যি তখন থেকে আমি কী লক্ষ্য করছিলুম জানো? কিছু টের পেল নাকি। মাতাল বটে—কিন্তু ভারি চালাক। খুব সাবধান কিন্তু। ও ছোটজাতের লোককে একটুও বিশ্বাস নেই।

চন্দন একটু এগিয়ে এল।—আর তুমি কী জাত হাসি?

হাসি মুখ নামাল—ঠোঁটে হাসিটা ঠিকই আছে। বলল, থাক। আর জাতের কথা তুলে কষ্ট দিও না ছোটবাবু। সকালটা আজ এমন ভালো হবে, কোনদিন কি ভেবেছিলুম? আজ আর নষ্ট করো না একে।

চন্দন হাসতে হাসতে বলল, বামুন-টামুন নও তো?

চোখ তুলল, হাসি।—যদি তাই হই? আরো বেশি ভালবাসা পাবো বুঝি?

নাঃ, হাসি। জাতটাতই কোনদিন মানিনি।

আমি বামুন নই তোমার মতো।—হাসি মুখ ঘুরিয়ে খিলখিল করে হাসল। —তা, কেন? অত জাতের খবর কেন শুনি? ভালোবাসার ঝোঁকে তখন এ কথাটা মনে ছিল না—তাই না?

না—মানে, তুমি ব্রজদাকে ছোটজাত বললে যে, তাই জানতে ইচ্ছে করছে।

সেই কথা ?—হাসি কেটলির ঢাকনা তুলে কী দেখে নিয়ে বলল—ও বাগদীর ছেলে। সব জেনেশুনেই তো ওর সঙ্গে চলে এসেছিলুম। খুব হইচই খিটকেল পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেদিন নিজের কাঁচা মনটাকে বশ মানাতে পারিনি ছোটবাবু। বাড়ির পাশ দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যেত। মরণ আর কী! গাড়িটাও বিগড়ে যেত আমাদের বাড়ীর কাছে এসে। সে কথা বলতে গেলে আজ দিনটাই কেটে যাবে। থাক। আমি···আমি খ্রীষ্টানের বাড়ির মেয়ে।

তুমি খ্রীষ্টান ?

হাসি দূরের দিকে তাকিয়ে বলল, আমি খ্রীষ্টান কিসের ? কিছুই তো মানিনে। আজ সাত-আট বছর চার্চে যাইনি। কোন পরব করিনি। আমি ওর সঙ্গে চলে এসে হিন্দুই হয়ে গেছি মনে মনে। এখনও তাই। ওই দ্যাখো না, লক্ষ্মীপুজো করি। ঘরে গিয়ে দেখে এস। আর এই তো—দিব্যি সিঁদুর পরি। শাঁখা পরি।

চন্দন আড়ষ্ট চোখে ওর সিঁথির দিকে তাকাল। নতুন করে সিঁদুর দিয়েছে কখন। সিঁদুরটা খুব লাল ক্রূর চোখে মারমূর্তি হয়ে তাকাচ্ছে চন্দনের দিকে। সে দৃষ্টি সরাল। বলল, যাক গে—জাতে কিছু আসে যায় না। আমি অবশ্য কোন ধর্মটর্ম মানিনে। বিশ্বাসই নেই। আমি পাপী মানুষ।

হাসি হঠাৎ জ্বলে উঠল যেন।—আমিও পাপী ছোটবাবু।

বলেছি নাকি যে তুমি পাপী ?

হাসি ঠোঁট কামড়ে একটু চুপ করে থেকে বলল, এ যদি আমার পাপ হয়—হোক। আমি—আমার এত জ্বালা ছোটবাবু! এত জ্বালা! মাঝে মাঝে মনে হত, হাসপাতাল থেকে চুরি করে বিষ এনে খাই। পারছিলুম না। থাক—সেকথা পরে কোন সময় বলব। আমি আজ মরীয়া—

ব্রজর পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। হাসি বদলে গেল সঙ্গে সঙ্গে। ব্রজ ঝড়ের বেগে এসে ঢুকল। এক হাতে মস্ত ঠোঙা। অন্য হাতে পাঁউরুটির প্যাকেট। বলল, টোস্ট করতে দেরী হয়ে গেল। মিতুনের আঁচে করে নিলুম। শালা গাঁইগুঁই করছিল বড্ড! বললুম, যাবেন একদিন কোথাও—ভাড়া নেব না। ঠিক বলিনি স্যার ?

বারান্দায় সতরঞ্জি পেতে খাওয়া হল। ততক্ষণে রোদে ভরে গেছে উঠোনটা। বাইরে রূপপুর দিনের মুখোমুখি আবার ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। ব্রজর দেখাদেখি চন্দন খুব তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নিল। হাসি খুব আস্তে আস্তে খাচ্ছিল। যতবার চন্দন তাকিয়েছে, দেখেছে হাসি তার দিকে তাকিয়ে আছে—অবিকল সুনন্দিতার মতো। এই সব মোহময়ীদের সঙ্গে চন্দনের পরিচয় ছিল না। পুরুষমানুষের জীবনে এই সব চমৎকার সুখ আর আকর্ষণ আছে সে অতটা তলিয়ে কোনদিন ভাবেনি। এখন বেশ তৃপ্তি আর সুখে ভিতরটা শান্ত লাগে। যখন সে উঠে দাঁড়াল তার বুকের ভিতর সেই তৃপ্তি আর সুখ দুলে উঠল। শান্ত হেসে হাসির উদ্দেশ্যে সে বলল, আসি।

হাসি মাথা নাড়ল। ব্রজ ফের দৌড়ে বেরিয়ে গেছে।

চন্দন এ্যাটাচি কেসটা সঙ্গে নিল। ভিতরের দরজার খিলটা আরও শক্ত করে এঁটে দিল। তারপর বাইরের দরজায় তালা দিয়ে ফের হাসির উদ্দেশ্যে বলল, চলি।

হাসি ভুরু কুঁচকে সামান্য হাসল মাত্র। এত ভালো লাগছে ওকে। আজ যতক্ষণ না ফের রাত আসে, মনে মনে একটা ছটফটানি থেকেই যাবে চন্দনের। এটা সে কোনমতে হয়ত এড়াতে পারবে না। হাসি তাকে একটা কিছু দিয়েছে —নিশ্চয় দিয়েছে, যা না পেলে এই রূপপুরে রুমাদের চোখের সামনে স্টেশন ওয়াগন হাঁকিয়ে যেতে পারত না। পারতই না।

সরু রাস্তায় গাড়িটা কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে হাইওয়েতে পৌঁছে যেতেই ব্রজ আচমকা এক বিকট হাঁক দিল—হেই যানেবালে ভাইলোক! হুঁ-সি-য়া-র!

কিন্তু চন্দন চমকায়নি। সে শুধু রাতের সেই ঘটনাটা ভাবতে ভাবতেই এসেছে। রোদ যত বাড়ছে, সে তত জড়িয়ে পড়ছে ওই একই ঘটনার গোপন আড়ষ্ট আর পুংখানুপুংখ স্মৃতিপুঞ্জের মধ্যে। হাসি—হাসির দেহ—অন্ধকার —মাংসের স্বাদ এবং পাপ। বারবার ঘুরে ঘুরে সেই একই দৃশ্য এবং কথাগুলো। সুনন্দিতা এই আলোড়নের মধ্যে কোথায় তলিয়ে গেছে।...

আর রুমা—রুমার ছিপছিপে হালকা শরীরটা—শুধু শরীরটাই কখন অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে এবং সবটুকু স্মৃতি এখন এই জীবনের কাছে অসংলগ্ন একটা গোঁজামিল ছাড়া কিছু নয়। অথচ মনের কোনখানে একটুখানি বিষণ্ণতা মৃদু জ্বরের মতে রয়ে গেল যেন।

আস্তে আস্তে ভিড় বাড়ছে। বাসস্ট্যাণ্ডে বাসের ভেঁপুর গর্জন, মাঝে মাঝে রুটের নামতা ঘোষণা, এলোমেলো হাজারটা কথা ভারি চাকার ঘর্ঘর—রূপপুর চটিতে সকালবেলার অর্কেস্ট্রা বাজছে যথারীতি। সবুজ স্টেশনওয়াগনের গায়ে হাত বুলোচ্ছে গেঁয়ো পেসেঞ্জার। যুবতী বউকে শোনাচ্ছে—এ হল আমাদের বেজাদার গাড়ি! চন্দন সীতাংশুবাবুর চায়ের দোকানে গিয়ে বসল। ব্রজ গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে হাঁকডাক চালিয়ে যাচ্ছে সমানে।

ছোটবাবু যে! নমস্কার। পরক্ষণে খিলখিল করে হাসি।

'স্যাঙ্গুভ্যালির' সামনে কয়েক মিটার দূরত্বে দাঁড়িয়ে করযোড়ে নমস্কার করছিল রুমা। চন্দন নিষ্পলক তাকাল। হ্যাঁ, রুমাই। সঙ্গে অমিত আর লতু। সেজেগুজে সকালবেলায় বাসস্ট্যাণ্ডে এসেছে—মানে, কোথাও যাওয়া হবে। কিন্তু এ কি রুমার নির্লজ্জতা—নাকি ইচ্ছে করেই নিষ্ঠুর আঘাত দেওয়া? তাকে ছোটবাবু বলা হচ্ছে। নমস্কার করা হচ্ছে এত সব লোকের সামনে। সীতাংশু দেখছে বিস্ফারিত চোখে। এরা জানে, পরেশবাবুর শালীর সঙ্গে এই লোকটার বিয়ে হবার কথা ছিল—হল না। এদের মধ্যে কেউ কেউ আরও টের পেয়ে গেছে, পরেশবাবুর লুকনো কালোটাকাগুলোর একটা বিরাট অংশ এখন এই লোকটার হাতে—যা দিয়ে সে ওই গাড়িটা কিনেছে। আর নাকি ওই নিয়েই বিবাদ হওয়ায় লোকটা পরেশবাবুর পাম্প ছেড়ে ব্রজর বাড়ি উঠেছে।

চন্দন হাসল না। গম্ভীর মুখে সিগ্রেট জেবলে বাইরে এল। ব্রজর কাছে যাবার জন্যে পা বাড়াল। ভিতরটা দারুণ কাঁপতে লেগেছে। তার বুকে ধুক-ধুক শব্দ হচ্ছে। মুখ—আয়না থাকলে দেখে নিত, কতটা ফ্যাকাসে আর দুটো কান কতটা লাল হয়ে উঠেছে।

নির্লজ্জা রুমা পিছন থেকে আবার বলল, ও ছোটবাবু—হল কী মশাই? পালাচ্ছেন কেন? এবং ফের খিলখিল করে হাসি।

হ্যাঁ—এটা পরিষ্কার বিদ্রূপ! লোকজনের সামনে ইচ্ছে করেই অপমান করছে রুমা। এত সাহস আর জোর এ মেয়ের থাকতে পারে, কল্পনা করতে পারেনি চন্দন। সে ঘুরে দাঁড়াল। একটা কিছু জবাব দেবে ভাবল। কিন্তু মুখ তুলে তাকাতে পারল না। চোখ নামিয়ে রেখেই শুধু বলল, এটা ডেঁপোমির জায়গা নয়।

মোটেও না স্যার।—রুমা সপ্রতিভ ভঙ্গীতে বলল, বলছি কী, আপনার ওই ময়ূরপঙ্খী নৌকার সামনে তিনটে সিট দিন না। ফার্স্ট ক্লাসের ভাড়া দেব। কান্দীতে নামিয়ে দেবেন। ফাংশান আছে। কী? দেবেন না?

চন্দন আরও রেগে বলল, সীট নেই। তারপর হনহন করে চলে গেল ব্রজর কাছে। পিছনে রুমার হাসি তার পিঠে চাবুকের মতো কয়েক মুহূর্ত আছড়ে পড়তে লাগল।

ব্রজ বলল, পরেশবাবুর শালী কী বলছিল স্যার? কোথায় যাবে নাকি? ডাকব? এখনও জায়গা হবে। নিয়ে নিন না।

চন্দন কড়া স্বরে বলল, না।

ব্রজ গোঁফের আড়ালে হেসে চাপা গলায় বলল, পরেশবাবু বেঁচে থাকলে তো ওনাকেই বউ করতে হত—হত না বলুন? তখন? কী করতেন স্যার?

চন্দন হাসতে পেরে বেঁচে গেল।...তখন কি আর এ স্টেশনওয়াগনের ধারে-কাছে কেউ আসত ব্রজদা? হয়তো একখানা অ্যামব্যাসাডার কেনা হত।

কিন্তু আবার বলছি—বড্ড ঠকলেন। অমন মেয়ে আর হয় না।...ব্রজ কথাটা বলেই সামনে দৌড়ল।...এই ভাই, এই যে! কোথায় যাওয়া হবে? আসুন। জায়গা আছে।

চন্দন রুমাকে দেখছিল। কী উজ্জ্বল গাল রুমার! সকালের সব আলো ধরে রেখে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। চোখ জ্বালা করছে। গগলস বের করে পরল চন্দন। নিরাপদে দেখতে থাকল রুমাকে। এবং এ দেখার মধ্যে হিংস্র ধরণের একটা ইচ্ছে থেকে গেল—যার পরিণত নাম কাম। কামনা নয়—কাম। জিঘাংসার লকলকে একটা শিখা শরীর থেকে ঠেলে বেরোচ্ছিল। আর শরীর থেকে বেরোতে গিয়ে রক্ত-মাংসের কটু গন্ধ ছড়াচ্ছিল যেন। দাঁতে দাঁত চেপে বসে গেল আস্তে আস্তে।

ব্রজ ততক্ষণে জোর ডাকাডাকি সুরু করেছে। নতুন প্রকাণ্ড ভেঁপুটা অশ্লীলভাবে ঘনঘন টিপছে আর চেঁচাচ্ছে—আরে মেরে দিলপিয়ারি! ব্রজর এ-ব্যাপারটার সরল অর্থ করে নিয়ে একটি মধ্যবয়সী গেঁয়ো মুখরা বউ চাপা গলায় মন্তব্য করল, ঢং দ্যাখো মিনসের। ঘরে মাগ আছে, টেপাটিপি করগে না মুখপোড়া।

ব্রজর কানকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন। পলকে ফ্যাঁচ করে হেসে বলে উঠল, সরলা মাসী যে! কেমন আছ মাসি? তোমার পদ্মরাণীর খবর কী?

পদ্মরাণী মরেছে! তোর গাড়ি ছাড়বে কখন তাই শুনি। খালি টেপাটেপি তো করেই যাচ্ছিস রে বাপু।

ব্রজ অকুতোভয়ে বলল, শুধু ওই করেই তো কাটাচ্ছি মাসি। ওই পর্যন্তই পারি।

চন্দন শুনছিল। তার চমক খেলে গেল। একটা অশ্লীল অন্ধকারের পথে এবার তার যাত্রা।

উনিশ

সামনের দিক থেকে আসছিল খালি ট্রাকটা। প্রচণ্ড বেগে ছুটে আসছিল। এ রুটের রাস্তাটা সংকীর্ণ—কোনরকমে দুটো গাড়ি পাশাপাশি সাবধানে যেতে-আসতে পারে মাত্র। পীচ থেকে চাকা নামানোই ভালো। কিন্তু ব্রজর সেদিকে একরোখামি বড্ড। চন্দন সামনের ট্রাকটার দিকে তাকিয়ে ভয়ে-ভয়ে বলল, বাঁয়ে নামো ব্রজদা। এই প্রথম ব্রজকে হঠাৎ তুমি বলে ফেললে সে। বিরক্তিতে। এতক্ষণ সারাটা পথ ব্রজর কাণ্ডকারখানা দেখে তার খারাপ লেগেছে। কত জায়গায় না অকারণে গাড়ি থামিয়ে পথের ধারের চেনা মানুষের সঙ্গে কথা বলেছে ব্রজ !...এই যে দাদু, কেমন আছেন ?...আরে চাচা যে ! চাচীর বাতের খবর কী ? ...আদাব মিয়াসাব, আদাব। আমার বিবিজানকে আশীর্বাদ করুন।...ঘুঁটেকুড়ুনী বুড়িও তার মাসি।...ও মাসি, মেয়ের বাড়ি যাবে তো এস। নিয়ে যাই।

বুড়ি কপালে হাত রেখে রোদ আড়াল করে বলছে, কে, বেজো নাকি ? আবার এ লাইনে এলে গো বোনপো ? বাঃ বাবা, ভালো। ভাবলুম, আমার বেজোর কী হল—তার ভ্যাংগাড়িরই বা হল কী ! বেঁচে থাকো—বাবা বেঁচে থাকো। হ্যাঁ—যাবো, যাবো সুরিকে দেখতে। সামনে মাসের পাঁচুই। আহা, কদিন রাস্তাঘাট এত ফাঁকা লাগছিল রে সোনা। এ বয়সে কপালের দোষে রাস্তায় নেমেছি বাবা, তোকে না দেখল কেমন যেন লাগে।...

যতক্ষণ বুড়ি এই সব কথা বলেছে ব্রজ স্টিয়ারিঙে থুতনি রেখে বসে থেকেছে। মুচকি মুচকি হেসেছে। প্যাসেঞ্জার তাড়া দিতেই তার কাঁকনপরা থ্যাবড়া হাতটা গীয়ারের মুঠিতে নেমেছে। ক্যাঁচ আওয়াজ করে ফের চলতে সুরু করেছে গাড়িটা। আগের চেয়ে দ্বিগুণ বেগে চলেছে।

পাঁচণ্ডীর বাঁকে ছোটখাটো গুটিকয় দোকানপাট। ছিটেবাতার ঘর, খড়ের চাল। নয়ানজুলিটা গভীর খাল। তার ওপর বাঁশের সাঁকো। ওপাশে ঘন গাছপালা আর বাঁশবনে ঘেরা গ্রাম। টিনের চালে এরিয়েল দেখা যাচ্ছে। আমড়াগাছে জাল শুকোতে দিয়েছে। রোদে তালাই পেতে শুয়ে আছে একটা ঝাঁকড়াচুলো লোক—তার বউ পাকা চুল খুঁজে তুলে ফেলছে। একটা স্তনে মুখ দিয়ে টানাটানি করছে ন্যাংটো বাচ্চাটা। গাড়ির শব্দে মুখ তুলে বউটা তাকাচ্ছে। দু চোখের বিস্ময় আর আনন্দ এতদূর থেকে দেখা যায়। সে অস্টুটে কী বলে উঠতেই মরদটা একবার মুখ তুলে দেখল গাড়িটা। তার দাঁতগুলো রোদে ঝকঝক করল। সেও হাসছে। একটা দোকান থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়েছে একটা রোগা লোক। খালি গা, পরনে ডোরাকাটা লুঙ্গি। গলায় মাদুলি, হাতে সোনার তাগা। ছুঁচলো দাড়িটা চৈত্রের হাওয়ায় কাঁপছে তিরতির করে।...হেই বাবাজীবন বেজো ! এ্যাদ্দিনে এলি বাপ ! বড় আনন্দ রে, বড় সুখ হল। তোর লেগে রোজ কান পেতে থাকি।

জোবেদালি চাচা, কেমন আছো ? চাচী ভালো ? ওবেলার ট্রিপে নেমন্তন্ন চাচা ! চাচীকে নিয়ে সিনেমা দেখতে যাব। ব্রজ হা-হা করে হাসে।

বাপ বেজো, এই লিস্টি আর এই টাকা...জোবেদালি একটা চিরকুট আর

কয়েকটা নোট এগিয়ে দিয়েছে। হাঁপানিটা বেড়েছে। এদিকে মাল নেই টাটে। তোর ভালো হবে মাণিক!

ব্রজ স্টিয়ারিং থেকে হাত তুলে হতাশার ভান করে বলেছে, নাও! হল তো! দিলে আবার বোঝাটা মাথায় চাপিয়ে। এই ভয়েই বোঁ করে বেরিয়ে যাব ভাবছিলুম।

তারপর নিয়েছে লিস্টি আর টাকা।...মজুরী বাবদ একটা মুরগী চাই কিন্তু।

জোবেদালি কবুল। তার মনোহারি টাটের সামনে খদ্দের এসে গেছে ওদিকে। তড়াক করে এক লাফে রঙ ঝিলমিল টাটে গিয়ে চড়েছে সে।

কিছু দূর গিয়েই আবার এক কাণ্ড। সাঁকোর ধারে বসে ছিল লোকটা। মাথার চুল শনের মতো। খোঁচাখোঁচা গোঁফ-দাড়ি। নাদুসনুদুস খালি গা—পৈতে ঝুলছে। খাটো ধুতি পরনে। হাত তুলে দাঁড়িয়েছে সে।...এই যে ব্রজ-গোপাল! কালই খবর পেয়েছি তুমি আবার আসছ। তাই পথ চেয়ে বসে আছি বাবা।

ব্রজ লাফিয়ে নেমে গিয়ে প্রণাম করে গেছে। মাথায় ধুলো ঠেকিয়ে বলেছে, ভালো আছেন পণ্ডিত মশাই?

আর ভালো থাকা ব্রজগোপাল! কাল বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট এসে বয়স জিগ্যেস বলল। বললুম তা বাহান্ন-তিপান্ন হল স্যার। উনি বললেন কী জানো? বললেন—তা বলুন তো পণ্ডিতমশাই, আমার বয়স ষাট—কাকে বুড়ো দেখাচ্ছে। বাবা, রাগে অপমানে ভিতরটা জ্বলে গেল। কথাটা বুঝলে তো? ঠাট্টা করে রিটায়ার করতে বলছে আমাকে।

আপনি কী বললেন স্যার?

আমি?...খিকখিক করে হাসল পণ্ডিত।...বললুম, তা স্যার আপনার দুধ-ঘি খাওয়া শরীর। আর আমি শাকপাতাভোজী বামুন। আমাকে তো বুড়ো দেখাবেই। হিক...হিক হিক!

ব্রজ হেসেছে হো হো করে। গাড়ি শুদ্ধ লোক হেসেছে।

ব্রজ, ছোট মেয়ের কঠিন অসুখ। এই দ্যাখো প্রেসক্রিপশান। কত লাগবে জানিনে বাবা—দুটো টাকা দিচ্ছি। বেশি লাগে তো দিয়ে দিও। শোধ দেব'খন।

আলাপ করিয়ে দিই নতুন মালিকের সঙ্গে। এই স্যার, আমাদের পণ্ডিত মশাই—দারুণ জ্ঞানী সাধক মানুষ। পণ্ডিতমশাই, ইনি এখন আমার নতুন মনিব। এমন মনিব পেয়ে আমি সার্থক।

নমস্কার স্যার। আশীর্বাদ করি, পথ আলো করে চলুন। এ নিরানন্দ দুঃখিনী পল্লীগ্রামে আপনার শকট শঙ্খধ্বনি করে মঙ্গল আনয়ন করুক। শাস্ত্রে বলেছে...

ব্রজ আসনে এসে বলেছে, একটা পদ্য চাই কিন্তু। আগেরটার মতো। জানেন স্যার—পণ্ডিতমশাই আমার গাড়ির জন্যে কত পদ্য লিখেছিলেন?...দূর ছাই! ভুলে গেলুম যে।

সংস্কৃত শ্লোকটা শোনা যায়নি গাড়ির শব্দে। যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে চন্দন দেখেছে, পণ্ডিতমশাই হয়তো তখনও শ্লোকটা আওড়ে চলেছে। ব্রজ

বলেছে, অমন লোকের আশীর্বাদ পাওয়া কি কম কথা ? লাগে লাগুক দু-দশটা টাকা বেশি, টাকা মলে তো সঙ্গে যাবে না স্যার। ওনারাই তো আমার আপন-জন। ওনারা ছাড়া আর কে আছে বলুন ? ব্রজর আর কেউ নেই।

এত সুন্দর এই পথটা ! রূপপুর থেকে ঢালুতে নেমে এসে বরাবর সমতল মাটির দেশ। এ মাটির রঙ আলাদা। শুধু গাছপালা ঝোপঝাড় ফসলের ক্ষেত। পথের ওপর ঘন ছায়া পড়ে থাকে সারাবেলা। ছোট্ট নদী, খাল, দুধারে কখনও জলা—সেখানে শালুক ফুটেছে রঙবেরঙের। সাদা বকের ঝাঁক ওড়াউড়ি করছে। বটতলার চণ্ডীমণ্ডপ। কামারশাল। মুদীর দোকান। রাস্তার ধারে তাঁতিরা সুতো ছড়াচ্ছে, সার-সার কাঠি পোঁতা আছে অনেক দূর। খটাখট মাকু চলছে। চরকী ঘোরাচ্ছে মেয়েরা। পুকুরঘাটে একটি একলা বউ হাঁটুর ওপর দুহাতে শাড়ি তুলে অল্প জলে দাঁড়িয়ে অপকর্ম করছিল। গাড়ির শব্দে ত্রস্তে কাপড় ছেড়ে দিল। ব্রজ মন্তব্য করেছে, দিলে, দিলে কাপড়টা নষ্ট করে ! কী সুন্দর মুখ বউটির ! সলজ্জ চাপা হাসিটা দৃষ্টি এড়ায়নি চন্দনের। আবার কি দেখা হবে ওর সঙ্গে ? এখানেই কোথাও ? মনটা কেমন 'পুলকে গরগর করে ওঠে। মনে হয়, এই ছায়াঢাকা সুন্দর পথ একটার পর একটা ভাঁজ খুলে রূপের বাহার দেখাচ্ছে। আবার একটা বটতলা রাস্তার ধারে। বাঁশের মাচায় যারা আড্ডা দিচ্ছিল, তাদের একজন উঠে এসে দাঁড় করিয়েছে গাড়ি।...রোখো বেজাদা ! এটুকুন আগুন দিয়ে যাও।

মলোচ্ছাই ! আর আগুন পেলে না কোথাও ?.. ব্রজ দেশলাই দিয়েছে। নাও জলদি করো। দেরী হয়ে যাচ্ছে।

বিড়ি ধরিয়ে তৃপ্তিতে ধুঁয়ো ছেড়ে লোকটা বলেছে, পথ কানা হয়েছিল হে বেজোদা ! বড় তুষ্টু হল পেরানটা।

আবার চলেছে সবুজ স্টেশন ওয়াগন। লোক নামছে, লোক উঠছে। প্রথম 'সাইতে'র দিন ভাড়া নিয়ে দরাদরি নেই। ব্রজ আগেভাগে বলে নিয়েছে মালিককে। এ গাড়ির মালিক আপনি ছোটবাবু। আর আমি শালা অধম ব্রজগোপাল তার ড্রাইভার বটে—কিন্তু ওরাই তো আমাদের সব। এ গাড়িকে ওরা নিজের গাড়ি মনে করে। দেখছেন তো স্যার ?

চন্দন দেখছে। সারাপথ দেখতে-দেখতে চলছে। কিন্তু বিরক্তও হয়েছে। যখন-তখন গাড়ি থামালে লেট হয়ে যাবে যে। আইনের কড়াকড়ি আছে। বাস গুমটিতে অ্যাসোসিয়েশন আর ট্রান্সপোর্টের সরকারী লোক রয়েছে খবরদারির জন্যে। মৌরী নদীর ধারে মস্তো বাজার পুশুলে-চণ্ডীতলা। ওপারে জেলা বর্ধমান সামনে, ডাইনে তিন মাইল নদী ধরে পশ্চিমে এগোলে বীরভূম সীমানা। ওখানেই নদীতে স্নান করে হোটেলে খাবার কথা। ব্রজ বলেছে—পুশুলেতে হরেক মজা আছে স্যার, টের পাবেন ক্রমে ক্রমে। মন পড়ে থাকবে ওখানটায়। কত সব রঙবেরঙের মজা আছে...হঠাৎ জিভ কেটেছে সে।...আপনি আবার সাত্ত্বিক মানুষ। খাঁটি বোষ্টমের চালচলন আপনার। নাঃ আপনাকে পাপের ছিটে লাগতে দেব না।

সেই সময় বুকটা ধুক ধুক করে উঠেছিল চন্দনের। পাপের কথা বলছে ব্রজ। পাপ কাকে বলে ? পোশাক তুলে দেখুক না ওই নির্বোধ মাতাল ড্রাইভারটা, সারা গায়ের ফরসা রঙ পাপের ছিটেয় গত রাতে চিতাবাঘের মতো

হয়ে গেছে। চিতাবাঘই বটে। এই প্রাণীটা নাকি রাত ছাড়া শিকার করে না। এই প্রাণী বড় চতুর, ভীষণ হিংস্র, প্রচণ্ড শক্তিমান। এই প্রাণীর নিষ্ঠুরতার সীমা নেই।

একদিন—চাকরীর পর প্রথম দিন, জিয়াগঞ্জে জিনিসপত্র আনতে গিয়ে সারা-রাত ঘুমোতে পারে নি চন্দন। অস্থির হয়েছিল ভেবে—তুমি পারবে তো চন্দন, পারবে তো তুমি? ভালো বলে সুনাম আছে তোমার। পরেশের অন্ধকারের সোনা ছুঁতে তোমার হাত কাঁপবে না তো? এ কোন মরালিটির প্রশ্ন হয়ত ছিল না সেদিন—ছিল সাহস আর শক্তির প্রশ্ন। পরে পরেশের অন্ধকারের সোনা ছুঁতে সাহস আর শক্তিকে দেখেছিল দুপাশে তৈরী। আসলে মানুষ সব পারে। এই মানুষই তো অমৃত ফেলে স্বেচ্ছায় তুলে নিতে পারে বিষের পেয়ালা। এখানেই মানুষের স্বাধীনতার বোধটা কাজ করে—যা কোন প্রাণীর কাছে নেই।

...তারপর চন্দন, তারপর গতরাতে আরেকরকম অন্ধকারের সোনা তুমি ছুঁয়েছ। তোমার এতটুকু বাধেনি। তৃপ্তির স্বাদে তুমি আবিষ্ট হয়ে গেছ। কালিনে-নরমতায় শৈত্যে-উষ্ণতায় গড়া দুটি স্তন, দুটি ঠোঁট, আর ঝাঁঝালো শ্বাস-প্রশ্বাস তোমাকে পুরুষ জীবনের একটা নগ্ন সত্যের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। না, তুমি সাত্বিক নও ছোটবাবু। ব্রজ তোমাকে যা ভাবছে, তুমি তা নও। প্রগাঢ় তমসার মধ্যেই তো পাপের ফুল ফোটে থরে-থরে। অলৌকিক সেই ফুলের গন্ধে আত্মাকে মোহিত করে। তারপর চুপিচুপি পিছন থেকে আক্রমণ করে যে তার এক নাম নরক, অন্য নাম যন্ত্রণা। তুমি কি এখন খুবই যন্ত্রণার্ত? তুমি কি আর কোনরাতেও ব্রজ ড্রাইভারের অসতী বউটাকে ছোঁবে না?

আড়চোখে দেখছিল ব্রজকে। শিখদের মতো চুড়োবাঁধা চুল, ঘন গোঁফদাড়ি, হাতে কাঁকন—একটা আত্মতৃপ্ত সুখী আর বোকা মানুষটাকে। রাগ হচ্ছিল। চাবকাতে ইচ্ছে করছিল। ইডিয়ট, তুই কি মানুষ? বুধু, আহাম্মক, হতচ্ছাড়া! তোর মতো গবেট এ লাইনে আর একজনও নেই। অমন সুন্দরী স্বাস্থ্যবতী ক্ষুধার্ত বউটার দিকে একবারও তাকায় না পাজিটা। হয়তো গোপনে রক্ষিতা রেখেছে অন্য ড্রাইভারদের মতো। অথচ অবাক লাগে, ওই খৃস্টান মেয়েটাকে ঘরের বের করে এনেছিল ও! কোথায় গেল সে ভালবাসাগুলো? কেন গেল? সব কথা জানার প্রবল কৌতূহল চনমন করছিল মনে।

ব্রজদা আরে! চাকা নামাও। লরিটা কীভাবে আসছে দেখছ না?

ব্রজ দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরেছে।...আসুক। ও শালাদের স্বভাবই এই। ঠিক পাশ কাটিয়ে যাবে দেখবেন। শালারা ভয় দেখায় ব্রজকে।

ট্রাকটা সোজা রাস্তার মাঝামাঝি আসছে। চন্দন উত্তেজিত হয়ে পড়ল।... আঃ কী হচ্ছে!

ব্রজর মুখ লাল। চোখ দুটো নিষ্পলক। চরম মুহূর্তে সে ক্ষিপ্র হাতে স্টিয়ারিং ঘোরাল। চাকা নেমে গেল ঘাসের ওপর। ট্রাকটা ভীষণ শব্দে বেরিয়ে গেলো। একটা হাসির শব্দ শুনল যেন। গাড়ি থামিয়েছে ব্রজ। ডানদিকের চাকা কেবল পীচের কিনারা ছুঁয়ে আছে। যাত্রীরা উত্তেজিত হয়ে গজগজ করছে।

উঃ খুব বাঁচা বেঁচেছি। ট্রাকটা কার? ড্রাইভারকে চেনা মনে হল। শালা ফের এদিকে আসবে না? ব্রজদা গাড়ি ঘোরাও। চলো, শালা কন্দুর যায় দেখি!

ব্রজ ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে ধাবমান ট্রাকটা দেখছিল। এবার দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, শালা হারামীবাচ্চা! রোসো। এখনও হয়নি শিক্ষা।

চন্দনের বুক কাঁপছিল। খুব অল্পের জন্যে বেঁচে গেছে গাড়িটা। সে বলল, কার ট্রাক চিনতে পারলে? নাম্বারটা পড়া গেল না।

ব্রজ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে জবাব দিল, শংকরা। রাধিকের সেই ঢ্যামনাটা।

শংকর ড্রাইভার?···চন্দন চমকে উঠল।

হ্যাঁ। ঠিক আছে। আজ ফিরে গিয়েই এর বিহিত হবে। ভাববেন না স্যার। আপনি শুধু চুপচাপ দেখবেন। আর বেগতিক দেখলে যা করার করবেন।···বিশ্রী শব্দ করে গীয়ার টানল ব্রজ। গাড়ি আবার পীচের ওপর তুলল।

এবার দুপাশে ফাঁকা মাঠ—যতদূর চোখ যায়। ব্রজ স্তব্ধ। গাড়ির যাত্রীরাও চুপচাপ। ঘটনাটার আকস্মিকতায় হয়তো সবাই ক্ষুব্ধ—কিছুটা ভীতও। তাই কথা বলতে ইচ্ছে করে না কারো। ফাঁকা পথে গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিয়েছে ব্রজ। ঘড়ি দেখল চন্দন। না—লেট হবে না পেঁছতে। দেড় ঘণ্টার যাত্রা। আর মিনিট কুড়ি বাকি আছে।

লম্বা একটা সাঁকো পেরোতে পেরোতে ব্রজ মুখ খুলল।···শিশির চন্দ্রর ট্রাক চালাচ্ছে শঙ্কর। ভেবেছে, শিশিরবাবু ওর মাথা বাঁচাবে। দেখি।···

ছেড়ে দাও ব্রজদা। বলে চন্দন এতক্ষণে সিগ্রেট জ্বালাল। তার বাঁদিকে দুজন যাত্রী। দুপায়ের ফাঁকে গীয়ার। এঞ্জিন গরম হয়ে উঠেছে। ধকধক করে জল ফুটে ভাপ বেরোচ্ছে। পা দুটো আড়ষ্ট হযে উঠেছে এবার। ক্লান্তি লাগছে। এমনি করে প্রতিদিন দুবেলা আসতে আব ফিবে যেতে হবে? ভালো লাগবে তো?

মাঠ শেষ হল। বাঁক ঘুরে সবুজ গ্রাম। ক। ঠব ফলকে লেখা আছে—পুশুলিয়া দুই কিমি। রাস্তার ধারে পাঠশালা। ছেলেমেয়েরা পড়ায় মন দিয়েছে বোঝা যায়—জানালায় কারো চকিত মুখটা ঘুবে এল। চোখে হাসি। হয়তো ব্রজর গাড়ি দেখে ওরাও চঞ্চল হল। গাছতল য মাস্টাবমশাই ছড়িহাতে দাঁড়িয়ে আছেন। সেখানে একদল ছেলেমেয়ে বসে পড়াশুনোয় ব্যস্ত। হয়তো মন্তেসরী কায়দা। দিদি পারুল একসময় মাস্টারি কবত। মনে পড়ে গেল।

রাস্তায় ভিড় দেখা যাচ্ছে এবার। রিকসো সাইকেল বাস পথচারী—কত-রকম। নারকোল গাছের ফাঁকে রঙীন দালানবাড়ি উঁকি দিচ্ছে। পুশুলে এসে গেল।

ঘিঞ্জি রাস্তার দুধারে দোকানপাট। অবিশ্রান্ত হর্ণ দিতে দিতে এগোচ্ছিল গাড়ি। লোকজন গিজগিজ করছে সবখানে। একটু পরেই বাসস্ট্যাণ্ডের মস্তো চাটান। পিছনে নদী। জল চকচক করছে। চরের বালিতে গরুর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে অনেকগুলো। নানারকম সব্জী আর বস্তা বোঝাই সেগুলো। ঘাটের ওপর বাস গুমটি। কাগজপত্র ব্রজই সই করিয়ে আনল। চন্দন গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে নদী দেখছে।

ব্রজ এসে ডাকল, স্যার, সাধুদার হোটেলে যাই। হোটেল তো রূপপুরে দেখেছেন। কিন্তু এ জিনিস হয় না! আসুন না—চোখ জুড়ে যাবে! হাসতে হাসতে এগোল সে।

হোটেলটা সামনে দেখা যাচ্ছিল। কোন সাইনবোর্ড নেই। উঁচু মেঝে, দরমা-বাতার দেয়াল, আলকাতরামাখা কালো টিনের চাল। ব্রজ চেঁচাচ্ছিল, সাধুদা, ও সাধুদা! আমি এসে পড়েছি।

কেউ অবশ্য বেরোল না। ব্রজ ঢুকে গেল চেঁচামেচি করতে করতে। চন্দনও ঢুকল। টেবিল চেয়ার নেই। পিঁড়ির ব্যবস্থা। একপাশে ছোট্ট জলচৌকিতে বসে আছে একটা প্রৌঢ় লোক। জনাকতক মেঝেয় বসে খাচ্ছে। তিনটি মেয়ে পরিবেশন করছে, জল যোগাচ্ছে, এঁটো তুলছে। পরিপাটি শাড়ি জামা, খোঁপায় ফুল। আঠারো থেকে পঁচিশের মধ্যে বয়স তিনজনের। বয়স কম যার, তার রঙ বেশ ফর্সা। বাকি দুজন শ্যামলা। মোটাসোটা গড়ন। ফরসা মেয়েটি ছিপছিপে হালকা। মুখশ্রী আছে। অন্য দুটির চলনসই চেহারা। এ যৌবনে পথের কুত্তাটারও নাকি রূপ খুলে যায়।

ব্রজ চন্দনের দিকে চোখ টিপল। ব্রজকে দেখে তিনজনেই কিন্তু হইচই করে উঠেছে। ও মাগো! ব্রজদা যে! ও ব্রজদা, হঠাৎ উধাও হয়েছিলে কোথায়? ওরে, ব্রজদা এসেছে রে! নদীতে জাল ফেলে ইলিশ ধরে আন! তারপর খিলখিল হাসির উচ্ছাস। প্রৌঢ় লোকটি ধমক দিলেও ওদের কান নেই।

কী সাধুদা! কথাই বলছ না যে?

এস হে পাঞ্জাবী। কথা কী বলব? এলে তো দেখতেই পাচ্ছি। দেখছি ব্রজগোপাল এল। সাধুপদ জলচৌকিতে থাপ্পড় মেরে ডাকল। বোস হে ব্রজ, বোস।

ব্রজ বলল, ইনি আমার নতুন মালিক, সাধুদা। গাড়িতে বরাবর সঙ্গেই থাকবেন। খাঁটি বামুনের ছেলে। তার ওপর মস্তো পাস দিয়ে বসে আছেন। হুঁ হুঁ বাবা। এই দিদিমণিরা! আমার স্যারকে প্রণাম কর শিগগির!

চকিতে তিনজোড়া বাহু, আর ঠোঁট নড়ে উঠল। ওরে বাবা, আমাদের ভাগ্যি!

সাধুপদ দেখছিল। এবার উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে ঝুঁকে প্রণাম করল। ...অধমের সৌভাগ্য স্যার। ওরে ইন্দি, মোড়াটা এনে দে।

ফরসা মেয়েটি দৌড়ে ভিতর থেকে মোড়া এনে দিল। চন্দন বসল। ব্রজ বলল, এবেলা যা আছে, তাই দিও সাধুদা। স্পেশাল কিছু করতে হবে না—ভীষণ খিদে পেয়েছে। স্যর, তাহলে চানটা সেরে আসি। চমৎকার জল আছে নদীতে। জিনিসপত্র নির্ভাবনায় সাধুদার কাছে রাখুন। দাদা নামে যেমন সাধু, তেমনি স্বভাবেও। ইন্দি, এটু সরষের তেল দিবি রে? সাবান পোষায় না।

ইন্দি চোখ পাকিয়ে বলল, আর কাকেও বলতে পারছ না, শুধু এই ইন্দিই আছে!

সাধুপদ বলল, ইন্দি, কোণের বাবুকে দ্যাখ—কী বলছেন।

ইন্দি ভ্রু কুঁচকে কপট ঝাঁঝে সেদিকে এগোল। ব্রজ বলল, তাহলে আকালীই নিয়ে এস।

আকালী বলল হ্যাঁ—আকালী তো ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো। পদ্মকে যে সেদিন···হঠাৎ ব্রজর দিকে তাকিয়ে জিভ কাটল সে।

পদ্ম বলল, তাই যাচ্ছি বাবা, যাচ্ছি। ব্রজদা এলে যেন কী লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় হোটেলে।

চন্দন ব্যাগটা সাধুপদকে দিল। সাধুপদ সেটা পাশে রেখে বলল, আর বলবেন না স্যার। ব্রজটা এসে হুলস্থুল বাধিয়ে দ্যায়। আমার মেয়ে তিনটি ওর বড্ড ন্যাওটা।

চন্দন বলল, ওরা আপনার মেয়ে ?

আজ্ঞে, স্ত্রী নেই। একা মানুষ। ছেলেপুলে বলতে ওই তিনটিই স্যার। যা বাজার পড়েছে, কী আর করা যায় !···যান, স্নান করে আসুন। গরম-গরম পাবেন। বাসি জিনিস আমি রাখিনে।

পদ্ম বাটিতে তেল এনে দিল। ব্রজ বেরোল। চন্দনও। বাইরে এসে ব্রজ বলল, শালা সাধুদা চাঁদের হাট বসিয়ে রেখেছে। ও মেয়েদের আর বিয়ে হবে ভাবছেন ? সে গুড়ে বালি। আর, নিজেও তো ইচ্ছে করে বিয়ে দিচ্ছে না। কোন লোককে তো বিশ্বাস করে না—এত কিপটের ধাড়ি লোকটা। আমার শুধু কষ্ট হয় স্যার—ভবিষ্যতে মেয়েগুলোর কী হবে।

কেন ?···চন্দন অকারণ প্রশ্ন করল।

বা রে বা ! মেয়ে তো বটে। স্বামীর ঘর করার ইচ্ছে নেই ? ছেলেপুলের মা হবে না ? কী যে বলেন। নেহাৎ বেশ্যা যে বাজারের মেয়ে, তাদেরও ঘর-সংসার স্বামী কাচ্চাবাচ্চা থাকে ছোটবাবু। আমি দেখেছি।

ঢালু পথে নদীর বালিতে নেমে গেল দুজনে। বাঁদিকে দহ পড়েছে। সেখানেই সবাই স্নান করছে। চিকন সোনালি বালির ওপর বসে ব্রজ তেল মাখতে থাকল। বেশ চড়া রোদ পড়েছে। চরের ওপর ঘূর্ণি দিয়ে হু হু করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের কাক একখানে নাচানাচি করছে। গরুর গাড়িগুলোর কাছে বালির ওপর ইঁটের উনুনে রান্না চাপিয়েছে গাড়োয়ানরা। ওপারটা ঢালু—ক্ষেতে পাকা গম, কোথাও কুমড়ো বা তরমুজের ঘন সবুজ ঝাঁপি। কিছু বাবলা গাছ। পিছনে নীল ধূসর বিশাল আকাশ। হাঁটু জল পেরিয়ে এপার ওপার যাওয়া-আসা চলেছে লোকের। ডাইনে দহের জলে বাতাসের কাঁপন বার বার। জল ছিটিয়ে সাঁতার কাটছে ছেলেমেয়েরা। পাড়ের দিকে হোটেলের নিচেই ঘাটের ধাপ। মস্তো পাথর পড়ে রয়েছে সেখানে। তেল মাখা হলে ব্রজ বলল, ভুল হয়ে গেছে। সাধুদার ঘাটেই যাই, চলুন। এখানে বড্ড ভিড়।

ক্লান্তি লাগছিল। আর দেহে সেই রাতের পাপতাপ লেগে রয়েছে। প্যান্ট-শার্ট খুলে শুধু আন্ডারপ্যান্ট রেখে চন্দন সাবান ঘষল এলোপাথাড়ি। সারা শরীরে ঘন ফেনা জমিয়ে দিল। সকালে আজ দাড়ি কাটা হয়নি। সেলুন হয়তো আছে এখানে। নিজের হাতে কাটা অভ্যাস তার। কিন্তু দাড়িটা কাটা দরকার। পরিষ্কার ফিটফাট থাকবার ইচ্ছে পেয়ে বসেছে এতক্ষণে।

ব্রজ চুলের ঝুঁটি ধরে হাপুস করে একটি ডুব দিয়েই উঠেছে।···আ মা ! কী ঠাণ্ডা, কী ঠাণ্ডা ! শালা চৈতমাস যেতে বসেছে—তবু জলের কী বাড় গো ! এ্যাঁ ?

হুসহাস করে জল ভেঙে ঘাটে উঠল সে। চন্দন বলল, ব্যস ! এই শেষ ?

ব্রজ হাসল।...পাগল হয়েছেন স্যার ? মাতাল আর বেড়াল একই মাল জানেন না ? দুজনেই জলকে বড্ড ডরায়।

চন্দন দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপ দিল। জল ছড়িয়ে পড়ল অনেকটা দূর অব্দি। ওপাশ থেকে একটি মেয়ে চেঁচাল—চোখ আছে না নেই ? চানকরা গায়ে জল ফেলল তো !

ব্রজ দাঁত বের করে আওয়াজ দিল, জল কি কেউ ফেলে ? জল পড়ে।

চন্দন যোগ করে দিল সঙ্গে সঙ্গে, আর পাতা নড়ে।

এ্যাঁ ? জল পড়ে পাতা নড়ে !...ব্রজ অবাক কয়েক মুহূর্ত। পরক্ষণেই মনে পড়ে গেছে।...ওরে বাপ ! বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ। সে কি আজকের কথা ? এ বাগদীর ছেলেও বর্ণপরিচয় পড়েছিল। ভাবতে পারেন ?

মেয়েটি গলা ডুবিয়ে চন্দনকে দেখছে। চন্দনও নির্লজ্জের মতো তাকে দেখতে থাকল। এত দুষ্টুমির চপলতা তার মধ্যে কিলবিল করে উঠেছে। জিয়াগঞ্জে গঙ্গার ঘাটে এমন অনেক সরল কৌতুক সে আর বন্ধুরা মিলে করেছে একদা। কিন্তু এখন কি এটা সেই সরলতা অবিকল ? কোমর জলে দাঁড়িয়ে বুক ডলতে থাকল সে। ধরা পড়ল, স্বাস্থ্যটা আগের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে।

উঠুন স্যার, দেরী করবেন না। এক ঘুম ঘুমিয়েই আবার সাজতে হবে। তিনটেয় ট্রিপ। ফের পাঁচটায় ছাড়লে এখানে এসে সন্ধে। তারপর হিসেব করুন, এখানে থেকে সাতটায় রওনা দিচ্ছি। ব্রজ তাড়া দিচ্ছিল।

মেয়েটি ওঠার নাম করে না আর। এও কি হাসিদের অন্যতমা ? চন্দন ফের তাকাতেই মেয়েটি হেসে মুখ ফেরাল। ভালো লেগে গেছে চন্দনকে ? কোথায় থাকে ও ? অবিবাহিতা মনে হচ্ছে।

চন্দন উঠে এসে গা মুছতে মুছতে চাপা গলায় বলল, মেয়েটিকে চেনো, ব্রজদা ?

ব্রজ একটু দেখে বলল, না তো। কেন ?

এমনি জিগ্যেস করছি।

ব্রজ একটু দেখে নিয়ে গম্ভীর মুখে চাপা গলায় বলল, মনে হচ্ছে জিনিসটি ভালো।...আমি চললুম স্যার। পাত দিতে বলিগে। আপনি আসুন।

ব্রজ কী ভাবল ? চন্দন একটু আড়ষ্ট হল। তাড়াতাড়ি পোশাক পরে নিয়ে ধাপে উঠল। কয়েক পা গিয়ে মুখ ফিরিয়ে আর একবার দেখার লোভ হল মেয়েটিকে। আশ্চর্য ! সে জলের ধারে উঠে এদিকে তাকিয়েই দাঁড়িয়ে আছে। দুপুরের উজ্জ্বল রোদে তার মিটিমিটি হাসি আর চোখের ঝিলিক স্পষ্ট করে তুলেছে। এক মুহূর্তেই কি দেখামাত্র ভাল লেগে গেল এই পাড়াগাঁয়ের কুমারীটির ? এ একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা বটে।

নাকি মাথায় ছিট আছে ? পাগলটাগলা ? কিংবা সত্যিসত্যি অসতী মেয়ে—যারা কম-বয়সেই নষ্ট হয়, আর তারপর থেকে পছন্দসই পুরুষ দেখলেই দুরন্ত ক্ষিদেয় ঝাঁপিয়ে আসে—ভয় মানে না, লজ্জা মানে না ? পরেশদা একটা কথা বলত। মেয়েদের পুরুষ সম্পর্কে একটা লজ্জা বা ভয় স্বভাবত থাকে। থাকে বলেই ওরা যেমন পুরুষের কাছে মিষ্টি তেমনি নিজেরাও জীবনটা তারিয়ে ভোগ করতে পারে। তাই পুরুষঘেঁষা মেয়েরা বড় হতভাগিনী হে, বুঝেছ

কিনা ? পুরুষের ওপর থেকে লজ্জা ভয়টা হারালেই ওদের সব গেল।...হয়তো রুমার সম্পর্কেই এমন ধারণা ছিল পরেশের। সেটাই ঠারেঠোরে বলতে চাইত সে।

হোটেলের পিছনে সব্জীলতা আর ঝোপঝাড়। কিছু ফুলের গাছ। আর একবার তাকাল চন্দন। হ্যাঁ, গা মুছছে—এদিকেই চোখ। ঠোঁটে হাসি, চোখে ঝিলিক। একটা চটুল লোভের ঝিলিক বয়ে গেল চন্দনের রক্তে।...

ব্রজ পাতে বসে গেছে আগে। সে দুপুরের খাওয়াটা বেশি করেই খায়। কারণ রাতের দিকে সেটা অনিশ্চিত হয়ে ওঠে। চন্দন বসলে ইন্দি বলল, আপনার চেহারার সঙ্গে কার মিল আছে বলব বাবু ?

পদ্ম হাসতে গিয়ে গেলাসের জল গড়িয়ে পড়ল। আকালী বলল, খদ্দরের সঙ্গে ঠাট্টা কী রে মুখপুড়ি ! বাবা, শুনছ ?

সাধুপদ ধমকাল, এ্যাই ইন্দি !

ইন্দি ভাত গড়িয়ে দিতে দিতে বলল, বাবু রাগ করলেন নাকি ?

চন্দন বলল নাঃ। রাগ কেন করব ? কার মিল আছে আমার সঙ্গে ?

ব্রজ মুখে ভাত গুঁজে বলল, কোন সিনেমার লোকের নাম করবে নির্ঘাৎ। ইন্দিটা ভীষণ ছবি দ্যাখে। এই ইন্দি, তোর কাছে অনেক ভাড়া পাই, হিসেব করে দেখিস।...

ইন্দি উঠে গেলে পদ্ম বলল, আপনাকে দেখে সববাই রাজেন্দ্রকুমার ভেবে বসবে বাবু।

আবার হাসির ধুম পড়ে গেল। সাধুপদ যথারীতি গর্জাল, এ্যাই পদ্ম !

চন্দন লেবু চুষতে চুষতে বলল, তোমরা খুব সিনেমা দ্যাখো বুঝি ?

যম, যম। বুঝলেন স্যার ?...সাধুপদ বলল। পশুলেতে এ্যাদ্দিনে সিনেমা বসছে। এবার আমাকে চটিপটি তুলে পথ দেখতে হবে নির্ঘাৎ। কী বলব, বলুন ? মা-মরা আদুরে মেয়ে সব। বেশি বকলে ভাববে· ব্রজ, ভাত চাই ? ও আকালী, দেখছিস কী ?

খাওয়া শেষ হলে চন্দন আঁচানোর জায়গায় গেল। ব্রজ নিজেই হাত ধুয়ে নিয়েছে। সাধুপদ ডাকছিল, ইন্দি, ও ইন্দি, স্যারের হাতে জলে ঢেলে দে।

ইন্দি দৌড়ে এসে জল ঢালতে থাকল। চন্দন আড়চোখে দ্যাখে, সে মুখ টিপে সমানে হাসছে।...হাসছ যে ইন্দি ?

কোন জবাব না দিয়ে হাসতে হাসতে সরে গেল মেয়েটা। সাধুপদর মেয়েগুলো বেশ। আপাতদৃষ্টে অবশ্য খারাপ বলে মনে হয় না অর্থাৎ হোটেলের মেয়েদের সম্পর্কে লোকে যা ভেবে থাকে, হয়তো তেমন নয়।

ব্রজ বলল, চলুন স্যার, পানটান খেয়ে ঘুমোবার জায়গায় যাই।

সে আবার কোথায় ?

আছে। ব্রজর কী নেই ভাবছেন·

বাসস্ট্যাণ্ডের ধারে অনেকগুলো চা পানবিড়ির দোকান। একটা দোকানের সামনে গিয়ে ব্রজ হাঁকল, শ্যামা, কেমন আছিস রে ?

ব্রজর বয়সী পানওলা বলল, আবার জুটেছ পুশুলের ঘাটে ? তোমার মরণ নেই দেখছি। ভাবলুম, এবার বেজাটা বিদেয় হল। উরে শালা ! ফের কোত্থেকে চাঁদ এসে উদয় হল।

ব্রজ বলল, আমার জানের দোস্ত স্যার। শ্যামা, ইনি আমার নতুন মালিক।

শ্যামা মাথা নুইয়ে বলল, নমস্কার স্যার। আপনি কিনলেন তাহলে ? আগের মালিক রাজকমলবাবুর সঙ্গে আমার চেনা ছিল।...তা বেজা, সেদিন তুই শালা কাটলি আর আমার ঘাড়ে—বাপ্ রে বাপ্ ! সে কী ঝামেলা ! হর পাঁচু তফেল কেউ সামলাতে পারে না। শেষ অব্দি ওর বউকে খবর দিলুম। তারপর যদি সীনটা দেখতিস মাইরি !

ব্রজ হাসতে হাসতে ভেঙে পড়েছে।...খুব ঝাঁটাপেটা করলে বুঝি ? ধরিস নি তো !

পাগল ! আমি গিয়ে ঝাঁটা খাই আর কী !...স্যাব, মিষ্টি না সাদা ? জর্দা দোব ?

চন্দন তাকিয়েছিল অন্যদিকে। একতলা বাড়ির ছাদে কাপড় মেলছে একটি মেয়ে। তারপর এদিকে তাকিয়েই দাঁড়িয়ে গেছে। স্তব্ধ নিঃশব্দে হাসছে। সেই মোহিনী সর্বনাশী !

জর্দা দেব স্যার ?

চমকে চন্দন বলল, না—ইয়ে মিষ্টি পান।

সেই বাড়িটার নিচে দিয়ে দুজনে এগোচ্ছিল। ব্রজ আগে, পিছনে চন্দন। চারপাশে অতসব লোকজন, ভিড়, হইচই। তার মধ্যে ওপর থেকে একটা ছোট্ট ঢিল এসে টুপ করে পড়েছে চন্দনের মাথায়। ঢিলটার দিকে তাকিয়ে মাথা ঝেড়ে ওপরে তাকাল সে। স্থির দাঁড়িয়ে হাসছে। দুহাতে ভিজে কাপড়। চন্দন দুষ্টুমি করে একটা চোখ টিপল। মোহিনী জিভ দেখাল ভেংচি কাটার ভঙ্গীতে।...এমনি করে প্রেম ? যত সব ছেনালী ! সেক্সে পাগল হয়ে আছে। ধুস শালা !

উঁ ? কী বলছেন স্যার ? ব্রজ ঘুরল।

না তো !...চন্দন অপ্রস্তুত। সত্যি কিছু বলে ফেলেছিল নাকি ? সে বলল, কোথায় যাচ্ছি আমরা ? কতদূরে ব্রজদা ?

ব্রজ বলল, কাছেই। আমার এক পাতানো মা আছে—তার ছাদের ঘরে আগে থাকতুম এক সময়। চলুন না, সেখানেই শোব ! কী খাতির হবে দেখবেন। হোটেলে খেয়েছি বললে রেগে যাবে। কিছু বলবেন না কিন্তু। অমন মা হয় না স্যার।

কুড়ি

সর্বনাশীর মুখোমুখি পড়ে গেল সন্ধ্যার ট্রিপে এসে। ধকল সামলাতে নদীর দিকে নেমে গিয়েছিল চন্দন। ব্রজ গাড়ি রেখে আশেপাশে ইয়ারবন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছিল। দিনমান লোকের ভিড় কাটিয়ে একটুখানি একলা হতে চেয়েছিল বলেই ওদিকে আসা। নদী এখানে বেশ চওড়া। দু পাশে বুকভরা

বালির চড়া পড়েছে মধ্যিখানে কিছু স্রোতের জল। দহের উল্টোদিকে চড়ার ওপর কিছু দূরে হেঁটে গেল সে। দুপুরে দেখা সেই গরুর গাড়িগুলো নেই। বালির ওপর চাকার দাগ, পোড়া হাঁড়ি আর ইঁটের উনুনটা ভাঙচুর। ছেঁড়া কাপড়, ন্যাকড়া, পেঁয়াজের খোসা, মাছের আঁশ সরু একফালি চাঁদের আলোয় চকচক করছে। একটা কুকুর ঘুর ঘুর করছে সেখানটায়। নির্জন ফাঁকা নদীর বুকে যে পাতলা অন্ধকার—তার ওপর অল্প জ্যোৎস্নার হলুদ ছোপ পড়েছে। অশান্ত হাওয়ায় ঝিকিমিকি জল কাঁপছে। খাড়া পাড়ের দিকটায় ঝোপঝাড়-গুলো ঝুঁকে পড়েছে। সেখান থেকেই হুড়মুড় করে কে গড়িয়ে এসে নিচে পড়ল। পড়েই অস্ফুট একটা শব্দ—নকল আর্তনাদ ছাড়া কিছু নয়, কারণ পরক্ষণে খিলখিল হাসি শোনা গেল।

চন্দন দু পা এগিয়ে বলল, কে ?

জবাব নেই। কাপড় ঝাড়ছে একটু ঝুঁকে। কী যেন বিড়বিড় করছে। পুরুষ নয়—মেয়েই বটে। সেটুকু তক্ষুনি জানা গেছে। চন্দন ভাবছিল, মেয়েটি সম্ভবত ওই ঝোপে অপকর্ম করতে এসেছিল, জলের উদ্দেশ্যে আসতে গিয়ে পা হড়কে সটান নিচে এসে পড়েছে। তার হাসি পেল। একটু অপ্রস্তুতও হল। নতুন জায়গা, নির্জন সন্ধ্যার নদী অচেনা মেয়ের কাছে থাকা নিরাপদ নয়। সে সরে এল তক্ষুনি। সামনে অল্প কিছু দূর হাঁটল। হাঁটতে হাঁটতে একবার পিছু ফিরে দেখে নিল মেয়েটিকে। মেয়েটি সেখান থেকে সরে এসেছে। চড়ার মাঝামাঝি এসে এদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আছে একটা অস্পষ্ট মূর্তি। সঙ্গে সঙ্গে চন্দনের রক্তে শিহরণ জেগেছে। সেই মেয়েটি নয়তো ? ভালো করে দেখার জন্যে ঘুরে কাছাকাছি এল সে। জ্যোৎস্না খুবই কম। ইচ্ছে করেই প্রায় পাশ ঘেঁষে এল সে। হ্যাঁ, সেই মোহিনী সর্বনাশীই।

তাহলে কি বাঘিনীর মতো আড়ালে অনুসরণ করে এসেছিল তাকে ? এ যে সাংঘাতিক মেয়ে রে বাবা! জিয়াগঞ্জের নলিনী ডাক্তারের বউটির মতো—অবশ্য সে ছিল হিস্টিরিয়ার রুগী, পাগল বললেই চলে, দিন-রাত অশ্লীল খিস্তি করত পুরুষ মানুষ দেখলেই। আচমকা দৌড়ে এসে চন্দনের হাত ধরে টেনেছিল একদিন—অকথ্য ভাষায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। ভয়ে চেঁচামেচি করে পালিয়ে এসে বাঁচে তখন। শেষের দিকে ওকে বেঁধে রাখা হত। নিজে ডাক্তার হয়েও বউর এ বিচ্ছিরি রোগটা সারাতে পারেনি নলিনী। কবরেজী করান হয়েছিল। কবরেজের মতে—অগ্নির প্রবলতা হেতু এই ব্যাধি। যুবকেরা বলত কামাগ্নি। চন্দনের অবশ্য দুঃখ হত মহিলাটির জন্যে। যে সুতীব্র জৈবতা দাবিয়ে রাখাই মানুষের বৈশিষ্ট্য, পুরু পাথরের দরজা ভেঙে সেটা হিংস্রভাবে বেরিয়ে পড়লে ভারি দুঃখের ব্যাপার ঘটে যায়। নলিনীর বউটি ছিল অসাধারণ স্বাস্থ্যবতী আর সুন্দরী। ফর্সা গায়ের রঙ। মুখে প্রতিমার আদল। সেই মেয়ে হঠাৎ উলঙ্গ হয়ে বেরিয়ে অচেনা পুরুষ মানুষকে ধরে টানাটানি করে! একদিন তার হাতে-পায়ে শেকল পরানো হল। বন্ধ ঘরে জানোয়ারের মতো থাকে সে। অবিশ্রান্ত শেকলের শব্দ হয় ভিতরে। বীভৎস চেঁচামেচি আর কান্না শোনা যায়। কখনও শোনা যায়, সে অশ্লীলতম যৌন কথাবার্তা বলে চলেছে কোন অদৃশ্য পুরুষের উদ্দেশ্যে। হাসছে কখনও বা সুর ধরে গান গাইছে। ভালবাসার গান, দুঃখের গান। দেহের ভয়ঙ্করতম এক বন্যায় ভেসে যেতে-যেতে তারপর অসহায়

কাঁকিয়ে কাঁদছে। কবরেজ বলত, কাম—হ্যাঁ কাম, মহাকাম। তাবৎ সৃষ্টির মূলে সে। অসহ্য সুখের জন্যে অসহ্য যন্ত্রণা! সে অবিশ্যি আদ্যাশক্তিরই স্বরূপ। স্বয়ং অগ্নি—যিনি ব্রহ্মার নিম্নাংগে দাউ দাউ প্রজ্জ্বলিত হন ; এ বড় গুহ্যতত্ত্ব হে নলিনী। তোমরা এলোপ্যাথি ডাক্তার—বিলেতি বিদ্যের পোকা॥ এ তোমরা বুঝবে না। বুঝবে না স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা কেন নিজ কন্যা সন্ধ্যার দিকে কামার্ত হয়ে দৌড়েছিলেন হ্যাঁ। কামকে তুচ্ছ ভেবো না। নিন্দে করো না। তিনিই সৃষ্টির কারণ। নলিনী, কানে কানে বলি শোন। এর একমাত্র উপায় কামতুষ্টি। সে তোমার দ্বারা সম্ভব নয়, তা তো ধরাই যাচ্ছে। সুতরাং যদি একটা ব্যবস্থা করতে পারো...

এ সব গুজব হতে পারে। তবে বেশ রটে গিয়েছিল ছোট্ট শহরটাতে। তারপর নাকি নলিনীর বউর তুষ্টির উদ্দেশ্যে কী ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দিব্যি সেরেও গেল মেয়েটি। মজার কথা, মা হল সে। তারপর থেকে একেবারে স্বাভাবিক। কত দিন পরে তাকে দেখেছে চন্দন। ছেলের হাত ধরে ঘোমটা-পরা বউটি গঙ্গার ঘাটে যায়। একান্তে বসে ছেলেকে সাবান মাখায়। নিজে ডুব দিতে গিয়েও কিন্তু ঘোমটাটা খোলে না—দেহের একটুও বাইরে দেখাতে চায় না। শক্ত সযত্ন দেয়ালের মতো শাড়ির আড়ালে লুকিয়ে থাকে। ওই ঘন পুরু লজ্জার নিচে যে অনেক দুঃখ আর অপমানের দিনগুলি রয়ে গেছে।

পারুল একদিন কী কথায় চন্দনকে বলেছিল, জানিস রে চানু, নলিনী ডাক্তারের ছেলেটা কিন্তু বাপ-মা কারও চেহারা পায়নি অমন ফরসা সুন্দর স্বামী-স্ত্রীর অমন ময়লা বেঢপ বাচ্চা হল! লোকে যা বলে, তা মিথ্যে বলে না রে!

সেদিন চন্দনের মনে হয়েছিল, দিদিটা কী অসভ্য আর কুচুটে! নলিনীর বউর বন্ধ ঘরে কাঁকিয়ে কাঁদাটা যে শুনেছে, সে এসব ভাবেই না। ভাবতে নেই।...

চন্দন কয়েক মুহূর্তের অন্যমনস্কতায় এই সব ভাবছিল। তারই মধ্যে মেয়েটি হেসে উঠেছে। বলেছে, বাবাঃ! কোথাও একলা যাবার যো নেই। সবখানেই খালি মানুষ!

চন্দন দাঁড়াল। তার বুক ধকধক করছে। পা দুটো কাঁপছে—ভারি লাগছে, ঠিক আগের রাতে হাসিকে পাশে দেখে যেমন লেগেছিল। কিন্তু সামলে নিয়ে আচমকা ওর হাত ধরে ফেলল। বলল, কী নাম তোমার?

আঃ ছাড়ুন!...হাতটা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে যেন সরে এল সে।...ভালো হবে না বলছি। আমি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব।

নাম না বললে ছাড়ব না। চন্দন ওর চুলের গন্ধ টের পাচ্ছিল।

আমার নাম নেই। ছাড়ুন না। হাতটায় লাগছে যে!

তখন ঢিল ছুঁড়লে কেন?

কখন? যাঃ!

সেই দুপুরবেলা যখন তোমাদের বাড়ীর নিচে যাচ্ছিলুম।

কাক তাড়াচ্ছিলুম। বয়ে গেছে পরকে ঢিল ছুঁড়তে!

চলাকি করো না। ঘাটে চান করছিলুম তখন হাসছিলে।

আপনাকে দেখে নাকি? ব্রজকে দেখে।

আবার মিথ্যে? ভেংচি কাটোনি আমাকে?

আপনি চোখ টিপলেন কেন? যদি মাকে বলে দিতুম!

চন্দন দু হাতে হ্যাঁচকা টানে আরও টেনে নিল ওকে। মেয়েটির ছটফটানি কমে গেল। বুকের সঙ্গে মিশে গেল কতকটা। চন্দন সরু চাঁদটার দিকে ওর মুখটা তুলে ধরল। তারপর চুমু খেয়ে বসল। মেয়েটি ত্বরিতে নিজের কাঁধের কাপড়ে ঠোঁট গাল ঘষে বলে উঠল, ছিঃ!

তোমার নামটা বলবে না?

আপনার নাম বলুন আগে।

চানু!

যাঃ ওইটুকু নাম হয়?

হয়। এবার তোমার নাম বলো?

আচ্ছা। ব্রজর গাড়ীটা নাকি আপনি কিনেছেন?

তুমি কেমন করে জানলে?

শ্যামা বলছিল। শ্যামা...

ওকে জিগ্যেস করেছিলে? শ্যামা যদি কিছু ভেবে বসে?

বয়ে গেছে ওর। এবার ছাড়ুন, বাড়ি যাই। মা খুঁজবে।

নাম না বললে ছাড়বই না।

আমি চেঁচাব। পুশুলের লোককে তো চেনেন না—সেবার...

আমিও রূপপুরের লোক।

আরও জোরে চেপে ধরল মেয়েটিকে। তারপর বালির ওপর বসে পড়ল ওকে নিয়ে। মেয়েটি আবার ছটফট করে উঠল।...এই, কে এসে পড়বে এক্ষুনি। ছেড়ে দিন না! যাঃ, ফেট! কী অসভ্য!

নাম না শুনে ছাড়ব না। বলো, কি নাম?

গৌরী।

ভারী সুন্দর নাম তো! বাড়িতে কে আছে তোমার?

মা। বাবা নেই।...একটু শান্ত হল আবার। গড়গড় করে বলে দিল, আমরা ময়রাদের। মিষ্টির দোকান ছিল বাবার। মা চালাতে পারল না। তুলে দিল। আপনি তো বামুন...পৈতে দেখছিলুম।

লেখাপড়া শিখেছ কদ্দুর?

ক্লাস সিকস। সেও কবেকার কথা। মায়াদির তখন বিয়ে হয় নি। রাস্তাটা পাকাই হয় নি।

আর পড়নি কেন?

কোথায় পড়ব? হাইস্কুল তো ওই নদীপারে লাভপুরে—অনেক দূরে। এ্যাদ্দিনে পাকা রাস্তা হল। এখন হলে পড়তুম।

কিন্তু তুমি এমন কেন গৌরী?

কেমন শুনি?

আমি তোমার অচেনা—ভয় করল না একটুও।

কিসের ভয়? আপনি মায়াদির বরের মতো—অবিকল। প্রথমে তো তাই ভেবে হেসেছিলুম। জানেন? বরটা কী বদমাস। একবার আমাকে...

আমি যে আরও বদমাস, গৌরী।

জানি বাবা জানি। আপনাদের খালি তো ওই—যাঃ! আমি এবার যাই। মা বকবে।

এমনি-এমনি তো ছেড়ে দেবো না গৌরী।...চন্দন ঝুঁকে গেল ওর মুখের দিকে।

একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এল গৌরীর মুখ থেকে—ভয়চকিত একটা 'না'!...তারপর দু পাশে মাথা বার বার ঝাঁকি দিয়ে, না না না।

চন্দন তীক্ষ্ণ দৃষ্টে তাকাল। বয়স অনুমান করা কঠিন। রুমার চেয়ে বেশীই হবে। যৌবনের যে সময়টাতে কৈশোরের ছায়া অসহায় হয়ে লেপটে থাকে মেয়েদের দেহ-মনে সেই অনেক রোদ্দুর আর যেন ছায়া লেগে থাকা সময় চলেছে রুমার। কিন্তু এর কণ্ঠস্বরে যত কিশোরীপনা থাক, দেহ বলে দিচ্ছে আসল ঠিকানা। একটা আদিম আবেগ আর সরলতা ওকে খুব সহজে পাপের দিকে ঠেলে দিতে পারছে।...না, না, না, ও অস্ফুটে বলছিল। খোঁপা খুলে বালিতে চুল ছড়াচ্ছিল, আর সেই সময় চন্দনের মনে কী একটা কষ্ট উঠে এল। এ কষ্টের উগ্র ঝাঁঝ আছে। দু হাতে ধরে ওকে তুলে দাঁড় করাল সে। এ মেয়ে হয়ত 'ভালো' মেয়ে নয়—কিন্তু এ তো হাসিও নয়। নলিনীর বউও নয়। যদিও মনে হচ্ছে একটুখানি ছিট আছে মাথায়। হয়তো আর পাঁচটা মেয়ের চেয়ে অসাধারণ—কিছুটা অস্বাভাবিকও।

আবছা শোনা যাচ্ছে ব্রজর হর্ণের শব্দ। হয়ত স্যারকে খুঁজছে। গাড়ি ছাড়ার সময় হয়ে এল। মেয়েটি স্থির দাঁড়িয়ে আছে। কোথায় ওর দৃষ্টি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না—চাঁদটা হেলেছে ওধারে নদীর পাড়ে। বাবলা গাছের গুঁড়িতে আটকে গেছে যেন। কোথাও জলচরা পাখি ডাকল। ঘাটের দিকে কার গান শোনা গেল। চন্দন বলল, তোমায় আমার এত ভালো লেগেছে! প্রতিদিন তো দুবার করে আসব এখানে দেখা হবে।

আমাকে একদিন কান্দি নিয়ে যাবেন আপনার গাড়িতে? চড়কপুজোর দিন। জানেন, মড়া নাচায় সন্ন্যেসীরা? কত ধুম হয়। নিয়ে যাবেন তো? ভাড়া দিতে পারি—কিন্তু দেব না।

দিও না।

মা সঙ্গে যাবে কিন্তু। একলা ছাড়বে না। তা জানেন তো?

তোমার মায়ের ভাড়াও লাগবে না।

যাঃ, তাহলে ধরা পড়ে যাব! মায়ের ভাড়াটা নেবেন। আর বলবেন, এ মেয়েটা...আচ্ছা, কী বলবেন বলুন তো?

তাই তো! কী বলব?

বারে! বলবেন, খাতির।

খাতিরটা কার?

ওই রে! মা ডাকছে! এই আমি যাই। আচমকা বালির ওপর দৌড়ে পালাল সে। ঘাটের ওদিকে উঁচু থেকে ওর মায়ের চেরা গলার ডাক শোনা যাচ্ছিল, গৌরী—ই—! গৌরী—ই-ই-ই! ফাঁকা নদীর ওপর শব্দগুলো জোরে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল.

—এ দাস্যি মেয়ের জ্বালায় যে জ্বলে মলুম গা! এত করে বলেছি, সাঁঝ-সকালে কোথাও বেরুবিনে। ছত্রিশ জাতের লোক আসছে-যাচ্ছে পুশুলের ঘাটে! ও গৌ রীই-ই-ই। পোড়াকপালী হতচ্ছাড়ী আঁটকুড়ি—

ঘাটের ওপরে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে ময়রাগিন্নি। গৌরী হয়তো পাশের ঝোপের ভিতর দিয়েই গেল।

ব্রজ ঘন ঘন হর্ণ দিচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে—হেই রূপপুর যানেবালে! পুশুলে-কান্দি-প্রতাপপুর-সোনাডাঙা-রূপপুর!

সোনাডাঙা! কী সর্বনাশ! হাসি বলেছিল ওর দিদিকে দেখা করে যেতে। তিন-তিনবার আসতে-যেতে বাড়িটা রাস্তার ধারে পড়েছে, ভুলে গিয়েছিল কথাটা। এবার দেখা করতেই হয়। নয়তো হাসি রাগ করবে।

কিন্তু ব্রজ থামাল না গাড়ি। সোনাডাঙা পেরিয়ে গেল ভীষণ জোরে। অন্ধকার মাঠে গিয়ে তারপর হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে চন্দনের দিকে তাকাল। দাড়ি গোঁফ কাটিয়ে নিঃশব্দ হাসি থর থর করছে। চন্দন রেগে চুপচাপ বসে আছে। চন্দন জ্বলে উঠল তাকে হাসতে দেখে। বলল, ব্রজদা আমার কথা না শুনলে আমার মাথায় আগুন ধরে যায়। ভবিষ্যতে এমন যেন আর না হয়।

ব্রজ গম্ভীর হয়ে গেল কয়েক মিনিট। প্রতাপপুরের কাছে এসে সে মুখ খুলল, ছোটবাবু! স্যার?

বলো।

কথাটা হচ্ছে আপনাকে কেউ অপমান করলে আমি তা সইতে পারি না। ফাটাফাটি লেগে যেতে পারে। আপনি জানেন না, আমার ভায়রাশালা কী মাল। আমার চেয়েও ঝড় মাতাল হারামীটা। আমার ওপর রাগটা ওর মাগের যতটা নয়, ওর তার চেয়ে বেশী। এক সময় শালা সন্ধ্যের পর রাস্তায় ইঁট কাঠ ফেলে রাখত আমার গাড়ী আসার আগে—নয়তো একগুচ্ছের হেগে রাখত। একবার গাড়ী থামিয়ে সবাই মিলে শালার বাড়ী ঢুকে দিলুম দে মার। তবে—হাসির দিদিটা ভালো। শিক্ষিত মেয়ে যে! মাস্টারী করে স্কুলে।... একটু চুপ করে থেকে সে আবার বলল, ভালো বলছি—ভালই বা কিসের? ওই মাগী তো এখনও হাসিকে ফুঁসলাচ্ছে—বেজাকে ছেড়ে আয়। ও মাতাল বাঁদী-টাঁদীর ঘর, করিস নে।...চিঠি লিখেছে—চিঠিটা আমি দেখেছি স্যার। হাসি দ্যাখায় নি—লুকিয়ে দেখে ফেলেছি। লিখেছে, ওদের স্বজাতির যে লোকটা হাসিকে বিয়ে করতে চেয়েছিল, সে দুমকায় ভালো চাকরীবাকরী করছে এখন। হাসির ইচ্ছে হলে সে রাজী আছে এখনও। বুঝুন ব্যাপার।

চন্দনের রাগটা ভিতরে থেকে গেল—কিন্তু এসব শুনে আবার স্বাভাবিক হতে পারল সে। বলল, তাই নাকি? ভারী অদ্ভুত তো!

ব্রজ চুপ করে গেল। চাঁদটা পুশুলেতে থাকতেই ডুবেছে। সারা পথ ঘন অন্ধকার। হেড লাইটের আলোয় অনেকটা দূর-অব্দি চকচক করে উঠেছে পীচের পথ। চন্দন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল। গৌরী! জীবনের নতুন মাঠে এক আশ্চর্য ফসল। সজীব, স্বচ্ছন্দ আর সুন্দর! পাপের হাতটা অবশ হয়ে যায় তার দিকে উঠতে। গল্প উপন্যাসের প্রেম-ভালোবাসা আর বাস্তব জীবনের প্রেম-ভালোবাসা সম্ভবত একেবারে আলাদাভাবে গড়ে ওঠে। আলাদা রঙ, ভিন্ন

রকম চেহারা আর বিন্যাস। বাস্তবজীবনে রক্ত মাংসের গন্ধটাই যেন ঝাঁঝ ছড়ায় বেশী করে। নারী আর পুরুষ নিজের রক্ত-মাংসদেহ নিয়ে ভালোবাসার মোকাবিলা করতে মুখোমুখি হয়। কোন বইতে পড়েছিল, নায়ক-নায়িকা পরস্পর ভালোবাসা নিয়ে সারা জীবন কাটিয়ে দিল, স্পষ্ট হয়েও হতে পারল না! বোগাস! সত্যিকার ভালোবাসার নিয়মরীতি অমন নয়ই মোটে, সত্যিকার ভালোবাসা একটা বিস্ফোরণ, ভীষণতম তছনছ। সে সব সময় স্পষ্ট আর আত্মপ্রকাশে তৎপর। ঘর ধুসানোই তার অনিবার্য নিয়ম। সে একটা আকস্মিক বন্যা—তার দুকুল ভাসানো ভয়াবহ জল-কল্লোল আশে-পাশের সবাই শুনতে পায়। সে অস্তিত্বের গোড়ায় কখনো চাপ চাপ পলিমাটি এনে সমৃদ্ধ আর শক্ত করে—কখনো উন্মূল করে নিয়ে যায়। এই তো নিজে আমি—আমি চন্দন তার প্রমাণ। আমিতো উন্মূল হয়ে গেছি। রুমাকে একতরফা ভালবাসার ভয়ংকর উর্দ্দাম বন্যা আমার নিচে আনে নি উর্বর পলির কঠিন কোমল বাঁধুনি। আমি ভেসে গেছি।...

স্যার!

এ্যা? চন্দন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল। কোথায় এল গাড়ি ব্রজদা?

ঘুম লেগেছিল? রূপপুর ঢুকছি।

মুখ বাড়িয়ে দেখে নিল চন্দন। রুমাদের পেট্রোল পাম্প পেরিয়ে যাচ্ছে। হীরুবাবু আর হকসায়েব দাঁড়িয়ে আছেন। একটা ট্রাক থেকে পিপে নামানো হচ্ছে। ওপাশে একটা অয়েল ট্যাংকার দাঁড়িয়ে। হকসায়েবই চালাচ্ছেন তাহলে। হকসায়েব কি সত্যি বিশ্বাসী লোক? চন্দনের মতো অসৎ নন? গা শির শির করে উঠল চন্দনের। একটা গভীর ভয় ওর ভিতরে গুর গুর করে উঠল।

বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে ব্রজ কপাল মুছে বলল, গাড়ি কদিন হাটুবাবুর গ্যারাজেই থাক স্যার। কী বলেন?

চন্দন মাথা দোলাল। আড়ামোড়া ছেড়ে রাস্তার ধারে দাঁড়াল সে। প্রথম দিনটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতার মধ্যে কেটে গেল। রাস্তাটা মন্দ নয়, ছবির মতো সুন্দর গাছপালা পুকুর খাল বিল গ্রাম। কিন্তু একঘেয়ে লাগতে বাধ্য। এখন ভাবতে ভয় করে শুধু যদি নদীর বালিতে ওই অদ্ভুত ঘটনাটা না ঘটত, প্রতিটি দিন কী বিচ্ছিরি একঘেয়েমিতে ভরে উঠত। আর সে ভয়টা রইল না। দিনের প্রথম ট্রিপে বেরিয়ে পড়ার মুহূর্তে মনে পড়ে যাবে একটি বিচিত্র মেয়ের কথা—যে হয়তো তার জন্যে প্রতীক্ষা করছে। ঘণ্টা মিনিট গুনে ছটফট করছে টারমিনাসের আশে-পাশে। সে হাসি হয়েও হাসি নয়, নলিনী ডাক্তারের বউ নয়। সে নয় রুমার মতো সাবধানী মেয়ে। সে অনন্যা। পৃথিবীর এইসব মেয়েদের সঙ্গে তাকে মেলানো যায় না। আসলে হয়তো সে আকাশ থেকে খসে-পড়া মেয়ে—মাটিতে ফলে নি, ফলতে পারে না এমন আশ্চর্য শস্য।

কেমন একটা ভালবাসায় বুকটা ভরে উঠল চন্দনের। চৈত্রের রাতের ঝলমল প্রসারিত ভিড়ে হল্লায় মুখর এই রূপপুরকে সুন্দর লাগল আজ। পাণ্ডেজীর বহু রূপকুমারী।

ব্রজ চলে গেল গাড়ী নিয়ে গ্যারেজে রাখতে। তার মানে ব্রজ আজ বউর কাছে শোবে। শোক্ না। কিছু যায়-আসে না চন্দনের? হাসিকে তার

এখন খুবই অশ্লীল আর জঘন্য কুকীর্তির মতো লাগছে। গৌরীর পাশে হাসিকে বেরঙা মনে হচ্ছে॥ যার হাতে মাপকাঠি নেই, তাকেই তো অন্ধ বলে।

'স্যাঙ্গুভ্যালিতে' জমজমাট ভিড়। সীতাংশুবাবু নিজের জায়গা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল॥...এখানেই বসুন ছোটবাবু। কথা আছে। ভেরি আরজেণ্ট এ্যাণ্ড কনফিডেনসিয়াল।

কোথাও বসার জায়গা নেই। চন্দন বলল, থাক। পরে আসছি।

চড়ক পুজো অব্দি ভিড়টা থাকবে।...সীতাংশু বলল॥...পীরের থানের মেলা না উঠলে রূপপুর স্বস্তি পাবে না। আপনি এখানেই বসুন। কথা আছে জরুরী।

অগত্যা চন্দন বসল।

ওরে, ছোটবাবুকে স্পেশাল চা দে। কিছু খান। ট্রিপ সেরে এলেন—ক্ষিদে নিশ্চয় পেয়েছে?

নাঃ। আপনি কথাটা বলুন সীতাংশুবাবু।

হাজির জাযগাটা হল না। শিশির চন্দ্ররা বেশি চোট দিয়ে নিয়ে ফেললেন।

হল না? জায়গাটা ভাল ছিল।...চন্দনের মন খারাপ হয়ে গেল।...আর পছন্দও হয়েছিল আমার। পিছনে ফাঁকা, পাশে পুকুর। সামনে রাস্তা।

হ্যাঁ। তবে আরেকটা প্রায় অমনি জায়গাই পেয়ে গেছি। ফাঁকব দিক থেকে যদি বিচার করেন, এর তুলনা হয় না স্যার। পিছনে ধু ধু মাঠ আবার আশেপাশে গাছপালা রয়েছে। পুকুর একটু দূরে অবশ্যি॥ তাতে কী? টিউবেল বসিয়ে নেবেন।

কোথায় বলুন তো?

নুটবাবুদের বাংলো বাড়ির পাশেই। ওনাদেরই জায়গা। কথাবার্তা আজ দুপুরে বলেছেন বউরাণী।

চন্দন ভুরু কুঁচকে বলল, বউরাণী কে?

নুটবাবুর বউকে আমরা বউরাণী বলি জানেন না?...সীতাংশু হাসল।... অন্য কারণে নয়—ওনার আচার রাণী-মহারাণীদের মতো। সে জন্যেই বলি। যাক গে, খদ্দের কে তাও বলেছি।

আমার কথা বলেছেন?

লুকিয়ে লাভ নেই।...সীতাংশু কণ্ঠস্বর চাপা করল হঠাৎ।...পরেশবাবুর বউর সঙ্গে আপনার বিবাদ চলছে॥ আপনি পরেশবাবুদের গদী ছেড়ে চলে এসেছেন। তাই ভাবলুম, আপনার নাম করলে অসুবিধে তো নেই-ই, বরং... যাক্ গে। তা' বউরাণীর মুখে শুনলুম, আপনি মাঝে মাঝে যান ওনার কাছে।

চন্দন গম্ভীর হয়ে বলল, আগে যেতুম না। কাল সন্ধ্যায় একবার গিয়েছিলুম।

যাবেন বই কি। আপনি নিজেই বরং করে নিন না জায়গাটা। ইচ্ছে হলে আমাকে পান খেতে কিছু দেবেন—নয় তো দেবেন না।...আবার খিক খিক করে হাসল সীতাংশু।...আর বউরাণীর ভাবগতিক সেই রকম মনে হল।

কী মনে হল?

আপনি পাবেন। উনি বললেন, চন্দনবাবুকেই নিয়ে আসুন সঙ্গে। তা আমার আর যাবার দরকার কী? কাগজপত্র সব দেখে এসেছি। পরিষ্কার জায়গা। পরিমাণ এগারো ডেসিমেল। আপনি শিগগির দেখা করুন। তারপর আর যা করার, সে আমি করে দেব। ইঁটখোলা বেশি দূরে নয়। এক মাসেই বাড়ী তুলে দেবার ভার আমার—অবশ্যি যদি আমাকে...

চন্দন হেসে বলল, আপনাকেই দেব সব দায়িত্ব। আমার তো দুবেলা রাস্তায় হুড়োহুড়ি করে কাটবে। সময় পাব কোথায়? তা সীতাংশুবাবু, দাম কী রকম বলল? আমার ক্ষমতায় কুলোবে কিনা দেখি আগে।

সীতাংশু কানের কাছে মুখ এনে বলল, আপনি যদি চালাক হন অল্পতেই হবে। নয় তো এমন হাঁকবে, চোখে অন্ধকার দেখিয়ে ছাড়বে। সে জন্যই। তো আপনাকে যেতে বলছি। মনে হল, আপনাকে বউরাণীর পছন্দ হয়েছে।

চন্দন ভুরু কুঁচকে বলল, তার মানে?

সীতাংশু চাপা হাসল। কথার মানে যেমন খুসি করুন না। বউরাণী! ওরে বাবা! দূর থেকে নমস্কার করে এখানের লোকে। আপনার বরাত স্যার। ওনার নেকনজরে পড়ে পরেশ মজুমদার লাল হয়েছিল।

চন্দন জোরে হেসে উঠল।...আমার লাল হয়ে দরকার নেই।

খুশি আপনার। কিন্তু ছোটবাবু...চোখ নাচিয়ে কী যেন ইঙ্গিত করল সীতাংশু। পরক্ষণে একটুখানি ব্যাখ্যা করে দিলে যেন। বলল, বউরাণী আপনাদের মতো সুন্দর যুবকদের একটু তোয়াজ পছন্দ করেন। কখনও যাত্রা-থিয়েটারে পার্ট করেননি? করবেন। দোষ কী?

চন্দন হাসতে হাসতে বলল, তাই বলুন। বুঝেছি। সে পারব বইকি।

কই রে, ছোটবাবুর চা কই? ওরে হারামজাদা!...গর্জাল সীতাংশু।

চন্দন বলল, কিন্তু ওর বাড়ির পাশে বাড়ি করে আবার চিরকাল ওইসব তোয়াজ-টোয়াজ করে যেতে হবে না তো সীতাংশুবাবু?

সীতাংশু দুটো বুড়ো আঙুল দেখাল।...জায়গাটা করে নিয়েই নিজের মূর্তি ধরতে বাধা কিসের? খানকি মেয়ে তখন বুক চাপড়ে মরুক না!

সীতাংশুর চোখ-মুখে একটা কদর্য উল্লাস থমথম করছে দেখে চন্দন অপ্রস্তুত হল। এতক্ষণে লোকটা 'বউরাণী'র আসল ইমেজটা পর্দা ছিঁড়ে বের করে দিল যেন। হ্যাঁ এই হয়তো সুনন্দিতার ইমেজ এই রূপপুর টাউনশিপে। 'খানকি মেয়ে!'

চা এলে কোনরকমে প্লেটে ঢেলে গিলে ফেলল সে। তারপর বেরিয়ে এল। সীতাংশু কিচেনের দরজায় কাকে ধমক দিতে ব্যস্ত হয়েছে।

উদ্দেশ্যহীনভাবে কিছু দূর হাঁটল সে। ব্রজ এত তাড়াতাড়ি ফিরছেনা সেটা নিশ্চিত। সব রুটের ড্রাইভাররা একে-একে জুটবার সময় হল। এখন ওদের মৌজের আসর বসবে কোথাও। ব্রজর ফিরতে হয়তো দুপুর রাত।

একবার ভাবল সুনন্দিতার ওখানে যাবে—পরে ঠিক করল আগামীকাল সকালে গেলেই চলবে। বরং সীতাংশুবাবুকে সঙ্গে নিয়েই যাবে। বাঘ নাকি একবার নরমাংসের স্বাদ পেলে তারপর শুধু নরমাংসই খোঁজে। কিন্তু বাঘে

মানুষ-এ ব্যাপারে ভীষণ ফারাক আছে। সুনন্দিতাকে মনে পড়লেই কেমন ছমছম করে বুকের ভিতরটা। মনে হয় আত্মাটা পুরো গ্রাস করে ফেলবে। তার ওপর সীতাংশুবাবু যা ভয় ধরিয়ে দিল একটু আগে। গায়ে পড়ে তোয়াজ করার স্বভাব চন্দনের নেই। তা সে পারে না।

হাসির এতক্ষণে হাসপাতালে থাকার কথা। ব্রজর ঘরের ডুপ্লিকেট চাবি ব্রজর কাছে আছে। সদর দরজার ডুপ্লিকেট চাবিটা চন্দনের কাছে। অসুবিধে হবে না। সরু রাস্তায় পা বাড়িয়ে বুক কেঁপে উঠল হঠাৎ। টাকা অর্ধেকের বেশি ব্যাংকে রেখেছিল—বাকি অর্ধেকের গাড়ি কেনা বাদে যা আছে, তাও কম নয়, সবটা কালো সুটকেশে কোটের পকেটগুলোতে ঠাসা আছে। জায়গা কেনা এবং বাড়ি তৈরীর ব্যাপারে নগদ টাকার দরকার হবে বলে রেখেছে এমনি করে। তাছাড়া পুরোটাই রাখতে সাহস পায়নি। ব্রজর বাড়ির দিকে যত এগোল, মনে হল—চুরিটুরি হয়ে যায়নি তো? একটেরে বাড়িটা—হাসি নেই। ব্রজর ঘরে অবশ্য চুরি করার মতো জিনিস তেমন কিছু নেইও। বিছানা কাপড়-চোপড় ছাড়া দু-চারটে তৈজস মাত্র। সবাই জানে ব্রজ বাউণ্ডুলে মানুষ—বউটাও তেমন সংসারী নয়। তবে কিনা চোরের কাণ্ড—একটা ঝাঁটা পেলেও নাকি তার খাটুনি উসুল হয়।

খুব লম্বা পা ফেলে দ্রুত এগোল চন্দন। কলাঝোপ ঘেরা পুকুরটা এক নিশ্বাসে পেরিয়ে গেল। তারপর মনে হল কে বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে আছে—চৌকাঠে ঠেস দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। চন্দন বলে উঠল, কে?

আমি। বাব্বাঃ! কখন থেকে পথ তাকাচ্ছি। বাবুদের ফেরবার নাম নেই। বড়বাবু তো রাত পুইয়ে ফিরবেন জানি। ছোটবাবুও কি সেই পাঁকে আটকে গেল? তাই ভাবছিলুম এতক্ষণ। হাসি হেসে উঠল।

চন্দন কাছে গিয়ে বলল, তুমি হাসপাতাল যাওনি?

হাসি দরজার মধ্যে সরে বলল, গেলুম না। ননী ডাক্তারকে বলে এলুম বিকেলে। মনমেজাজ ভালো নেই।

কই সরো। যেতে দাও।

হাসি সরল না। অন্ধকারেও ওর চোখের ঝিলিক দেখা যাচ্ছে। চাপা গলায় বলল, ছুলে জাত যাবে বুঝি ছোটবাবুর। পুশুলের ঘাটে চান করে পবিত্র হয়েছে বুঝি?

যাঃ এই তো ছুঁচ্ছি।...চন্দন ওর কাঁধে হাত রেখে একটু ঠেলে দিল।

হাসি দরজা বন্ধ করে বলল, আমাকে একবার কোলে নাও না ছোটবাবু।

এত পাগলামি ভালো নয় হাসি। পস্তাবে।

নেবে না কোলে?

যাঃ! বাড়াবাড়ি করো না।

বেশ, আমি কথা বলব না।...হাসি বারান্দার দিকে এগোল।

হাসি শোন।

শুনব না। যেচে পড়ে গেছি, তাই দাম কমে গেছে।

হাসি, এস কোলে নিচ্ছি।

হাসি দৌড়ে এসে একলাফে ওর কোমর পা দুটো দিয়ে আঁকড়ে ধরল হাত দুটো গলায় বেড় দিল। চন্দনের মনে হল একটা মারাত্মক সাপ তার শরীরে জড়িয়ে গেছে। তারপর এত ভারি লাগল দেহটা! সে হাসিকে সামলাতে না পেরে ঝুঁকে গেল। হাসির সর্বনাশা শ্বাস-প্রশ্বাস ছড়িয়ে এল মুখের ওপর। ...ও ছোটবাবু, হল কী তোমার? ভয় পেলে নাকি গো?

চন্দন খুব আস্তে বলল, একটু নামো তো হাসি। হঠাৎ কেন মাথা ঘুরছে।

একুশ

মৌরী নদীর ওপারে বাবলাগাছের গুঁড়িতে বিঁধে থাকা সেই চাঁদটা এখন এপারে পুরুলিয়ার ঘন কালো গাছপালার মধ্যে ঢ্যাঙ্গা শুকনো একটা গাছ বেছে নিয়ে তারই ডালে উজ্জ্বল ফল হয়ে ঝুলে আছে। এখন মৌরী নদীর খালি বুক ভরে গেছে জ্যোৎস্নায়। চন্দন পাড়ের দিকে তাকিয়ে ছিল। বালির ওপর যে ধুপ ধুপ করে দৌড়ে আসছিল, সে ব্রজগোপাল। কাছে এসে খিক-খিক করে হাসল সে।...কে গেল স্যার?

চন্দন চমকে বলল, কে আবার? তোমার গাড়ি ধোওয়া হল?

প্রায়। ছোঁড়াগুলোকে লাগিয়ে দিয়েছি। চলুন।

দুজনে পাশাপাশি হাঁটছিল। চন্দনের মনে হল ব্রজ যা দেখেছে অস্পষ্টভাবে তার জন্যে উসখুস করছে। আজ একটা ট্রাককে পাশ কাটাতে বাঁদিকের দুটো টায়ারই নোংরা হয়ে গেছে। রাস্তার ধার ছাড়া লোকের—বিশেষ করে পাড়াগেঁয়ে স্ত্রীলোকের আর বসবার জায়গা নেই। কী বিচ্ছিরি স্বভাব সব! বাড়িতে ল্যাট্রিন নেই—কিন্তু মাঠে ঝোপঝাড়ও তো রয়েছে। তা নয়—রাস্তার ধারটাই বেছে নেয় সন্ধ্যের দিকে। গাড়ির আলো গায়ে পড়লে উঠে দাঁড়ায়। গাড়ি চলে গেলে ফের বসে। আর তার ফলে নতুন টায়ারগুলোর এই দুর্দশা। বাসস্ট্যান্ড থেকে সোজা নামিয়ে এনেছিল ব্রজ নদীর মধ্যে। অত খাড়া ঘাটে উঠবে কেমন করে কে জানে। গরুর গাড়ির কথা আলাদা—ভীষণ চেঁচামেচি হইহল্লা করে, লেজ মুচড়ে, পাচনবাড়ির গুঁতো মেরে, লোকেরা ঠেলে তোলে। সেদিন ওই করতে গিয়ে, এক গাড়ি কুমড়ো হুড়হুড় করে গড়াতে গড়াতে ফাটাফুটি হল। গৌরীর সে কী হাসি! একটু আগে চন্দনের মুখে তার মোটরগাড়ির এই দুর্দশা শুনতেও সে হাসি সামলাতে পারছিল না। হঠাৎ ব্রজর দৌড়ে আসা দেখে সে পলকে পালিয়েছে। কিন্তু ব্রজ বড় চালাক। আজ হাতেনাতে দেখে ধরে ফেলেছে সবটা। বোঝা যায় সে বেশ উসখুস করছে।

চন্দন বলল, গাড়ি উঠবে তো?

ব্রজ আশ্বস্ত করল।...কী যে বলেন! বড় বড় ট্রাক ধুয়ে নিয়ে যায় এখান থেকে। আগের অমন লঝঝড় অবস্থায় কতবার আমিও ওকে ধুয়ে নিয়ে গেছি! সে ভাববেন না।

গাড়িটা দেখা গেল দাঁড়িয়ে রয়েছে। কালো কালো কয়েকটা আধন্যাংটো মূর্তি ডলাইমালাই করছে। জল ছিটোচ্ছে। ব্রজ এগিয়ে বলল, হল রে বাবারা?

দেখে যাও না বেজোদা। টর্চ জেবলে দেখে নাও।

টর্চ বের করে খুঁটিয়ে চাকাদুটো দেখল ব্রজ। ...বাঃ! খাসা হয়েছে মাণিকরা। যা স্যারের কাছে বখশিস নে।

একটি ছেলে চেঁচিয়ে উঠল বখশিস তো নেবই। মজুরী নেব না?

ওই হল সোনা।...ব্রজর কণ্ঠস্বরে আদর বেরোচ্ছে।...ছোটবাবু, চারজন আছি —একটা টাকা দিয়ে দিন। অনাথ বাপ-মা মরা ছেলেপিলে সব। বাসস্ট্যাণ্ডে পড়ে রাত কাটায়।

বালককণ্ঠে হল্লা উঠল।...না, না বেজোদা। দু টাকা! নেবই না—আমরা ছোঁবই না।

চন্দন দুটো টাকাই দিল। ওরা চেঁচামেচি করতে করতে চলে গেলে। বলল, ওরা কোত্থেকে এসে জুটল ব্রজদা?

আর বলবেন না।...ব্রজ টর্চটা টিপে বালির ওপর এদিক-ওদিক ঘাট অব্দি দেখে নিল।...সব আশেপাশের গ্রাম থেকে এসে জুটেছে। এখানে দিব্যি আছে। প্যাসেঞ্জারদের মোট বয়ে দ্যায়। ড্রাইভারদের ফাইফরমাস খাটে। দুচার পয়সা পায়টায়। আরও বড় হলে তখন চালাকচতুর যারা, কোন গাড়িতে এ্যাসিস্ট্যাণ্ট হয়ে যায়। আমার জানা ক'জন মেকানিক আছে এ্যাসিস্ট্যাণ্ট আছে এ লাইনে। এমনি করে গাড়ি ধুতে ধুতে একদিন...ওরে বাবা! সময় হয়ে এল যে! আসুন স্যার, বসে পড়ুন।

গাড়ি ঘুরিয়ে নাও। আমি বরং হেঁটেই যাচ্ছি।

ভয় করছেন?...ব্রজ উদ্দাম হাসল। আপনার আশীর্বাদে আমি এ গাড়ি নিয়ে অকাশে উড়ে চক্কর দিতে পারে। এই দেখুন।

স্টার্ট দিয়ে জলের ওপর ঘুরিয়ে বালিতে তুলল গাড়িটা। ভিজে বালি। আশ্চর্য ক্ষিপ্রতয় গাড়িটা বোঁও করে ঘাটের দিকে ছুটে গেল। তারপর যেন সত্যি প্লেনের মতো মুখ উঁচু করে সগর্জনে উঠে গেল ঘাটের ওপর। চন্দন দৌড়ে এগিয়ে গেল। লোকটা ড্রাইভার হিসেবে সত্যি অসাধারণ। আশ্চর্য তার বউ হাসি! হাসি এখন একমাস ছুটি নিয়ে চুটিয়ে প্রেম চালাচ্ছে।...

এ মুহূর্তে হাসির কথা ভাবতে থাকল চন্দন। অনেক রাতে টলতে টলতে ব্রজ বাড়ি ফিরলে হাসি বলে, ঘরের কথা বুঝি মনে ছিল না তো এলে কেন শুনি?

মাতাল ব্রজ বলে, ঘর? আমার শালা ঘর নেই—আমি হাঘরে। পথই আমার ঘর।

পথেই থাকো গে। যাও। আর আসতে হবে না। এক্ষুনি চলে যাও।

ব্রজ হাসে। আমি কি ঘরে এসেছি? আমি বাড়ি এসেছি।

সেদিকে তো দিব্যি টনটনে জ্ঞান। বাড়ি এসেছি! তোমার চৌদ্দ পুরুষের বাড়ি এটা। বাড়ি! বাড়ি কখনও দেখেছ? জানো বাড়ি কী দিয়ে হয়?

জানি বইকি।...আঙুলে টাকা বাজায় ব্রজ। বলে, টাকা। টাকা দিলে বাড়ি হয়। আমার টাকা নেই, আমার বাড়ি হয় না। আমার শালা টাকাও হবে না বাড়িও হবে না। পথ—হ্যাঁ, পথই আমার বাড়ি। জন্মেছিলুম পথে, মরব পথে।...ব্রজ গলা চড়িয়ে ডাকে।...ছোটবাবু! ছোটবাবু ঘুমোলেন স্যার? আমার জন্মের হিস্ট্রি শুনুন। উঁহু হু—দরজা মাৎ খুলিয়ে—শুয়ে শুয়ে শুনুন। আমার জন্মো স্যার, আপনার দিব্যি, পথে। গেছেন কখনও দ্বারকা নদীর

ওদিকে? শাদল-রুইগাঁর নাম শুনেছেন? ভীষণ বানবন্যা হয়। একবার হল কী, নদীর বাঁধ ভেঙে জল ঢুকছে দেখে বাগ্দীবউ স্বর্ণলতা—আমার মা স্যার, হাসি, তোর চৌদ্দপুরুষের এমন নাম নেই, কী নাম! আহা হা—স্বর্ণ, আবার লতা। আমার মা স্বর্ণলতা পালাচ্ছে বাপের বাড়ি। উঁচু দেশ সেটা। আমার বিধবা মা পালাচ্ছে, বুঝলেন স্যার? পথে আমার জন্মো হল। প্রকাশ্য রাস্তায় স্বর্ণলতা বাগ্দিনী অধম ব্রজগোপালের···হঠাৎ ডুকরে কেঁদে ওঠে ব্রজ॥ ফুঁপিয়ে বলে, আমি···আমি সেই থেকে পথের মানুষ হয়ে গেলুম স্যার। ঘর আমাকে সয়? নাঃ। ছোটবাবু স্যার...

চন্দন বেরিয়ে ধমক দ্যায়, আঃ, কী হচ্ছে ব্রজদা! যাও শুয়ে পড়ো।

নাঃ। আমি শোবনা। ও ছেনালের কাছে আমি শোব না!

হাসি চেঁচিয়ে ওঠে, তোমার চৌদ্দপুরুষ ছেনাল।

অ্যাও চোপ মাগী! খবর্দার!

চন্দন এগিয়ে আসে।···ব্রজদা, এমন করলে আমিই চলে যাব তোমার এখান থেকে।

ব্রজ নরম হয়ে বলে, কভী নেহি। আমি চললুম। এ্যাই হাসি, চললুম। আর কক্ষনো আসব না।···টলতে টলতে সে দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

চন্দন ধরে ফেলে তাকে। সে চন্দনের পা ছুঁতে হাত বাড়ায়॥···আটকাবেন না স্যার। ব্রজ চলল। ব্রজ তার বউটাকে রেখে গেল—দেখবেন। ব্যস! হাসি, ছোটবাবু তোমাকে দেখবেন। ডরো মাৎ॥ দেবতাকে রেখে গেলুম তোর মতো পাপীর পাহারায়। তোর কপাল রে হাসি!

ব্রজ চলতে চেষ্টা করে। চন্দন টানাটানি করে। এবং হঠাৎ হাসি এসে গোপনে চন্দনের পাশে চিমটি কাটে। হাসি কী বলছে টের পায় চন্দন। তার খারাপ লাগে। কিন্তু ব্রজর গোঁ—শেষ অব্দি সত্যি সে চলে যায়। তাকে আটকানো যায় না। কী প্রচণ্ড জোর লোকটার গায়ে।

হাসি দরজা আটকে দ্যায়। চাপা হেসে ফিরে আসে॥ ফিসফিস করে বলে, ও মরুক। এস।...এবং চন্দনকে 'আসতে' হয়। অমলিক ভালবাসা দিয়ে রাতটাকে সাজাতে হয়। জঘন্য!...

চন্দন বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে দেখল গাড়ি পেঁছনর সঙ্গে সঙ্গে ভিড় জমে গেছে। ছাদেও একদঙ্গল লোক বসেছে। রূপপুর মেলায় আজ কলকাতার যাত্রার আসর। ভিড়টা সে কারণে বেশি। আর দুটো বাস আছে এ লাইনে। সে দুটোও একই অবস্থা। ব্রজ বলল, আসুন। ভাড়া বের করো—বাবারা। গাড়ি ছাড়ব এক্ষুনি। স্যার, ঝটপট ভাড়াগুলো নিয়ে নিন। আমি আসছি।

শ্যামার পানের দোকানের পাশে গৌরী এসে দাঁড়িয়ে আছে। ব্রজর লম্বা ছায়াটা তাকে একবার ঢেকে ফেলে আবার মুক্ত করে দিল। এখানে এখনও ইলেকট্রিসিটি আসেনি। দোকানগুলোয় হ্যাসাগ আর ডেলাইট জ্বলছে। খাপচা খাপচা আলো পড়েছে তেমাথা রাস্তা আর বাসস্ট্যান্ডে। একখানে কুমড়ো জড়ো করা আছে। পেঁয়াজ আর আলুর বস্তা নিয়ে ট্রাকের অপেক্ষা করছে ব্যাপারীরা। চায়ের দোকানের বেঞ্চে দুজন শিখ ড্রাইভার কী কথায় হা হা করে হেসে উঠছে। গোল চাঁদটা উঠে এসেছে গৌরীদের একতলা বাড়ির ছাদের কার্নিশে। দুটো নারকোল গাছের মাঝখানে বেলুনের মতো ভাসছে। গাড়ি-ধোওয়া ছেলেগুলো

জটলা করছে আর সিগ্রেট টানছে। প্রিং প্রিং করে অন্ধকার চিরে এসে গেল একটা সাদা প্রাইভেট কার। ছাদে বাকসো পত্তর বেডিং বোঝাই। গাড়িটা মোড়ে একবার থামল। ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে কী জিগ্যেস করল শ্যামাকে। তারপর বাঁদিকে ঘুরে চলে গেল। হয়তো কলকাতা থেকে এল গাড়িটা। এখানে কোন আত্মীয় বাড়ি আছে গাড়ির মালিকের। চন্দন গৌরীকে তখনও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। ভাড়া নিতে নিতে সে যতবার তাকাল, দেখল গৌরী স্থির দাঁড়িয়ে আছে। অসমাপ্ত কথাগুলো নিয়ে বেচারা মুশকিলে পড়ে গেছে হয়তো। ব্রজটা আজ সব মাটি করে দিয়েছে।

এতক্ষণ ব্রজ এল তার বেঢপ ছায়াটা পাশে ও পিছনে দোলাতে দোলাতে। গৌরীকে আবার ঢাকল। দু মিনিট ঢেকে রাখল রাহুর মতো। শ্যামার কাছে পান নিল। ব্রজর হাতে একটা গোল মতো টিফিনকৌটো। নির্ঘাৎ ওর সেই পাতানো মা-বুড়ির দেওয়া কোন খাবারদাবার। বুড়িটার পয়সা আছে। একটা বাড়ি আছে। তিনকুলে কেউ নেই। ব্রজকে এত ভালোবাসে, ভাবা যায় না! ব্রজর আখের মন্দ হবে না, যদি যোগাযোগটা বরাবর রাখে। চন্দন হাত বাড়িয়ে ছিল। বলল, কই কী হল?

প্রতিদিনের সেই আণ্ডাওয়ালা লোকটা। যাবে সোনাডাঙ্গার ওদিকে। সারাদিন এলাকা চষে হাঁসমুরগীর ডিম কেনে এক ঝুড়ি। আসবার সময় যেমন, যেতেও এ-গাড়ি তার বরাদ্দ। ব্রজর আস্কারা সবই। আসবার সময় একটা সিকি, যাবার সময় দুটো ডিম—করজোড়ে বলবে ওতেই মাফ করে নেন হুজুর।

যা ভেবেছিল তাই। হাতের চেটোয় দুটো ডিম বেরিয়ে এল। ডিমদুটো দেখে চন্দনের হঠাৎ খারাপ লাগল। খেঁকিয়ে উঠল সে, রাখো তো তোমার, ওই ঘোড়ার ডিম! পয়সা বের করো।

ঘোড়ার ডিম শুনে গাড়িশুদ্ধ লোক হাহা হিহি হাসছে। কাঁচুমাচু মুখে লোকটা বলল, সব খরচ হয়ে গেছে বাবু। আর একটা কড়ি নেই—বিশ্বাস করুন। ওতেই ক্যামা দিন বাবু। আমি আপনার পুরনো পেসেঞ্জার।

ব্রজ এসে গেল।...এককড়ি সেখ নাকি হে?

ডিমওয়ালা ব্রজকে দেখে লাফিয়ে উঠেছে।...বেজোদা, বাবু ডিম নিচ্ছেন না। ভাড়া চান বেজোদা। ও বেজোদা, লক্ষি ভাই...

চন্দন কী বলতে যাচ্ছিল, ব্রজ ডিমদুটো নিয়ে বলল, ছেড়ে দিন স্যার। গরীব মানুষ।

চন্দন রেগে গুম হয়ে গেল। গাড়িটা ব্রজর—না তার? সে গম্ভীর মুখে বলল, ওসব আমি পছন্দ করিনে ব্রজদা। গাড়ির খরচা হিসেব করে চলাই ভালো। পোষাবে না এভাবে।

ব্রজ কানেই নিল না কথাটা। দরজা খুলে নিজের সীটে বসে হর্ন বাজিয়ে হাঁকল—সোনাডাঙ্গা—প্রতাপপুর—রূপপুর। ছেড়ে গেল, ছেড়ে গেল!

একজন যাত্রী বলল, আর বসাবে কোথা হে ব্রজ? তোমার না ছোটবাবুর মাথায়? ছাড়ো ছাড়ো। তিন মিনিট লেট হয়ে গেছে।

ব্রজ চন্দনের উদ্দেশ্যে বলল, দেখুন তো স্যার, ওই যে পুঁটুলি হাতে স্ত্রী-লোকটা—কোথায় যাবে মনে হচ্ছে! গাঁয়ের মানুষ সব—ঘাবড়ে যায় বাসস্ট্যাণ্ডে এসে।...চন্দন গেল না দেখে সে নিজেই চেঁচাল—এই, এই যে মেয়েটা। কোথায়

যাবে গো? এস, এস,—ছেড়ে দিচ্ছি! আ মলো ছাই! হাঁ করে ওদিকে কী দেখছে। স্যার, ছোটবাবু' দেখুন না একবার!

চন্দন বাঁদিকের দরজা খুলে সামনের যাত্রীটিকে বলল, সরে যান একটু...সে কোনরকমে ইঞ্চি ছয় জায়গা দিলে চন্দন বসল। ব্রজ গাড়ি স্টার্ট দিয়ে হর্ন বাজাতে বাজাতে এবং যথারীতি রুটের নামতা হাঁকতে হাঁকতে লোকের ভিড় ঠেলে একেবারে হাজির হল সেই মেয়েটির কাছে। গাড়ি ঘুরিয়ে নেবার মুহূর্তে চেঁচাল আবার, কানের মাথা খেয়েছ গা? যাবে তো এস না। ওদিকে কী দেখছ?

স্ত্রীলোকটি অদূরে কোন দোকানের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। এবার সচকিত হয়ে বলল, গুরুলে যাব বাবা। এ গাড়ি গুরুলে যাবে?

যাবে, যাবে। এস। শিগগির। ব্রজ হর্ন বাজাল আবার॥

স্ত্রীলোকটি ব্যস্ত হয়ে একবার ওদিকে একবার এদিকে তাকাল আর ছটফট করে উঠল। আমার ভাইপো আছে গো! সন্দেশ কিনতে গেল যে! ও সুরেন, সুরেন রে! দ্যাখো তো এখন কী করি! ওরে ডাকবুকো ছোঁড়া!

ব্রজ দরজা খুলে ধমক দিল, আরে ভাইপো আসছে। তুমি এসে চাপো দিকি। এস, আমার এখানেই এসো।

ভড়কে গিয়ে স্ত্রীলোকটি বলল, ওখানে কোথা বসব? ও সুরেন!

যাত্রীরা তাগিদ দিচ্ছিল। চন্দনও রেগে-মেগে বলে উঠল, কী হচ্ছে ব্রজদা! কোন মানে হয়?

ব্রজর কান নেই। সে যথাসাধ্য সরে বলল, আরে বাবা! তুমি আমার মা, আমি তোমার ছেলে। এসে বসো তো চুপচাপ। এস। তোমার ভাইপো না বোনপো এক্ষুনি এসে যাবে। ব্যস! অলরাইট। ফাস্টক্লাসে বসতে পেয়েছ।

সাবধানে ওইটুকু জায়গায় বসে সে নাকিস্বরে বলল, সুরেন কোথা বসবে গো?

ব্রজ গাড়ি ঘরাতে ঘুরাতে বলল, সে ভাবনা তোমার নেই।

পাশের বাসটার কন্ডাকটার দৌড়ে এল পাশে। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলল, এই বেজো! কী ভেবেছ কী? পাঁচ মিনিট লেট করে ছাড়লে—সব প্যাসেঞ্জার কি তোমার একার রেজেস্ট্রি করা নাকি? প্রত্যেক ট্রিপে হ্যাংলামি করছ! কই, ছোট-বাবু কোথা? ও ছোটবাবু!

ব্রজ জবাব ছিল না। চন্দনও সাড়া ছিল না। গাড়ির চাকা গড়াচ্ছে। হর্ণ বাজছে। স্ত্রীলোকটি এবার ভীষণ চেঁচামেচি সুরু করেছে।—আমাকে নামিয়ে দাও। ও সুরেন' ও মা গো—গাড়ে যে চলে যাচ্ছে!

সত্যি সত্যি কেঁদে ফেলল শেষঅব্দি। গাড়ি আস্তে চলেছে অবশ্য। সবাই জানে, বাসস্ট্যান্ড ছেড়ে যাচ্ছে আপাতত—বাসওয়ালাদের ঝামেলার জন্যে এটাই রীতি, এবং সামনের বাঁকে গিয়ে গাড়িটা দাঁড় করাবে। কিন্তু স্ত্রীলোকটি লাফালাফি শুরু করেছে। রাগে চন্দন অস্থির হয়ে পড়ল। সে কী বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় দৌড়ে সেই ভাইপো সুরেন এসে হাজির। এসেই জোর ধমক—বাঁশ ফাটাচ্ছ কেন? আমি কি মরেছি, না চিতেয় উঠেছি পুশুলের ঘাটে?

সুরেন এলি বাবা! ওরে, আমার বুক ধড়ধড় করছে রে!

সুরেন বলল, চোপ! বেজোদা, জায়গা কই!

ব্রজ বলে দিল, সামনে এঞ্জিনের ওপর বোস না হে। উঁহু, আমার সামনে নয় —বাঁদিকে।

সুরেন লাফিয়ে উঠে বসল।...গরম লাগবে না তো?

ব্রজর ত্বরিত জবাব।...পাছার তলায় পিসির পোঁটলা দাও না হে! পিসি, ভাড়া কে দেবে?

আশ্বস্ত পিসি আরামে জবাব দিল, দিচ্ছি বাবা, দিচ্ছি।

স্যার, ভাড়াটা নিয়ে নিন। বারো আনা দাও, পিসি।

পিসি আদুরী মেয়ের মতো দুলে বলল, ওরে বাবা। বা-রো-আ-না সে পারব না বাবা। এই আধুলিটা আছে।

ব্রজ সকৌতুকে ধমকাল।...চেপেছে ফাস্টোকেলাসে। বারো আনার কম দিলে একেবারে কোথায় নামিয়ে দেব জানো? ঢেলাইচণ্ডীর মাঠে। ভূতপেরেতে ছিঁড়ে খাবে তখন।

তোমার দিব্যি ভাইপো, আর নেই। পিসি বলে ডেকেছ, পাশে জায়গা দিয়েছ মাণিক!

সুরেন বনেটে পা ঝুলিয়ে বসে সিগ্রেট টানছে। ছাই উড়ে এসে চন্দনের মুখে-চোখে পড়ছে। সে বিরক্ত। সুরেন বনেটে বাজনা বাজিয়ে গান ধরে দিলে সে ধমকাল, সিগ্রেট ফেলো তো হে!

ব্রজ বলল, ওপাশে মালিক আছেন—ওনাকে দাও। স্যার, পয়সাটা নিন।

চন্দন বলল, গুরুলে তো আট মাইলেরও বেশি। তাই না? একটাকা। লাগবে দুজনের।

যা দিচ্ছে নিন স্যার। ফাউ প্যাসেঞ্জার—যা দ্যায়, তাই লাভ।

একটাকা লাগবে।

ব্রজর ঠোঁটে হাসি। কোন কথা বলল না। আলোর ধাক্কায় সামনের পথ থেকে জ্যোৎস্নাময় অন্ধকার দুধারে হুড়মুড় করে সরে যাচ্ছে। স্ত্রীলোকটি আধুলিটা ব্রজর পিঠের দিক দিয়ে হাত বাড়িয়ে চন্দনের হাতে গুঁজে দিল। অমনি চন্দন সেটা ছুঁড়ে দিল রাস্তায়। ব্রজ একবার তাকাল মাত্র। কিন্তু কোন কথা বলল না। স্ত্রীলোকটি চেঁচিয়ে উঠল আর্তস্বরে—ফেলে দিলেন? অমন চকচকে আধুলিটা?

চন্দন গজগজ করল।...হ্যাঁ, গাড়ি কিনতে পয়সা লেগেছে। তেল জোগাতে পয়সা লাগে। ড্রাইভারের মাইনে দিতে হয়।

গাড়ির ভিতর স্তব্ধতা কিছুক্ষণ। শুধু গাড়িটার গরগর গোঁ গোঁ—কখনও আর্তনাদের মতো, গোঙানির মতো আঁ আঁ অাঁ অাঁ শব্দ। গাছপালার বিশাল বিরাট ছায়াগুলো আলোর সামনে নিরন্তর আক্রান্ত এবং স্যাঁ স্যাঁ করে জ্যোৎস্নার মাঠে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। কচিৎ শেয়ালের উজ্জ্বল-নীল চোখের ঝিকিমিকি, সাপের এঁকেবেঁকে পালানো, গরুর গাড়ির বলদগুলো কান খাড়া করে পা ফেলছে, এবং স্তব্ধতা—যে স্তব্ধতা এই সবুজ স্টেশনওয়াগানটার সব শব্দ দিয়ে ঠেলে নাড়ানো যায় না।

হঠাৎ ব্রজ হেসে উঠল হো হো করে। স্টিয়ারিংয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ল হাসতে হাসতে। উদ্দাম হাসির দমকে তার শরীর কাঁপতে থাকল।

রোখকে রোখকে! সোনাডাঙ্গায় নামব।...কে চেঁচিয়ে উঠেছে তারপর।...

রূপপুর পৌঁছে অভ্যেসমতো কিছুক্ষণ রাস্তায় পায়চারি করছিল চন্দন। ব্রজ এবার গাড়ি রাখতে যাবে। গাড়ি স্টার্ট দিয়েছে সে। হঠাৎ গাড়িটা চন্দনের কাছে এসে থেমে গেল। ব্রজ মুখ বের করে বলল, ছোটবাবু।

কি হল ?

আমার ওপর রাগ করেছেন ?

না। রাগ করব কেন ব্রজদা ? ও তুমি ভেবো না। যাও, গাড়ি রেখে এস।

ব্রজ কাঁচুমাচু মুখে একটু হাসল। আমার কী হয় জানেন ? মাঝে মাঝে ভুলেই যাই যে আমি বাপ্তোৎ ড্রাইভার। গাড়িটা নিজের বলে ভুল করে বসি। মাতালছাতাল মানুষ, কিছু মনে করবেন না স্যার।

চন্দন ওর কাঁধ ছুঁল হাত বাড়িয়ে। বলল, কিছু মনে করিনি। যাও, গাড়ি রেখে এস। আজ কিন্তু শিগগির আসবে। বেশি খেয়ে এলে তখন সত্যিসত্যি রাগ করব।

ব্রজ বলল, অব্যেস। আসলে হয়েছে কী জানেন, রাজকমলদার আমলে তখন একা-একা সব করেছি কি না। সেই অব্যেস। ভুলে যাই যে এখন আর গাড়িটা রাজকমলদার নেই।

চন্দন একটু চমকাল।...মালিক হিসেবে রাজকমলবাবুর চেয়ে আমি হয়তো সত্যি খারাপ ব্রজদা। কিন্তু কী করব বলো ?

ব্রজ জিভ কাটল।...ছি ছি। আমি কি তাই বলেছি ? আপনি অনেক ভালো। আপনি দেবতার মতো মানুষ স্যার। আপনার দেনা কি জীবনে শুধতে পারি ! আপনি ব্রজর ভাঙ্গা হাড় জোড়া দিয়েছেন।

দেরী করো না। শিগগির ঘুরে এসো।...চন্দন সরে এল।

ব্রজ গাড়ি নড়াল না। তার চোখে জল চিকচিক করছে। কেঁদে ফেলল এই সামান্যতেই ! এত সেণ্টিমেণ্টাল লোকটা—অদ্ভুত। রুমাল বের করে চোখ মুছে আবার বলল, তাছাড়া আপনাকে আমি বিশ্বাস করি। রাজকমলদার যত প্রশংসা করি না কেন, আপনার মতো একটা দিকে অত ভালোমানুষ সে ছিল না।

কোন দিকে ব্রজদা ?...চন্দন সকৌতুকে প্রশ্ন করল।

হাসি ছুটি নিয়েছে এক মাস। রাজকমলদা হলে হাসিকে আমায় আগলে রাখতে হত। রাজকমলদা মরে গেছে—নিন্দে করব না। কিন্তু আপনি সে হলে বিশ্বাসই করতুম না। হাসি যে খুব গায়েপড়া মেয়ে ! শালা রাজকমলদার আলুর দোষ ছিল, আপনার দিব্যি।...হা হা হেসে আচমকা বোঁও করে গাড়িটা নিয়ে চলে গেল ব্রজ।

চন্দন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। কি কথা বলে গেল ব্রজ ড্রাইভার ? হঠাৎ কেন একথা বলল সে ? তাকে বিশ্বাসের কথা তুলে সতর্ক করল না তো। নাকি যা বলল, সরল মনেই বলল ? ওর হাসিটা কানে বার বার কাঁপিয়ে পড়তে থাকল চন্দনের। গাড়ির পিছনের লাল আলোটা একটা ষড়যন্ত্রসংকুল জলন্ত দৃষ্টির মতো কতক্ষণ ধকধক করতে থাকল চন্দনের দিকে। দাঁতে দাঁত চেপে সে গাল দিল শালা, মাতাল। নপুংসক !

হয়তো একটা কিছু আঁচ করে ফেলেছে লোকটা ! কিন্তু হাসি তো খুব সাবধানী মেয়ে—সে নিজেও এত সতর্ক।...পরক্ষণে মনে হল, যা ভাবছে তা ঠিক নয়। ব্রজ তাকে বিশ্বাস করে।

কিন্তু এও সত্য যে ব্রজ এরকম একটা ব্যাপার ঘটা স্বাভাবিক, সে সম্পর্কে বেশ সচেতন।

একটু এগিয়ে গেল সে অন্যমনস্কভাবে। সেই সময় পড়ে গেল অবাঞ্ছিত-ভাবে—একেবারে হকসায়েবের মুখোমুখি। হকসায়েব রিকশো চেপে আসছিলেন। চন্দনকে দেখেই চেঁচিয়ে উঠলেন—রোখো, রোখো! চন্দনবাবু ও চন্দনবাবু!

চন্দনকে দাঁড়াতে হল। রিকশো থেকে নেমে দৌড়ে এলেন হকসায়েব।... যখনই খুঁজি, শুনি নেই। কী ব্যস্তবাগীশ হয়ে পড়েছেন চন্দনবাবু। বাবা গণি, রিকশো নিয়ে চলে যা। ছেড়ে দিলুম। কাল পয়সা নিস।

রিকশো চলে গেল। চন্দন গম্ভীর হয়ে বলল, বলুন হকসায়েব।

হকসায়েব তার একটা হাত ধরে কাছে ঘন হলেন।...বলব কী বাবা ছোটবাবু! বড় দুঃখের কথা। জিন্দেগীভোর শুধু মানুষের কাছে দুঃখই পেয়ে এলুম। এ আমার নসিব। আমার মরণ নেই, যেচে পড়ে লোকের ভালোমন্দ দেখতে যাই। আফশোষ!

চন্দন বলল, হয়েছে কী?

হকসায়েব চাপা গলায় বললেন, আপনার বউদি—মানে পরেশবাবুর স্ত্রী এমন অল্প পানির মাছ, জানতুম না বাবা। বলি—সকলকেই যদি সন্দেহ করবি, সবাইকে যদি ভাববি, দিলে সব মেরে—তাহলে বাঁচবি কেমন করে বাছা? ও আমি তখনই বুঝেছিলাম—আপনার মতো জানাশুনো নিজের লোককে যখন বিশ্বাস করে না—তখন আমি তো বেজাত, একেবারে পর মানুষ! আর, হলও তাই।

চন্দন একটু হাসল।...আপনাকে অবিশ্বাস করছে নাকি?

করছে মানে? আচরণেই বোঝা যাচ্ছে। ভাবলুম, অনাথ-এতিম স্ত্রীলোক, মাথার ওপর পুরুষমানুষ নেই—অতগুলো নাবালক রয়েছে পুষ্যি। তাই গেলুম, যদি ধরেটরে টাটখানা খাড়া রাখা যায়। আর আমি ওতে নেই বাবা। এত লোকের উপকার করেছি—এই আমার স্বভাব ছোটবাবু, চিরকাল ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াই!

চন্দন বাধা দিয়ে বলল, ছেড়ে দিলেন নাকি?

হুঁউ। এইমাত্র সব সম্পর্ক চুকিয়ে এলুম। কৌটো খুলে একটা পান মুখে দিয়ে হকসায়েব বললেন, আসলে স্ত্রীলোক মানুষ। কাকেও বিশ্বাস করতে পারছে না। এখন দুবোনেই নাকি পাম্পে গিয়ে বসবে ঠিক করেছে। রুমা কলেজ বন্ধ করেছে। হেডমাস্টারের ছেলের সঙ্গে বিয়ের কথা সব পাকা হয়ে গেছে। জামাই তো বাউণ্ডুলে হবে। নিষেধ না শুনলে কী করি বলুন।

রুমা কলেজ ছেড়ে দিল? সত্যি বলছেন?

পিক ফেলে হকসায়েব বললেন, হ্যাঁঃ।

দিয়েছে—না দেবে?...চন্দন তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকাল।

হকসায়েব তার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন, সেটা সঠিক জানিনে। শুনলুম, ওই পর্যন্ত। দিচ্ছে—নাকি দেবে।

বিয়েতে সে রাজী?

এ্যাঁ? হ্যাঁ।...পরক্ষণে মাথা নাড়লেন।...সে স্ত্রীলোকের মনের কথা কেমন করে জানব? দিদির হুকুম—না মেনেও তো যো নেই। যাক্ গে, ছেড়ে দিন। এত অকৃতজ্ঞ ওনারা ভাবতেও পারিনি বাবা। নুটুবাবুর বউকে ধরেটরে অমন

ফ্যাসাদ থেকে বাঁচিয়ে দিলুম। আর এইরকম উল্টে—যাক্ গে। আমার নসীব।

চন্দন চাঁদটার দিকে তাকাল।

তো ছোটবাবু, গাড়ি তো বেশ চলছে দেখছি। এবার নিজে ড্রাইভিংটা শিখে ফেলুন। কখনো পরের ওপর ভরসা রাখবেন না। শিখে নিন গাড়ি চালানো।

চন্দন মাথা দোলাল মাত্র।

আসি ছোটবাবু। দেখা তো রোজই হবে।...চলে গেলেন হুকসায়েব।

চন্দন অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে শুরু করল। কিছু দূরে গিয়ে চমকে উঠল সে। কোথায় যাচ্ছে সে? কেন যাচ্ছে? ব্রজর বাসার রাস্তা কতদূরে পিছনে ফেলে চলে এসেছে যে!

একটু ইতস্তত করে ফের পা বাড়াল সে। হনহন করে হাঁটতে থাকল। চারপাশে এত ঝড উঠেছে! মাটি টলমল করছে। শুধু একটা শব্দ মাথার ভিতর, এই টলোমলো আলোড়িত স্থাবরজঙ্গমের মধ্যে বারবার জ্বলজ্বল করে উঠছে —রুমা। জিয়াগঞ্জের প্রান্তপ্রবাহিনী কাজল জলের এক সুন্দর ফসল—রুপোলি মাছের মতো ছটফটে একটা নগ্ন বালিকাদেহ, যার দুই স্তনের মাঝখানে অলৌকিক একটা নীলাভ তিল, উরুতে স্নিগ্ধ ক্ষতের জলছবি, পাছার ওপর দিকে তেকোনা হাড়ের রঙটা এখনও ঘন নীল হয়ে আছে। এই ফসলের ওপর পৃথিবীর কারো অধিকার থাকতে পারে না। এ তার নিজের। একান্তভাবে নিজস্ব।

লতু বেরিয়ে এসে বলল, কে? কাকে চাই? মা নেই। মাসি আছে। ও মাসি, সেই লোকটা এসেছে।

সেই লোকটা! এত তাড়াতাড়ি এই বাচ্চারাও ভুলে গেছে চন্দনকে! হয়তো বাচ্চারা এমনি হয়। চন্দন ডাকতে গিয়ে চুপ করে গেল। রুমা নামটা তার জিভে হারিয়ে গেল। বড্ড তেষ্টা পেয়েছে। থুথু শুকিয়ে গেছে। আগে এক গ্লাস জল খেয়ে নেবে।

মাসি! ডাকছে যে!

রুমা বারান্দায় বেরিয়ে বলল, কে ডাকছে রে?

চন্দন লতুকে পাশ কাটিয়ে ভিতর ঢুকল। বলল, আমি।

রুমা একবার তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল।...কেন?

রুমা তাকে 'কেন' বলছে? এমনি করে এত গম্ভীর—এত নির্বিকার! চন্দন আরও এগিয়ে গেল।...রুমা, আসতে বাধ্য হলুম।

কী অপরাধ করেছি, জানিনা তো। কিছু বলার থাকলে দিদিকে বলাই ভালো।

রুমা, শোন—

রুমা হঠাৎ ঘুরল মুখোমুখি। তার নাসারন্ধ্র কাঁপছে।...কেন, কেন তুমি এসেছ এখন? জানো না, কেউ বাড়ি নেই? যা বলার, পাম্পে গিয়ে বলো। আমি কিছু বুঝিনে।

রুমা, আমি যাই করি—

কোন কথা শোনার সময় নেই আমার।...বলে রুমা ঘরে গিয়ে ঢুকল।

চন্দন দাঁতে ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর এক লাফে বারান্দায় উঠল। হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে বলে উঠল, কেন—কেন তুমি কলেজ

ছেড়ে দিচ্ছ? কেন এত শিগগির বিয়ে করতে যাচ্ছ? ভেবেছ, কী? পরেশদা নেই বলে কি আমিও বেঁচে নেই? আমি বলছি—এ চলবে না। এ হয় না। আমি এসব কখনো বরদাস্ত করব না।

আচমকা রুমা তার গালে চড় মেরে বসল।...ইতর ছোটলোক! বেরোও এখুনি। কেন এসেছ? কেন এসেছ তুমি?...মুহুর্মুহু চড় আর থাপ্পড় পড়তে থাকল চন্দনের গালে, মাথায়, বুকে। তার জামা খামচে ধরে কড়কড় করে ছিঁড়ে দিল। তাকে ধাক্কা মারল। তারপর দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে কাঁদতে বিছানায় উপুড় হয়ে পড়ল রুমা। লতু সনতু মানতু প্রথম হাঁ করে দেখছিল। এবার এক-সঙ্গে কেঁদে উঠল। গ্যাঁদা দৌড়ে এল খুন্তী হাতে। চন্দন স্থির দাঁড়িয়ে আছে।

স্নেহধারা রিকশো থেকে নেমেই পাশ দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে আসা লোকটাকে চিনতে না পেরে বলে উঠল, কে? কে গেল রে লতু? রুমা, কে এসেছিল?

জবাব গ্যাঁদা দিল বারান্দা থেকে।.. তোমাদের সেই পুরনো লোকটা বউদি! কী কাণ্ড!

বাইশ

হাঁটুবাবুর গ্যারেজটাই সবচেয়ে বড়ো এখানে। মস্তো টিনের শেড রয়েছে। খোলা চত্বরেও গুটিকয় ট্রাক বাস কাঁচুমচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তেল চুকচুকে লোহালক্কড়ের কাঁড়ি ছড়ানো ঘাসের ওপর এক কোণে কী একটা ফুলের ঝাড়। খানিকটা জ্যোৎস্নায় খানিকটা বিজলী আলোয় তাকে কেমন চতর অ'র হিংস্র লাগে। সেখানে ব্রজ নেই—তার থাকার কথা'ও নয়। গাড়ি রেখেই বেরিয়ে গেছে। বাড়ি নিশ্চয় যায়নি। মেকানিকেরা সেলাম জানিয়ে বলল, একবার রাধার হোটেলে দেখতে পারেন। তাই বলছিল যেন...বলছিল না শম্ভু?

শম্ভু নামে লোকটা বিজলীবাতি নিয়ে একটা ট্রাকের তলায় ঢুকতে ঢুকতে বলল, হ্যাঁঃ।

ছন্নছাড়ার মতো হাঁটছিল চন্দন। বড় রাস্তায় এসে বুকের জামার ছেঁড়া অংশটা একবার দেখে নিল। আজকাল কী সব পলকা কাপড় বেরিয়েছে। এক-টানেই ফরফর করে ছিঁড়ে গেছে! এই জামাটা তাকে পরেশ মজুমদার এনে দিয়েছিল কলকাতা থেকে। সে বেঁচে থাকলে আজকের এই কাণ্ডটা ঘটত কি? পুরো জীবনটা অন্যরকম থাকত। একটা লোকের না থাকাতে কত কী ওলট পালট ঘটে যায়! একটামাত্র লোকের থাকাটা অনেকগুলো লোকের জীবন কী রকম করে তোলে! পরেশদা'টা কী ছিল ভাবা যায় না!

উথালপাথাল ঝড়ের মুখোমুখি আবার পড়ে গিয়ে এত একলা লাগছিল চন্দনের। শুধু পরেশের কথাই মনে পড়ছিল—অনর্গল পরেশের উদ্দেশ্যে কথা বলতে ইচ্ছে করছিল। একটা চাপা কান্নাকান্না ভাব স্যাঁতসেতে করে দিচ্ছিল ভিতরটা। এতদিনে ধরা পড়ল, মাথার ওপরকার বড় গাছটা ঝড়ে উপড়ে গেছে। রূপপুরে আজ সে এত অসহায় প্রতিপন্ন হয়েছে। 'জিয়াগঞ্জের সেই লোকটা'—হুঁঃ, এখন সে একটা লোক হয়ে পড়েছে! কোথাও নির্জনে গোপনে পরেশের

জন্যে ভীষণ চেঁচিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে করে। অথচ চারপাশে এত ভিড়, এত উল্লাস আর আনন্দ—দলে দলে বাঘ বেরিয়ে পড়ার মতো এবং তার এই রকম ভীরু শোকেচ্ছার ছোট্ট প্রাণীটা মুহূর্তে আক্রান্ত হবে!

এখন ব্রজকে তার চাই-ই। ব্রজ ছাড়া আর দোসর নেই কোথাও। ওই কিম্ভূত চেহারার অদ্ভুত লোকটাকে এত ভালো লাগছে এতক্ষণে! তারা সারা রূপপুর তোলপাড় করে ডাকতে ইচ্ছে করছে, ব্রজদা—আ—আ! তুমি কোথায় আছো?

রাধার হোটেলে আলো জ্বলছে দেখা গেল। মোটে তো নটা বাজে! জনাতিন খাচ্ছে। রাধাকে দেখা গেল না। সে ভিতরে চোখ বুলিয়ে বলল, ব্রজ ড্রাইভার আসেনি এখনো?

পরক্ষণে মনে পড়ে গেল শংকরের কথা। গ্যারেজের লোকটা ভুল বলেছে। শংকরের সঙ্গে ব্রজর এখন রীতিমতো মারামারি হবার কথা না? প্রশ্নটা করেই অপ্রস্তুত হল চন্দন। ফিরে আসবে ভাবল। রাধার সেই বোনঝি বা ভাইঝি মেয়েটি মুখ তুলে হাসছিল চন্দনকে দেখে। একটা ছোকরা জলের গ্লাস আনছিল। সে জবাব দিল, বসুন বাবু, দিদিকে ডেকে দিই। এক্ষুনি ভেতরে গেল। ও দিদি, শুনছ? ছোটবাবু এয়েছেন।

মেয়েটি ভুরু কুঁচকে চোখ নাচিয়ে বলল, বেজোকে খুঁজছেন?...বলেই সে আঙুল দেখিয়ে ভিতরের দিকটা দেখাল।

ব্রজ তাহলে সত্যি এখানে আছে? ব্যাপার কী? শংকরের সঙ্গে মিটমাট হয়ে গেছে নির্ঘাৎ। ভারি অদ্ভুত এ লাইনের ড্রাইভারগুলো।

রাধা এল হন্তদন্ত। মুখভরা হাসি।...ওরে আমার কী হবে রে! ছোটবাবু যে গো! বলি, সুয্যি আজ কোনদিকে উদয় হলেন গো? বসুন, বসুন বাবু। রাধার ভাগ্যি! বসুন—আমার টাটেই বসুন না। অ সন্ধ্যা, বরং কম্বলখানা নিয়ে আয় দিকি শিগ্গি। দাঁড়ান ছোটবাবু কম্বল দিই।

থাক।...চন্দন একটু ইতস্তত করে বলল, মানে—ব্রজদাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

রাধা চোখ নাচাল। ফিসফিস করে উঠল, এয়েছে মুখপোড়া ডাকাত। এখানে যে মধু আছে গো। ছাড়তে পারে? ওকে বলেছিলুম—রোস, ঠাণ্ডা মাথায় থাকো। বেজো এসে পায়ে ধরে ক্ষ্যামা চাইল বলে! হলও তাই।...রাধা সশব্দে হেসে আঁচলে ঠোঁট ঢাকল।...এয়েছে। এসেই জমিয়েছে। খানিক বাদে একে একে আরও এসে যাবে মুখপোড়ারা। রাধা ছাড়া গতি আছে কারো এ রূপপুরে? মাগ-ছেলেপিলে কোথা কোথা ফেলে সামান্য কটা টাকার জন্যে পড়ে আছে বিদেশে। যাই বলুক লোকে, ওদের কষ্টের দিকটা তো কেউ বিচার করে না ছোটবাবু। এখানে এসে এক জায়গায় বসে যদি স্ফূর্তি পাস—করে নে। দুদিন বই তো নয়। ওই তো আমাদের বড়বাবু—মজুমদার মশাই! দীর্ঘশ্বাস ফেলল রাধা। আবার বলল, গঙ্গার ধারে বাস করেছি—ওখানেই আমার চোখ খুলে ছোটবাবু। প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে দেখেছি—বেঁচে থাকাটা আসলে কেমন জিনিস! কিছু না গো, কিছুই না!..অ সন্ধে, তিন নম্বরের ওনাকে দ্যাখ। কী বলছেন?...ছোটবাবু, বসুন—ডেকে দিই বেজোকে।

কম্বল বিছিয়ে দিলে চন্দন বসল। সিগ্রেট জ্বালল। ব্রজ এক্ষুনি এসে যাবে ভিতর থেকে। কিন্তু কী বলবে তাকে সে? কিছু খুঁজে পেল না। কিন্তু

একটা কিছু বলতে তো হবেই। এ কথা তো বলা যাবে না যে আমার কেমন লাগছে, তুমি আমার কাছে থাকো ব্রজদা! বলা তো যাবে না যে তুমি ছাড়া আমি এ বিরাট পৃথিবীতে এত অসহায় বোধ করছি! কী বলবে ব্রজকে?

রাধা চলে গেছে। চন্দন উসখুস করতে থাকল। ব্রজ নির্ঘাৎ ভাববে, তাকে ছোটবাবু মাতাল হতে দেবে না কিংবা সকাল সকাল ঘরে ফেরার জন্যে তাগিদ দিতে এসেছে। আহা, ছোটবাবু কী দেবতা মানুষ!

ব্রজ দাঁত বের করে এসে গেল। গোঁফের ডগা ভিজে চকচক করছে। দাড়িতে সকড়ি লেগেছে। বোঝা যায় মাল খেতে খেতেই হন্তদন্ত হয়ে উঠে এসেছে।...

চন্দন মিটিমিটি হাসল শুধু!

কোন খারাপ খবর নয় তো স্যার?...পরক্ষণে ব্রজর চোখ চলে গেল চন্দনের জামার দিকে। সে তীক্ষ্ণদৃষ্টে ওর মুখের দিকে তাকাল। কী হয়েছে ছোটবাবু?

কিছু না।

আপনার জামা ছিঁড়লেন কিসে?...সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ব্রজ।

তারকাঁটায় লেগে।...মুখ দিয়ে কথাটা হুট করে বেরিয়ে গেল চন্দনের।

তারকাঁটা? কোথায় তারকাঁটা? পড়ে গিয়েছিলেন নাকি?

হ্যাঁ। হাটুবাবুর গ্যারেজের ওখানে।

হাটুদার গ্যারেজে? ওখানে তারকাঁটা পেলেন কোথায়?

চন্দন হেসে উঠল জোরে।...ফেট্! কে জানে তারকাঁটা না কী। পেচ্ছাব করতে বসে...যাক গে। তুমি এখানে কী করছ?

ব্রজ আশ্বস্ত এবং অমায়িক হেসে গোঁফটা হাতের চেটোয় মুছে পরিতৃপ্ত কণ্ঠে বলল, যা করি স্যার। ছোটলোক মানুষের কারবার। আপনি নির্ভাবনায় চলে যান। বুঝতে পারছি, কেন এসেছেন। কিন্তু ভাববেন না। শংকর বলুন, রাজু বলুন, আর আমাদের ইসলামদা—সব শালা ড্রাইভার এ বেজোর চোখের দিকে তাকালেই ঠাণ্ডা। ও আপনি ভাববেন না। শংকরা এখন আমার জানের দোস্ত। দেখবেন? শংকরা, শংকরা! এ্যাই শালার ব্যাটা, ইধার আও! তুমকো বোলাতা হ্যায়! রাধিকা, ও শালাকো কান পাকাড়কে লে আও জলদি!

রাধা মুখ ঝামটা মেরে সরে দাঁড়াল। যারা খাচ্ছিল, আমোদ পেয়ে হাসছে। চন্দন বলল, থাক। চলো ব্রজদা, আজ আর নয়। চলো, বরং বাসায় গিয়ে সেদিনের মতো ভূতের গল্প শোনাবে। বউদি একলা আছে যে!

ব্রজ শংকরের আসার দিকে মনোযোগী। ঘাড় বেঁকিয়ে ভিতরের দরজাটার দিকে তাক করে আছে। শংকর বেরোল।...কী রে! চেল্লাচ্ছিস কেন?

তোর বাপ এয়েছে রে!...ব্রজ আঙুল তুলে দেখাল চন্দনকে।...গড় কর শালা। ইধার আ-যা-না রে! ছোটবাবু, শংকরাকে আশীর্বাদ করুন।

শংকর করযোড়ে টলতে টলতে এগিয়ে চন্দনের পা ছোঁবার চেষ্টা করল। চন্দন পা সরিয়ে নিল সশব্যস্তে।...আঃ কী হচ্ছে সব!

শংকর কপালে দুহাত জোড় করে ঠেকিয়ে বলল, ক্ষমা করবেন ছোটবাবু। আপনি দেবতা—আমি বাঞ্চোৎ একটা তুচ্ছ ড্রাইভার। তবে হ্যাঁ—আমি—সে জামার ভিতর থেকে একটানে পৈতেটা বের করল।.. আম্মো আপনার মতো ব্রাহ্মণ সন্তান বটি। সেদিন খয়রাডাঙার ওখানে আপনার গাড়িকে একটুখানি ঠাট্টা করছিলুম·

কারণ—বেজো আমার বন্ধু। বেজো আমাকে ডাণ্ডার বাড়ি মেরেছিল। বাগদী হয়ে ব্রাহ্মণের রক্ত বের করেছিল। ও শালার অনন্ত নরক হবে। কিন্তু বেজো—আমার জানের দোস্ত। ক্ষমা করে দিয়েছি। না রে বেজো?

চন্দন আমোদ পাচ্ছিল। বলল, তাহলে উঠি। ব্রজদা এস।

ব্রজ হাত যোড় করল।...তাল কাটবেন না স্যার। আপনি মনিব। আমার মালিক। রুজীদেনেওলা। কিন্তু এখান বেজো অন্য জিনিস।

শংকর ব্রজের দিকে কটাক্ষ করল।...বেজো! তুই শালার আক্কেল আছে বে? এত বড় লোকটা এয়েছেন—তুই তাকে পায়ের ধুলো দিতে বলছিস না আখড়ায়? ছোটবাবু, আমরা সামান্য ড্রাইভার—শয়তানের চাক্কা ঘুরোই—আপনি হুইলি এডুকেটেড ম্যান...ইংরিজিটা ঠিক বললুম তো স্যার? ক্লাস নাইনে এ্যালজেব্রা কষতে পারলুম না বলেই আমার এ দুর্দশা। স্যার অনুগ্রহ করে—প্লীজ, একবার আসুন। ধন্য হয়ে যাবো, মাইরি।...জিভ কাটল সে।...না, না। যাবেন না। শুধু দেখবেন—বসে বসে দেখবেন, আমরা কজন শুওরের বাচ্চা কেমন করে মৌজ করছি।

ব্রজ ধমক দিল।...এ্যাই শংকরা! আমার মালিকের অপমান কচ্ছিস?

শংকরা ঝুঁকে এল।...নেভার। কভী নোহি। অপমান করছি স্যার? বলুন।

চন্দন হাসল। না, না। চলো, কোথায় তোমাদের আখড়া।

ব্রজর ঠোঁট ফাঁক হয়ে গেল কয়েক মুহূর্ত। রাধা মুখ টিপে হাসছিল। এতক্ষণে বলল, যান না ছোটবাবু, দোষ কিসের? পুরুষব্যাটাছেলে তো বটে। আপনার মজুমদার মশাই হলে এতক্ষণ অপেক্ষাই করত না—সটান ঢুকে বলত,...

চন্দন বলল, আমি মজুমদার মশায়ের ছোটভাই তো বটে! চলো ব্রজদা, তোমাদের গুলতানিটা দেখি।

ব্রজ কথা বলল না। শংকর দুহাত বাড়িয়ে আপ্যায়ন করতে করতে এগোল। চন্দন ভিতরের ঘরটা পেরিয়ে অপ্রশস্ত উঠোনে নামল। কোন আলো নেই—যা আছে তা জ্যোৎস্না। চাঁদ এখন মাথার ওপর। উঠোনে সতরঞ্জি বিছিয়ে জনাতিন লোক বসে রয়েছে। সামনে একটা গামলা। পাশে কয়েকটা কালো বোতল। মাটির ভাঁড়। শালপাতায় পেঁয়াজ কুঁচো। ভিজে ছোলা। বোঝা গেল গামলায় মাংসের তরকারি রয়েছে।

রাধা একটা মোড়া নিয়ে হাজির হল।...বসুন ছোটবাবু। আমি ওদিকে দেখি।

সে চলে গেল। শংকর বলল, মেরে দোস্ত! আমাদের সম্মানী গেস্ট এয়েছেন—সবাই একসঙ্গে নমস্কার করো। আমাদের ওস্তাদ পরেশ মজুমদারের ভায়রা...

ব্রজ ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল, আরে চোওপ! বিয়েই হয়নি—তার ভায়রা।

শংকর ঘুরে বলল, হয়নি?

না।

ধুৎ শালা! আমারই ভুল। হয়নি—হতে যাচ্ছে।

ব্রজ আরও জোরে ধমকাল।...না বে না। হতেও যাচ্ছে না। তুই থাম।

হচ্ছে না? শংকর যেন হতাশ হল। কেন? যাঃ! কোন মানে হয় না।

ইসলাম ড্রাইভার সেলাম করে বলল, চিনতে পারছেন ছোটবাবু? সেই যে সেদিন আলাপ হল—সীতুর ওখানে!

ব্রজ বলল, রাজু, রাধিকেকে গিয়ে বল, একটা ভালো বাটিতে করে খানিক মাংস দেবে সারের জন্যে। আমরা খাব, আর উনি বসে থাকবেন নাকি?

শংকর লাফিয়ে উঠল, সবুর। হাম যাতা হ্যায়।...বলে সে দৌড়ে চলে গেল।

চন্দন চাঁদটা একবার দেখে নিয়ে হাত বাড়িয়ে একটা বোতল তুলল। বোতলটা জ্যোৎস্নায় দেখল কয়েক মুহূর্ত। তারপর ছিপি খুলে শুঁকল। তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধে নড়ে উঠল সে। ছিপি বন্ধ করে বোতলটা ধরে রইল। একেবারে না খেয়েছে তা নয়। জিয়াগঞ্জে কালিপুজোর রাতে বন্ধুরা মিলে গঙ্গার ধারে বসে একটু আধটু খেত। বাকি রাতটা ধরা পড়ার ভয়ে বাড়ি ফিরত না। প্যাণ্ডেলে প্যাণ্ডেলে পুজো দেখে বেড়াত ভোর অব্দি। কথা বললে পাছে ধরা পড়ে, ভিড়ের আড়ালে চুপচাপ নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করত। এখন এই পরিবেশ—জ্যোৎস্না, এইসব লোক, আর খানিক আগে যা সব ঘটেছে তার জ্বালা —সব মিলিয়ে একটা গভীর লোভ তার মধ্যে ছোঁকছোঁক করে উঠল। কোনমতে চাপা দিতে পারল না তাকে। ক্ষতি কী? বারবার মনে হল, ক্ষতি কিসের? কে তাকে বকবে? সে স্বাধীন। এখানে সে যা খুশি করতে পারে। তাছাড়া তার টাকাকড়ি আছে। একটা গাড়ি আছে। রুট পারমিট আছে। তার আনন্দের পথে কোন বাধা তো নেই!

আর—এখন একটা তীব্র অসাধারণ উল্লাস তার পক্ষে জরুরী। তা না হলে প্রচণ্ড জ্বালা থেকে আজ এই রাতটা অন্তত তার নিষ্কৃতি নেই। হাসির যৌবন-পিচ্ছিল টলটলে সুন্দর দেহটাও আজ রাতে কোন উদ্ধার নয়। চুপচাপ শুয়ে মৌরী নদীর ধারে খুঁজে পাওয়া বোকা মেয়েটির ভাবনাও নয় সান্ত্বনা। বরং সবই আজ তেতো—তুচ্ছ—অপ্রয়োজনীয়। হাসির মাংস আজ থকথকে পোকায় ভরে উঠবে। ওর শ্বাসপ্রশ্বাসে পচা অন্তক্ষতের দুর্গন্ধ বেরোবে।

খালি এইরকমই মনে হয় এখন। সুনন্দিতার ঘরের দেয়ালে টাঙানো আবসার্ড পেণ্টিংটার মতো হয়ে উঠেছে সামনের ভবিষ্যত। খাবলা খাবলা রঙ, বাঁকানো রেখা, চেপে ধরা থরথর উচ্ছ্বাস। ছবিটা কী, বোঝে না সুনন্দিতা। বলেছিল, বুঝি না। কিন্তু ভালো লাগে। মনে হয় নিজের ভিতরটা ওইরকম হয়ে উঠেছে। চন্দনবাবু, মানুষ অনেক কিছু বুঝতে পারে না বলেই তো দিব্যি খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে বেঁচে থাকে। বুঝলেই হয়তো আপনার পরেশদার মতো গাময় চাকা গজায়!...

গা শিরশির করে উঠল। কী সাংঘাতিক অদ্ভুত কথাটা বলেছিল পরেশ! ভাবতেই বুক কাঁপে।

চন্দনকে চুপচাপ লক্ষ্য করছিল লোকগুলো। শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করে দেখছিল যেন। চন্দন ছিপিটা ফের খুলে কয়েক ঢোক গিলে ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলতেই হাসির ধুম পড়ে গেল। শংকর ততক্ষণে দৌড়ে এসেছে। বাটিটা সামনে ধরতেই চন্দন এক টুকরো মাংস তুলে মুখে দিল।

শংকর কোমর ঘুরিয়ে নাচতে নাচতে বসে পড়ল।...নিঁদ গেয়া সজনী তো আব ম্যায় যাঁউ কাঁহা...চেরা গলায় গেয়ে উঠল সে।...এ্যাই বেজো! ঢাল রে!

চন্দন বলল, আমি ঢেলে দিই তোমাদের?

ফের হল্লাহাসির ধুম পড়ে গেল। কেবল ব্রজ যেন একটু গম্ভীর—সেটা এতক্ষণে লক্ষ্য করল চন্দন। ব্রজর কি অস্বস্তি হচ্ছে ছোটবাবুর জন্যে? চন্দন বলল, ব্রজদা—এখন আমি তোমার মালিকটালিক নই। নাও, তোমাকে খাইয়ে দিই। হাঁ করো। লক্ষি সোনা ব্রজদা···এই, এই...ব্যাস্'

ব্রজ গিলে নিয়ে মুখ মুছে কেমন হাসল।···তাহলে জাত দিলেন ছোটবাবু?

চন্দন বলল, জাত? সে কবে গেছে ব্রজদা। আমি কবে থেকে তোমাদের দলে ঢুকে গেছি।···সে আবার বোতলটা মুখে উবুড় করল। এবার সামলাতে পারল না। কাশির চোটে জল বেরিয়ে পড়ল চোখে।

শংকর বলল, অভ্যেস নেই। রাধে, গেলাস দিয়ে যা স্যারকে!

গ্লাস রাধা আনল না—আনল সন্ধ্যা। রেখে চলে গেল। ইসলাম বলল, বেজা—চল, খেয়েদেয়ে যাত্রা শুনতে যাই। মেলায় কলকাতার দল নেমেছে রে!

ব্রজ বলল, যাব। অনেকদিন গানবাজনা শুনিইনি। ছোটবাবু, যাবেন তো?

চন্দন মাথা নাড়ল।···নিশ্চয় যাবো।

একটু পরে সে লক্ষ্য করল, এদের আসরে কোথায় যেন তাল কেটে গেছে। কেমন যেন জমছে না। সম্ভবত তার উপস্থিতিই এর কারণ। ততক্ষণে বেশ নেশা হয়ে গেছে। দুপুরের খাওয়া হজম হয়ে গেছে। এত রাত্রে পাকস্থলী খালি পেয়ে মদ হুলুস্থুলে বাধাবার তালে ছিল। চন্দন দেখল, তার সামনের লোকগুলো ক্রমশ যেন দূরে সরে যাচ্ছে। মাথা ঠিক রাখার চেষ্টা করল, পারল না। ঝোঁকের বশে আরও খানিকটা খেয়ে ফেলল সে। গুনগুন করে উঠল—গান গাইবার ইচ্ছেটা দমন করা গেল না। শংকর টুইস্ট নাচতে লাগল। এবার জমে উঠল আসর। ব্রজও দুলতে থাকল। সবাই কথা বলার চেষ্টা করছে। এ ওকে বলছে, চোওপ, আমি বলি—ও তাকে থামাচ্ছে, খবর্দার' চন্দন দুহাত তুলে উঠে দাঁড়াল।···এই সব, চুপ। এবার ব্রজদা গাইবে—আমার প্রাণের দাদা ব্রজ-গোপাল গান করবে। ইয়েস—আমি বলছি—ব্রজদা, ওঠ। ব্রজদা গাইবে, আমি নাচব' এ্যাই রাধা!

রাধা বারান্দা থেকে সাড়া দিল, বলুন বাবু!

তুম ইধার আও, রাধা।

রাধা হাসতে হাসতে এল।···ওরে বাবা! ছোটবাবু যে ভেতরে-ভেতরে এমন, টেরও পাইনি! মরণ আমার। সব শেয়ালের এক রা!

রাধা, আমি তোমাকে বখশিস দেব। অনেক টাকা দেব। তুমিও নাচবে।

রাধা খিলখিল করে হেসে বলল, আমার পোড়াকপাল! আমি কি নাচতে জানি?

শংকর গর্জে উঠল, রাধে! তুই আলবৎ নাচবি। ছোটবাবুর হুকুম, তুই নাচবি।

ইসলাম বলল, সেই যে কথায় বলে—ক'মন তেল না পুড়বে, রাধা না নাচবে।

হো-হো করে হেসে উঠল সবাই। চন্দনের প্যান্টের পকেটে ভাড়ার টাকা-পয়সা রাখার থলিটা ছিল। যথারীতি খুচরোগুলো সীতাংশুর কাছে বদলে নোট নিয়েছিল। আচমকা সেটা বের করে সে থলির বাঁধনটি খুলতে থাকল।...রাধা, হাম তুমকো রুপেয়া দেগা। তুমি নাচবে।

ব্রজ বাঘের মতো থাবা বাড়িয়ে বলল, ছোটবাবু! পরক্ষণে এক ঝটকায় থলিটা কেড়ে নিয়ে নিজের প্যাণ্টের পকেটে ভরল।...আপনি বাড়ি যান স্যার। এক্ষুনি বাড়ি চলে যান। এটা আমার কাছে জিম্মা রইল। কাল সকালে হিসেব বুঝে নেবেন। এখনও ব্রজ মাতাল হয়নি।

চন্দন গর্জাল।...এ্যাই ব্রজ! তোমাকে আমি বরখাস্ত করলুম!

ব্রজ বসে পড়েছে। মদ ঢালছে আবার।

ব্রজ, আমার থলি দাও! তোমাকে আমি নট করে দিলুম।

রাধা ব্রজর উদ্দেশ্যে বলল, ঢঙ মিনসের! টাকা দিলেই কি আমি নিতুম? এমন টাকায় আমি পেচ্ছাব করে দিই! আমার যা আছে, তাই খাবার লোক নেই রে!

ব্রজ ধমক দিল, শংকরা! তোর মাগকে সামলা।

রাধা পা তুলে ব্রজর পিঠে তাক করে হাসতে হাসতে বলল, দোব একেবারে চেপটে' কে কার মাগ রে মুখপোড়া! ঘরে নিজের যোয়ান মাগটাকে সামলাগে না!

চন্দন টলতে টলতে আরেকটা বোতলের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল, ব্রজ ওকে ধরে ফেলল।...দোহাই স্যার! আর খাবেন না। চলুন, আপনাকে রেখে আসি!

নেভার। তোকে আমি বরখাস্ত করেছি। তুই আমার ড্রাইভার নোস ব্রজদা। ...চন্দন দাঁড়িয়ে দুলতে থাকল।...আজ থেকে আমার ড্রাইভার শংকর। শংকর, শিশিরচন্দ্র কত টাকা দ্যায় তোমাকে? তার ডবল দেব। চলা আও; ওকে আমি দেড়শো দিই, খোরাকি দিই—তবু ওর পোষায় না বলে আমার থলিটা কেড়ে নিল। ওকে আমি থানায় দেব। এই, কোন হ্যায়! যাও—থানামে যাকে বড়-বাবুকো বোলো, চন্দন বাবুকো ছিনতাই হুয়া।...

ব্রজ প্রায় পাঁজাকোলা করে তুলে ওকে বাইরে নিয়ে এল। চন্দন সমানে চেঁচামেচি করছিল। রাস্তায় এসে ছেড়ে দিয়ে ব্রজ বলল, ছিঃ! আপনি কেন এমন হবেন ছোটবাবু? না—আমার প্রাণ থাকতে এ আমি হতে দেব না। লাথি মারুন, সইব। কিন্তু না—এই রিক্সো! বাবুকে আমার বাসায় পেঁছে দিয়ে আয়।

একটা রিকশো এগিয়ে এল সঙ্গে সঙ্গে। ব্রজ জোর করে চন্দনকে তুলে দিতে দিতে বলল, এখন এদিক-ওদিক করে নিজেই পড়ে হাত-পা ভাঙ্গবেন। এই, ফিরে এসে ভাড়া নিবি আমার কাছে। আমি রাধার হোটেলে আছি। সাবধানে নিয়ে যাবি বাবা।

রিকসো গড়াচ্ছিল। শান্তভাবে বসে থাকতে বাধ্য হল চন্দন। চোখ বুজল। কোথায় ভেসে যাচ্ছে—অপার্থিব দেশ পেরিয়ে একটা আবেগের স্রোতে ধাবমান। কাঁচা রাস্তায় রিকশোটা ঝাঁকুনি খেতে থাকল। তখন সে চোখ খুলল।

জ্যোৎস্না ঝকঝক করছে ব্রজর বাড়ির সামনেটায়। রিকশো থামতেই হাসিকে দেখা গেল।...ইস, কখন থেকে ঘরবার করছি! ছিলে কোথায় এতক্ষণ? তোমার বাবা এসেছেন জিয়াগঞ্জ থেকে। বুড়োমানুষ—খুঁজে পেতে এসে হাজির। তোমার বিছানায় শুতে দিয়েছি। তুমি বরং বাইরে শোও আজ রাত্তিরটা। ঘুমিয়ে পড়েছেন এতক্ষণ। এখন আর জাগিয়ে কাজ নেই।

চন্দন থ হয়ে দাঁড়াল। তারপর চলে যাওয়া রিকশোটার উদ্দেশ্যে বলল, এ্যাই রিকশো! রোখো—আমি আবার যাব।

রিকশো দাঁড়াল। হাসি কাছে এসে চমকে বলল, একী! তুমি—তুমিও... ছিঃ!

কী হাসি? ও কিছু না।

এ আমি জানতুম। যে লাইনে আছো, পা পিছলে পড়তেই হবে। ছি, ছি!

পা পিছলে কি এখন পড়লুম হাসি?

হেসো না। লজ্জা করা উচিত।

তোমার তো লজ্জা নেই, হাসি। মদ খাওয়ার চেয়ে আরও বড় পাপ কি আমরা করিনি? ওসব ধর্মকথা আমায় শুনিও না। এ্যাই রিকশো, হাম যাতা হ্যায়। ঠারো। হাসি, কাল সকালে বাবার সঙ্গে দেখা করব। বাই, বাই। টা টা।...

হাসি পিছনে দৌড়ে এল। ডাকল ছোটবাবু শোন!

রিকশোয় লাফ দিয়ে চড়েছে চন্দন। রিকশোটা গড়াতে শুরু করেছে। হাসি দাঁড়িয়ে থাকল চুপচাপ। চন্দন ততক্ষণে মাথা ঠিক রাখার চেষ্টায় ব্যস্ত। কিন্তু সব গুলিয়ে যাচ্ছে। চাঁদটা ক্রমাগত গলে-গলে সব কিছু হলুদ করে ফেলেছে। আর সেই পরিব্যাপ্ত হলুদ স্রোতে অনন্তকাল ধরে গড়িয়ে চলেছে রিকশোটা। তার ইচ্ছে করছে রিকশোটা দাঁড়িয়ে যাক। কিন্তু রিকশোওলা তার কথা শুনতে পাচ্ছে না হয়তো। লোকটা যেন খুব ষড়যন্ত্র সংকুলভাবে প্যাডেল ঠেলছে। ভয়-ভয় করতে লাগল তখন। কোথায় নিয়ে যাবে তাকে? চেঁচিয়ে কাকেও ডাকতে ইচ্ছে করল। গলার-স্বর বেরোল না একটুও। দম বন্ধ হয়ে এল। চোখ বুঁজল প্রচণ্ড ত্রাসে।

যখন চোখ খুলল, দেখল হলুদ রঙটা আর নেই। ভীষণ কালো চারপাশের অন্ধকার। রিকশো ঝাঁকুনি খাচ্ছে। হিক্কা উঠল এতক্ষণে। মরীয়া হয়ে সে চেঁচিয়ে বলল, এ্যাই রিকশোওলা! কোথায় নিয়ে এলি আমাকে? এই ব্যাটা ভূত কাঁহাকো! কোথায় যাচ্ছিস আমাকে নিয়ে?

রিকশোওলা মুখ ফিরিয়ে জবাব দিল যেখানে বলেছিলেন বাবু।

আমি বলেছিলুম?

হ্যাঁ বাবু।

তব ঠিক হ্যায়। চলো। হাম যব বোলা তো যানা ভি পড়ে গা। নেহি রোখো—মাত! হাঁ—উও ঠিক হ্যায়। চলো।

একটু পরে হিক্কা তুলে চন্দন ডাকল, রিকশোওলা!

বলুন বাবু।

ঠিক পথে যাচ্ছ?

আমার ভুল হয় না বাবু। আমি এখানকারই লোক। ঠিক পৌঁছে দেব—ভাববেন না।

রিকশোওলা!

আজ্ঞে স্যার?

তুম জানতা হাম কৌন হ্যায়?

জানি বইকি। আপনি মজুমদার মশায়ের ভাই।

হ্যাঁ—ঠিক।

মজুমদার মশায়কেও কতদিন এমনি করে পৌঁছে দিয়েছি বাবু।...রিকশোওলা খুকখুক করে হাসতে লাগল। বাড়ির দরজায় গিয়ে গিন্নিমার সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি করে তারপর উনি বলতেন, এ্যাই মকু, আভি চলো নুটবাবুকা কোঠি।

কার কোঠি ?

নুটুবাবুর, বাবু। আমি ওনাকে ধরে নামাতুম। বউরাণীকে ডেকে দিতুম। তারপর বখশিস পেতুম।

হাম ভি তুমকো বখশিস দেগা' পরক্ষণে পকেট টিপে সে চেঁচিয়ে উঠল।.. এ্যাই রোখে, রোখো। আমার থলি আমার থলি কোথায় গেল!

থলি ? খোদার কসম বাবু, আপনার গায়ে হাতে দিইনি এখনও।

ও! ব্রজ নিয়েছে। শালা ব্রজকে আমি বরদাস্ত করেছি।

এসে পড়েছি বাবু। কই, নামুন।...রিকশোওলা নেমে এসে তাকে ধরবার জন্য হাত বাড়াল।

চন্দন ওকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে নিজেই নামল। টলতে টলতে এগোল।... রিকশোওলা চলে যাও। তোমাদের বউরাণীকে আমিই ডাকব। হাম ছোটবাবু ডাকে গা খানকিকো।...পরক্ষণে জিভ কেটে বলে উঠল, সরি। ভেরি সরি রিকশোওলা। বউরাণী খুব ভালো—আমি আজ সারারাত তাস খেলব ওর সঙ্গে। গেট আউট ব্লাডি কুত্তা'

রিকশোটা চলে গেল গাছপালার ভিতর ঘন ছায়ার ঝুপসিতে। কুকুরটা গর্জাচ্ছে সামনে কোথাও। বারান্দায় টিমটিমে বালব জ্বলছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠে চন্দন ডাকল, কোই হ্যায় ? হাম আয়া। বউদি! এই বউদি!

বাঁদিকের ঘুপটি ঘরের দরজাটা খুলে গেল। বিলাসের মুখটা বেরোল একবার। তারপরই সশব্দে বন্ধ হল। কুকুরটা সামনের ঘরের ভিতর অনবরত গরগর করছে। সুনন্দিতা ভিতর থেকে একবার বলল, কে? তারপর দরজা খুলল। চন্দনের দিকে তাকিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। তার ভুরু দুটো কুঁচকে গেল।

চন্দন বলল, আমি শুতে এলুম বউদি। রূপপুরে আমাকে কেউ জায়গা দিল না। আমি ঘুমোবো। আই এ্যাসিওর—কোন গোলমাল করব না—স্রেফ ঘুমুবো। দেবে না জায়গা ?..বউদি,...ধুস শালা! আপনাকে বউদি বলছি! বউরাণী'

সুনন্দিতার ঠোঁটের পাশে একটু হাসি ফুটল এতক্ষণে '...দাদার লাইন ধরে ফেলেছেন' বাঃ! কিন্তু চন্দনবাবু, এখানে শোবার ভাগ্য তো সবার হয় না! শুনছেন তো ? আমার কুকুরটা রেগে গেছে আপনার ওপর। বেরিয়ে এলে নেশা ছুটিয়ে দেবে। শিগগির পালান। বলে দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিল সে। কুকুরটা আরও জোরে গর্জন করে উঠল।

চন্দন সঙ্গে সঙ্গে টলতে টলতে নামল: হ্যাঁ—নেশা ছুটে গেছে মনে হচ্ছে। দম-আটকানো ভাবটা বেড়ে গেছে। বমি আসছে। গাছপালার ভিতর এসে সে হুড়মুড় করে বমি করে ফেলল। তারপর হাঁটতে লাগল। কী একটা ঘটে গেল যেন। বোঝবার চেষ্টা করল সে। তারপর হাইওয়ের দিকে এগোল। রাধার হোটেলেই যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। আশ্চর্য, সুনন্দিতা এত নিষ্ঠুর মেয়ে! নেশাটা শেষ করে দিলে'

তেইশ

গাছপালার দিক থেকে কী একটা পাখি ডাকছিল সেই সকাল বেলায়, নিজের ভিতরকার চাপা গোপন কষ্টটার মতো। বুকের কোনখানে ঠুকরে খাচ্ছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না– সেই রকম। মনে হল, অনেক দিন টানা অসুখের পর সবে আজ পথ্যি পাবে। আর ঠিক তেমনি খুঁতখুঁতে মি নিয়ে সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল দেয়ালগুলো। খুঁজছিল। খুব কঠিন অসুখটার কোন চিহ্ন কিংবা আরও কিছু স্মৃতি। দেয়াল ধবধবে সাদা, চিকন। তাই শূন্যতা মনে হল। কিছু নেই, অথচ কিছু ঘটেছিল। হাঁ, কাল রাতেই তো! কাল সারারাত ধরে একটা ভয়ঙ্কর উপদ্রবের মধ্যে ছোটছুটি করে বেড়িয়েছিল সে। ঝড় কিংবা আগুন। কিংবা বন্যা...

তারপর সে ধড়মড় করে উঠে বসল। জানলা দিয়ে একখাবলা রোদ উপচে এসেছে মেঝেয়। লাল সিমেণ্টের ওপর খানিকটা খুসি চকচক করছে। বাইরের সেই পাখির ডাকটা তখনও বুকের ভিতর কষ্ট হয়ে বাজছে। সে ভাবল, এটা ঠিক নয়। তার খুসি হওয়া উচিত। এই সকালে পৃথিবীতে এখন অনেক খুসি। অনেক সুখের মধ্যে নিজের অসুখের কথা ভুলে যাওয়া ভালো।

এবার সে বিছানা আর দেয়ালগুলো ভালো করে দেখে নিল। আর তখনই টের পেল, কী কী ঘটেছিল। এই ঘরটা রাধার। এই ঘরে তাকে ব্রজ আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা ধরাধরি বয়ে এনেছিল রাস্তা থেকে। বেশ কয়েকবার বমি করেছিল সে। তার শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। মাথা ঘুরছিল। তারপর আর কিছু মনে পড়ে না।

হাসি পেল এবার। মদ তাকে মাতলামি ছাড়া আরও একটু দিয়েছিল, সেটা শারীরিক কষ্ট। তার বেশি কিছু নয়। মদ আর কীই বা দিতে পারত! মাতলামি তার স্মৃতিকে তো নষ্ট করতে পারছিল না। স্মৃতি তাকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছিল ভয়ার্ত জন্তুর মতো—কিছুদিন থেকে। সে চাইছিল একটা আশ্রয় হয়তো, যেখানে বিস্মৃতি সব অতীতকে দূরে সরিয়ে রাখে। অথচ কিছু মিলল না। উপদ্রুত রাতের হাতে মুহুর্মুহুঃ মার খেল সে।

ব্রজও কি রাতের পর রাত এমনি করে মার খায়? ভালবাসে মার খেতে? ব্রজও কি তার মতো বিস্মৃতির জন্যে হন্যে হয়ে ছোটাছুটি করে? আবার হাসি পেল তার। মাতলামি আর শারীরিক কষ্ট ছাড়া মদ আর কিছু দিতে পারে না। ব্রজ বোকা। সে নিজেও আজ বোকা হয়ে পড়েছিল। মদ আর খাবে না সে।

বাইরের অস্পষ্ট কথাবার্তার শব্দ শোনা গেল এতক্ষণে। সে লজ্জা পেল। লোকের সামনে এখন তাকে বেরোতে হবে। লোকেরা জানবে ছোটবাবু রাধার হোটেলে রাত কাটিয়েছে। সে উদ্বিগ্ন হল। ব্রজ কোথায় আছে? সে এখনও এসে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছে না কেন? ঘড়িটা হাতে যথারীতি বাঁধা রয়েছে। প্রায় সাতটা বাজে। স্নান করা দরকার। প্রথম, ট্রিপের সময় হতে-হতে তাকে তৈরী হয়ে নিতে হবে। মেঝেয় কয়েক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়িয়ে

রইল সে। তারপর হঠাৎ মনে পড়ে গেল গতরাতে বাবা এসেছেন জিয়াগঞ্জ থেকে। ব্রজর বাড়িতে ছেলের জন্যে অপেক্ষা করছেন।

আরও লজ্জায় পড়ে গেল সে। অনুশোচনা এল। চুলগুলো আঁকড়ে ধরল। এই রুক্ষ চেহারা এলোমেলো পোশাকে বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়ানো অশোভন হবে। ওঁরা জানেন, চন্দন রূপপুরে এসে পরেশের মতোই সোনার খনির খোঁজ পেয়ে গেছে। চন্দন এখন মান্যগণ্য মানুষ। একটা গাড়ি আছে তার। এসবের সঙ্গে এই নোংরা হয়ে ওঠা পোশাক আর বিধ্বস্ত চেহারা মোটেই মানাবে না।

এখন ব্রজকে খুবই দরকার। রাতে ব্রজ এখানে ছিল কি না কে জানে। চন্দন পা বাড়াল। রাধা হয়তো বাইরের হোটেলঘরে রয়েছে। এ ঘরের দরজা থেকে কিচেনের কিছুটা দেখা যাচ্ছে। সন্ধ্যা নামে কিশোরীটি উনুনে আঁচ দিচ্ছে। সন্ধ্যাকেই ডাকবে ভাবল। চোরের মতো পা টিপে-টিপে চলা নিজের এই সতর্ক গতিবিধিগুলো কিছু দুঃখে টের পাচ্ছিল চন্দন। পরেশ হলে নিশ্চয় এমন করত না। বুক ফুলিয়ে গট গট করে কিংবা টলতে টলতেই সোজা বেরিয়ে যেত। অত সাহস চন্দনের নেই-ই। সে আর যাই হোক, পরেশ মজুমদার হতে পারছে না—এটা ঠিক। সুনন্দিতা তাকে ঠিকই বলেছে চন্দন পরেশের টাকা পরেশের বউ বা শালীর অজানতে মেরে দিয়েছে বটে, কিন্তু এখনও মনের গভীরে কিছু কিছু নীতিবোধ সমানে কাজ করে যাচ্ছে। ভয় সে কাটাতে পারছে না। লজ্জা তাকে জড়িয়ে ধরছে পায়ে-পায়ে। না—রাগ দিয়েও এগুলো এড়ানো যাচ্ছে না—যায় না।

সেই মুহূর্তে রাধা এসে পড়ল। একটা নিঃশব্দ উজ্জ্বল হাসি তার ভরাট মুখের চামড়ায় প্রতিফলিত হল।...উঠে পড়েছেন?...চাপা গলায় সে বলল।... বারান্দায় জল আছে। মুখ ধুয়ে নিন। টুলের ওপর মাজন আছে, সাবান আছে—সব ঠিকঠাক রেখেছি। কোন অসুবিধে হবে না, ছোটবাবু। আমার ভাগ্যি।

চন্দন হাসতে পারল না। খুব অকারণে তার মধ্যে রাগ ঠেলে এল। স্থির নির্বিকার তাকিয়ে সে শুধু বলল, ব্রজ কোথায়?

বেজো?...খিকখিক করে হেসে উঠল রাধা। সারারাত্তিরটা ওই উঠোনে গড়িয়েছে মিনসে। ওরা সব্বাই। যাকে বলে, গলাগলি জড়াজড়ি ভাবের নদীতে সাঁতার কেটেছে ছোটবাবু। তা পরে প্রথম রোদটা গায়ে পড়তেই উঠে বসেছে। তখন আর কী? নিত্যি যেমন করে, এই পোড়ারমুখীকে শাপান্ত করতে করতে কেটে পড়েছে। যেন, আমিই ওদের যত খোঁয়ারের মূলে। ('মূল' শব্দ রাধা 'মু আর ল' এর মধ্যে অস্পষ্ট হ্রস্ব ইকার মিশিয়ে উচ্চারণ করল।

চন্দন ভ্রূ কুঁচকে উঠোনটা দেখে নিল। সতরঞ্জিটা দলা পাকিয়ে পড়ে রয়েছে এখনও। কয়েকটা বোতল গেলাস আর মাটির ভাঁড় গড়াগড়ি যাচ্ছে। কিছু এঁটো শালপাতা আছে। একটা কুকুর চেটেপুটে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে আছে এক-কোণে। রাতের বমিগুলো নির্ঘাৎ ওই জন্তুটাই শেষ করেছে। কুকুরটা মাতাল হয়ে পড়েনিতো? কুকুর কি মাতাল হয়? দৃশ্যটা চন্দনের মনে ঘৃণাভাব আনল। নিজের ওপর। এবং যারা যারা মদ খায়, তাদের প্রত্যেকের ওপর। তারপর সে বলল, আমি যাই, রাধা।

রাধা হন্তদন্ত বলল, সে কী! তাই হয় নাকি ছোটবাবু? না—না।

হতভাগিনীর ছায়ায় যখন দুদণ্ড রয়েছেন, সেবা করতেও কি দেবেন না? আমার ভাগ্যি!

চন্দনের ইচ্ছে হল, প্রশ্ন করে এই নীচ জাতীয় স্ত্রীলোকটিকে, তোমার কিসের ভাগ্যি রাধা? তোমার সেবা কথাটার মানে কী!...প্রশ্ন করল না। বলল, যথেষ্ট তো করেছ। আর করার কিছু নেই, রাধা। দেরী হয়ে যাচ্ছে—আমি যাই।

রাধার মুখ থেকে হাসি নিভল। গম্ভীর দেখাল তাকে। একটা হালকা প্রশ্বাস ফেলে মাথাটা সামান্য দোলাল সে।...হ্যাঁ, যাবেন বই কি। রাধার ঘরে কেউ চিরকাল থাকে না ছোটবাবু, কিন্তু একটা কথা; নিজের জামা-কাপড়ের অবস্থাটা একবার দেখুন। বলছিলুম কী, গণশাকে ততক্ষণ পাঠিয়ে ব্রজর বাসা থেকে আপনার জামা-কাপড় আনিয়ে দিই। আপনি মুখ ধুয়ে চা-টা খান। বেজোও হয়তো এসে যাবে। যত মাতালই হোক, লোকটার দায়িত্বজ্ঞান খুব আছে ছোটবাবু। ভাববেন না—মালিককে এখানে ফেলে রেখে সে গাড়ি নিয়ে চলে নিশ্চয় যাবে না।

রাধাকে বুদ্ধিমতী দেখাল। অভিভাবিকার মতো প্রাজ্ঞ আর বিচক্ষণ। চন্দন কয়েক মুহূর্ত ওর দিকে তাকিয়ে ওকে বুঝতে চেষ্টা করে বলল, আমার জন্যে তোমার এত ভাবনা কেন, রাধা?

রাধার ঠোঁটের কোণে কেমন হাসি ঝিলিক দিল।...ভাবনা? তা হয়। আমি তো সারা জীবন কম মানুষ দেখলুম না ছোটবাবু। মানুষ আমি চিনতে পারি। কোনখানে কার ঘা, ঠিকই বুঝে নিই। যাক ও কথা। মুখ ধুয়ে নিন। চা আনছি।

রাধা বেরিয়ে গেল। খাটের পাশে দেয়ালে মস্তো আয়নাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল চন্দন। নিজেকে দেখে নিল। কে ও? চেনা মনে হল না। ওই লোকটার বয়স তার চেয়ে অনেক বেশি। ওর সারা চেহারায় অনেক যন্ত্রণার ছাপ। লোকটা কোথায় কী অপরাধে পুলিশের হাজতঘরে বাস করেছে যেন—তার আঙুলে পিন ফুটিয়ে দেওয়া হয়েছে, কড়িকাঠে ঝুলিয়ে বেটনের বাড়ি মারা হয়েছে, একটা স্বীকারোক্তির জন্যে ক্রমাগত তার শরীরকে পীড়ন করা হয়েছে—তবু সে বেকবুল থেকেছে। শেষরাতের দিকে অজ্ঞান হতে হতেও সে যেন বিড়বিড় করে বলেছে, আমি কিছু জানি না, কিছু জানি না!

আর কী বলে গেল ওই মেয়েটা? কোনখানে কার ঘা—কিসের ঘা? ঘা যা কিছু, ওই তো শরীরে। মনে কি কিছু গুরুতর আছে? কিছু কিছু গোপনীয় সিফলিস, একটা ক্যানসার? খুব ভয় পেয়ে গেল হঠাৎ। সরে এল। একটা কদর্য বর্তমানের মধ্যে সে আকণ্ঠ পুঁতে গেছে। শুধু মনে পড়ছে এমন সে ছিল না কোনদিন। সে ছিল মুক্ত মানুষ। সে ভালবাসতে জানত। শ্রদ্ধা করতে পারত। আজ তার মধ্যে শুধু ঘৃণা, ঘৃণা, ঘৃণা।

এক্ষুনি স্নান করতে পেলে ভালো হত। থাক। মুখটুখ ধুয়ে রাধার সেবা নেওয়া যাক। সে বারান্দায় এল। একটা জলচৌকি পাতা রয়েছে। পাশে বালতিতে জল আর প্লাস্টিকের মগ। দাঁতের মাজন। সাবান কৌটো। একটা ভাঁজকরা পরিচ্ছন্ন সবুজ তোয়ালে। এর মধ্যে নিষ্ঠার প্রকাশ অনুভব করল সে।

মুখ ধুতে ধুতে টের পাচ্ছিল, অদূরে দাঁড়িয়ে রাধা তাকে দেখছে।...

সেই খাটের বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসে আবার ঘরের ভিতরটা দেখে নিল চন্দন। এই ঘরটা রাধার। এই বিছানায় রাধা শোয়। দেয়ালগুলো তখন শূন্য মনে হয়েছিল, এখন দেখল তা ঠিক নয়! ছাদ ছুঁয়ে-ছুঁয়ে অনেক বাঁধানো ছবি রয়েছে। সবই দেব-দেবীর ছবি। তাকে লক্ষ্মীপ্রতিমা। টেবিলে চিরুনি, কিছু প্রসাধন কৌটো আর শিশি। রাধাও সাজে তাহলে! জীবনকে ভোগ করে। যা তার দখলে, তা নিষ্ঠায় ভোগ করতে জানে সে। ওই ফোটোটা কার? ভালো করে দেখার জন্যে মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল চন্দন। চিনতে পারল না। জায়গায়-জায়গায় রং চটে গেছে। এক যুবক-যুবতীর ছবি। ওই যুবতীটিই কি রাধা? যুবকটি কে?

পিছনে রাধার কথা শোনা গেল।...কী দেখছেন ছোটবাবু? চিনতে পারছেন?

চন্দন ঘুরে দেখল, রাধার হাতে ট্রে। ট্রেতে চায়ের কাপ, প্লেটে সিঙাড়া আর জিলিপি। চন্দন একটু হাসল।...তোমার ছবি?

হ্যাঁ।...রাধা বিছানায় ট্রে রাখল। চন্দনের পাশে এসে দাঁড়াল।...ছবিটা বহরমপুরে তুলেছিলাম। তা বছর চোদ্দ—না, বারো হবে—সেই যেবার খুব ঝড় হল।

চন্দন বলল, পাশেরটা কে?

রাধা খাটের দিকে এসে বলল, চা জুড়িয়ে যচ্ছে। খেয়ে নিন। গণেশকে পাঠিয়েছি আপনার কাপড় আনতে।

চন্দনও সরে এল। পা ঝুলিয়ে খাটে বসল...বললে না যে?

রাধা মুখ তুলল। কয়েক মুহূর্ত কেমন শান্ত তাকিয়ে থাকার পর জবাব দিল, চিনবেন না।...পরক্ষণে হাসল সে। বলল, ওর সঙ্গে আমার বিয়ের কথা ছিল, হয়নি। হয়নি—সে তো ভালই হয়েছে। ভগবান সব ভালোর জন্যই করেন, ছোটবাবু। করেন না?

আমি জানিনে।...চন্দন অন্যদিকে তাকিয়ে জবাব দিল।

আমি কিন্তু জানি। বিয়েটা হলে খুব কষ্ট পেতুম। ঠকতুম।...রাধা হাসতে লাগল।...ঝড়ের রাতে মিনসের বুকে লাথি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিলুম ছোটবাবু। আর সে আসেনি। বেঁচে আছে কি না, তাও জানিনে।

ছবি রেখেছ যে?

রাধা সকৌতুকে বলল, আমার ছবি আছে যে মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখি ছোটবাবু। অবাক মানি। মনে মনে ওকে বলি, তুই কী বোকা ছিলিস রাধা! হ্যাঁ, ওই বোকা মেয়েটাকে একশো ঝাঁটা মারি মনে মনে। সেজন্যেই ওকে আস্ত রেখে দিয়েছি। আমার চুপকথাটি বলার মানুষ তো আর নাই। ওকে গাল দিই, শাপান্ত করি। আবার সুখ-দুখের কথাও বলি। আর কাকে বলব, কে শুনবে? ...একটু চুপ করে থেকে সে আবার বলল, তবে আমি এখন সুখী ছোটবাবু—আপনাদের দশজনের আশীর্বাদ। আমার কোন দুঃখ নেই। খুব ভালো আছি। না—বলবেন, টাকা-পয়সার ভালো থাকা—তা নয়। সে অন্যরকম।

গণেশকে পাঠিয়েছ ব্রজর বাড়ি?

রাধা উঠে দাঁড়াল।...হ্যাঁ, এসে পড়বে এক্ষুনি। বসুন। জামা-কাপড়গুলো রেখে যান। লণ্ড্রিতে পাঠিয়ে দেব'খন। একটু বসুন।

রাধা চলে যাবার একটু পরেই আচমকা হাসি এসে পড়ল।...কী মানুষ তুমি! ছি ছি! এতটুকু বুদ্ধিশুদ্ধি তোমার নেই?

চন্দন দ্রুত বাধা দিল।...বুদ্ধিশুদ্ধি কি তোমারও আছে হাসি? এমন করে তোমার না এলে চলত না?

হাসি খবরের কাগজে মুড়ে প্যান্ট-শার্ট এনেছে। বিছানায় রেখে কড়া চোখে বলল, থামো! আর বাহাদুরি দেখিও না। গণশাকে পাঠিয়েছ কেন? একটু না সামলালে তোমার বাবার সামনেই কী সব বলে ফেলত। ওঠ শিগগির!.. চার-পাশটা চকিত চোখে দেখে নিয়ে ফের ফিস ফিস করে সে বলল, আর কোথাও জায়গা পাওনি? এখানে এসে জুটেছিলে' ছিঃ!

চন্দন একটু হেসে ভ্রু কুঁচকে বলল, না। তোমার ভয় নেই। রাধার বিছানায় আজ রাধা শোয়নি—আমি একা ছিলুম। আর শুলেও তখন আমার কোনরকম জ্ঞান গম্যি ছিল না। তোমার হিংসার কারণ নেই, হাসি।

হাসি তেঁতো মুখে বলল, বয়ে গেছে আমার হিংসে করতে। দেরী করো না। তোমার বাবা চলে যাবেন বলছেন।

চন্দন হাসির সামনেই পার্ট-প্যান্ট খুলে ফেলল। আণ্ডারপ্যান্ট পরা অবস্থায় কাগজের মোড়কটা খুলতে খুলতে বলল ব্রজদা কোথায়? বাড়ি যায়নি?

কে জানে কোন চুলোয়! আমি এত খবর রাখিনে।...হাসি ঘরের ভিতরটা দেখতে দেখতে জবাব দিল।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে নিল চন্দন। এবার মেটামুটি নিজেকে চেনা যাচ্ছে। টেবিল থেকে চিরুনি নিয়ে যত্ন করে চুল আঁচড়াল সে। তারপর গম্ভীর মুখে বলল, তুমি—হাসি, তুমি কি এবার আমার পাশে-পাশে হেঁটে যাবে?

যাঃ! তুমি রিকশো করে চলে যাও।.. হাসির মুখে একটা লজ্জা ঝিলিক দিচ্ছিল।..আমি পায়ে হেঁটে যাচ্ছি'খন। আর শোন, তোমার বাবাকে আমি বলেছি, ছোটবাবু কী কাজে ব্যস্ত হয়ে বেড়াচ্ছে—বাইরে কোথায় গিয়েছিল। বুঝেছ?

বুঝেছি।...বলে চন্দন বাইরের হোটেলঘরে গিয়ে ঢুকল। রাধা নেই সেখানে। হয়তো কিচেনে আছে। হোটেলঘরে জনাচার গ্রামের লোক চা খেতে খেতে গল্প করছে। তারা চন্দনকে লক্ষ্য করল না। চন্দন রাস্তায় গিয়ে রিকশো ডাকল।...

ব্রজর বাড়ির দরজায় রমণীমোহনকে ব্যস্তভাবে অপেক্ষা করতে দেখা যাচ্ছিল। চন্দনকে দেখে তিনি দু চার পা এগিয়ে এলেন।...এস। আমি গতকাল সন্ধ্যায় এসেছি। জরুরী খবর আছে।

রিকশোর ভাড়া মেটানো অব্দি চন্দন কোন কথা বলল না। শান্ত ও গম্ভীর হয়ে বাড়ি ঢুকল। রমণীমোহন সেটা গ্রাহ্য করছিলেন না সম্ভবত। বারান্দায় উঠে তিনি মোড়ায় বসলেন। চন্দন একপাশে দাঁড়াল। রমণীমোহন বললেন, জায়গাটা ভালোই মনে হচ্ছে। তোমার ড্রাইভারের বউটিও খুব ভালো মেয়ে। কোন অসুবিধে হচ্ছে বলে মনে হল না। যাক গে, শোন। বলছিলুম কী, এখানে বাড়িটাড়ি করার চেয়ে জিয়াগঞ্জে যদি তেমন তৈরী ভালো বাড়ি পাও, তোমার আপত্তি আছে?

চন্দন নিষ্পলক তাকিয়ে বলল, কী জরুরী কথা আছে বলছিলেন ?

রমণীমোহন সতৃপ্ত হাসলেন।...ওই কথাটাই। হারুকে তুমি তো চেনো—সাব-রেজিস্ট্রি অপিসের মুহুরী—যুগল, তোমার বন্ধু যুগলের দাদা। হারু কদিন আগে একটা খবর দিয়েছিল। বামুনতলার ঘাটের ওপর সেই বাড়িটা, মানে রাজুদার বাড়ির সামনাসামনি, একেবারে গঙ্গার ধারে দোতালা বাড়ি...

চন্দন বলল, হ্যাঁ। বলুন।

আচায্যিমশাইরা তো এখন কলকাতায় থাকেন। আগে মাঝে মাঝে আসতেন। গত ক'বছর থেকে আর আসছিল না। আচায্যিমশাইকে তোমার চেনার কথা নয়। যাই হোক, উনি বাড়িটা বেচবার জন্যে কদিন হল, জিয়াগঞ্জ এসেছেন। আজ বুধবার তো ? উনি রোববার ফিরে যাচ্ছেন। হারু বললে, পুরো টাকা এখন না দিলেও চলবে—বায়না করে দিলেই হল। পরে...

চন্দন বলল, কত চায় ?

বায়না ?

উঁহু। পুরো দাম।

একটু দমে গেলেন যেন রমণীমোহন।...সে অবশ্যি কম নয়। তবে আজকাল আমাদের মতো ফ্যামিলির বাড়ি বানাতেও তো কমে কুলোয় না। দোতালা বাড়ি। খুব বেশি হলেও তোমার বয়সী হবে। ওপরে নিচে আটখানা ঘর। রান্নাঘর প্রকাণ্ড। ভাঁড়ারঘর আছে। পায়খানা আর টিউবেল হলেই ব্যস। সে আস্তে আস্তে করলেই চলে।

চন্দন লোভার্ত রমণীমোহনকে একবার দেখে গিয়ে ফের বলল, কত চায় ওরা ?

সাঁইত্রিশ হাজারে রফা হয়েছে। চাল্লিশ হেঁকেছিল।

চন্দন মুখ ঘুরিয়ে বলল, আমার অত টাকা আছে জানলেন কীভাবে ?

রমণীমোহন চমকে উঠলেন। অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, না—মানে, এখানে বাড়ি করবে লিখেছিলে তো। তাই ভাবলুম, চান্সটা নিই।

চন্দন শুকনো হেসে বলল, বাড়িটা টিঁকবে তো ?

কেন ?

গঙ্গার ধারে বললেন।

না, না।...ব্যস্তভাবে দুহাত নাড়তে থাকলেন রমণীমোহন।...সে ভয় নেই। এপরটা তো বরাবর ভরাট—আমার বাল্যকাল থেকে দেখছি। তাছাড়া ভিতের পিছনে অনেকটা নিচে অব্দি মজবুত গাঁথনি আছে। সেকালের গাঁথনি। তুমি ভেবো না। কেলের ছেলেকে মা গঙ্গা কখনো আছড়ে ফেলেন না।...হেসে উঠলেন রমণীমোহন। তারপরই কণ্ঠস্বর চেপে সতর্কভাবে বললেন, তা আছে টাকা ? কী করবে ? যা বলার আজই গিয়ে শেষ কথা বলতে হবে।

চন্দন আস্তে বলল, ঠিক আছে।

তাহলে এখনি বেরোতে হয়।...রমণীমোহন উঠে দাঁড়ালেন।

চন্দন বলল, আমি গিয়ে কী করব ? আপনাকে টাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। আপনি যা করার করবেন।

ভয়ার্ত মুখে রমণীমোহন বললেন, আ-আমি অত টাকা নিয়ে যাব ? আজকাল পথঘাটের অবস্থা ভালো বটে, কিন্তু...

কিছু হবে না। চন্দন আশ্বস্ত করল।...আপনার কাছে টাকা আছে, কেউ জানবে না।

সে ঘরে ঢুকল। পরেশের টাকার অবশিষ্টটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। যাক—এবার নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। স্বচ্ছন্দ স্বাধীন জীবনযাপন করতে আর হয়তো বাধা থাকল না। সবটা নগদ নেই কাছে। কান্দী যেতে হবে। ব্যাঙ্ক থেকে তুলে দিতে হবে। আজ ব্রজ একা গাড়ি নিয়ে টিপ দিক !...

* * *

কান্দী শহরে সব কাজ চুকিয়ে বাবাকে বাসে তুলে দিল যখন, তখন দুপুর গড়াচ্ছে। খুব হালকা লাগছিল নিজেকে। এ একরকম ভালোই হল। এখানে বাড়ি করে পারিবারিক জীবনযাপন করার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া গেল। এবার তার সত্যিসত্যি ছুটি। মাসে মাসে টাকা পাঠিয়ে যাবে যথারীতি। আর কোন দায়-ঝক্কি থাকবে না। সবুজ গাড়িটা তাকে যে জীবন দিয়েছে, সেখানে ব্রজর মতোই বিচরণ করবে সে দায়বিহীন। যা খুসি করবে সে।

একটা বিশাল শিরিস গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে খুসি মনে সিগ্রেট ধরাল সে। হ্যাঁ, যা খুশি করবে। আবার মদ খাবে। মাতলামি করবে। শরীরের কষ্টকে সুখ বলে মানতে চেষ্টা করবে।

সে অলস চোখে পৃথিবীর দিকে তাকাল। এইসব ভনভনকরা মাছির মতো মানুষ, দোকানপাট, ঘরবাড়ি, সুখ-দুঃখ হাসি কান্না সারাবেলা, মুহূর্তে-মুহূর্তে হাস্যকর আর তুচ্ছ হতে থাকল তার কাছে। নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে কতক্ষণ ধরে ফেলে-আসা জীবনটাও দেখে নিল স্মৃতিব দিকে ! কিসের কষ্ট, কেন কষ্ট ? কেন সে নিজেকে বঞ্চিত বা প্রবঞ্চিত মনে করছে ? কোথায় ভালবাসার আশা করেছিল, ভালবাসা চেয়েছিল বলে এই অসুখ ভাব সমানে টেনে আনছিল এতদিন ?

'নমস্কার ছোটবাবু '

ট্রাকটা তার সামনে এসে আচমকা ব্রেক কষেছে এবং শংকর ড্রাইভার স্টিয়ারিং থেকে হাত তুলে নমস্কার করছিল। ট্রাকটা ভরতি। ত্রিপলে ঢাকা দেওয়া খোল। তার ওপর জনাচার-পাঁচ লোক বসে রয়েছে। চন্দন মাথাটা একটু দোলাল। রাতের কথাটা মনে পড়ে লজ্জা পাচ্ছিল সে।...রূপপুর ফিরে যাচ্ছ নাকি ? বলল সে।

শংকর জবাব দিল, না স্যার। পুশুলে চললুম। আসুন না আপনিও। ব্রজকে পেয়ে যাবেন ' ব্রজর কাছে শুনছিলুম তখন, আপনি আজ ট্রিপে থাকছেন না।

চন্দন হঠাৎ উৎসাহে এগিয়ে গেল।...হ্যাঁ, এখানে কাজ ছিল। চলো, পুশুলেতেই যাই।

শংকর গীয়ারে বিশ্রি শব্দ করে দরজা খুলে দিল। চন্দন উঠে বসার পর গড়াতে থাকল ট্রাক। শংকর খুসি হয়ে বলল, আর বলবেন না স্যার। সেই ভোরবেলা বেরিয়েছি। বহরমপুর, তারপর গেলুম বেলডাঙ্গা, সেখানে থেকে

সটান ফেরত হয়ে আবার কান্দী—এবার চললুম পুশুলে। নাকে দড়ি বেঁধে ঘোরাচ্ছে চন্দ্রবাবু। মাঝে মাঝে মনে হয় যাই গাড়িশুদ্ধ পরেশবাবুর মতো উল্টে!

বিকট হাসতে থাকলে সে। চন্দন বলল, খাওয়া দাওয়া হল কোথায়?

এখানেই। রূপপুরে আছে রাধার হোটেল, এখানে চাঁপার। দু মাগীই সমান—'তুই দ্যাখ মুই দ্যাখ' যাকে বলে।...শংকর স্পীড বাড়িয়ে দিল চৌমাথায় এসে। সামনে সূর্য। শংকরের মুখটা ঘেমে তেতে লাল হয়ে গেছে। গোঁফের নিচে দাঁতগুলো নিঃশব্দ হাসিতে বেরিয়ে পড়েছে।...বুঝলেন স্যার? যে-লাইনে আছি, রাধা চাঁপা বৃন্দে বিস্তর আছে—পথের দুধারে ফুলফলের বাগান, স্যার। মন্দ লাগে না। আপনারও লাগবে না।...বলে সে চন্দনের মুখটা দেখে নিল একবার।

চন্দন বলল, পুশুলে থেকে ফিরবে কখন?

ঠিক নেই।.. শংকর বলল।...একগাড়ি সরষে তিসি এই সব বোঝাই হবার কথা। বেচুবাবু আগাম গিয়ে বসে আছে ওখানে।

বেচুবাবু?

যেন চমকালেন স্যার!

নাঃ, চমকাবো কেন?...চন্দন হেসে উঠল।

লোকটা ভারি ঘুঘু।...শংকর চাপা গলায় বলতে থাকল।...এদিকে মাগী-বাজও কম নয়। কাল রাতে আপনি যখন নুটুবাবুর ওখানে গিয়েছিলেন..

চন্দন রুদ্ধশ্বাসে বলল, তুমি কেমন করে জানলে?

শংকর মুচকি হেসে জবাব দিল, জানি। যেভাবে হোক, জানতে পেরেছি। আমার স্পাই আছে স্যার। ছেড়ে দিন, যা বলছিলুম। আপনি রাতে যখন নুটুবাবুর ওখানে গিয়েছিলেন, শালা বেচুচন্দ্র তখন নুটুবাবুর বউর ঘরে ছিল! দেখা হয়নি আপনার সঙ্গে?

চন্দন শুকনো গলায় বলল, নাঃ।

জোর হেসে শংকর বলল, কী কান্ড! যাক গে, রাধার ঘরে এসে ভালো করেছিলেন। অযত্ন করার মতো মেয়ে ও নয়। মানীর মান রাখতে জানে রাধা।

গাড়ি সমান বেগে এগোচ্ছিল। এবার বাঁদিকে মোড় নিল, পুশুলের রুটে। ঢালু হয়ে রাস্তাটা নেমে গেছে অনেকদূর। সামনে দূরে বন—সবুজ গাছপালার স্থির দেয়ালটা রোদে তরতর করে কাঁপছে।

...বুঝলেন স্যার? যতটা নষ্ট মেয়ে বলে লোকে ওকে ভাবে, ঠিক ততটা ও নয়। তবে এও ঠিক, ধোওয়া তুলসীপাতাটিও নয়। মানুষ যখন, রক্ত-মাংস শরীরে আছে। বাসনা-কামনাও থাকবে বইকি। লাইফে তো কম দেখলুম না।

চন্দন নিস্পৃহভাবে বলল, আমাকে বিছানা ছেড়ে নিয়ে রাধা কাল শুল কোথায়?

জানেন না?

না।

উঠোনে তো আমরা চার মাতাল গড়াগড়ি খাচ্ছি। জ্যোৎস্না আমাদের

গায়ের ওপর গড়াতে গড়াতে পাঁচিল টপকে পালাল। হঠাৎ শালা ঘুমটা গেল চিড় খেয়ে। এমন তো হয় না। কেন হল? উঠে বসে তাই ভাবছিলুম। নাকি রাধার কাছে গিয়ে শোব—জিভ কাটল শংকর। সরি স্যার, আই অ্যাম ভেরি ভেরি সরি।

না, তুমি বলো।...চন্দন একটু হাসল।

হোটেলঘরে তালা। কিচেন ভেতর থেকে বন্ধ। এই গরমে শ্রীরাধিকে ওখানে থাকে? বারান্দায় সে নেই। তাহলে গেল কোথায়? ওর ঘরে তো আপনি রয়েছেন। হঠাৎ খেয়াল হল, আপনি তো অজ্ঞান অবস্থায় শুয়ে পড়েছেন—তাহলে ওঘরে ভেতরে থেকে খিল আঁটল কে? ধরে নিলুম, নির্ঘাৎ ভিতরে ও মাগী—থুড়ি, রাধাই রয়েছে।

চন্দন অপ্রস্তুত স্বরে বলল, কিন্তু আমি তো টের পাইনি। সকালেও কোন বিছানা দেখলুম না মেঝেয়।

না স্যার, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন—শালীর সাধ্য ছিল না আপনার বিছানায় গিয়ে শোয়। সেকথা নয়। ছিল মেঝেতেই। ফুল স্পীডে ফ্যান চলছিল। ব্যস!

তাহলে রাধার সঙ্গে এক বিছানায় না হোক, একই ঘরে রাত কাটিয়েছে সে। ভাবতে চন্দন আড়ষ্ট হয়ে পড়ল। কেন এগুলো ঘটতে সুরু হয়েছে তার জীবনে? কে যেন ষড়যন্ত্র করে কোথায় নিয়ে চলেছে তাকে তার অজানতে—ক্রমশ অন্ধকার থেকে অন্ধকারতর জায়গায়। পরিশেষে নরকের দরজায় গিয়ে কি এই রথটা থামবে কোন একদিন? চন্দন জোর করে হাসতে লাগল।... কী সর্বনাশ!

শংকর স্টিয়ারিং থেকে একটা হাত তুলে বলল, কিছু সর্বনাশ নয়। আপনার সঙ্গে বদমাইসি করবে, সে জোর ওর কোথায়?

চন্দন টের পাচ্ছিল, শংকরকে আগে যত মন্দ কুচুটে লোক ভাবত, বস্তুত সে তা নয়। তাকে পছন্দ করা চলে। অন্তরঙ্গ হতেও বাধা নেই। হাসিদের সেই গ্রামটা পেরিয়ে যেতে যেতে শংকর বলল, পাঁচ-দশ মিনিটের জন্যে সামনের গাঁয়ে একবার দাঁড় করাব। আপনাকে গাড়িতে রেখে একবার পাশের বাড়িতে ঢুকব।

কী ব্যাপার? চেনা কেউ নাকি?

শংকর নিঃশব্দ হাসিতে দাঁত বের করল।...কতকটা। আপনাকে বলতে লজ্জা কী—দু-চার চুমুক তালের তাড়ি খেয়ে নেব স্যার। আজকাল খরার দুপুরের তেষ্টা জলে মেটে না।

তাই বলো '...চন্দন সিগারেট বের করে জেবলে নিল। শংকরকেও দিল।

শংকর বলল, জেবলে ঠোঁটে গুঁজে দিন। দিন না, আমি বলছি।

একটু পরেই গ্রামটা এসে গেল। একটা বিশাল তেঁতুলগাছের নিচে গাড়ি থামিয়ে শংকর নামল। বলল, দশ মিনিটের বেশি হবে না। এলুম বলে এক্ষুনি। ...যেতে যেতে হঠাৎ ফিরে এল সে। ফের বলল, ততক্ষণ গাড়িতে না বসে আসুন না আমার সঙ্গে। এরা চমৎকার লোক। আসুন স্যার, আসুন। আপনাকে মোড়া দিতে বলব,—আপনি মোড়ায় জজসায়েবের মতো বসে দেখবেন। বদ-

মাইসি করলে মার লাগাবেন। ফক্কুড়ি করলে চাঁটি মারবেন। তবে স্যার, নিজের মাথাটিও কুল রেনে রাখবেন কিন্তু। ভেরি ডেঞ্জারাস।

ওর কথার ভঙ্গীতে ব্রজর আদল রয়েছে। নাকি ইচ্ছে করেই ব্রজকে অনুকরণ করছে শংকর—চন্দনকে বশ মানাতে? উদ্দেশ্য কী শংকরের?...কিন্তু শেষঅব্দি নামল চন্দন। ওকে অনুসরণ করল। শংকর পিছন ফিরে গাড়ির ভরা খোলের ওপর বসে থাকা লোকগুলোর উদ্দেশ্যে বলে গেল, মাল ছেড়ে সরবি না।...

মাটির ছোট ছোট ঘর, খড়ের চাল। স্পষ্ট বোঝা যায়, সমাজের সবচেয়ে নিচুতলার মানুষগুলো এসবের মালিক। শংকর চড়া গলায় ডাকছিল, ভূষণ! ওরে ভূসণো!

ডাকতে ডাকতে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভিতর। গুঁফো বেঁটে কালোকুচ্ছিত একটা প্রৌঢ় লোক দাওয়ায় গড়াচ্ছে দেখা গেল। একপাশে তিনটে তাড়ির কলসী--মুখে ন্যাকড়াবাঁধা রয়েছে। ঘরের ভিতর থেকে মধ্যবয়সিনী একটি মেয়ে বেরিয়ে ঘোমটা দিল মাথায়।...আসুন বাবু! এত দেরী যে?

শংকর সেই ভূষণকে খোঁচাখুঁচি করছিল। ভূষণ একবার লালচোখে তাকিয়েই আঙুল তুলে হাঁড়িগুলো দেখাল, এবং ফের শুয়ে পড়ল। বোঝা যায় প্রচণ্ড নেশায় সে বুঁদ। শংকর বলল, মলোচ্ছাই!

মেয়েটি বলল, খালি পেটে সকাল থেকে গিলছে। সইবে কত? খোয়ারি ভাঙতে সেই সন্ধে। বাবু বসুন। গেলাস আনছি। সুখি থাকলে কত খুসি হত—নেই। আজ সকালে জামাই এসে নিয়ে গেল।

শংকর কিছু ভাবছিল। বলল। না থাক। একটা নিয়েই যাই। পুশালের নদীর চড়ায় বসে খাব। বলে পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে ফেলে দিল সে।

কলসিটা বয়ে আনতে আনতে শংকব বলল, যে জন্যে আপনাকে ডেকে আনলুম, তা হল না। ছুঁড়ি নেই। ভূষণের মেয়ে। অমন জিনিস ছোটলোকের বাগানে ফুটল কীভাবে, বুঝতে পারবেন না। ফিলিম স্টার স্যার, জ্যান্ত সিনেমা।

চন্দন চমকে উঠেছিল! শংকর তাকে কী ভেবেছে! কিন্তু আত্মসম্বরণ করে সে একটু হাসল। শুধু বলল, তাই নাকি!

চব্বিশ

রূপপুর চটির বাসস্ট্যাণ্ডে সবে গাড়ি পৌঁছেছে, অমনি সন্ধ্যার আকাশ তোলপাড় করে ঝড়জল এসে গেল। চন্দন দৌড়ে সীতাংশুর চায়ের দোকানে এসে ঢুকল। যাত্রীরাও ছুটোছুটি করে কে কোথায় গিয়ে মাথা বাঁচাল। দেখতে দেখতে রূপপুরের সব রূপ একেমেলো ভাঙচুর ছত্রখান। হাইওয়ে একেবারে নির্জন হয়ে গেছে। গাছপালা উথালপাতাল দুলছে। লাইটপোস্টে ঢাকনা দেওয়া জ্বলন্ত বাতিগুলো কাঁপতে লেগেছে। আকাশ ঝলসে উঠেছে, চিড় খাচ্ছে বারবার। কানে তালা ধরিয়ে দিচ্ছে মেঘের আওয়াজ। মোটা ফোঁটায়

ঘন বৃষ্টি ঝরছে উদ্দাম। সীতাংশু ঝুঁকে আকাশ দেখতে দেখতে বলল, মরশুমের প্রথম কালবোশেখি। কিন্তু খুব অসময়ে এসে পড়ল যে!

চন্দন ব্রজকে লক্ষ্য করছিল। বাসস্ট্যান্ডে বাসগুলো ভিজছে। একটা বাসের দরজা থেকে ঝুঁকে কে রুটের নামতা হেঁকে রসিকতা করল। স্টেশনওয়াগনের ভিতর চুপচাপ বসে ছিল ব্রজ—হঠাৎ গাড়িটা গড়াতে থাকল। চমকে উঠল চন্দন। মাথা খারাপ হয়েছে ব্রজর? এই দারুণ ঝড়বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি রাখতে হাটু-বাবুর গ্যারেজে চলল! চন্দন চেঁচিয়ে বারণ করবে ভাবল। কিন্তু ব্রজ আচমকা বোঁও করে হাইওয়েতে গিয়ে পড়েছে।

আজ বিকেলে একবার মাতাল হয়েছিল ব্রজ। পুশুলিয়ায় নদীর চড়ায় শংকরের সঙ্গে সেই তাড়ির কলসীটা সাবাড় করেছিল। শেষ ট্রিপ যখন ছাড়ল, তখনও সে বেশ নেশাগ্রস্ত। চন্দনের ভয় হচ্ছিল, কোন অ্যাকসিডেন্ট না ঘটায়। ঘটেনি অবশ্য। কিন্তু সারাপথ ব্রজ আজ কেমন গম্ভীর থেকেছে॥ যাত্রীদের সঙ্গে রসিকতা করেনি। টলতে টলতে এসে স্টিয়ারিং ধরেছিল, একবার মাত্র হেঁকেছিল—সোনাডাঙ্গা প্রতাপপুর রূপপুর! ছেড়ে গেল!

চন্দন যায়নি ওদের তাড়ির আসরে। দূরে দূরে একা বালির চড়ায় ঘুরে বেড়িয়েছে সে। ভেবেছিল গৌরী আসবে—আসেনি। হয়তো আসবার সুযোগ পায়নি। মনটা সেই থেকে খারাপ হয়ে আছে। আজ এত দেখতে ইচ্ছে করেছিল মেয়েটাকে! গৌরী যেন হঠাৎ উধাও হয়ে গেছে পুশুলিয়া থেকে।

হয়তো কাল আবার দেখা হবে। সন্ধ্যার নদীর নির্জন বুক ভরিয়ে দেবে আবার। বলবে, কাল আমাকে খুঁজেছিলে নাকি? মা আসতে দেয়নি। কী করব বলো! মা আজকাল সবসময় বড্ড চোখে চোখে রাখছে।.....

আজ সারারাত চুপচাপ শুয়ে গৌরীর কথা ভাবতে ভালো লাগবে তার।

সীতাংশু বলে উঠল, আরে' ব্রজটা কি পাগল, না মাথা খারাপ!

চন্দন তেঁতো মুখে বলল, পাখা উঠেছে পিঁপড়েটার। কোন মানে হয়?

কে ঘরের ভিড় থেকে মন্তব্য করল বেজোর মরণ নেই। কত ঝড়জল ঠেঙাল চিরটাকাল।

সেটা হয়তো ঠিক। পথে এই দুর্যোগ নামলেও নামতে পারত। তখন কী হত? এর পর হয়তো কতো ঝড়ের বিকেলসন্ধ্যা পথে কাটাতে হবে। কাল-বোশেখির দিন এসে গেল। তারপর একসময় বর্ষা আসবে। বর্ষার মধ্যে সবজে গদ্যিটা রূপপুর থেকে পুশুলিয়া যাবে, পুশুলিয়া থেকে রূপপুর আসবে। বিরামবিহীন আসা-যাওয়ার ছন্দে বাঁধা তার জীবন।

সীতাংশু বলল, চা খাবেন তো?

থাক্।...চন্দন বৃষ্টি দেখতে দেখতে জবাব দিল। বড্ড ক্লান্তি লাগছে। ব্রজর বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়তে পারলে ভালো হত। কিন্তু সেখানে হাসি আছে। হাসি তাকে জ্বালাবে। হাসির কথা মনে পড়তেই মন আরও তেঁতো হয়ে গেল। কদিন থেকে হাসি বলছে, কী একটা গোপন খবর শোনাবে তাকে। কী হতে পারে সেটা? ক্রমশ অসহ্য লাগছে গায়েপড়া বেহায়া মেয়েটাকে। প্রথম প্রথম কোন মেয়ের ছেনালিপনা ভালো লাগে, তারপর অসহ্য হয়ে ওঠে। হয়তো এটাই শরীরের নিয়ম, মনের নিয়ম।

বরং রাধার ওখানে যাবে। ঝড়বৃষ্টি কখন থামবে কে জানে! সে কালো

আকাশ দেখতে একটু ঝুঁকল, সেই সময় সীতাংশু বলল, আরে কী কাণ্ড দেখছেন! ভুলে গিয়েছিলুম এক্কেবারে।

চন্দন তাকাল।

দাঁড়ান।...খুঁজে পাচ্ছিনে যে!.....সীতাংশু টেবিলের কাগজপত্র হাতড়াচ্ছে ব্যস্তভাবে।...মলো ছাই: এখানেই যে রেখেছিলুম, গেল কোথায়?

চন্দন নিস্পৃহভাবে বলল, কী?

চিঠি। যা বাবা! এই বাঁদরগুলোর জ্বালায় কিচ্ছু ঠিক থাকবার যো নেই। দেখছ কাণ্ড?

চন্দন কৌতূহলী হল।...চিঠি? কার চিঠি?

চোখ নাচাল সীতাংশু।...আপনারই। বিকেলে দিয়ে গেল একটা ছোকরা। এই যে, পেয়েছি।

হাত বাড়িয়ে চিঠিটা নিল চন্দন। সাদা মুখআঁটা খামে ভরা পাতলা চিঠি। ওপরে তার নামটা ইংরিজিতে লেখা। অক্ষরগুলো স্পষ্ট। কিন্তু কার হাতের লেখা চিনতে পারল না। তার গা ঘেঁষে অনেক লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। কেউ-কেউ লক্ষ্য করছে। থাক্, পরে খুলবে। সে চিঠিটা হাতের মুঠোয় গুটিয়ে রেখে সিগ্রেট ধরাল। কিন্তু একটু পরেই টের পেল এই কাগজের টুকরোটা তাকে খুব ভিতর থেকে উত্যক্ত করছে। কার চিঠি? কে লিখেছে তাকে—কী লিখেছে? যে দিয়ে গেছে তাকে সীতাংশু চেনে কি না জানতে অস্বস্তি হচ্ছে। তখন সে সাবধানে খামটা ছিঁড়ল। ভাঁজ খুলে ভিতরের ধূসর রঙের লাইনটানা কাগজটা চোখের সামনে মেলে ধরল। অমনি সারা শরীর কাঁপিয়ে বাইরের ঝড়বৃষ্টিটা ভিতরে ঢুকে পড়ল যেন। রুমা তাকে চিঠি লিখেছে! প্রথম লাইনের প্রতিটি অক্ষর ধীরে পেরিয়ে যেতে যেতে সেই সময় আচমকা সব আলো নিভে গেল। রূপপুর চটি পলকে ডুবে গেল বিশাল অন্ধকারের তলায়। ঝড়ের শব্দ বৃষ্টির শব্দ, লোকজনের অস্ফুট চিৎকার, সীতাংশুবাবুর গর্জন—মোমবাতি কই, মোমবাতি!...এবং চিঠিটা চন্দনের হাতে থরথর করে কাঁপতে লাগল।

মোমবাতি জ্বলে ওঠার আগেই সে এক লাফে বাইরে চলে এসেছে। তারপর দৌড়তে শুরু করেছে। অন্ধকার, এখন এত অন্ধকার! হাতের মুঠোয় চিঠিটা ভিজছে টের পেতেই সে প্যান্টের পকেটে গুঁজে রাখল।...প্রথম লাইনটা কী ছিল যেন? আর মনে পড়ছে না। মনে পড়ছে না। একটা নির্জন বাতি চাই এই অন্ধকারে। একটুখানি আলো দরকার। একান্তে, গোপনে, একলা—একটুকু আলো।

ঝড় কমেছে ততক্ষণে। বৃষ্টি বেড়েছে। সারা শরীর ভিজে যাচ্ছে। এই আকাশ-চোয়ানো ধারা অনেক সুখ অথবা অনেক দুঃখের মতো মনে হয়।

কিন্তু কোথায় চলেছে সে? কেন বেরিয়ে পড়েছে? থমকে দাঁড়াল পথে।... প্রথম লাইনটা কী ছিল যেন?...আমি তোমাকে অনেক...অনেক কী? দুঃখ? অপমান? কী রুমা, কী করেছ তুমি? না—তুমিই কিছুই করোনি রুমা। সব দোষ আমার।

চোখ ছাপিয়ে জল এল এতক্ষণে। এই উদ্দাম অন্ধকারে রূপপুর-পুরুলিয়া রুটের 'ভ্যানগাড়ির ছোটবাবু' বৃষ্টির জলে চোখের জল মেশাচ্ছে, কেউ দেখতে পেল না।

একটু দাঁড়িয়ে থেকে আবার পা বাড়াল সে। চেনা যাচ্ছে না কোনটা কী, কোথায় রাধার হোটেল, কতদূর রুমাদের পেট্রোল পাম্প...কোথায় পাণ্ডেজীর গদী, কিংবা ব্রজ ড্রাইভারের বাসায় যাবার পথ। কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না। ব্রজর মতোই এখন সে রাস্তার মানুষ হয়ে উঠেছে। অনন্ত বৃষ্টির মধ্যে অন্তহীন সময় ধরে অশেষ পথের ওপর টলতে টলতে সে আজীবন আমৃত্যু হেঁটে যেতে পারলে হয়তো তার সব পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়ে যেতে পারে।

মনে মনে প্রার্থনার মতো সে উচ্চারণ করল ঃ আমাকে বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও! আকাশের এপার-ওপার চকিত ছুটে গেল তীব্র আলোর চাবুক। ভয়ঙ্কর শব্দে মেঘ ডেকে উঠল। বিশাল সব ড্রাম গড়িয়ে নিয়ে যেতে থাকল কারা। গুমগুম শব্দে অন্ধকার ভরে গেল।...আমাকে বাঁচাও, আমাকে আমাকে বাঁচাও!...টলতে টলতে এগোল সে। সারা শরীর বেয়ে অশ্রুপাতের মতো বৃষ্টি গড়াতে থাকল। সব পাপ ধুয়ে যায় না কি এমনি করে? সব দুঃখ নেমে যায় না পায়ের তলায়?

কে?...একঝলক বিদ্যুতের আলো—তারপর কে যেতে যেতে চেঁচিয়ে উঠেছে।

চন্দন দাঁড়াল।

ছোটবাবু না? দৌড়ে এসেছে ব্রজ ড্রাইভার। ছোটবাবু স্যার!

ব্রজ?

হ্যাঁ, স্যার। এমন করে অন্ধকারে ভিজতে ভিজতে কোথায় যাচ্ছেন?

তুমি এমন করে অন্ধকারে ভিজতে ভিজতে কোথায় যাচ্ছ, ব্রজদা?

হাসল ব্রজ।...আমার ভালো লাগল স্যার। অনেক গরম গেছে আজ সারাটা দিন—তাই ভিজতে ইচ্ছে হল।

আমারও তাই ব্রজদা।

কিন্তু ওদিকে যাচ্ছেন কোথায়?

চন্দন কেমন হাসল।...কে জানে! কিছু দেখতে পাচ্ছি না, এত অন্ধকার।

বাসায় চলে যান শিগগির। অভ্যেস নেই—জ্বরটর হয়ে যাবে। আসুন, আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। আমি শালার কথা ছেড়ে দিন! আজ সারারাত টোটো করে ঘুরব।

ব্রজর কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। হয়তো সে টলছেও। কিন্তু সুস্থ মানুষের মতো কথা বলছে সে। এটা সে পারে। চন্দন বলল, আমারও আজ ঘুরতে ইচ্ছে করছে।

না স্যার, না। আসুন। আমি পৌঁছে দিচ্ছি! হাসি বেচারা একলা আছে।

চন্দন ফুঁসে উঠল।...তোমার হাসি একলা থাকলে আমার কী?

ব্রজ হো হো করে হেসে উঠল। না, কিছু না। হাসি আমার বউ। কই, আসুন!

চন্দন গম্ভীর স্বরে বলল, তোমার বাসায় আমি যাব না, ব্রজদা।

কী মুশকিল! তাই বলে এমনি করে ভিজবেন? তাহলে বরং রাধার ওখানে চলুন। রাধা খুব খুশি হবে। আমার নেশাটাও চটে গেছে বিষ্টিতে—চাঙ্গা করে নেব। ইচ্ছে করলে আপনিও...

মদ আর আমি খাবো না।

খাবেন না? বাঃ, সে তো ভালই। কই· আসুন!

চন্দন অন্ধকার বৃষ্টিমুখর রূপপুরকে দেখছিল। পাণ্ডেজী যখন এখানে এসেছিলেন, তখন রূপপুর চটির রূপ ঝড়বৃষ্টির রাতে হয়তো অবিকল এমনি ছিল। জনমানুষহীন গভীর অন্ধকার। শুধু বৃষ্টির শব্দ। পাণ্ডেজী কি এখন তাঁর দোতালার ঘরে বসে এ-রূপ দেখছেন? তাঁর বহু রূপকুমারী আবার আদিম হয়ে উঠেছে! সেইসব রাতে কি এমনি করে কেউ তীব্র অন্তর্জ্বালায়, বিমূঢ় আবেগে, আশা-হতাশায় তোলপাড় হতে হতে পথে বেরিয়ে পড়ত? চোখের জলের সঙ্গে বৃষ্টির জল মিশে ঝরে পড়ত পথের বুকে?

ব্রজ হাত ধরে টানল। বলল, আপনার কষ্ট হচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, আমি বুঝি আমি আনএজুকেটেড মানুষ হলেও বুঝতে পারি। কিন্তু মনের ঘা খোঁচালেই জ্বালা বাড়ে।

চন্দন ওর টানে পা বাড়াল। কী বলতে চায় এই লোকটা! একটা নির্বোধ মাতাল ভাঁড়! বৃষ্টির ফোঁটা আর গায়ে বেঁধে না। সারা শরীর ভিজে অবশ হয়ে গেছে। ব্রজ অনর্গল কী বলে চলেছে, কিছু বোঝা যাচ্ছে—কিছু অস্পষ্ট। গলার ভিতর থেকে কথা আসছে ব্রজর। চন্দন কান করছে না আর।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ব্রজ বলল, দুচ্ছাই! রাধার ঘরটা কই? কোথায় এলুম! উঁহু—ঠিক আছে। ওই তো। আসুন, রাধার সামনে আজ আপনাকে একটা খুশির খবর দেব।

রাধা সত্যি সত্যি খুশি হয়েছে। বলল, এইসব সময় খুব ভয়ে-ভয়ে থাকি, ছোটবাবু। এই সময়টাতে যত চোরডাকাতগুণ্ডা এসে হামলা করে কি না।

ব্রজ বলল, তোমার ঘরে টর্চ নেই রাধা?

আছে। আবার কোথায় মরতে বেরোবি বেজো? কেমন মেঘ ডাকছে, শুনছিস? এলি, বোস্। ভালো জিনিস আছে—এনে দিচ্ছি। মৌজ করে খা। কী বলেন ছোটবাবু?

ব্রজ বলল, ছোটবাবু ভিজে গেছেন দেখছিস না, ছুঁড়ি?

এ্যাই বেজো. অকথা কুকথা কইবিনে—খবরদার।...রাধা কপট রাগ দেখাল। ...আমাকে ছুঁড়ি বলছিস, আমি কি ছুঁড়ি রে মুখপোড়া? ছুঁড়ি তোর ঘরে আছে, দ্যাখগে।

চন্দন বলল, রাধা, দাও না ওকে টর্চ। আমার জামাকাপড় এনে দিক।

রাধা যেন এতক্ষণে চন্দনের পোশাক দেখল।...অই মা! এ যে বেড়ালভেজা একেবারে! আসলে হয়েছে কি জানেন গো? এত কম আলোয় আর চোখে দেখতেই পাইনে। দিচ্ছি। অ সন্ধ্যে, সন্ধ্যেমণি! খাটে বালিশের কাছে ব্যাটারি-লাইট বাতি আছে, এনে দে তো মা। আর শোন, আলনায় নতুন তোয়ালে রয়েছে, নিয়ে আয়। সেই সকালে খুলেছি যেখানা—বুঝলি তো? ছোটবাবুকে মুখ মুছতে দিয়েছিলুম।

ভিতর থেকে সন্ধ্যার জবাব এল, বুঝেছি বাপু, বুঝেছি। গলা ফাটিও না।

রাধা হাসল। এ ছুঁড়ির তেজ হয়েছে রে বেজো। শুনলি, গলার টানখানা?

ব্রজ চোঁ চোঁ করে সিগ্রেট টানছিল—মেঝের দিকে মুখ। বলল, রাধা, আজ তোমাদের একটা খুশির খবর শোনাব। ঘুরে আসি॥ তারপর।

রাধা ভ্রূ কুঁচকে বলল, তোর আবার খুশির খবর কিরে মিনসে। মাগ বিয়োবে নাকি?

ব্রজ মুখ তুলল। সারা মুখে হাসি—ভিজে গোঁফদাড়ি থরথর করে কাঁপছে। শুধু বলল, মাইরি!

এ্যাঁ! রাধা কপালে চোখ তুলল। সত্যি বলছিস?

তোমার দিব্যি। ব্রজ খিকখিক করে হাসতে লাগল।

যাঃ?

ব্রজ চটে গিয়ে বলল, কেন? আমার বুঝি ছেলেপুলে হতে নেই? রাজ্যের লোকের ছেলেপুলে হচ্ছে—আর আমার হবে না? শুনুন স্যার, হোটেলওয়ালির কথাটা একবার শুনুন।

সন্ধ্যা এসে তোয়ালে আর টর্চ দিয়ে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে হাসিমুখে ব্রজর কথা শুনছিল। রাধা তাকে ধমক দিয়ে বলল, আ মর! তুই আবার হাঁ করে কী গিলছিস? গুয়ের ডিম ভাঙেনি এখনও...তোর সব তাতে কান কেন রে?

ব্রজ বলল, বারে! শুনবে না কেন? আলবাৎ শুনবে। রূপপুর থেকে পুশুলে সবাই শুনবে। ব্রজগোপাল ড্রাইভারের ছেলে হবে!

রাধা হেসে গড়িয়ে পড়ল।...মিনসের মুখের রাখঢাক নেই! তা হ্যাঁরে বাঁদর, ছেলে হবে না মেয়ে হবে, তা জানলি কেমন করে?

আমার মন বলছে রাধা, ছেলেই হবে। না হয়ে পারে? উ রে বাস! নিজের হাতে ড্রাইভিং শেখাব—গাড়ি চলবে যেন তুফান মেল! কী বলেন স্যার?...বলেই সে টর্চটা প্রায় ছোঁ মেরে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

চন্দন কাঠ হয়ে বসে ওর কথা শুনছিল। রাধা সন্ধ্যাকে ঠেলে ইসারায় ভিতরে পাঠিয়ে দিল। তারপর ফিসফিস করে বলল, মদে তাড়িতে লোকটার মাথা এবার যেতে বসেছে ছোটবাবু। কী বলে গেল শুনলেন?

চন্দন খুব আস্তে—অন্যমনস্কভাবে বলল, কেন রাধা? ব্রজ তো পুরুষ-মানুষ—ঘরে বউ রয়েছে। তা...

রাধা এদিকওদিক তাকিয়ে বিকৃতমুখে চাপা গলায় বলল, পুরুষ! আপনাকে বলতে আমার লজ্জা কিসের ছোটবাবু? ব্রজর শরীরে দোষ আছে—বউর সঙ্গে এক বিছানায় শোয়, ওইটুকুনই। ব্যস! ছেলে হবে বললেই হল? যদি হয়, জানবেন—অন্য কারো সঙ্গে ওর বউটা নষ্ট হয়েছে। এ হতেই পারে না কক্ষনো। এই যে, তোয়ালে নিন, বাবু।

চন্দন মুখ ফিরিয়ে বাইরে অন্ধকার দেখতে থাকল। একটু পরে সে বলল, তুমি কেমন করে জানলে রাধা?

রাধা মুখ ফেরাল—যেন লজ্জা পেল। বলল, জানি বইকি। আমি অনেকের অনেক কথা জানি, ছোটবাবু।

ব্রজর সঙ্গে তোমার কোনদিন বুঝি ভাব ছিল রাধা?

ভেবেছিল রাধা চটে যাবে। রাধা কিন্তু চটল না। খিলখিল করে হেসে উঠল। তারপর বলল, আজ আপনাকে কেমন—কেমন লাগছে কেন গো ছোট-বাবু?

কেমন লাগছে ?

মনমরা। কী হয়েছে ? শরীর গারাপ ?

চন্দন শুকনো হেসে বলল, হ্যাঁ রাধা। ভিজলুম কতক্ষণ।

সন্ধ্যাকে বলব, মাথা টিপে দেবে বরং। এখানেই শোবেন তো ?

দেখি। একটু ভেবে নিয়ে আবার বলল চন্দন, আজ কিছু ঠিক নেই, রাধা।

রাধা একটু দাঁড়িয়ে ভিতরে চলে গেল। হেরিকেনটা তুলে কাছে আনল চন্দন। পকেট থেকে চিঠিটা বের করল এবার। ভিজে গেছে অনেকটা। কালির হরফ ধ্যাবড়া হয়ে গেছে। 'আমি তোমাকে অনেক দুঃখ দিয়েছি...' মুখ তুলল চন্দন। কে কাকে দুঃখ দিয়েছে ? সব গুলিয়ে যাচ্ছে—অর্থহীন, এই অন্ধকারের মতো একাকার। চিঠিটা দলা পাকাতে থাকল সে। তারপর ছুঁড়ে ফেলল বাইরে। আলোর ওপর ঝাঁপিয়ে আসা পোকাগুলো বড্ড জ্বালাচ্ছে। হেরিকেনটা দূরে খাবার টেবিলে রেখে এল। তারপর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকল। ব্রজ গোপাল ড্রাইভার এইমাত্র ধ্যাবড়া হাতে বড় বড় হরফে লিখে দিয়েছে ঃ আমার ছেলে হবে। তার মানে, তার বউ হাসি মা হতে চলেছে। হাসি কেন চন্দনকে একথা বলেনি ? নাকি লজ্জা পেয়েছে বলতে ? নাকি বলার অপেক্ষায় থাকবে আজ রাতে ?...হ্যাঁ, হাসি একটা খবর শোনাবে বলেছিল। সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে আবার। কিছুই স্পষ্ট নয়। রাধা বলল, ব্রজ পুরুষত্বহীন। রাধা জানে। রাধার এসব ভালোভাবে জানার কথা। সে অনেক পুরুষের পাশে শুয়েছে। ব্রজর পাশেও শুয়েছে কতরাত। তার অভিজ্ঞতা অনুযায়ী ব্রজর পুরুষত্ব নেই। ছেলেপুলের বাবা হতে সে পারে না। তাহলে হাসির পেটে যে বাচ্চাটা এসেছে, তার বাবা কে ?...বুক দুরুদুরু করে কেঁপে উঠল চন্দনের। প্রচণ্ড ভয়ে তার শরীর অবশ হয়ে পড়ল।

ছোটবাবু !

কে ?

এই যে ! হনুমানের গন্ধমাদন তুলে আনার মতো করে ফেলেছি স্যার। আপনার স্যুটকেশশুদ্ধ এনে দিলুম। চাবি নেই—কী করব বলুন ?...ব্রজ হাসতে লাগল...তবে হাসি ক্ষেপে গেছে একেবারে ! ভাবছি, কখন এসে না হানা দেয় রাধার আখড়ায় ! কোথায় আছেন বলিনি অবশ্যি।

কেন ব্রজদা ? হাসি ক্ষেপল কেন ?...নির্লিপ্তভাবে প্রশ্ন করল চন্দন।

ক্ষেপবে না ? বাসায় না ফিরে বাইরে বাইরে কাটাচ্ছেন ! রান্নাটান্না জুড়োচ্ছে ওদিকে।

তোমার বাসায় আর যাব না ব্রজদা।।

ব্রজ যেন চমকে উঠল।...কেন স্যার. কেন ?

বৃষ্টি ছেড়েছে বাইরে ?

হ্যাঁ। তবে এখনও চাঁদ ওঠেনি। ভীষণ অন্ধকার।

আমি বেরোব, ব্রজদা।

এ্যাঁ ! বেরোবেন ? কোথায় যাবেন আবার ?

জিয়াগঞ্জ চলে যাব। চলো, আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

ব্রজ ধুপ করে পাশে বসে পড়ল। ওর মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকিয়ে

রইল কয়েক মুহূর্ত। তারপর একটু কেসে গলা ঝেড়ে বলল, কেন স্যার? কী দোষ করেছি আমি?

তুমি কোন দোষ করনি ব্রজদা। আমার...আমার আর সইছে না। ক্লান্তি লাগছে। প্রতিদিন ওই একই রাস্তায় দুবেলা যাওয়া আব আসা, আসা আর যাওয়া!...আমার হাঁফ ধরে গেছে।...চন্দন ভাঙা গলায় বলতে থাক্‌ল। তাছাড়া ঠিক এসব আমার পোষায় না। আস্তে আস্তে আমার ভিতরটা কালো হয়ে যাচ্ছে। একটু করে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছি। আমার খুব ভয় হচ্ছে ব্রজদা... ঠিক বোঝাতে পারব না। কিন্তু বলো, আমাকে কি এসব মানায়—আমি তো পরেশদা নই।..

ব্রজ যেন মন দিয়ে কথাগুলো শোনার চেষ্টা করছিল। কোন জবাব দিল না। তার শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ শোনা যেতে থাকল।

রাধা এল।..চলুন, ওঘরে জায়গা করেছি।

চন্দন বলল, ওঘরে যাব না রাধা। আমি জিয়াগঞ্জ ফিরে যাচ্ছি।

রাধা চমকে উঠে বলল, সে কী! কী হল হঠাৎ? খারাপ খবরটবর এল নাকি? ও বেজা, কী খবর আনলি রে?

ব্রজ মুখ তুলল। তার দুচোখে জল ছলছল করছে।...রাধা, ছোটবাবু আর থাকতে পারছে না রে। তবে হ্যাঁ, এ আমি জানতুম, বুঝলি রে? ঠিক জানতুম।

চন্দন বলল, তোমার ভাবনা নেই ব্রজদা। আমাকে পৌঁছে দিয়েই তুমি গাড়ি নিয়ে চলে আসবে। গাড়ি তোমার জিম্মাতেই রইল! যেমন চলছিল, চলবে। ওঠ—আর দেরি করো না।

রাধা মাথা নেড়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, কী জানি বাবা, কিছুই বুঝতে পারলুম না! হঠাৎ সব এমন করে এলেনই বা কেন, চলেই বা যাচ্ছেন কেন! ও সন্ধে, তেলের কড়াই নামা তো—আর ভাজতে হবে না। ভাবলুম, বিষ্টি বাদলার দিন, মৌজ করবে—তেলেভাজার চাট দিয়ে দিই। আমার কপাল!

চন্দন তাড়াতাড়ি রাধার সামনেই জামা-কাপড় বদলে নিল। ওরা দুজনে হাঁ করে তাকিয়ে আছে—মুখে কোন কথা নেই। তারপর চন্দন ডাকল, এস ব্রজদা।

ব্রজ নিঃশব্দে ওকে অনুসরণ করল। রাধার টর্চটা তার হাতে রয়েছে। সামনে এগিয়ে সেটা জ্বালাতেই চন্দন বলল, থাক্‌। চোখ জ্বালা করছে। অন্ধকারই ভালো।

বৃষ্টিধোওয়া আকাশে নক্ষত্র ঝকমক করছে। তখনও কোথাও কোন আলো নেই। হয়তো ঝড়ে মেইন লাইনের তার ছিঁড়ে গেছে কোথাও। দিনের আলো না ফুটলে কিছু করা যাবে না। হাটুবাবুর গ্যারেজ থেকে অনেক চেঁচামেচি করে গাড়ি বের করল ব্রজ। সবাই ঘুমোচ্ছিল। এ রাতে ব্রজ ছাড়া আর কে জ্বালাতন করতে পারে?

তারপর অন্ধকার হাইওয়েতে ছুটে চলেছে সবুজ স্টেশন ওয়াগন। ব্রজ মাঝে মাঝে আড়চোখে ছোটবাবুকে দেখে নিচ্ছে। তীব্র হেডলাইটের ছটায় দুধারে সাঁৎ সাঁৎ করে সরে যাচ্ছে গাছের ছায়াগুলো। ক্বচিৎ শেয়ালের জ্বলন্ত নীল চোখ নেমে যাচ্ছে মাঠের দিকে। চন্দন ডাকল, ব্রজদা!

বলুন, স্যার।

গাড়িটা তোমার নামে লিখে দেব, ভাবছি।

ব্রজ ভাঙা গলায় বলল, কেন? বেশ তো আছে। আর—আমার তো পয়সা-কড়ি কিছু নেই—আমি একটা ভিখিরি মানুষ, স্যার।

চন্দন একটু হাসল।...না—পয়সাকড়ি লাগবে না।

গাড়ি আমি চাই। কিন্তু তার মালিক হওয়া আমার সইবে না স্যার, আমাকে ক্ষমা করবেন।...ব্রজ একটু ইতস্তত করে আবার বলল, লোকে পাঁচকথা বলবে। এখনই তো বলতে শুরু করেছে—তো আমাকে এমনি-এমনি গাড়ি দিয়েছেন শুনলে রুক্ষে নেই।

কী বলছে লোকে?...চন্দন সোজা হয়ে বসল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টে ওর মুখের দিকে তাকাল।

না বোঝাবার মতো মূর্খ আপনি নন।

ব্রজদা!...অস্পষ্ট চেঁচিয়ে উঠে চন্দন থেমে গেল।

হ্যাঁ—সবাই বলাবলি করে আজকাল। আমার কানে আসে। চুপ করে থাকি—কী বলব? আমার নিজের মুখটাই যে বাঁধা।...একটু চুপ করে থেকে আবার বলল ব্রজ, হাসির পেটে বাচ্চা এসেছে। এবার তো সবাই আরও বলবে। বলুক, কিন্তু সইব। হাসির ওপর কোন জুলুমও করতে পারবো না সেজন্যে। ও বেজাতের সঙ্গে জাতঘর সব ছেড়েছিল একদিন। আমি শুধু এজন্যেই ওকে বরাবর ক্ষমা করে আসছি স্যার, বুঝলেন! শুধু এজন্যেই। নয়তো...যাক। তখন বলছিলুম না, মনের ঘায়ে খোঁচাতে নেই। জ্বালা বাড়িয়ে লাভ কী বলুন?...সে অস্পষ্টভাবে হাসল। তারপর ফ্যাঁচ করে নাক ঝাড়ল।

ব্রজদা, তুমি আমাকে সন্দেহ করো—তাই না?

আপনি উঁচু গাছ—কী আসে যায় তাতে আপনার? ব্রজর মতো একটা অধম বাগদী-সন্তান কী সন্দেহ করল, না করল, তাতে আপনার গায়ে কালির ছিটে লাগবে না—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।...ব্রজ হঠাৎ স্পীড বাড়িয়ে দিল গাড়ির। থরথর করে কাঁপতে থাকল গাড়িটা।

একটু স্পীড কমাও। রাস্তা ভিজে—স্লিপ করতে পারে।

ভয় পাবেন না। মনে কোন মন্দ ইচ্ছে নেই।...ব্রজ হাসতে লাগল।...আমি শালা ছোটলোক মানুষ—কত বিষ হজম করে দিব্যি বেঁচে থাকতে জানি। ভয় নেই—ঠিকই পৌঁছে দেব।

চন্দন ক্ষুব্ধভাবে বলল, ব্রজদা, আমাকে তুমি ভুল বুঝো না। আমি ভয় পাই নি।

পেয়েছেন, স্যার।

কেন ভয় পাবো, শুনি?

ব্রজ সামনের দিকে তাকিয়ে বলল, মনকে শুধোন। কিন্তু ব্রজগোপাল ঠিক আছে। তার হাতে স্টিয়ারিং কোনদিন কাঁপে না।...

একটু পরে চন্দন ডাকল, ব্রজদা!

উঁ?

চন্দন পরক্ষণে চমকে উঠল।...এ কী? তুমি কাঁদছ ব্রজদা?

উঁহু।

না—তুমি কাঁদছ!

এ আমার সুখের কান্না স্যার—হাসির ছেলে হবে। হাসির বড় সাধ ছিল, সে মা হবে—ভগবানের আশীর্বাদে তাই হতে চলেছে সে। এ যে কত আনন্দ, বোঝাব কেমন করে? আমি আনএজুকেটেড ম্যান—আমি ভাল করে কথা বলতে জানি নে। কিন্তু ভগবান প্রত্যেক মানুষকে সমানভাবে ভাগ করে মমতাটা তো দিয়েছেন! হাসির জন্যে...তার পেটের বাচ্চাটার জন্যে আমার মমতার শেষ নেই।

চন্দন তার কাঁধে হাত রাখল।...ব্রজদা, তোমার মতো মানুষ আমি কখনও দেখিনি। তুমি অনেক বড়ো—তুমি অনেক...

সরে বসুন স্যার। এ সব শুনলে সত্যি আমার হাত কাঁপে। মাথা গোলমাল হয়ে যায়। আমি সামান্য ড্রাইভার—বাগ্দীর ছেলে!

ব্রজদা, তোমাকে আজ লুকোব না। চুরি করা টাকায় আমি এ গাড়িটা কিনিনি। লোকে যাই বলুক, পরেশদা টাকাগুলো আমার জন্যেই রেখে গিয়েছিল—সে আমি বেশ বুঝেছি। তা না হলে সে সেগুলো রুমার কাছেই রেখে দিত। তাই বলছি, তুমি ভয় পেয়ো না। গাড়িটা নিলে তোমার কোন পাপ হবেনা।

ব্রজ কেমন হাসল।...টাকার গায়ে পাপপুণ্য লেখা থাকে না স্যার। টাকায় পাপপুণ্য কিসের?

তবে নেবে না কেন গাড়ি? লোকের কথায় তো তুমি কান দাও না ব্রজদা! তুমি তো কাকেও গ্রাহ্য করো না।

ব্রজ গোঁফে তা দিয়ে বলল, হ্যাঁ, করিনে বটে।

চন্দন একটু ঝুঁকে এসে বলল, আমি তোমাকে বিক্রিকবলা করে দেব, ব্রজদা।

ব্রজ আপনমনে ফিক ফিক করে হাসল। তারপর বলল, ও কথা শুনলে আমার আত্মা কষ্ট পাবে। ছেড়ে দিন'

চন্দন চুপ করে থাকল। এই ব্রজ ড্রাইভারের একটা আত্মা আছে—যেন চন্দনের নেই! চন্দনের আত্মা যেন কষ্ট পায় না।

দূরে দিগন্তে কিছু আলোর আভাস। এতক্ষণে চাঁদ উঠছে। দুপাশে বিস্তৃত মাঠের ওপর রাতের রং বদলাতে শুরু করেছে। তারপর সামনের আকাশে ভাঙা চাঁদটাকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। ব্রজ ডাকল, স্যার'

বলো, ব্রজদা।

রূপপুর ছেড়ে কেন পালাচ্ছেন, তা জানি! কিন্তু পালিয়েও কি বাঁচবেন ভেবেছেন? বাঁচবেন না। আমি আনএজুকেটেড বাগদীর ছেলে—আমি কবে বুঝে ফেলেছি, কোথাও বেশি জড়িয়ে পড়লে কষ্ট পেতে হয়, আর আপনি এজুকেটেড ম্যান ভদ্রসন্তান হয়েও বুঝতে পারেন নি। আমার খুব অবাক লাগে। ছোটবাবু স্যার, পথ দিয়ে যেতে হয়—না গেলে চলে না। কিন্তু পথ তো ঘর নয়—পথে ঘর বাঁধবার জেদ করেই আপনি কষ্ট পেলেন!

কী বলতে চায় ব্রজ ড্রাইভার? চন্দন তাকিয়ে থাকল ওর মুখের দিকে। স্টিয়ারিং-এ, দু হাত রেখে সামনের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে কথা বলছে ব্রজ। ওর চোখ দুটো এত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে।

ব্রজ বলল নয় কি? বুকে হাত দিয়ে বলুন।

ব্রজ হাসল।...কদিন জিরিয়ে নিন বাড়িতে। আগাগোড়া সব ভেবে দেখুন। তারপর খবর দেবেন। আমি আসব। আপনাকে নিয়ে যাবো।

চন্দন বলল, এসো। কিন্তু আমি আর সত্যি ওখানে ফিরে যাবো না, ব্রজদা।

হঠাৎ ব্রজ মুখ ফেরাল। ওর মুখে কী একটা দুর্বোধ্য আবেগ যেন থমথম করে উঠল। বলল, যদি হাসি আমার সঙ্গে এসে বলে, চলুন ছোটবাবু? তাও যাবেন না?

চন্দন প্রথমে শিউরে উঠেছিল, বুকের ভিতর হাতুড়ি নেমেছিল যেন, পরক্ষণে রাগে জ্বলে উঠল সে।...ব্রজদা! হাসির সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই!

ব্রজ হাসতে লাগল আবার।...নাঃ, ঠাট্টা করছি। ও কিছু না—ছেড়ে দিন। বলেছি না, আমি শালা আনএজুকেটেড ম্যান, কখন কী বলতে কী বলে ফেলি! আমাকে ক্ষমা করুন।.. কী কাণ্ড! এরই মধ্যে কখন বহরমপুর ব্রীজ এসে গেল নাকি? খুব জোর আসা গেছে দেখছি! ও ছোটবাবু। ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে এবার সিগ্রেট খাবেন না? আহা, মা গঙ্গাকে কতদিন দর্শন করিনি'

একটু পরেই গাড়িটা ব্রীজের মাঝামাঝি গিয়ে থামল। দুদিক থেকে দুজনে বেরিয়ে পরস্পর উল্টোদিকের রেলিংয়ে ঝুঁকে এবং সিগ্রেট টানতে টানতে নিচে কালো জল দেখতে থাকল। সেই রহস্যময়ী গঙ্গা। যার কাজল জলেব অলৌকিক ফসল—রুপোলি ইলিশের মতো এক বালিকার দেহ, উরুতে স্নিগ্ধ ক্ষতের জলছবি, সদ্যোদ্ভিন্ন দুটি মৃদু স্তনের মাঝে পরম নীলাভ তিল।

পঁচিশ

গঙ্গার ধারে আচার্যিদের সেই বাড়িতে উঠে যাওয়ার কদিন পরে রূপপুর থেকে হৃদয় ঠাকুর এসে হাজিব। তার ভোল-বদল দেখে অবাক লাগল চন্দনের। খাকি ঢোল-ঢাল হাফ প্যাণ্ট পরেছে হৃদয়, গায়ে চড়িয়েছে চিত্র-বিচিত্র রঙীন হাফ কুর্তা, কাঁধে কণ্ডাকটারদের চামড়ার ব্যাগ ঝুলছে। সেলাম বাজিয়ে অ্যাটেন-সান দাঁড়াল সে। ব্যাপারটা বুঝতে সময় লাগছিল চন্দনের।

হৃদয় যথারীতি আকাশে চোখ তুলে বলল, জয়েন করেছি স্যার। হুঁ, যেই বলা, অমনি লেট করি নি। আপনি তো ভালই জানেন, চুপচাপ বসে থাকা আমার ধাতে নেই।...সে একমুখ হেসে আরও বলল, তবে আপনার দিক থেকে ভালই হল। বেজাকে তো বিশ্বাস নেই। অ্যাদ্দিন আপনার চোখের সামনে খুব লুটেছে, এবার? এবার পারবে এই শর্মা থাকতে? পাই পয়সা গুনে ভাড়া নিচ্ছি। পাই পয়সা হিসেব রাখছি। আর কারো সাধ্যি নেই যে বেজোর পেণ্টুলের পকেটে দুটো ডিম গুঁজে দশ মাইল মেরে দেবে। হুঃ হুঃ হুঃ!

খুব হাসতে লাগল হৃদয়। চন্দন বলল, ব্রজদা তোমাকে রেখেছে বুঝি? বাঃ।

হৃদয় খুশী হয়ে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার। বেজো বললে, ছোটবাবু তো বাড়ি গিয়ে রইলেন—ভদ্রলোকের ছেলে, শিক্ষিত ছেলে—এ ধকল কি সয় ওনাদের? তা ঠাকুর মশাই, তুমি তো একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার সন্তান, কপাল

দোষেও বটে—আবার রাজরোষেও পড়ে বেনের উনুনে ফুঁ দিচ্ছ, এস—তোমার যোগ্য একটা কাজ দিই। কী? না—ভাড়ার পয়সা আদায় করবে, হিসেব রাখবে। ছোটবাবুকে হপ্তায় সব বুঝিয়ে দিয়ে আসতে হবে কিনা...তারপর এ্যাপয়েনমেন পেয়ে গেলুম। ব্যস!

চন্দন এবার হেসে ফেলল।...ভালোই তো। এসো, ভেতরে এসে বসো।

হৃদয় শশব্যস্তে বলল, বসব না স্যার। এতক্ষণে ওদিকে সব লুটপাট হয়ে গেল। ও বাগদীকে কিচ্ছু বিশ্বাস নেই। মালকড়ি বুঝিয়ে দিয়ে এক্ষুনি দৌড়ব। শিশিরবাবুর ট্রাক ওয়েট করছে বহরমপুরে। শংকরাকে বলে এসেছি।

বলে সে ব্যাগ খুলে এক টুকরো কাগজ আর একগোছা নোট বের করতে থাকল। চন্দন বলল, সে কি হয় নাকি? বাড়ীতে তোমার কত গল্প করেছি। তোমাকে দেখলে খুসি হবে সবাই। এই দুপুরবেলাটা জিরিয়ে নাও।

হৃদয় আমল দিল না। বলল, না স্যার, বেজোর অসুবিধে হবে। তাছাড়া . হঠাৎ চোখে ঝিলিক তুলে সে চাপা গলয় বলল, বেজো কী কাণ্ড করছে শোনেন নি? আপনি তো চলে এলেন, তারপর ব্যাটা কদিন ফাঁক পেয়ে জোর মদবাজি করতে লাগল আর বউ ঠ্যাঙাতে শুরু করল। সে কি ঠ্যাঙানি স্যার! প্রতি রাতে লোক জড়ো হয়ে বেজাকে ধরে সামলায়। আর বাগদীর মুখ—মুখ তো নয়, কুকুরের ইয়ে স্যার। ছেনাল বেশ্যা বলে খামাকা গালমন্দ দুবেলা—সতীলক্ষ্মী মেয়ে কতক্ষণ সইবে বলুন? আপনিও ছিলেন—হাতেনাতে দেখেছেন। খেরেস্তানের মেয়ে হলে কী হবে? অমন আর হয় না স্যার। শালা বাগদী তাকে বের করে এনে কী লাঞ্ছনাটা না করলে। এদিকে মেয়েও নাকি পোয়াতি। মনের জ্বালায় সে সোনাডাঙ্গা দিদির কাছে পালাল। গত শুক্রবারে এই কাণ্ড।

চন্দন কাঠ হয়ে শুনছিল। এতক্ষণে অন্যমনস্কভাবেই বলে উঠল, হাসি পালিয়েছে?

হ্যাঁ। 'পালাবে না তো কি পুজো করবে ছোটলোককে—বলুন?...হৃদয় ফিসফিস করে উঠল।...সবাই বলছে, বেজোর নাকি বাপ হবার সাধ্যি নেই—আলবাৎ বেজোর বউটা অসতী। কে জানে, সত্যি না মিথ্যে! তবে স্যার—হ্যাঁ ভালই করেছেন এক রকম। চলে এসে ক'লির ছিটে থেকে বেঁচে গেছেন। রূপপুর কি মানুষের জায়গা? ছ্যা ছ্যা—ওয়াক থুঃ।

চন্দন চমকে উঠল। কী বলছে হৃদয়? সে স্থির চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, আমার নামে কিছু রটেছে বুঝি?

হৃদয় ব্যস্তভাবে বলল ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন—কান করতে নেই। স্যার, এবার বুঝে নিন। আমার দেরী হয়ে গেল।

চন্দন বলল, একটু অপেক্ষা করো হৃদয়, আসছি।

বাড়ীর সামনে ছোট্ট এক ফালির রাস্তার ধারে একটা আদ্যিকালের বটগাছ। তার এক পাশের শেকড় গঙ্গার জল ছুঁতে নেমে গেছে। ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াল হৃদয়। নিচে বামুনঘাট। যারা স্নান করতে যাচ্ছে, তারা ওর দিকে তাকিয়ে নির্ঘাৎ অবাক হচ্ছে। মুখ উঁচু করে ঘোড়ার মত এক জোড়া পুরনো বাতিল ধরনের মিলিটারি বুট ঠুকছে হৃদয়—বড় ব্যস্ততা তার। ব্যাগটা টানটান হাতে ধরে আছে। দেখতে দেখতে এক পাল বাচ্চা ছেলেমেয়ে ঘিরে ধরল ওকে। হৃদয়

খেঁকিয়ে উঠল প্রথমে—কী হচ্ছে? এ্যাঁ? ঠাকুর দেখছ, শিবঠাকুর? তারপর তাড়া করল। দলটা সরে গিয়ে আবার ফিরল। এবার সে ক্ষেপে গিয়ে গালমন্দ শুরু করল। বড্ড পাজি জায়গা তো! ওরে ছুঁচোর পোরা, মা-বাবা নেই ঘরে? ওরে শকুনের পাল...

চন্দন ফিরে এসে তাকে বাঁচাল। হৃদয় সখেদে বলল, ছ্যা ছ্যা ছ্যা—ওয়াক থুঃ' আজকাল মা-বাবারা কী সব বিয়োচ্ছে ঘরে ঘরে!

চন্দন ধমক দিতেই সরে গেল বাচ্চাগুলো। হই হই করে ঘাটের দিকে নেমে গেল। চন্দন হাসছিল না। মুখটা গম্ভীর। সে বলল, হিসেব এখন থাক হৃদয়। তুমি না থাকতে চাইলে আর জোর করব না। এক কাজ করো—এই চিঠিটা নাও। হকসায়েবকে দেবে। খুব জরুরী কিন্তু।

চিঠি নিয়ে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পকেটে রাখল হৃদয়। তারপর বলল, হিসেব নেবেন না স্যার?

না। মাসের শেষে ব্রজদাকেই আসতে বলো। আর...

চন্দনকে থামতে দেখে হৃদয় বলল, আর কী স্যার?

থাক। তুমি ব্রজদাকেই একবার আসতে বলো।

হৃদয় আর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করল না। মাথা দুলিয়ে প্রায় দৌড়ে চলে গেল। খরার দুপুরে গনগনে রোদে গঙ্গার বালি ঝিকমিক করছে। সেদিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল চন্দন। বটের ছায়ায় অল্প ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। গুঁড়ির কাছে বাঁধানো ভাঙা চত্বরে বসে পড়ল সে। হাসি পালিয়ে গেছে। এই কথাটা তার মনের ভিতর বার বার ঝাঁপিয়ে আসছিল। বেচারা হাসি! হঠাৎ তাড়াতাড়ি সে নিজেও চলে এল রূপপুর ছেড়ে—আসবার সময় দেখা করা হয় নি। হাসি নিশ্চয় অবাক হয়েছিল। দুঃখ পেয়েছিল। হয়তো দেহের সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে একসময় কোথাও পৌঁছান যায়। কোথাও শেষ প্রান্তে কিছু থাকে —যা ভালবাসা অথবা ঘৃণা। হাসি কোথায় পৌঁছেছিল, ভালবাসায় কি? জানতে এত ইচ্ছে করে। আর চন্দন। সে হাসির দেহের ধাপ ডিঙিয়ে যেতে যেতে যেন উঠে এসেছিল যে চূড়োয়—তার নাম ঘৃণা। হাসিকে ক্রমশ অসহ্য লাগছিল তার। হাসির দেহ—খুব হিসেব করে দেখলে, যে কোন পুরুষের পক্ষে একটা চমৎকার কাম্য জিনিস এবং আনন্দ—অথচ চন্দন কেন যেন অতৃপ্তি আর অতৃপ্তির ক্রোধকেই আবিষ্কার করছিল বার বার। কেন এমন হয়? হয়তো দেহ জীবনের শেষ কথা নয় তাই। অথচ বেচারা হাসির গর্ভে হয়তো চন্দনই একটা অবাঞ্ছিত জীবন সৃষ্টি করে বসেছে।

যত একথা ভাবল চন্দন, একটা গভীর ভয় শিরশির করে উঠল তার মাথার ভিতর দিকে। সে মনে মনে অপ্রস্তুত, বলল না—আমার কোন দোষ নেই। কী করতে পারতুম আমি? হাসি নামে এক সুন্দরী মেয়ে আমার বুকের ওপর উঠে এসেছিল রাতের অন্ধকারে। তাকে সাপ ভেবে ছুঁড়ে ফেলতে পারি নি। কেউ কি পারে? কে এমন ইন্দ্রিয়জিৎ পুরুষ? দেহের নিজস্ব ধর্ম আছে। তার ওপর মনের কোন জোর নেই—কোন জোর খাটে না, বিশেষ করে অন্ধকারে যখন কোথাও অন্য কোন মানুষ নেই। আর একদিন এই বটগাছের ছায়াতেই এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল। রুমা নামে এক বালিকা চন্দন নামে এক যুবকের পিঠে বুক ঘষে জড়িয়ে ধরেছিল। বলেছিল, আমাকে বয়ে নিয়ে চলো এবং ঠিক

সেদিনও এটা ইচ্ছের বিরুদ্ধে ঘটেছিল। দেহে একটা অবাঞ্ছিত স্রোত—যার আসল নাম কাম—হু হু করে বয়ে এসেছিল কয়েক মুহূর্ত। সে ত্বরিতে চকিতে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল রুমাকে। রুমা অবাক হয়েছিল। কেঁদেছিল একটু। অথচ এটা হয়। এ একটা অনিবার্য প্রাকৃতিক উপদ্রব। শুধু তফাত এই যে, হাসিকে ধাক্কা দিয়ে ফেলতে পারে নি। হাসির জন্যে তার মনে কোন রকম সংস্কারের বাধা ছিল না—রুমার জন্যে ছিল।...

আবার রুমার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। নিচে ওই দহের জলের এক আশ্চর্য শস্য সেই বালিকা। এই গ্রীষ্মে দহের কালো জল রুমাময় হয়ে উঠছে।...

রূপপুর থেকে চলে আসার পর ক্রমাগত সে চেষ্টা করেছে খুব হইচই করে দিন কাটাবে এখানে। একটা ইলেকট্রিক জিনিসপত্রের দোকান খুলবে। ব্যবসা করবে। টাকা পয়সার হিসেবে ব্যস্ত হয়ে থাকবে। অথচ ভাবতে ভাবতে দিন-গুলো কেটে গেল বৃথা। আশ্চর্য, আগে তো এমন ঘটেনি। সারা জিয়াগঞ্জ শহর জুড়ে, তার মাটি আর প্রকৃতির সবখানে, এখন শুধু স্মৃতি আর স্মৃতি। আরো বেশি প্রবল হয়ে উঠছে রুমার অস্তিত্ব। প্রচণ্ড হার স্বীকারের লোভে ছটফট করছে ভিতরটা। না—এখানে থাকা ক্রমশ অসহ্য আর অসম্ভব হয়ে উঠছে। অন্য কোথাও পালাতে হবে তাকে। সকাল-বিকেল অন্যমনস্কভাবে গঙ্গার ধারে ঘুরে বেড়ায় সে। অবচেতনে কী যেন সন্ধানী দৃষ্টিপাত। টের পেতেই চমকে ওঠে। চোয়াল শক্ত হয়ে যায়। আঃ, ভীষণ হার হয়ে গেছে তার। চন্দন, তুমি হেরে গেছ! রাগে ধকধক করে জ্বলে ওঠে তার চোখ দুটো। অসহায় আক্রোশে হাত মুঠো হয়ে যায়। তারপর ভাবে মদ খাবে। কিন্তু শেষ অব্দি একটা নিরুৎসাহ তাকে ক্লান্ত করে। মদ—মদও কারো কারো কাছে শুধু দেহের কষ্টই দিতে পারে—আর কিছু নয়। নাকি আবার ফিরে যাবে রূপপুরে? অনেক রাতে গঙ্গার ধারের বাড়িটার দোতলায় বসে জানালার বাইরে অনেক দূরের আকাশ দেখে সে। দক্ষিণ পশ্চিম কোণে একটা মোটা নক্ষত্র জ্বল জ্বল করে। ওখানে কোথাও পুরুলিয়া তার সুন্দর নদী মৌরী—আর গৌরী নামে এক অবোধ যুবতীকে নিয়ে অপেক্ষা করছে মনে হয়। অবচেতন যৌবনের বিহ্বলতায় গৌরী সেখানে বালির চরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভ্যান গাড়ীর ছোটবাবুকে খুঁজছে। ভাবছে, কোথায় গেল লোকটা? ব্রজকে কি সে জিগ্যেস করেছে তার কথা? সব শুনে কি কষ্ট পেয়েছে গৌরী? চন্দন মনে মনে গৌরীকে আদর করে বলে, লক্ষ্মী মেয়ে, তুমি নিরাপদে থাকো। তোমাকে আমি ছোঁব না। কারণ, সত্যি তো তুমি আমার কেউ নও—তোমাকে চেষ্টা করেও আপন মনে করতে পারি নি।...

গঙ্গার ওপারে জৈন মন্দিরের প্রকাণ্ড পেতলের গম্বুজ রোদে ঝকমক করছে। রেল লাইনের ধারে এক দঙ্গল শুওর খেদিয়ে নিয়ে যাচ্ছে একটি মেয়ে। আজিম-গঞ্জ স্টেশনে দুপুরের ডাউন ট্রেনটা হুইসল দিয়ে ছাড়ল। ভার কাঁধে নিয়ে এক দল দেহাতি কালো কালো মানুষ চরের ওপর নেমে আসছে। দহের জলে অজস্র মানুষ সাঁতার কাটছে। হঠাৎ চলমান জীবনের সব কিছু উদ্দেশ্যহীন আর অকারণ লাগল। আবার হাসির কথা ভাবতে থাকল সে। হাসির পেটে একটা বাচ্চা এসেছে, হ্যাঁ সেদিন হাসিও বলেছিল বটে—একটা সুখবর আছে ছোট-বাবু!...বিকৃত মুখে সিগ্রেট জ্বালল চন্দন।

ব্রজ একটা হাড়ে হাড়ে বদমাস। বউকে নির্যাতন করতে পারল—অথচ চন্দনের গাড়িটা তো ছাড়তে পারল না—সব জেনে শুনেও! আরও অবাক লাগে, ব্রজটা কী! সে রাতে ছেলের বাবা হওয়ার কি মিথ্যে আনন্দ দেখাচ্ছিল রাধার সামনে? ব্রজ একটা ঘুঘু—তাতে কোন সন্দেহ নেই। আবার হৃদয়টাকেও জুটিয়ে বসেছে সে। না জানি, রূপপুর পাংশুলিয়া রুটে যাত্রীদের কী দুর্দশা হচ্ছে হৃদয়ের হাতে!

হোক্। হকসায়েবকে লিখে দিয়েছে গাড়ীর একটা খদ্দের দেখে দিতে। ব্রজ মরুক গে। হকসায়েবের কাছ থেকে শিগগির জবাব আশা করছে সে। এ ব্যাপারে ওঁর মতো করিৎকর্মা লোক আর রূপপুরে নেই।

রমণীমোহনকে বাড়ীর দরজায় দেখা গেল। স্নান করতে যাচ্ছেন। চন্দনকে দেখে এগিয়ে এলেন।...রূপপুরের লোকটা চলে গেল!কী খবর এনেছিল?

চন্দন বলল, তেমন কিছু না।

তা—ওখানে বসে কী করছ? যাও বেলা হয়েছে। চানটান করো। রমণীমোহন গামছাটা মাথায় ঢাকলেন। অভ্যাস মতো পথ থেকে এক টুকরো ইঁট তুলে নর্দমার দিকে ফেলে দিলেন। আজকাল খুব বিষয়ী বিত্তবান লোকের মতো পা ফেলে হাঁটেন তিনি। অকারণে যাকে খুশী, ধমক লাগান। আশ্চর্য, সবাই আজকাল সেটা বরদাস্ত করে।...দেখ, ওখানটায় একটা বেড়ার ব্যবস্থা করতে হবে। হতচ্ছাড়া মেয়েগুলো সন্ধেবেলা ঘাটে যেতে যেতে পাঁচিলের নিচেটা ছ্যা ছ্যা...কী নরক করে রেখেছে। গন্ধে বাড়িতে টেঁকা দায়। কই, ওঠ। ভেতরে যাও। ঘাটে নামবে, নাকি টিউবেলে? বরং টিউবেলেই ভালো। অনেক দিন ঘাটে নামা অভ্যেস নেই। অসুখ বিসুখ হয়ে যেতে পারে।

চন্দন উঠে দাঁড়াল। বলল, হ্যাঁ—টিউবেলেই চান করব।

রমণীমোহন নাকে গামছা ঢেকে পাঁচিলের ধারে আগাছার জঙ্গলটা দেখতে দেখতে ঘাটের দিকে চলে গেলেন।

চন্দন বাড়ী ঢুকতেই সর্বেশ্বরী এগিয়ে এলেন।...হ্যাঁ চাঁদু, রূপপুরের লোক এসেছিল শুনলুম! কে?

চন্দন জবাব দিল, তুমি চিনবে না। হৃদয় ঠাকুর।

সর্বেশ্বরী চাপা গলায় এবং চোখে ঝিলিক তুলে বললেন, খবর ভালো তো?

চন্দন কিছু টের পেয়ে বলল, ভালো।

পরেশের বউ কিছু বলে পাঠিয়েছে বুঝি?

চন্দন ভুরু কুঁচকে তাকাল।...কী বলে পাঠাবে? তোমাদের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই। আমার গাড়ীর কন্ডাকটর এসেছিল।

ও।...বলে সর্বেশ্বরী নিরাশ মুখে সরে গেলেন।

চন্দন ওপরে ঘরে গেল। বাবা মা এখনও স্নেহধারার কাছ থেকে খবর প্রত্যাশা করছেন! এ বাড়িটাও যেন গোপনে একটা ব্যাকুল প্রতীক্ষা বুকে নিয়ে ছটফট করছে। এই সব মুহূর্তে বড় জ্বালা দেয়। মাথার ভিতরটা চিড়বিড় করে জ্বলে ওঠে। একটা প্রচন্ড হতাশা তার সামনে এসে দাঁড়ায়। সেই হার-স্বীকারের দুঃখটা খোঁচাতে থাকে অনবরত। মনে হয়, একটা কিছু করা দরকার।

কিন্তু কী করবে সে? কীই বা করতে পারে?

হকসায়েবের চিঠি এল ক'দিন পরে। একটা পোস্টকার্ডে কয়েকটি লাইন মাত্র। পাণ্ডেজী গাড়িটা কিনতে রাজী হয়েছেন। শিগগির চলে আসুন। অন্যান্য খবর ভালই। কিছু সাক্ষাতে বলব।...

শুধু এইটুকুর প্রতীক্ষায় যেন কয়েকটা দিন ছটফট করছিল সে। সকালের ডাকে চিঠিটা পেয়েই তক্ষুনি বেরিয়ে পড়ল। বাসে ওঠার পর একবারের জন্যে মন কেঁপে উঠেছিল, রূপপুরের সঙ্গে সব সম্পর্ক সে শেষ করতে চলেছে। পরক্ষণে সংযত হল। কী হবে সম্পর্ক রেখে! ওই টাকা দিয়ে বরং—জিয়াগঞ্জেও নয়, অন্য কোথাও ছোটখাটো ব্যবসা-ট্যবসা করবে। বেঁচে তো থাকতেই হবে—কারণ একটা পরিবার তার অপেক্ষায় বেঁচে রয়েছে। আর শুধু কোনক্রমে আগের গরিবীচালে বাঁচা নয়, কিছুটা সচ্ছলতায় এনেও যাকে পৌঁছে দিয়েছে, তার মান বজায় তাকে রাখতেই হবে। ভাবতে গেলে এ একটা বিশ্রী ব্যাপার—আগে দুবেলা শাকভাতেই চলে গেছে, এখন প্রতিবার পাতে মাছ মাংস চাই-ই—অথচ এর জন্যে দায়ী তো চন্দন নিজে!

সুতরাং আমৃত্যু যেন প্রায়শ্চিত্ত করে যেতেই হবে। নিজের জীবনের কোন কিছুতে তার তাকানোর আর উপায় হয়তো সে নিজেই রাখে নি।

রূপপুর পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেল। বাস স্ট্যাণ্ডে অনেক চেনা মানুষের সঙ্গে দেখা হল। সবাই বড্ড কৌতূহলী যেন—হঠাৎ ছোটবাবুর চলে যাওয়া ব্রজর পারিবারিক বিবাদ, সব মিলিয়ে একটা অপরিচ্ছন্নতা ছিল এ কৌতূহলে। অল্প কথায় এবং একটু হেসে সে প্রথমে পাণ্ডেজীর গদীর দিকে এগোল। তারপর অবাক হয়ে টের পেল যে, তার মনে সেই জোরটা দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। সত্যি বেচে দেবে গাড়িটা?

ফিরে এসে সীতাংশুর সাঙ্গুভ্যালীতে ঢুকল। সীতাংশু চেঁচিয়ে উঠল, হালো ছোটবাবু! আরে, কী কাণ্ড!

চন্দন একটা খালি টেবিলের সামনে বসে বলল, আবার এলুম। একটা কাজ আছে। কেমন আছেন সীতাংশুবাবু?

সীতাংশু পাশে এসে বসল।...আপনি কত দিন বাঁচবেন—উঃ! এই একটু আগে আপনার নাম করছিলুম। কী অদ্ভুত লোক মশাই! হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই—শুনলুম চলে গেছেন—আর আসবেন না!

চন্দন বলল, হ্যাঁ—ওই রকমই।

সীতাংশু চাপা গলায় বলল, হুঁ—জানি বইকি। অকারণে স্ক্যাণ্ডাল ছড়ালে ভদ্রলোকের পক্ষে সত্যি বড্ড মুস্কিল হয়। কিন্তু এ স্যার, হচ্ছে কিনা মাটির দোষ। ছত্রিশ জাতের লোক উড়ে এসে জুড়ে বসেছে—ছত্রিশ মুখে ছত্রিশ রকম কথা বলে মজা পায়। তা বলে ঘাবড়ে গেলে চলে? নাঃ, পরেশবাবুর অনেক পেয়েও অনেক পান নি মশাই!

হাসতে লাগল সীতাংশু। চন্দন বলল, হ্যাঁ—তা তো পাই নি।

আরো জোর হাসল সীতাংশু।...গ্র্যাণ্ড বলেছেন! তবে আমি বলি কী একটু শ্রুড হোন।

শ্রুড হবো?...চন্দন একটু হাসল।

আলবাৎ। ওরে, ছোটবাবুকে ভালো করে চা দে। কিছু খান স্যার।

নাঃ। বড্ড গরম—চা খাবো না। একবার দেখা করতে এলুম। সম্ভবত সন্ধ্যার বাসেই ফিরে যাব।

সীতাংশু নিরাশ মুখে বলল, ফিরে যাবেন ?

হ্যাঁ। গাড়িটা বেচে দিতে এসেছি।

সীতাংশু ওর দিকে তাকাল। কিছুক্ষণ নিষ্পলক তাকিয়ে থাকার পর আস্তে আস্তে উঠে গেল। একটু পরে অকারণ গলা চড়িয়ে বলল, চন্দনবাবু, ভাল খদ্দের একজন চাই নাকি ?

চন্দন জবাব দিল, না। খদ্দের ঠিক হয়ে গেছে।

লোকাল, না বাইরের লোক ?

চন্দন টের পেল, দালাল লোকটি শিকারের গন্ধে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। সে বলল, এখানকারই লোক। বাইরের কেউ নয়।

কে, বলতে আপত্তি আছে ?

পাণ্ডেজী।

হেসে উঠল সীতাংশু।...পাণ্ডেজী আপনার গাড়ী কিনবেন—তাহলেই হয়েছে ! কী করবেন ও দিয়ে ? ভুষি খোল বইবেন বুঝি ?

চন্দন গম্ভীর মুখে বলল, সে তিনিই দেখবেন।

সীতাংশু বলল, দেখুন। কিন্তু আমার অফার রইল—হাতে ভালো খদ্দের আছে। পাণ্ডেজীর সঙ্গে যদি দরাদরি হয়েও যায়, আমার অনুরোধ স্যার, ফাইনাল কথা দেবেন না কিন্তু। কিছু বেশি পেয়ে যেতে পারেন।

বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে তাকিয়ে ছিল চন্দন। ব্রজ গাড়ি নিয়ে ফিরবে সেই রাত আটটা নাগাদ। নিশ্চয় অবাক হবে ব্রজ। অবশ্য হকসায়েবের কাছে যে চিঠিটা হৃদয়ের হাতে পাঠিয়েছিল, হৃদয় সেটা খুলে পড়েছে কী না কে জানে ! খামের মুখ ভালো করে এঁটে দিয়েছিল। তাহলেও হৃদয়ের মতো নাকগলানো স্বভাবের লোককে বিশ্বাস নেই। আবার অন্যদিকে, হকসায়েব যা খোলামেলা মানুষ—ইতিমধ্যে ব্রজকে বলেছেন কী না ঠিক নেই। সম্ভবত বলেন নি। কারণ, সীতাংশুর কানে এটা পৌঁছয় নি দেখা যাচ্ছে। চন্দন আবার ভাবতে থাকল। গাড়িটা কি বেচে দেওয়া ঠিক হবে ?

জনা পাঁচেক লোক কোবিনে টেবিল ঘিরে আড্ডা দিচ্ছিল। তারা একে একে উঠে গেল। নতুন কেউ এল না। ঘরটা ফাঁকা এখন। সীতাংশু দেশলাই কাঠি দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করছিল। চন্দনের চোখে চোখ পড়তেই বলল, আমার মতে কাজটা ভুল করছেন চন্দনবাবু। এ রুট সহজে কেউ পেত না—আপনি পেয়েছিলেন। এমন একটা রুট পারমিট যার হাতে থাকবে, সে ক' মাসেই রাজা হয়ে যাবে। কেন বেচতে যাচ্ছেন ?

চন্দন বলল, অসুবিধে আছে আমার।

সীতাংশু একটু, হাসল।...নাকি স্ক্যাণ্ডালের চাপে ?

কিসের স্ক্যাণ্ডাল ?

সীতাংশু দমে গেল।...না—মানে, আপনি যেমন ইয়ে ধরনের মানুষ। তবে কথা কী জানেন ? রূপপুরে কোন ভদ্রলোক নেই। সমাজ নেই। এত দিন থেকে এটাও কি টের পান নি ? যার যা খুশি করবে থাকবে, পয়সা কামাবে। মানি-মেকারদের জায়গা। এ জায়গা যে ছেড়ে যেতে চায়—তাকে দেখে মনে হয় খুব

বোকা কিংবা অন্ধ। না না চন্দনবাবু—প্লীজ স্যার, আমার কথায় রাগ করবেন না। যা ন্যায্য কথা, তাই বলছি।

চন্দন চুপ করে থাকল।

সীতাংশু একটু ঝুঁকে চাপা গলায় বলল, ব্রজর বউকে নিয়েই তো যত স্ক্যান্ডাল। সে পালিয়েছে। এখন আর সমস্যা কিসের? আপনাকে মানুষ হিসেবে এত ভালো লাগে বলেই এসব বলছি। নৈলে আমার গরজ কিসের, বলুন?

চন্দন উঠে দাঁড়াল।...চলি সীতাংশুদা—পরে দেখা হবে।

সে হন হন করে পাণ্ডেজীর গদীর দিকে চলতে থাকল। বিকেলের রোদে হাইওয়ের দু পাশের গাছের ছায়া লম্বা হয়ে যাচ্ছে। পীচের ওপর কালো কালো মোটা তুলির টানের মতো পড়ে আছে ছায়াগুলো। দূরে ধু ধু রুক্ষ মাঠ একটু হলদে দেখাচ্ছে। অন্যমনস্কভাবে হাঁটছিল চন্দন। হঠাৎ মনে এসে গেল, আরে! এখানেই—এই রূপপুরেই তো রুমা আছে! অমনি থমকে দাঁড়াল। খুব অর্থপূর্ণ মনে হল রূপপুর চটিকে' প্রাণবন্ত উজ্জ্বল একটা অস্তিত্ব। বাইরে দাঁড়িয়ে সে তাকিয়ে আছে—দেখছে জনপদকে। একটা গভীর লোভ তাকে ভিতর থেকে স্পর্শ করল চুপি চুপি। আর তক্ষুনি তার মনে হল, এই মাটি ছেড়ে গেলে সে উন্মূল গাছের মতো শুকিয়ে মরে যাবে। এখানকার বাতাসে রুমার প্রশ্বাসের গন্ধ আছে। এ মাটিতে রুমার পায়ের চিহ্ন আছে। এই বিশাল আকাশের দিকে তাকিয়ে রুমা একদিন বলেছিল, আমি কিছু ভুলি নি চন্দন দা! ত্বরিত চকিতে রূপপুর চটি রুমার ওই ছোট কথাটায় ভরে উঠল। ইচ্ছে হল, এক্ষুনি দৌড়ে চলে যায় রুমাদের বাড়ি। সেদিন রুমা তাকে আঘাত করেছিল, সে কোন দুঃখের কি যন্ত্রণার প্রতিক্রিয়া, এতক্ষণে যেন পরিস্কার বোঝা যাচ্ছিল।

আর রুমার সেই ছোট্ট চিঠিটা। 'আমাকে ক্ষমা করো।' কী দুর্দান্ত ক্ষোভে চিঠিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল সে! এখন আফশোস হচ্ছে পুরোটা পড়ে নি বলে।

আবার ফিরল চন্দন। একটা রিকসো ডাকল। রিকসোয় আপাতত রাধার হোটেলেই যাওয়া যায়। কিন্তু রিকসোটা কাজে আসতেই সে মত বদলাল বলল, না—থাক।

কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না চন্দন। বাস স্ট্যাণ্ডে একটা বাস সদ্য ছেড়ে যাবার জন্যে তৈরী হয়েছে। ওই বাসে প্রতাপপুরের কাছে নেমে পশুলিয়া চলে যাবে? দৌড়ে গিয়ে বাসটায় উঠে পড়ল সে। চেনা কণ্ডাকটার সেলাম করে বলল, সামনে চলে যান স্যার। ও প্রমথদা, তোমার জিয়াগঞ্জের ছোটবাবু!

প্রমথ ড্রাইভার এক সময় পরেশের ট্রাক চালাত। এখন বাস ড্রাইভার। চন্দনকে নমস্কার করে বলল, আসুন, আসুন। নিজের পাশে জায়গা দিল সে। খবরাখবর জিগ্যেস করতে লাগল। বেশির ভাগ খবর বড়বাবুর স্ত্রী অর্থাৎ স্নেহধারার। সামনে মাসে বড়বাবুর ছোট শালীর বিয়ে! ছোটবাবু জানে না দেখে সে অবাক।

প্রতাপপুর মোড়ে নেমে সে হাঁটতে থাকল। একটা লরী অন্তত পেয়ে যাবেই। এখনও যথেষ্ট বেলা আছে। পায়ে হেঁটে গেলেও চলে—মোটে আট-ন' মাইল দূরে পশুলিয়া। অনেকদূর হেঁটেও কোন গাড়ি পেল না। চেনা পথ।

হাঁটতে অবশ্য ভালই লাগছিল। রোদের তাপ ফুরিয়ে গেছে অনেকটা। উদ্দাম হাওয়া দিচ্ছে। মনে একটা প্রশান্তি ঘনিয়ে আসছিল চন্দনের। সামনের ব্রীজটা দেখে হঠাৎ সে চমকে উঠল এক সময়। ওই গ্রামটা সোনাডাঙা না? হাঁটতে হাঁটতে এতদূর চলে এসেছে সে। সূর্য মাঠের শেষে দিগন্তে নেমে গেছে। রোদের রঙ তখন লালচে। ঘুঁটেকুড়ুনী মেয়েরা বাড়ি ফিরছে। পাখিধরা সাঁওতাল কাঁধে ফাঁদ বয়ে দ্রুত হেঁটে চলেছে। একসার গরুর গাড়ি ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করে এগিয়ে আসছে। সোনাডাঙা সামনে। কী করবে এখন? ভুলেই গিয়েছিল যে এ-পথে এই গ্রামটা রয়েছে! রাস্তার ধারেই তো হাসিদের বাড়ি। ব্রীজে এসে দাঁড়াল চন্দন। এখানে কি অপেক্ষা করবে যতক্ষণ ব্রজ গাড়ি নিয়ে না ফেরে?

চুপচাপ দাঁড়িয়ে সিগ্রেট টানতে থাকল সে। সূর্য ডুবে গেল। না-আলো না-অন্ধকার একটা আশ্চর্য সময় তাকে পেরিয়ে গেল আস্তে আস্তে। মাথার ওপর শেষ পাখির ঝাঁক চলে গেল দূরের গাছপালার দিকে। তারপর অন্ধকার এল। তখন মনে হলো, যেন ব্রজর জন্যে নয়, সে আসলে পুশুলিয়া যেতে চেয়েছিল। মৌরী নদীর বালির চড়ায় দাঁড়িয়ে সম্ভবত গৌরীকে একবার কিছুক্ষণের জন্যে নির্জনে পেতে চেয়েছিল।

ব্রজর সঙ্গে রূপপুর সে আজ ফিরবে না। ওর গাড়ির আলো সে চেনে। গাড়ি এলে লুকিয়ে পড়বে গাছের আড়ালে। সকৌতুকে হাসল চন্দন। গোল্লায় যা ব্যাটা মাতাল! তোর মুখ যেন আর দেখতে না হয়।

সে হনহন করে এগোল। অন্ধকারে হাসিদের বাড়িটা পেরিয়ে যাবে। এও এক মজার লুকোচুরি। ফের হাসি পেল তার। হাসি—ব্রজর ছেনাল বউটাকেও একদফা গাল দিল। অবশ্য, সেও সকৌতুকে।

কিন্তু বাড়িটার সামনাসামনি এসে হঠাৎ কী হয়ে গেল যেন। মাথার ভিতর আচমকা একটা লোভ গরগর করে উঠল। সে দরজায় সামনে দাঁড়িয়ে অন্ধকার বাড়িটা দেখতে থাকল কিছুক্ষণ। বাড়ির ভিতরে কোন সাড়া নেই—নিঃশব্দ নিঃঝুম! পাশের বাঁশবনটা ক্রমাগত উদ্দাম বাতাসে তোলপাড় হচ্ছে। তালগাছের পাতাগুলো খড়খড় করে দুলছে। নিমফুলের গন্ধ ভেসে আসছে কদাচিৎ। দূরে আলো দেখা গেল। অমনি সে দরজা ধাক্কা দিল। কোন সাড়া পেল না প্রথমে। তখন ডাকল—হাসির নাম ধরেই ডাকল।

তারপর দরজা খুলে গেল। অবিকল হাসির মতো চেহারা—কিন্তু হাসির চেয়ে বয়স বেশি, একটু লম্বাটে গড়ন। হাতে হেরিকেন আছে—হাঁ করে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্তে।...কোত্থেকে আসছেন? কাকে চাই?

চন্দন একটু হেসে বলল, হাসিদি নেই এখানে? আপনি হাসিদির দিদি না।

হাসি '...কেমন যেন চমকে উঠল হাসির দিদি।...হাসি তো নেই। কেন, কী দরকার বলুন?

চন্দন বলল, হাসি নেই? কেন—আমি যে শুনলুম রূপপুর থেকে চলে এসেছে এখানে!

হাসির দিদি গম্ভীর হয়ে বলল, এসেছিল। তারপর অন্য জায়গায় চলে গেছে। সেখানে ভালো চাকরী পেয়েছে—গেছে।

চন্দন অস্থির হয়ে বলল, সে কী! কোথায় গেছে?

যেখানেই যাক, আপনার কী ? আপনি কে ?

আমি—মানে, ব্রজদা যে গাড়িটা চালায়, সেটা আমারই।

হাসির দিদি কঠোরমুখে বলল, বুঝেছি—আর বলতে হবে না। হাসির সঙ্গে আবার কী আপনাদের ? তার যা সর্বনাশ করার, করে তো দিব্যি ভালমানুষ সেজে বেড়াচ্ছেন।...গজগজ করতে করতে সে দরজা বন্ধ করছিল।

সেই সময় ভিতর থেকে মাতাল গলায় কে বলল, অত ইয়ে কী বাবা ! বলে দাও না যে হাসি দুমকা চলে গেছে। ওর লোকের কাছে গেছে, বলে দাও। ব্যস !

চন্দন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর সরে গেল আস্তে আস্তে। রাস্তায় গিয়ে উঠল। আবার হাঁটতে লাগল। সারা পৃথিবী জুড়ে এখন কী গভীর অন্ধকার ! সেই অন্ধকারে সে এগিয়ে চলল পুরুলিয়ার দিকে।

ছাব্বিশ

দিদির ঘরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে রুমা সাজগোজ করছিল। সে একটু ঝুঁকে কপালে একচিলতে টিপ দিল কড়ে আঙুলে। একটু হেসে নিজের দিকে তাকিয়ে থাকল ক'মুহূর্ত। কী যেন খুঁজল। ঠোঁটের নিচে তিলটা খুঁটল একবার। অমিত বলে, তোমার চেহারায় দিনে দিনে দারুণ সর্বনাশের লক্ষণ ফুটে বেরুচ্ছে। অমিত অত লাজুক ছিল। একটু ছোঁয়া লাগলে ওর মুখটা লাল হয়ে যেতে দেখেছে রুমা। সে আজকাল একটু ছোঁয়া পেতে ভালোবাসে। যেন বা একটু শারীরিক ঘনিষ্ঠতা চায়। ভাবটা এ রকম যেন : খুব হয়েছে, এবার খেলা ছেড়ে এস ঘরে যাই। খেলা !

সনতু, সনতু ! দেখে যা—মাসি হাসছে আপন মনে!

রুমা চমকাল। লতু এর মধ্যেই পেকে লাল হয়ে গেছে তো ! মায়ের গদীখাটে বসে একটা শিশুপাঠ্য প্রকাণ্ড মলাটের বই পড়ছিল আর মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে আকাশ দেখছিল। দুষ্টু মেয়ে ! কখন আড়চোখে রুমাকে লক্ষ্যও করেছে। রুমা নিঃশব্দে হাসছিল এটা ঠিকই।...খুব ডেঁপোমি শিখেছ ! রুমা ধমকাল।... এখন ঘরে বসে বই পড়ার সময় নয়। বলেছি না—বিকেলে পার্কে যাবে সনতুদের নিয়ে ?

লতু গম্ভীর হয়ে বলল, মেঘ উঠেছে—ওই দ্যাখো না মাসি !

রুমা উঁকি মারল। এই রে ! দিলে সব ভেস্তে। আকাশ কী কালো, কী কালো। থমথম করছে গাছপালা। মধ্যে কয়েকটা দিন বেশ হাসিখুশি ফরসা গেল। এ কখনো সয় ? আবার ধুন্ধুমার হুলুস্থুল বাধাবে। প্রতিটি বিকেলকে তছনছ করবে : অনেকখানি বিরক্তিতে রুমা ভুরু কুঁচকে আকাশ দেখতে লাগল।

লতু কী চোখে মাসিকে দেখছিল। ঠোঁটে বুড়ো আঙুল। বলল, হাসছিলে কেন মাসি ?

উঁ ?

বলছি—হাসছিলে কেন ?

মার খাবি লতু। ভারি মজা পেয়ে গেছো তো! মা থাকে না, আমি থাকি নে—একা একা দিব্যি গেল্লায় যেতে বসেছ। বলে রুমা আয়নার সামনে এল। শাড়িটা বুক থেকে তুলে আবার কোমর আর পাছার দিকটা ঠিক করে নিয়ে পরতে ব্যস্ত হল। তারপর ঘড়িটা কব্জিতে পরল। সময় দেখল। অমিত এক্ষুনি এসে পড়বে। কিন্তু আকাশের লক্ষণ ভালো নয়। ফাংশানটা নির্ঘাৎ নষ্ট করে ছাড়বে।

লতুর সম্ভবত খুব কথা বলতে ইচ্ছে করছে। সে বলল, কোথায় যাবে মাসি? ফাংশানে? সেদিনকার মতো আমাকেও নিয়ে চলো না!

যায় না। পড়া কামাই হবে।...রুমা গারজেনের ভঙ্গীতে বলল।...আর এখানে নাকি? সোনাডাঙা হাইস্কুলে—অনেক দূর।

লতু চুপ করে গেল। রুমা গলায় একটা সরু দানাওলা লাল পাথরের মালা পরে আবার নিজেকে দেখতে থাকল। মিনি ব্লাউজ পরলে কি সত্যি কিছু অশালীন হয়ে ওঠে মেয়েদের চেহারা? জামাইবাবু থাকলে কী যাচ্ছেতাই সব বলত! স্নেহধারাও আগের মতো মিনমিনে গেরস্থ-টাইপ থাকলে দারুণ চেঁচা-মেচি করত। আজকাল বলে—পরবে না কেন? যা আজকাল সবাই পরছে, সব পরবে। স্নেহধারা আরও আগে বাড়িয়ে বলে, সামনে আষাঢ়ে যাচ্ছে শ্বশুর ঘর করতে—তখন, যা গোঁড়া সেকেলে লোক ওঁরা, বারোহাতি ঘোমটায় ঢেকে রাখবে একেবারে। তা ছেলে আবার যদি তেমন-তেমন হত, তা হলেও কথা ছিল। ছেলের তো সাতচড়ে রা নেই মুখে, বাপের সামনে মুখ তুলে কথাও বলতে পারে না।...স্নেহধারার মনে সেই খুঁতখুঁতেমি ভাবটা আজও থেকে গেছে। কী আর করব? যে যুগ পড়েছে, কলেজে পড়া মেয়ে। তার ওপর লতুর বাপের আস্কারা পেয়েছে ছোটবেলা থেকে। সে বেঁচে থাকলে আকাশের চাঁদ চাইলে তাই এনে দিত শালীকে। তাই কিছু বলি নে বাবা। তুমি সুখী হলেই আমার সুখ!

স্নেহধারা যে এমন পাক্কা হিসেবী মেয়ে হবে, ভাবা যায় নি। তার এমন চোখ মুখ হবে, বুদ্ধিশুদ্ধি বাড়বে—কে ভেবেছিল? পাম্পিং স্টেশনটা দিব্যি চালিয়ে যাচ্ছে। মাস দুই আগে এজেন্সি তো প্রায় ক্যানসেল হতে বসেছিল। সেটা সামলে নিয়েছে। তেল কোম্পানীর ইংরেজী চিঠিগুলো নিয়ে যা সমস্যা। রুমা বুঝিয়ে দেয় মাত্র। স্নেহধারা ভারিক্কি চালে হীরুবাবুকে বলে, দাদা, জবাব লিখে দিন। লিখুন যে...

হীরুবাবু টাইপ করে আনার পর ফের রুমাকে পড়িয়ে নেয়। বুঝে নেয়। দরকার হলে বদলাতে বলে। তবে অমিত এসে বসলেই আমার ছুটি! বুঝলেন হীরুদা? অমিত এসে কাচঘরে বসলেই আমি আবার হাঁড়ি ঠেলতে যাব।... স্নেহধারা হাসে। রুমা ভাবে, দিদির চোখে একটা চশমা হলেই এবার সব মানিয়ে যায়। বেশ দ্যাখায় দিদিকে! একেবারে হেডমিসট্রেস।

কিন্তু অমিত এসে বসবে ও কাচঘরে—তাহলেই হয়েছে। আশাটা বুঝি বাণীবাবু হেডমাস্টার দিয়েছেন? অমিতকে ওরা কেউ চেনে না—রুমা চেনে। ও একটা ভীতুর ভীতু, বোকার বোকা, গোবেচারা টাইপ ছেলে। গান ছাড়া কিছু ভাবে না। গান ছাড়া ওর জগত নেই। ওর স্বপ্নটা কী রুমা তাও জানে। ওর স্বপ্নের শেষে আছে একটা বড় শহর। লক্ষ লক্ষ শ্রোতা। রেডিও, রেকর্ড,

ফিল্মের প্লে-ব্যাক আর মধ্যে মধ্যে সারারাত দরবারী কানাড়া চালিয়ে যাওয়া। বাপস। এক গাদা লোক ঘুমোচ্ছে, ঝিমোচ্ছে, স্টেজে পাখওয়াজ বাজছে, মাইক-গুলো চক চক করছে আলোয়, হাতে একটা তানপুরা।...

ওর গান ভালবাসতে গিয়েই এই ভালবাসাবাসির বিপদ হয়েছে। হ্যাঁ—দারুণ বিপদ ! বললে তো কেউ বিশ্বাস করবে না কথাটা। ওর গানে কী যেন আছে—একটা কিছু রয়ে গেছে ওর গলার স্বরে, হঠাৎ মনের গভীরতর দরজাটা খুলে যায়। ঘরের ভিতর ঘর, তার ভিতর ঘর। কী সব থরে থরে সাজানো সেই ঘরে! দেখামাত্র চেনা হয়ে যায় এই তো. এই তো। কী যেন গঙ্গার কাজল জল, কী যেন বৃষ্টির দিন ট্রেনের হুইসিল, কী যেন জৈন মন্দিরের পেতলের গম্বুজ—মন্দিরে রামের মূর্তি...ঘুরে ফিরে বারবার ভেসে ওঠে এক স্বপ্নের ছোট্ট শহর। সুখ দুঃখের দিনগুলো নিয়ে অজস্র বৃষ্টির ফোঁটার মধ্যে কেঁপে ওঠে ছেলেবেলাটা।

লতু!

উঁ?

কী আজেবাজে পড়ছিস! রাখ।

লতু বই বুজিয়ে তাকাল।

হ্যাঁ রে, তোর জিয়াগঞ্জের কথা মনে পড়ে না?

লতু জোরে মাথা দোলায়।...কী জিয়াগঞ্জ? না বাবা, কিছু মনে নেই।

জানিস লতু? আমি ছেলেবেলায় ট দিয়ে কথা বলতুম। কী না ভ্যাংচাত লোকেরা! আর বুঝলি লতু? জিয়াগঞ্জের রাজাদের রাসমন্দিরে একবার রাসের মেলা বসেছে। আমি ভিড়ে হারিয়ে গেছি। সে কী কান্না! যেখানে বাড়ি ছিল, সামনেই গঙ্গার ঘাট। ওপারে জৈনদের মন্দির। পেতলের গম্বুজ। ওখানে একটা ভারি চমৎকার বাগান আছে—'নলক্ষার বাগান' বলে লোকে। ফোয়ারা আছে। মন্দির আছে। তোদের রূপপুরে কী আর আছে দেখবার মতো? শুধু আজেবাজে লোক—ঠক জোচ্চোর আর দালাল। তা বুঝলি লতু? সেবার নৌকো চেপে ওপারে চলে গেছি একা। ওপারে আজিমগঞ্জ স্টেশনের ওদিকে গোয়ালপাড়া বলে একটা পাড়া আছে। সেখানে একটা মেয়ের সঙ্গে খুব ভাব ছিল। কিন্তু বাড়ি চিনি নে। কী করব? নলাক্ষার বাগানটা চিনতুম। গেলুম সেখানে। দুপুর অব্দি টো টো ঘুরছি। এদিকে বাড়িতে খোঁজাখুঁজি পড়ে গেছে। আর এদিকে হয়েছে কী, পথ হারিয়ে ফেলেছি আমি।...খুব হাসতে লাগল রুমা।..বিকেল হয়ে আসছে। গঙ্গার ধারে উল্টো দিকে হাঁটছি। সে এক মজা!

গম্ভীর লতু বলল, বাড়ি এলে কেমন করে?

এলুম তো।

বাবা খুঁজে আনল বুঝি?

তোর বাবা আনবে? ততক্ষণ তিনটে হারমোনিয়ম সারা হয়ে যাবে।

নিজে আসতে পারলে?

উঁহু। চাঁদুদা আনল। তরমুজের ক্ষেতে...

চাঁদুদা কে? ও। সেই লোকটা?

কী বললি?

সেই লোকটা তো? বাবার টাকা চুরি করেছে যে?

রুমার শরীর মুহূর্তে ঝাঁকুনি খেল। সাদা মুখে সে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাল লতুর দিকে। তারপর ছোট্ট করে বলল, হুঁ।

লোকটা আর আসে না কেন মাসি?

যে তোর বাবার টাকা চুরি করেছে, সে আসবে কেন? তাকে পুলিশে দেব না?

মাসি, মাসি! ঝড় আসছে, ঝড়! লতু লাফ দিয়ে খাট থেকে নামল। বাইরে গিয়ে চেঁচাল, বিষ্টি হবে, বিষ্টি হবে! কী মজা!

রুমা আকাশ দেখল। হ্যাঁ, সেই স্ফীতকায় চাপ চাপ কালো রঙটা নড়তে শুরু করেছে। দূরে পাণ্ডেজীর গদীর দিকের বটগাছ আর নারকোল গাছগুলোর মাথা দুলতে লেগেছে। সারা পশ্চিম দিগন্তে কালো রঙটা চিরে উজ্জ্বলতম হলুদ রেখা আর একটা বিস্তৃত রক্তাভা ফুলে উঠছে। দেখতে দেখতে এসে পড়ল ঝড়। শন শন হু-হু শব্দে ঝাঁপিয়ে এল। ধুলো, ধুলো! শুকনো পাতা ছেঁড়া ঘাস খড়কুটো কাগজের টুকরো আস্তাকুঁড়ের ছাই হুড়মুড় করে জানালা গলিয়ে এসে পড়ল। গাছপালা ঝোপঝাড় ভেঙে হুড়মুড় করে একটা গতিবান ব্যাপকতা রুপ-পুরকে নাড়া দিতে লাগল। দড়ি ছিঁড়ে একটা গাইগরু লেজ তুলে পালিয়ে গেল। কে কাকে ডাকল কোথায়। কারা সব দৌড়ে গেল। শন শন হু হু হা হা হা হা। নড়ে উঠল সমুল যা কিছু আছে মাটিতে দাঁড়ানো। তারপর লতুদের চিৎকার ঃ শিল পড়ছে, শিল পড়ছে! চড়চড় করে শিল পড়তে লাগল। জানালা গলিয়ে দু চারটে এসে পড়ল রুমার পায়ের কাছে। রুমা শুধু দেখল একবার। তারপর বৃষ্টি। প্রথমে ছোট ছোট ফোঁটা তারপর বড়ো বড়ো। প্রচণ্ড শব্দে মেঘ ডাকল। আবার ডাকল। বার বার ডাকতে লাগল। মাটির গন্ধ, ছেঁড়া পাতার গন্ধ, হয়তো বৃষ্টিরও গন্ধ। ঘন ছায়া এল ঘরের ভিতর। বৃষ্টির ছাঁট এসে পড়ছে ঘরের মেঝেয়। শাড়ির নিচেটা ভিজে যাচ্ছে। রুমা তবু সরল না। ঝড় বৃষ্টি দেখছে।

মাসি, মাসি! কী করেছ—কী! সব ভিজে গেল যে! ও সন্তু, ও গ্যাঁদা, দেখে যা—দেখে যা মাসী কী করেছে!

রুমা একটু হাসল ওর দিকে তাকিয়ে।

লতুও ভিজছে। ফ্রক থেকে জল চোঁয়াচ্ছে।...জানালা বন্ধ করে দাও! ও মাসি! দাঁড়াও—মা এসে বকবে। তখন আমার দোষ দিলে ভাল হবে না কিন্তু।

গ্যাঁদা দরজায় মুখ বাড়িয়ে একবার দেখে গেল। তারপর বারান্দায় তার সোল্লাস চিৎকার শোনা গেল—হো হো হো, কী মজা! দাদাবাবু ভিজেছে, দাদাবাবু ভিজেছে!

বারান্দায় অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর। লতু এগিয়ে গিয়ে বলল, বেশ হয়েছে, ভাল হয়েছে! আমাকে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল না তো—সইবে কেন?

রুমা নির্লিপ্ত স্বরে বলল, অমিত নাকি?

অমিত বারান্দার তক্তাপোষে বসে বলল, ভিজে একাকার হয়ে গেছি। রাস্তায় আসতে না আসতে পড়ে গেলুম সামনা-সামনি। কোন মানে হয়!

রুমা বলল, তোমার ফাংশান আজ গেল। এখন ভালো ছেলের মতো আবার ভিজতে ভিজতে বাড়ি ফিরে যাও।

অমিত ঘরের দিকে উঁকি মেরে বলল, তাড়িয়ে দিচ্ছ বুঝি?

তা কেন? ভিজে কাপড়ে থাকলে অসুখ করবে। গলা ধরে যাবে। এখানে তো ধুতির কারবার নেই, সব শাড়ি। পরবে নাকি?

পরব না তো কী করব? সত্যি, গলাটা যাবে নির্ঘাৎ।

যাঃ। শাড়ি পরে না। সোজা বাড়ি চলে যাও।

অমিত গম্ভীর হয়ে গেল। রুমার কথাগুলো কী রকম মনে হচ্ছে। আজকাল কিছুদিন থেকে রুমা যেন কেমন বদলে যাচ্ছে। আগের গায়ে-পড়া ভাবটা আর নেই। এ বাড়ি গানটান করে রাত বাড়লে আগে টর্চ নিয়ে হাইওয়ে অব্দি এগিয়ে দিত—এখন আর দেয় না। এগোতে পাঠায় গ্যাঁদাকে। তাছাড়া পাশে বসতেও চায় না যেন। কী হয়েছে রুমার?

অমিত তবু হাসবার চেষ্টা করল।...শাড়িতে দোষ নেই। সেদিন পণ্ডিত মশাইকে দেখলুম শাড়ি পরে মুড়ি খাচ্ছেন—মোড়ায় বসে।

রুমার কোন জবাব এল না। ঝড়ের বেগ কমেছে। বৃষ্টি ঝিরঝির করে ঝরছে। বাজ ডাকছে বার বার। গলি রাস্তাটা এরই মধ্যে জলে ডুবে গেছে। যোলাটে নোংরা জলের স্রোত বইছে।

অমিত আরও দু' মিনিট অপেক্ষা করে উঠল। ঘরের দরজার দিকে তাকাল। তারপর বলল, গলাটা গেল। কী বিচ্ছিরি বিপদ এসে পড়ে আচমকা! লতু, যাচ্ছি রে!

পরক্ষণে সে বৃষ্টির মধ্যে উঠোনে নেমে গেল। সন্তু গ্যাঁদা লতা এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, দাদারা ভিজছে, কাকাবাবু ভিজছে! কী মজা, কী মজা!

রুমা হয়তো উঁকি দিত না—কিন্তু ওদের চ্যাঁচানি শুনেই একটু ঝুঁকে দরজার বাইরেটা দেখে নিল। দেখল, অমিত লম্বা পায়ে উঠোন পেরিয়ে সদর দরজার কাছে গেল। এক মুহূর্ত দাঁড়াল। এদিকে তাকাতেই রুমার সঙ্গে চোখাচোখি হল। তারপর তাকে আর দেখা গেল না।

এবার রুমা উঠে দাঁড়াল। বারান্দায় এসে বৃষ্টি দেখতে দেখতে বলল, এই সন্তু! নৌকো বানাতে পারিস? কাগজ দে—বানিয়ে দিচ্ছি। লতু, জামা বদলাও শিগগির।...

কাগজের নৌকো বানাতে বানাতে রুমা ভাবল, যে যা ভাবে ভাবুক গে। ঝড়-বৃষ্টি এসে যেন খুব ভালো হয়ে গেল। আজ কিছু ভালো লাগছিল না। কপালের একচিলতে টিপটা হয়তো বাঁকা হয়ে গেছে। এই শাড়িটা কেন বাছতে গেলুম? কী বিচ্ছিরি রঙ! যাকগে, বেশ ভালো লাগছে বৃষ্টিটা। না এলে এতক্ষণ এক গাদা লোকের মধ্যে বসে থাকতে হত। একগাদা গেঁয়ো লোক, ফুলের মালা, সভাপতি মানেই একটা ওল্ড ফুল, ধূপকাঠি পোড়া গন্ধ, হারমোনিয়াম তবলা, কার বাড়ির গালিচা, কার বাড়ির কী...ভ্যাট, ভ্যাট! সব ভালগার লাগে। তার চেয়ে চুপচাপ একলা থাকা কত ভালো।

মাসি, মাসি!

কী রে সন্তু?

সন্তু আঙুল তুলে দ্যাখাল, নৌকোটা তুলসী গাছের ঝাড়ে আটকে গেছে।

যাক। আবার একটা বানাচ্ছে রুমা! আকাশ, আকাশ! তুমি আজ প্রাণ ভরে বিষ্টি দাও।

আকাশ একটা ভিজে চোখের মতো এখন পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ চমকে উঠল রুমা। এইমাত্র যেন কী দারুণ ব্যাপার ঘটে গেছে! অমিত সত্যি সত্যি কি ভিজতে ভিজতে চলে গেল? কী দুর্মতি কী নিষ্ঠুরতা! ওকে অমনিভাবে চলে যেতে দিল সে? কেন যেন ওর অমন করে ভিজে কাপড়-জামা গায়ে এসে পড়াটা পছন্দ হচ্ছিল না। ওকে আজকাল এত হ্যাংলা লাগে। মনমরা হয়ে পড়ল রুমা। বেশ কিছুক্ষণ ধরে তার মনে একটা স্যাঁতসেতে ভাব থেকে গেল। এবং আর কিছুদিন পরেই যে বাড়িতে শাঁখ বাজবে উলুধ্বনি দেওয়া হবে, ছাঁদনাতলা বাঁধবে লোকেরা, আগুনের সামনে মন্ত্র পড়া হবে, সেই বাড়িটা বিশ্রিভাবে ভিজে গিয়ে রুমার দিকে কাতর চোখে তাকাচ্ছে। রুমার মনে হচ্ছে এর লেজ ধরে টান দিলেই ম্যাও করে কেঁদে ফেলবে।

লতু, আয় ক্যারাম খেলি।

লতু সোৎসাহে ক্যারাম বোর্ড আনতে গেল। পরক্ষণেই তার আর্তনাদ আর লাফালাফি শুনে রুমা কাগজের নৌকো ফেলে উঠে দাঁড়াল। দৌড়ে ঘরে ঢুকে বলল, কী হয়েছে রে?

লতু একটা চেয়ারে উঠে বিশ্রিভাবে নাচছে। গলা নিখাদে তুলে বলল, সাপ ঢুকেছে, সাপ মাসি, সাপ!

রুমা সাপ শুনেই পিছিয়ে এল। ঘরের ভিতর এরই মধ্যে বেশ অন্ধকার হয়ে উঠেছে। সে হতচকিত হয়ে বলল, সাপ? কোথায় সাপ?

ওই যে লেজ! ওই যে! ঠাকুরের ছবির পাশে! ওই যাঃ ঢুকে গেল।

ঠাকুর ঘরে?

স্নেহধারার ঘরের লাগোয়া একটা ছোট্ট ঘর রয়েছে। ওটাই ঠাকুর ঘর। রামকৃষ্ণ-সারদামণি, বামাক্ষ্যাপা আর কালী মূর্তির গা টিকয় বাঁধানো ছবি একটা জলচৌকিতে সাজানো রয়েছে। সামনে ধূপচি পঞ্চ-প্রদীপ আর একটা ফুলদানী। নকসা কাটা কাঁসার থালায় একটা শাঁখ, সিঁদুর কৌটো, গঙ্গা জলের ঘটি ইত্যাদি রয়েছে। একটা সুন্দর আসনও গোটানো আছে এক পাশে। ওঘরে স্নেহধারা ছাড়া কারো যাবার হুকুম নেই।

রুমা সুইচ টিপে আলো জেবলে দিল। ঠাকুরঘরের সুইচটা এক পা বাড়িয়ে কোনক্রমে টিপে দিল। তারপর বলল, কই রে সাপ?

লতু বলল, ঠাকুরের ফটোর পিছনে।

ইতিমধ্যে গ্যাঁদা একটা লাঠি হাতে এসে হাজির হয়েছে। সন্তু মানতুরাও এসে গেছে। রুমা ধমক দিয়ে বলল, থামো সব। ভিড় করো না।

গ্যাঁদার হাত থেকে লাঠিটা নিয়ে দরজার কাছে যেতেই রুমার মনে হল, হঠাৎ খুব আশ্চর্যভাবে মনে হল, সত্যি তারা এত অসহায়, এত সামান্য মানুষ, এ বিশাল পৃথিবীতে! বাইরে আকাশ ঢাকা ঘন মেঘ, উদ্দাম বাতাস, বৃষ্টি ঝরছে —এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে একটা ছোট বাড়িতে কতকগুলো কমবয়সী মানুষ মাত্র। কী করতে পারে তারা—কতটুকু তাদের শক্তি? ওই সাপটা এসে যেন কথাটা ভালো করে বুঝিয়ে দিল তাদের। টাকা! টাকা দিয়ে তুমি কী

করতে পারো? থামাতে পারো ওই ঝড় বৃষ্টি? সাপটার আসা বারণ করতে পারো? কিচ্ছু করার সাধ্য তোমার নেই।...মনে হু হু করে একটা প্রবল কষ্টের ঢেউ উঠে এল। সারা ছেলেবেলা চাঁদুদা ছিল মাথার ওপর, তারপর ছিল জামাই-বাবু—এখন তো কেউ নেই। কাকেও মুখ ফিরিয়ে দেখতে পাচ্ছ নে! অমিত এসে-ছিল। অমিতকে তো ভারি চেনা গেছে! ও আমার চেয়েও ভীতু, আমার চেয়েও বোকা। সাপ কাথাটা শুনলে সে এতক্ষণ কড়িকাঠে ঝুলত। গত আশ্বিনে বোকা। সাপ কথাটা শুনলে সে এতক্ষণ কড়িকাঠে ঝুলত। গত আশ্বিনে কিছুতেই ওখানে বসে থাকতে চাইত না। আসলে অমিত নিজের জীবনটাকে খুব দামী মনে করে। তাই ও কেমন যেন স্বার্থপর। এই দ্যাখো না—একটু ঠাণ্ডা বাতাস বইলেই গলায় মাফলার জড়ায়। একটু রোদ্দুর চড়লেই ফাঁকায় নামতে গাইগুই করে। শরীর সম্বন্ধে ও এত সাবধানী, এত বাছবিচার কবে চলে। বাস-রিকসোয় চাপবার আগে চোখ বুজে কী বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ে, আর কপালে ও বুকে হাত ঠেকায়।

গ্যাঁদা বলল, খোঁচাও, খুঁচিয়ে দাও। মারো খোঁচা শালাকে।

রুমা তার দিকে তাকাল।...কই রে? দেখতে পাচ্ছিস?

গ্যাঁদা পা বাড়িয়ে বলল, দাও, দাও—লাঠিগাছটা আমাকে দাও না!

এতক্ষণ রুমার মনে হল, মধ্যিখানে কালীমূর্তির ছবির পাশ দিয়ে লেজটা দেখা যাচ্ছে যেন। লেজটা নড়ছে না। মনে হয়, খুব আরামে বসে আছে সাপটা। কিন্তু এলই বা কোন পথে? মেঝের জল যাবার ঘুলঘুলিটায় ঝাঁঝরি আছে। তাহলে? সম্ভবত বারান্দা দিয়ে সবার অজানতে উঠে এসেছে। সবাই তো তখন কাগজের নৌকো আর বৃষ্টি নিয়ে ব্যস্ত ছিল—তাই দেখতে পায় নি।

কিন্তু সাপটা ওখানে গিয়েই বা ঢুকল কেন? ঘরে এত সব জিনিসপত্তর —তার ফাঁকে দিব্যি ভালো জায়গা ছিল। তা না করে একেবারে ঠাকুর ঘরে গিয়ে ঢুকল। শুধু ঢুকল নয়, ঠাকুরের পিছনে গিয়ে আশ্রয় নিল। ওকে তাড়ালে পাপ হবে না তো? কী সমস্যায় ফেলে দিলে সাপটা! রুমা বিপন্ন মুখে তাকিয়ে রইল। দিদি এসে শুনলে কী বলবে কে জানে! কিন্তু দিদিও কি আর ও-ঘরে ঢুকে পুজোয় বসতে পারবে—যদি সাপটাকে না তাড়ানো হয়?

সেই মুহূর্তে আচমকা আলো নিভে গেল। ঘন বিপুল অন্ধকারে ভরে গেল ঘর। বাইরে যে সামান্য আলো রয়েছে, তা বৃষ্টিদিনের গোধূলিকালের আলো। আলো বলা ঠিক নয়—একটা মৃদু ধূসর আভা মাত্র।

কারেণ্ট ফেল, কারেণ্ট ফেল! এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল ছেলেমেয়েরা। তার-পর দৌড়ে বাইরে চলে গেল।

রুমা চেঁচিয়ে উঠল, গ্যাঁদা! মোমবাতি জ্বাল শিগগির!

গ্যাঁদা রান্নাঘরের দিকে দৌড়ে গেল।

রুমা দেখল, তার পা দুটো যেন নড়তে চাইছে না। মেঝের সঙ্গে গাছের মতো আটকে গেছে। উরু দুটো ভারি মনে হচ্ছে। মাথার ভিতরটা ভোঁ ভোঁ করছে। পরমুহূর্তে সে এক লাফে বাইরে গিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল।

গ্যাঁদা মোমবাতি জেবলে আনলে রুমা বলল, গ্যাঁদা, সাবধান।—যেন নিভে না যায়। আমার পাশে পাশে থাকবি।

লাঠিটা নিয়ে আবার সে ঘরে ঢুকতে গিয়েই পিছিয়ে এল। পা দুটো ভীষণ কাঁপছে। বুক ঢিপ ঢিপ করছে। থাক গে· কাজ নেই। আলো জ্বলুক, দিদি আসুক। ততক্ষণ—

রুমা বলল, এ লতু-সন্তু! তোরা সবাই তক্তাপোষে বসে থাক। খবরদার, নামবি নে। গ্যাঁদা, তুই এখানে আলোটা রাখ।

গ্যাঁদা তক্তাপোষে মোমবাতিটা আটকে দিয়ে বলল, সাপটাপে আমার ভয় নেই। কত দেখলুম।...তরপর সে রান্নাঘরে চলে গেল।

বারান্দার তক্তাপোষে রুমা লতুদের ছুঁয়ে বসে রইল। সেই অসহায়তার দুঃখটা আবার মাথা চাড়া দিয়েছে। আকাশভরা মেঘ-বৃষ্টি বাতাস, এই ছোট্ট বাড়িটাতে কয়েকজন কম-বয়সী অনভিজ্ঞ মানুষ। সংসারের কীই বা জানে, বোঝে! জামাইবাবুর জন্যে তার চোখ দুটো ভিজে এল। টাকা! টাকা সব নয়, টাকা কিছু নয়'...

হাইওয়ের ধারে পেট্রোল পাম্পের কাচঘরে গম্ভীর মুখে বসে স্নেহধারাও একই কথা ভাবছিল তখন। টেবিলে মোমবাতি জ্বলছে। হীরুবাবু দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছে। স্নেহধারা ভাবছিল, রুমা অমিতের সঙ্গে সোনাডাঙ্গার ফাংশানে চলে গেছে কতক্ষণ। এখন বাড়িতে ছোট ছোট কটি ছেলেমেয়ে। এই আকাশভরা বৃষ্টি-বাতাস, ইলেকট্রিসিটি বন্ধ, ওরা হয়তো ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে চুপচাপ বসে আছে। এত অসহায় ওরা, এত দুর্বল। না—টাকা কিছু নয়, টাকা দিয়ে সবখানে শক্তির আশা করা বৃথা। অস্থির হয়ে পড়ছিল স্নেহধারা। বৃষ্টিও তো থামতে চায় না' একবার নাকি ঠিক এমনি সময়ে জ্ঞানবাবুদের গদীতে ডাকাতি হয়েছিল। জীপে চেপে এসেছিল ডাকাতরা।

বুক কেঁপে উঠল, স্নেহধারার। আজকের ক্যাশে অনেক টাকা আছে। তোরাপ নামে একটা লোককে দারোয়ান রাখা হয়েছে। হকসায়েব তাকে এনে দিয়েছিলেন। মনে হয়, সে বিশ্বাসী লোক। শরীরে শক্তিও আছে। কিন্তু আজকাল ওই দিয়ে তো কিছু হয় না। হীরুবাবু বলছিল একটা বন্দুকের দরখাস্ত করতে। রুমার নামে একবার পরেশ একটা দরখাস্ত দিয়েও ছিল। সাবালিকা না হওয়ার জন্যে সেটা পাওয়া যায় নি। এখন তো রুমা বোধ হয় সাবালিকা। নাকি নিজের নামে দরখাস্ত করবে? হাসি পেল একটু। বন্দুক দিয়ে কী ঠেকাবে? কে ছুঁড়বে বন্দুক? রুমার বিয়েটা চুকে যাক ভালয়-ভালয়। তারপর বরং অমিতের নামে—

হীরুদা, উঁকি মেরে দেখুন তো—সব লাইন গেছে, না এদিকটা শুধু?

হীরুবাবু দেখে বলল, সব—সব। ঘুর-ঘুট্টি হয়ে গেছে।

হীরুদা, এক কাজ করলে হত।

বলুন দিদি?

দেখুন তো বিষ্টি কমেছে নাকি। একটা রিকশো ডেকে দেবেন।

বাইরে হাত বাড়িয়ে দৃষ্টি পরখ করে হীরুবাবু বলল, একটুখানি কমেছে। কিন্তু রিকসো পাওয়া যাবে না। সব এখন চৌমাথায় চলে গেছে।

তাহলে আপনার ছাতাটা দিন। বেরোই।

সে কী! টাকা পয়সা নিয়ে যাবেন কী করে?

তোরাপ সঙ্গে চলুক। তোরাপ শোন।

আগে যে ঘরটায় চন্দন থাকত, তোরাপের আড্ডা সেই ঘরে। ভাবা যায় না, এই ঘরটা এক সময় কী ছিল, আর এখন কী হয়েছে। দেয়ালগুলো শূন্য, তাকে কালি, হুকে একটা নোংরা ব্যাগ ঝুলেছে, দড়িতে তোরাপের জামাকাপড় ঝুলছে, জানলার কাছে একটা দড়ির খাটিয়ায় কাঁথা তেলচিটে বালিশ মাদুর-গুলো গুটোনো—ভাবা যায় না! আর সেই ঘরে এখন বৃষ্টির সন্ধ্যায় নিরুদ্বেগে বসে তোরাপ গাঁজা টানছে। স্নেহধারার কণ্ঠস্বর তার কানেই যায় নি হয়তো।

হীরুবাবু বলল, আজ আর ওর আশা করা বৃথা দিদি। নির্ঘাৎ নেশা করে পড়ে আছে। কী লোক না জুটিয়ে দিয়েছিল হকসাহেব!

স্নেহধারা রেগেমেগে বলল, কালই ওকে তাড়িয়ে দিন। নেশা করে পড়ে থাকবে, না পাহারা দেবে? কী জন্যে মাসে মাসে মাইনে গুণছি, শুনি! ইস, মজুমদারবাবুর টাকা সবাই গাছের ফলের মতো পেড়ে খেল আর নবাবীর চূড়ান্ত করল!

হীরুবাবু গলা চড়িয়ে ডাকতে লাগল।...ও তোরাপ, তোরাপ! এ্যাই তোরাপ!

স্নেহধারা বলল, দেখছ কাণ্ড? এখন যদি কোনকিছু হয়ে যায়, লোকটা তো ভুলেও চোখ খুলে এদিকে তাকাবে না! হীরুদা, কালই ওকে জবাব দিন। আমার অমন লোকের দরকার নেই।

হীরুবাবু মুখে যাই বলুক, তোরাপকে সে ভয় করে। একে সেখের পো, তার ওপর একসময় নাকি লাঠিয়ালী পেশা ছিল। বলল, আমি ব্যাটার ঘাড় ধরে ডেকে আনি। আজকের রাতটা তো যাক, তারপর দেখা যাবে।

টর্চটার ব্যাটারি কমে গেছে। হীরুবাবু টিপে দেখে নিয়ে পা বাড়াল। তোরাপের ঘরের দরজা খোলা। আলো ভিতর অব্দি পৌঁছল না। ভিজতে ভিজতে এক লাফে বারান্দায় উঠল সে। তারপর মিঠে গলায় ডাকল, তোরাপ আলি, কী করছ হে? সেই সময় হীরুবাবুর নাকে আচমকা একটা বিচ্ছিরি গন্ধ এসে লাগল। সে নাক ঢাকল। অন্ধকার ঘরে কজন লোক বসে আছে। কারুর আগুন জ্বলজ্বল করে উঠছে। হীরুবাবুর বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠেছিল। পরক্ষণে তোরাপের হুতুম প্যাঁচার মতো আওয়াজ এল—বাবু নাকি?

হীরুবাবু ভিতরে ঢুকে বলল, হ্যাঁ—তোমাকে দিদি ডাকছেন কখন থেকে। এরা সব কারা?

হৃদয় ঠাকুর একলাফে দাঁড়িয়ে বলল, আমি বাবদা।

হৃদয়ের পরণে যথারীতি হাফপ্যাণ্ট, চিত্রবিচিত্র হাওয়াই শার্ট, কাঁধে সেই কণ্ডাকটরি চামড়ার ব্যাগ। হীরুবাবু হেসে ফেলল।...তোমার আর মরণ হয় না ঠাকুর! এর মধ্যে তুমি কখন এসে জুটলে? এতক্ষণ তো তোমার পুশ্‌লেতে থাকার কথা।

হৃদয় বলল, সে আর বলবেন না বাবদা। বড্ড কেলেঙ্কারির কথা। আমাদের ছোটবাবু আর বেজো ড্রাইভার মদটদ খেয়ে খুব মারামারি হওয়ার উপক্রম। প্রায় হাতাহাতি হয় আর কী! শেষে রাগ করে বেজো পালিয়ে গেল। অনেক খোঁজা-খুঁজি করা হল—পাত্তা পাওয়া গেল না। অগত্যা ছোটবাবু গাড়ি নিয়ে থেকে

গেল পুশলেতে। আমাকে বললে, তুমি রূপপুরে চলে যাও এক্ষুনি। একজন ড্রাইভার নিয়ে এস। এসে তো এই ঝড়জলে? পড়ে গেলুম বাবুদা।

হীরুবাবু বলল, ভালো—খুব ভালো। আর ওটা কে?

শংকর সলজ্জ হাসল।...আমি হীরুদা।

আজ রাধার হোটেল ছেড়ে এখানে যে?

তোরাপদা বলেছিল, তাই এলুম। আজ এবেলা মালিকের কাছে ছুটি নিয়েছিলুম।

তোরাপ ততক্ষণে জামা গায়ে চড়াচ্ছে—অন্ধকারে লোকটা সব দেখতে পায় যেন। হীরুবাবুর টর্চ থেকে যা আলো আসছে, তাকে আলো বলা ভুল। ফরিদ খাটিয়ায় উঠে বসল। বলল, বাবু, কাল একবার গাঁয়ে যাব সকালবেলা। মাকে বলে রাখবেন।

হীরুবাবু দাঁত খিঁচিয়ে বলল। তুই নিজে বলগে না বাবা। আমার ওপর চাপাচ্ছিস কেন? একে তো আমার পায়ে-পায়ে দোষের অন্ত নেই। শালা কী পাপ করেছিলুম পূর্বজন্মে। মেয়েমানুষের হাতে—তোরাপ, লণ্ঠনটা বের করে জেবলে নাও। দিদিকে বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে। তা হ্যাঁ শংকর, বেজোর সঙ্গে চাঁদুবাবুর কিসের ঝগড়া?

শংকর হেসে বলল, সে হৃদে বলবে।

কাচঘর থেকে স্নেহধারা ডাকছিল হীরুদা। হীরুদা!

হীরুবাবু মুচকি হেসে বলল, ভয় পেয়ে গেছে। তোরাপ, হেরিকেন পেলে? আমি এগোই। শালা মেয়েমানুষের হাতে—হৃদয়, কাল একবার এসো দিনের বেলা।

হৃদয় বলল, আসব বইকি। আমি কারো ধার ধারি নাকি? ছোটবাবু আছে—নিজে আছে। আমার কী? তুমি ড্রাইভারের বউর সঙ্গে প্রেম করতে পারো, তার...(অশ্লীল বাক্য) আমি বললেই দোষ হবে? না কী হে শংকর?

শংকর বলল, আলবৎ। ফরিদ, আয়—মোতাত চটে যাবে। তোরাপ এক্ষুনি এসে পড়বে।...

হীরুবাবু টর্চের বোতাম টিপতে টিপতে কাচঘরের দিকে এগিয়েছে। স্নেহধারা বলল, কী হচ্ছিল এতক্ষণ? কারা কথা বলছিল হীরুদা?

তোরাপের বন্ধুবান্ধব সব। এখানেরই। ওরা থাকা এখন ভালই।

তোরাপ সেলাম দিয়ে ঘরে ঢুকল। কোন কথা না বলে সে সাবধানে দেশলাই জেবলে হেরিকেনটা ধরিয়ে নিল বগলে একটা মোটা লাঠি। স্নেহধারা আঁতকে উঠেছিল।...আহা, এখানে জ্বালছ কেন? এরা কোন দিন লংকাকাণ্ড না করে ছাড়বে না।

বিরক্ত মুখে সে উঠে দাঁড়াল। ব্যাগটা এতক্ষণ কোলে ছিল। এবার বুকের কাছে কাপড়ের ভিতর সতর্কভাবে ধরে রাখল। তারপর বলল, কই, ছাতাটা দিন। তোরাপ। তোমার ছাতা নেই?

তোরাপ বলল, পানি কমে গেছে। গায়ে লাগবে না আসুন মা।

ছাতা নিয়ে স্নেহধারা বেরুল। তোরাপ তার আগে-আগে চলছে। বাতাসের বেগ কমে গেছে অনেকটা। চারদিক সুনসান প্রগাঢ় অন্ধকার। হেরিকেনের আলোয় হাইওয়ের পীচে এখানে ওখানে ব্যাং দেখা যাচ্ছিল। কেউ চুপচাপ বসে আছে,

কেউ লাফ দিয়ে-দিয়ে রাস্তা পেরোচ্ছে। বৃষ্টির ছাঁট খুব অল্প। কাপড় একটু-খানি তুলে হাঁটছে স্নেহধারা। বাড়ি ঢোকার পথে কিছু কাদা হতে পারে—এদিকটা পীচের পথ। অন্ধকারে চলতে চলতে বারবার সে চারপাশে তাকাচ্ছিল। টাকা কাছে থাকলে মানুষের রক্ত শুকিয়ে যায়। অথচ এই টাকাই দেহে মেদ আনে। মুখের চামড়াকে মসৃণ আর উজ্জ্বল করে। চোখদুটো ভরাট হয়ে ওঠে—দৃষ্টিতে ফুটে ওঠে একটা নিরাপত্তার স্বাচ্ছন্দ্য। লতুর বাবা কী ছিল, আর কী হয়ে উঠেছিল। আর চাঁদু? চাঁদু যখন এল, পাঁজরের হাড় গোনা যায়। চোয়াল ঠেলে উঠেছিল। সেই চাঁদু গোলগল হয়ে উঠল দেখতে দেখতে।

কিন্তু তবু টাকার সেই অভিশাপ আছে যে। একজন গায়ে চাকা গজিয়ে আত্মহত্যা করে বসল। অন্যজন—ছি ছি, ওকথা ভাবলেও পাপ হয়। মানুষ অতখানি পাঁকে নেমে যেতে পারে, অমন সুন্দর সচ্চরিত্র ছেলে অত ভদ্র আর শান্ত—না দেখলে বিশ্বাসই হত না। স্নেহধারা ডাকল। তোরাপ!

কী মা?

তোমাদের সেই ছোটবাবুর খবর কী?

তোরাপ এক ছিলিম টানলেও মাথা ঠিক রেখেছে। একটু হেসে বলল, আমাদের না আপনাদের গো?...খুব হাসতে লাগল সে।

স্নেহধারাও একটু হেসে ফেলল।...ওই হল। শুনছিলুম, জিয়াগঞ্জে চলে গেছে। আর আসবে না। আবার সেদিন শুনলুম, আবার এসেছে। না এসে যো আছে? একবার যে মধুর স্বাদ পেয়েছে, সে স্বর্গে গিয়েও ছটফট করবে।

তোরাপ বলল, একটু আগে হৃদে ঠাকুরের কাছে একটা মজার কথা শুনলুম মা। চাঁদ বাবুর সঙ্গে বেজোর খুব মারপিট হয়েছে আজ। বেজো রাগ করে পালিয়েছে।

স্নেহধারা দাঁড়িয়ে গেল।...সে কি!

হ্যাঁ—হৃদে বলছিল। অবিশ্যি ওর কথার তিনভাগ বাদ দিয়ে একভাগ খাঁটি।

আবার হাঁটল স্নেহধারা।...তোরাপ, ব্রজর বউটাও পালিয়েছে।

জী হ্যাঁ। বেজো কি মানুষ মা?

একটু ইতস্তত করে স্নেহধারা বলল, আচ্ছা, তোরাপ, চাঁদুবাবুর সঙ্গে ব্রজর বউকে জড়িয়ে যা রটেছে তা কি সত্যি? তুমি তো এখানকার লোক—কত-লোকের সঙ্গে চেনা।

তোরাপ হাসতে হাসতে বলল, সত্যি মিথ্যে খোদা জানে। তবে কথা কী মা—বুঝছেন? যা রটে তা কিছু-কিছু বটে। এ হল গে ডাকপুরুষের বচন। এক-জায়গায় ঘি-আগুন থাকলে যা হয়, হয়েছে।

ছেলেটা খুব ভালো ছিল তোরাপ, বুঝলে? খুব সচ্চরিত্র। এখানে এসেই ও খারাপ হয়ে গেল।...স্নেহধারা যেন একটু ছটফট করে কথা বলছে।...মজুমদার-বাবুর টাকা মেরে গাড়ি করেছে, তা করুক। মজুমদারবাবু যা রেখে গেছে, তা তার ছেলে-মেয়েদের জন্যে যথেষ্ট। আমি সেজন্য একটুও গ্রাহ্য করিনে। কিন্তু... যাক গে বাবা। আমার নিজের নিয়ে ব্যস্ত এদিকে। শুধু মনে কষ্ট হয়, এই যা। ছেলেবেলা থেকে মেলামেশা ছিল আমাদের সঙ্গে।

তোরাপ গলা ঝেড়ে বলল, আচ্ছা মা, একটা কথা শুধোই—রাগ করবেন না তো?

না না! কী কথা?

আপনার বোনের সঙ্গে ছোটবাবুর বিয়ের কথা ছিল না?

হ্যাঁ ছিল।

যাক গে--দেননি, ভালই করেছেন। পরে পস্তাতে হত।

স্নেহধারা ঘুরে বলল, উঁ? হ্যাঁ—হয়ত হত। ছেড়ে দাও। এখন তো কোন কথা বলার মুখও রাখে নি সে।...

বাড়ির সামনে গিয়ে স্নেহধারা চমকে উঠল। দেখছ কাণ্ড? সদর দরজা খোলা রেখে দিব্যি সব বসে আছে। সে হন্তদন্ত হয়ে উঠোনে গিয়ে বলল, তোরা নির্ঘাৎ কবে মারা পড়বি। সদর দরজাটা তো বন্ধ রাখতে হয়। রুমা, তুই যাস নি?

লতু বলল, বিষ্টি এল যে। অমিতকাকু এসেছিল ভিজে কাপড়ে। কাপড় চাইল--মাসি তাকে বললে, বাড়ি যাও। অমিতকাকু রাগ করে চলে গেল।

রুমা হাসতে হাসতে বলল, অমিতটমিত পরে হবে। এখন দ্যাখো গে, তোমার ঠাকুর ঘরে সাপ ঢুকে বসে আছে।

স্নেহধারা আঁতকে উঠল।...এ্যাঁ, সাপ! আর তোরা চুপচাপ বসে আছিস! কই সাপ? কোথায় সাপ? কী সাপ?...বলতে বলতে সে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকে গিয়ে তখুনি পিছিয়ে এল এবং আছাড় খেল।

সাতাশ

সে রাত্রে চন্দন অস্থির হয়ে হৃদয়ের অপেক্ষা করছিল। একটা ট্রাক রূপপুর হয়ে সাঁইথিয়া যাবে—বিকেলে ওতেই হৃদয়কে রূপপুর পাঠিয়েছে। ওখানে অফ-টাইমের ড্রাইভার অনেক পাবে। কিন্তু রাত অনেকটা হয়ে গেল, হৃদয় আর আসে না। ওখান থেকে ফিরতি ট্রাক না পাওয়ার কথা নয়। শিশিরবাবুরা পুরুলিয়ায় একটা গদী খুলেছে। সেখানেই খোঁজ পাওয়া গেছে, ট্রাক একটা আসবেই। হৃদয়কে বলেও দিয়েছে ওই ট্রাকে আসতে। অবশ্য হঠাৎ ঝড়জল হয়ে গেল। কিছু দেরী হতে পারে সেজন্যে। চন্দন ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। বৃষ্টি থেমে গেল রাত ন'টা নাগাদ। তারপর আকাশ পরিষ্কার হল। নক্ষত্র ফুটে উঠল। আস্তে আস্তে রাত বাড়ল। বসন্ট্যান্ড বাজারের সব আলো একে একে নিভে গেল। সাধুপদ ডাকতে এল খাবার জন্যে। গাড়ির ভিতরে চুপচাপ বসে ছিল চন্দন। বলল, আজ আর কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না সাধুদা। আপনি ঘুমোন গে।

সাধুপদ বলল, বেজোর ভাবনা করবেন না ছোটবাবু। ও কী মাল আমি জানিনে? ঠিক এসে যাবে দেখবেন। আসবে—পায়ে ধরে কান্নাকাটিও করবে।

চন্দন গাড়ি থেকে নেমে বলল, ওর ধার আমি ধারিনে সাধুদা। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না।

সে তো একশো বার।...সাধুপদ সমর্থন করল।...আসলে হয়েছে কী জানেন? ছোটলোককে কক্ষনো বেশি আস্কারা দিতে নেই—মাথায় চড়ে বসে। সত্যি ছোট-বাবু, মাইরি বলছি—আমি বড্ড অবাক হয়েছি ওর কাণ্ড দেখে। আরে বাবা, মদ তো সবাই খায়—তুইও খেয়েছিস বরাবর। কিন্তু এমন করতে তো কক্ষনো দেখিনি। হাটবাজার জায়গা—দিনদুপুরে হাজার লোকের সামনে আপনাকে অমন আকথা-কুকথা বলে বসবে, ভাবতেও পারিনি। ছ্যাঃ, ছ্যাঃ, ছ্যাঃ!

সাধুপদ মিথ্যে বলেনি। ব্রজর এ আচরণ অভাবিত ছিল। বিকেলের ট্রিপে গাড়ি নিয়ে এসে কোথায় যথারীতি মদ খেতে গিয়েছিল সে। চন্দন শ্যামার পানের দোকানে সামনে বেঞ্চে বসেছিল। হঠাৎ টলতে টলতে এসে ব্রজ বলেছিল, স্যার, এবেলার ট্রিপে সব প্যাসেঞ্জার ফ্রি—বিনি ভাড়া। আমি আজ বিনি পয়সায় মানুষ বইব। হুঁ—ব্রজগোপাল আজ খানিক পুণ্যি করবে ছোটবাবু স্যার।

চন্দন প্রথমে কোন কথা বলেনি। ব্রজ সামনে দাঁড়িয়ে অনর্গল আবোল-তাবোল বকে যাচ্ছিল।...ব্রজগোপাল পাপীতাপী লোক—সে পুণ্যি করবে। আপনিও পুণ্যি করুন ছোটবাবু। সগ্‌গে যাবেন। এই শ্যামা, আমাদের ছোট-বাবুও পুণ্যি করবে—কী বলিস? কেন করবে পুণ্যি? এ্যাঁ? ওরে শ্যামা, জানিস—কেন করবে? হিঃ হিঃ হিঃ। মাইরি শ্যামা, ছোটবাবুর নজর আছে। শালা সাতমাইলের তেঁতুলতলার ভূষণো কুনাই—তার একটা ছুঁড়ি আছে। আমাদের ছোটবাবু মাইরি—চোখের দিব্যি,...হিঃ হিঃ হিঃ!

শ্যামা ধমকেছিল—এ্যাই বেজা, থামবি?

নো—নেহী। ব্রজগোপাল কভী নেহী থামে গা। মেরা হাথমে স্টিয়ারিং। যতক্ষণ স্টিয়ারিং আছে হাতে—ব্রজ থামবে না।...ব্রজ হাসছিল আবার। হাসতে হাসতে চন্দনের দিকে ঝুঁকে বলেছিল, গা-গাড়ি বেচবেন না স্যার? শ্যামা, স্যার গাড়ি বেচতে এয়েছিল। উরে শালা! গাড়ি বেচলে তেঁতুলতলা যে কানা হয়ে যাবে। ভূষণোর মেয়েটা ডুকরে কাঁদবে। [চোখ নাচিয়ে] জানিস শ্যামা, পুশুলেতেও ছোটবাবু একটা জুটিয়ে ফেলেছে। কী কপাল রে! ওই যে ময়লা মেয়েটা...মাইরি—হিঃ হিঃ হিঃ...

আচমকা চন্দন উঠে চড় মেরে বসেছিল ব্রজর গালে। ব্রজ চড় খেয়ে পড়ে গিয়েছিল। তারপর লাফিয়ে উঠে আস্তিন গোটাতে গোটাতে বলেছিল, চড় মারল আমাকে? এ্যাঁ! শ্যামা, তোর ছোটবাবুকে আজ আমি ঝাড়ব। শালা ড্রাইভার বলে কি মানুষের রক্ত গায়ে নেই? গায়ে কি শুধু মদ আছে বে শালা—তেরা [অশ্লীল বাক্য]...আও, চলা আও ভুঁসড়িবালে!

চারপাশে লোক জমে গেছে। কেউ হাসছে, কেউ ব্রজকে সামলাচ্ছে। চন্দন আবার চড় তুলে এগোতেই হৃদয়ঠাকুর মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল। চন্দনকে ঠেলতে ঠেলতে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল।...ছেড়ে দিন স্যার, ছেড়ে দিন। বাগ্দীর ছেলে—ওর মুখের রাখ্-ঢাক্ নেই। মিছেমিছি ভদ্রসন্তান কোন ছোটলোকের গাল খাবেন!

সাধুপদ দৌড়ে এসে চন্দনকে টানতে টানতে নিয়ে যায়। ব্রজ তখনও সমানে চেঁচাচ্ছে!...চলা আও! বাপকা বেটা হলে চলা আও! ওরে শালা। মনিব আছ তো আছ। যতক্ষণ গাড়ি চালাব—তুমি মনিব। গাড়ি থেকে নামলে তুমি যা, আম্মো তাই। কই ফারাক নেহী হ্যায়। চলা আও!.....

সাধুপদর হোটেলে ঢুকে লাল চোখে চন্দন কতক্ষণ ধরে একটা ক্যালেণ্ডার দেখছিল। ওখানে বাসস্ট্যাণ্ডে রীতিমতো ভিড়। নানান মন্তব্য কানে আসছিল। তারপর ঝড়বৃষ্টি এসে বাঁচাল। কে কোথায় মাথা বাঁচাতে সরে গেল। বৃষ্টির মধ্যে ফাঁকা বাসস্ট্যাণ্ডে দৌড়ে গিয়ে নিজের গাড়িতে উঠে বসেছিল চন্দন। আর বেরোয়নি।

সাধুপদ বলল, তাহলে সত্যি খাবেন না ?

চন্দন ঘড়ি দেখার চেষ্টা করল অন্ধকারে। তারপর বলল, চলুন আপনি—একটু পরে দেখছি।

সাধুপদ চলে গেল। চন্দন ভিজে মাটিতে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখে নিল। অন্ধকার নিঃঝুম হয়ে গেছে পুশুলিয়া। ঠাণ্ডা কনকনে বাতাস বইছে। চারদিক থেকে লক্ষকোটি পোকামাকড়ের ডাক ভেসে আসছে। ব্যাঙ ডাকছে। এই সব ধ্বনিপুঞ্জ প্রচণ্ড চিৎকারের মতো তার মাথার ভিতর ঢুকে পড়ছে। অস্থির হয়ে সে ভিজে মাটিতে পায়চারি করল কিছুক্ষণ। কাঁদায় জুতো নোংরা হয়ে গেল। সিগ্রেট জেবলে সে পীচের রাস্তায় চলে এল। ব্রজর কাছে গাড়ির চাবিটা রয়ে গেছে যে! হঠাৎ মনে পড়ল কথাটা। যাক্। ডুপ্লিকেট আছে—অসুবিধে হবে না। হৃদয়কে বলে দিয়েছে, কাকেও না পাওয়া গেলে পাণ্ডেজীর কাছে যেতে। হৃদয় এত দেরী করছে কেন ? অবশ্য শিশিরবাবুদের ট্রাকটা এখনও এল না।

খুব ক্লান্তি লাগছে। এমনি করে সারারাত অপেক্ষা করতে হবে নাকি ? এক-সময় সে সাধুপদর হোটেলে যাওয়াই ঠিক করল। হৃদয় হয়তো গাড়ির অভাবে আসতে পারছে না।

সাধুপদ ঘুমোয়নি। দরজা খুলে বলল, আসুন, আসুন! মা আকালী, শুনি নাকি ? একবার আয়দিকি রে! ছোটবাবু এয়েছেন। তখন বললুম স্যার, খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ুন।

আকালী এল পাশের ঘর থেকে। একটু হেসে বলল, ভাত বেড়েই রেখেছি।

চন্দন বলল, কিছু খাবো না। ক্ষিধে নেই। শোব।

তাই হয় ? ভাত বেড়ে রেখেছি যে।...আকালী দৌড়ে পাশের ঘরে গেল।

সাধুপদ আসন করে দিতে ব্যস্ত হল।.. খালিপেটে রাতকাটানো কাজের কথা নয়। ওর কথায় মন খারাপ করবেন না। ওদের মুখটাই অমনি। ও ইন্দি! ঘুমোলি ? বাবুকে জলটল দিয়ে যা।

আকালী ভাতের থালা এনে রাখল।...ওরা জেগে থাকবার লক্ষি ? দুজনে গলাগলি নাক ডাকাচ্ছে। এখন কানের কাছে ঢাকঢোল বাজালেও ঘুম ভাঙবে না। যত জ্বালা তো আমার!

চন্দন হাতমুখে জল দিয়ে খেতে বসল। বেশ রাঁধে এরা! কিন্তু সত্যি কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না। অথচ এরা বাবা-মেয়ে যে ভাবে সাধাসাধি করছে, পাতে না বসেও উপায় নেই।

সাধুপদ তার জলচৌকিতে বসে সিগ্রেট ধরিয়েছে। বলল, বর্ষা আসতে দেরী। মৌরী নদীতে যা মাছ হবে, দেখবেন। কী মধুর স্বাদ! ইয়া বড় সব পাবদা ওঠে জালে। গত কয়েক বছর ধরে ইলিশও উঠছে। এ এক তাজ্জব কাণ্ড স্যার! আকালী, গতবার ইলিশ উঠেছিল না ?

আকালী বলল, হ্যাঁ। কোত্থেকে উজিয়ে আসে সব।

সাধুপদ বলল, তা বেজার কথা বলছেন—লোকটা এমনিতে তো বড্ড ভালো ছিল। কখন তো কোনরকম মন্দ দেখিনি। তাড়ি মদটা খায়, এই যা। আসলে ব্যাটার বউটা পালিয়ে মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

বাবা-মেয়ে জোর হাসতে লাগল। আকালী বলল, কেরেস্তানের মেয়ে। ঘরে থাকবে কেন ?

সাধুপদ বলল, কী বলে দ্যাখো! কেন থাকবে না? কেরেস্তানের মেয়ে ঘর সংসার করছে না স্বামীর? সোনাডাঙ্গা গিয়ে দেখে আয় না।

বাইরে গাড়ির শব্দ হল। খুব চাপা গরগর শব্দ। তারপর শব্দটা বাড়ল। চন্দন চমকে উঠেছিল। এঁটো হাতেই সে দরজার কাছে উঠে গেল। বাসস্ট্যান্ডের দিকে আলো শিশিয়ে উঠেছে। রূপপুর থেকে সেই ট্রাকটা এল নাকি?

সাধুপদ বলল, ব্যস্ত হবেন না। হৃদে ঠাকুর আসছে। আপনি খেয়ে নিন তো।

বাইরে গাড়ির শব্দ হল। খুব চাপা গরগর শব্দ। তারপর শব্দটা বাড়ল। চন্দন দৌড়ে গেল বাসস্ট্যান্ডের দিকে। এ কী! তার স্টেশন ওয়াগনটা নিয়ে চলে যাচ্ছে কে? চন্দন প্রচণ্ড জোরে চেঁচিয়ে উঠল—এই, এই! কী হচ্ছে? রোখো, রোখো!

দৌড়াতে থাকল সে। ব্রজকে দেখা যাচ্ছে আবছা। গাড়ি চালিয়ে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে সে? চন্দন পিছন পিছন দৌড়ে চলল। ব্রজদা! এই ব্রজদা!

পীচের পথে পা পিছলে হোঁচট খেয়ে পড়ল চন্দন। হাঁটু দুটো হয়তো ছড়ে গেল। হাঁচড়পাঁচড় করে উঠে আবার দৌড়ল সে। চেঁচাতে থাকল—ভালো হবে না বলছি! ব্রজদা, ব্রজদা! রোখকে—রোখকে!

তীব্র বেগে গাড়িটা বাঁকের মুখে অদৃশ্য হয়ে গেল। অন্ধকার দিগন্তে কয়েক মুহূর্ত ধরে একটা আলোর ছটা শিসিয়ে উঠতে দেখা গেল। গুর গুর শব্দটা মিলিয়ে গেল। পোকামাকড়ের ডাক ব্যাঙের ডাক তীব্রতর হয়ে উঠল। অন্ধকারে স্তম্ভিত হয়ে এঁটো হাতে দাঁড়িয়ে থাকল চন্দন।

সাধুপদকে লণ্ঠন হাতে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। সে ডাকছিল—ছোট-বাবু, ছোটবাবু!

কাছে এসে সে বলল, কী ব্যাপার? কার গাড়ি?

চন্দন আড়ষ্ট স্বরে জবাব দিল, ব্রজ গাড়ি নিয়ে পালাল।

পালাবে কোথায়? মাতালের কাণ্ড। সক্কালে ট্রিপ নিয়ে হাজির হবে দেখবেন। ভাববেন না। আসুন। খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ুন।...

ব্রজ অমন করে গাড়ি নিয়ে গেল কেন? ঘুম আসছিল না চন্দনের! সাধু-পদর হোটেলে এর আগেও কয়েক রাত শুয়েছে। বিছানাপত্র ভালই দিয়েছে সাধুপদ। সেজন্য নয়, ব্রজর কথাগুলো মনে পড়ছিল—আর ক্ষেপে উঠছিল চন্দন। ওকে একটা চড় মেরে তার রাগ পড়েনি। চাবকাতে ইচ্ছে করছে শুধু। তার ওপর এমনি করে রাত-দুপুরে না বলে-কয়ে গাড়িটা নিয়ে গেল! হয়তো সাধুপদর কথাই ঠিক। ব্রজ বড্ড বেহায়া। তাছাড়া গাড়িটাকে সে ভীষণ ভাল-বাসে। হয়তো কাল সকালেই ট্রিপ নিয়ে এসে পড়বে। পাছে চন্দন তাকে গাড়ি চালাতে না দ্যায়, তাই অমনি করে গাড়ি নিয়ে রূপপুরে চলে গেল। হয়তো কাল এসে ঠিকই পায়ে ধরে কান্নাকাটি করবে। বলবে, আপনি আমার মা-বাপ স্যার—আমি আনএজুকেটেড অধম বাঙ্গালীসন্তান।...

লোকটাকে অবশ্য দোষ দেওয়া যায় না। সত্যি তো চন্দন ওর সর্বস্বান্ত করেছে। হাসি দুমকায় মামাবাড়ি গিয়ে উঠেছে নাকি। ব্রজ বলছিল, শীগগির

দুমকা গিয়ে ওকে নিয়ে আসবে। হাজার হোক, বউ তো বটে। পেটে বাচ্চা আছে। সেধে নিয়ে আসবে! হাসি ওইরকম মেয়ে। হঠাৎ রাগ উঠল তো কথা নেই। রাগ পড়ল তো পড়ল—তখন একেবারে মাটির মেয়ে! ব্রজ ওর ওপর রাগ করে থাকতে পারে—না, সে ব্রজর ওপর রাগ করে থাকতে পারে? মুখোমুখি দাঁড়ালেই গলে জল হয়ে যাবে। কেন যাব না বলুন? জাত ছেড়ে বেজাতের সঙ্গে এসে জুটেছিল—এ কি কম কথা? হতভাগা ব্রজগোপাল তার মর্যাদা রাখতে পারেনি! আর—বুঝলেন স্যার? ওর বড্ড সাধ ছিল একটা পেটে কিছু আসুক। তা এল এ্যাদ্দিনে—ভগবানকে ওকে যেভাবেই হোক দিলেন তো বটে—

চন্দন আড়চোখে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছে। 'যেভাবে হোক' কথাটা খুব ভিতরে খোঁচামারার মতো না?

ব্রজ বলেছে—তবে আমি শালা ওই খবরটা শুনে মদ খাওয়া বাড়িয়ে দিয়েছি। বা রে বাঃ! হাসি ছেলেপুলের মা হবে—আর আমার আনন্দ হবে না? স্ফূর্তি করতে মন চাইবে না? আরে বাবা, হাসি মা হলে তার স্বামী যখন তখন আমিও তো একজন বাপ বটি! না কী? বলুন—বিচার করে বলুন স্যার!...

হঠাৎ চন্দনের মনে হল, গাড়ি নিয়ে ব্রজ দুমকা চলে গেল না তো—হাসির কাছে? ওকে কিচ্ছু বিশ্বাস নেই।

রাতটা কখন এই সব সাতপাঁচ ভাবনায় কেটে গেল। সাধুপদর হোটেলে শুলে বিছানায় বেলা অব্দি পড়ে থাকা যায় না। তিন বোন মিলে এখন ঘরটা ঝাড়পোঁছ করবে। জল ঢেলে ধোবে। পিঁড়িগুলো ধুয়ে মুছে সাজিয়ে রাখবে। দিনের জন্যে তৈরী হওয়ার ব্যস্ততা এখন।

চন্দন উঠে দেখল সাধুপদ তার আসনে বসে গণেশ মূর্তিকে ধূপধুনো দিচ্ছে। এখন কয়েক মিনিট সে কারো সঙ্গে কথা বলে না। বিড়বিড় করে মন্ত্রতন্ত্র আওড়ায়। চন্দন ভিতরে উঠোনের দিকে গেল। দেখল আকালী উঠোন ধুচ্ছে কোমরে আঁচল জড়িয়ে। পদ্ম রান্নাঘরে কী খুটখাট করছে। ইন্দি বাটের দিক থেকে আসছিল—হাতে একরাশ থালাবাসন। চন্দনকে দেখে একটু হাসল সে। চন্দনও হাসল।

খিড়কির দরজার বাইরে একচিলতে সবজীখেত আর আগাছার ঘন জঙ্গল। লেবু গাছ, আমড়া গাছ, পেঁপে গাছ। নিচে নদীর দহ। কালকের ঝড়জলে মাটি কিছু পিছল হয়ে গেছে। পা টিপে-টিপে নেমে গেল চন্দন। একটু তফাতে বাঁপাশে গৌরীদের ঘাট। সে ঘাটে গৌরীর মা বসে ঘটি ধুচ্ছে আর আপন মনে বকবক করছে। গৌরীর সঙ্গে আজকাল দেখাই হচ্ছে না। হয়তো খুব কড়াকড়ি করছে ওর মা। চোখে চোখে রাখছে! কিছু কানে যায়নি তো গৌরীর মায়ের?

চন্দনের কাঁস শুনে গৌরীর মা এদিকে মুখ ফেরাল। নদীর ওপাড় ঘেঁষে সবে সূর্য উঠেছে। ভুরু কুঁচকে চন্দনকে দেখার চেষ্টা করে বলল, কে গো? ভূতনাথ নাকি? কখন এলে?

চন্দন হাসি চেপে বলল, না—আমি ভূতনাথ নই।

ময়রাগিন্নি ঠাহর করে দেখে একটু হাসল...আমার মরণ, বাবা। চোখে ভালো দেখতে পাইনে। অ—আপনি বুঝি 'ভ্যানগাড়ি'র ছোটবাবু?

চন্দনের গাড়ির নাম 'ভ্যানগাড়ি'। রাজকমলবাবুর আমল থেকেই এ নাম চালু। কেউ বলে 'ভ্যাংগাড়ি।' বেজোর ভ্যাংগাড়ি। চন্দন বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ, মা।...মা কথাটা তার বলতে ইচ্ছে করল হঠাৎ।

ময়রাগিন্নি খুশি হয়ে বলল, বেশ বাবা। বেশ। আমার মেয়ে তোমার কথা বলে বটে—প্রায়ই বলে।

চন্দনের বুকটা ঢিপঢিপ করে উঠল। মুখে হাসি রেখে সে বলল, কী বলে?

ময়রাগিন্নি একটা প্রকাণ্ড ঘটি উবুড় করে জলের ফোঁটা ঝরাতে থাকল।... ওর কথা আর বলো না বাবা। ক বছর আগে টাইফয়েড হল—কী জ্বর, কী জ্বর! বড়ো ডাক্তার আনলুম সেই বহরমপুর থেকে—আট টাকা ভিজিট! একটিমাত্র পেটের পোকা—মেয়ে তো নয়, কথায় বলে—মাটির ঢিপি। এই যায় —ওই যায়, এবেলা যায়—ওবেলা যায় অবস্থা। শেয়রে রাত্তির জাগি ঠায়—দু'চোখের পাতাটি বুজিনে। সান্নিপাতিক বিকার—এ কি যা তা কথা। শেষ আঁদ প্রাণটা তো রইল—গেল না। কিন্তু এ মেয়ে আর সে-মেয়ে নেই। চাল-চলন কেমনধারা হয়ে গেল। মুখবাগে হাঁ কার চেয়ে থাকে—যেন কিছু বুঝতে পারে না। তখন বুঝলে বাবা তখন গেলুম অষ্টগ্রামের বাবার থানে। তারপর থেকে একটু বুদ্ধিশুদ্ধি খুলছে। তবে—সোমত্ত মেয়ে—ছত্তিশজাতের জায়গা—

চন্দনের মনটা ভারি হয়ে গেল। একটা প্রচ্ছন্ন কষ্টের ঢেউ এসে কয়েক মুহূর্তের জন্যে তাকে আড়ষ্ট করল। হ্যাঁ—এটাই ভেবেছিল সে। গৌরী কেমন যেন একটু এ্যাবনরমাল—বয়সের তুলনায় তার মনটা কাঁচা মনে হয়েছিল। গৌরীর জন্যে মমতা বোধ করল সে। কিছু বলার জন্যে ঠোঁট ফাঁক করল—কিন্তু ময়রাগিন্নি কথা থামিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

সিঁড়ির ধাপে উঠে ময়রাগিন্নি মুখ ফেরাল হঠাৎ।...কাল খুব চেঁচামেচি হট্টগোল হচ্ছিল আপনাদের। কী নিয়ে বাবা? আকালী বললে, বেজোর সঙ্গে আপনার মারামারি হয়েছে।

চন্দন হেসে উঠল। ও কিছু না। মাতাল লোক—বুঝতেই পারছেন।

ময়রাগিন্নি চলে গেলে চন্দন একটু অস্থির হয়ে পড়ল। গৌরীর আরও কথা শুনতে ইচ্ছে করছিল তার। কিছু তো বলল না। গৌরী কি এখানেই আছে এখন—নাকি বাইরে আত্মীয়বাড়ি গেছে বেড়াতে? জিয়াগঞ্জ থেকে আসার পর আর দেখতে পায়নি ওকে। বৃথা কেটে গেছে মৌরী নদীর বালির চড়ায় অনেকগুলো নির্জন সন্ধ্যা! কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য লাগে, প্রকৃতি গৌরীর সঙ্গে যেন একটা দারুণ শঠতার খেলা খেলছে। ওর মধ্যে যৌবনের ভালবাসার কাকুতি যেমন দিয়েছে, তেমন সেই ভালোবাসাকে ফুলেফলে ভরিয়ে দেবার পথে কী যেন বাধাও সৃষ্টি করে রেখেছে! গৌরীর সঙ্গে এবার দেখা হলে তাকে আর অসভ্য হাতে ছোঁবে না চন্দন। নিবিড় মমতা দিয়ে শুধু অনুভব করবে তার অস্তিত্ব।

ইন্দি এসে গেল ঘাটে। একটা প্রকাণ্ড কালো কড়াই আর খুন্তি ধুতে এল।...বাপ! এতখন ধরে ঘাটে কী করছিলেন? চা জুড়িয়ে গেল ওদিকে?

চন্দন একহাঁটু জলে নেমে তাড়াতাড়ি মুখ ধুতে থাকল।...তোমরা যে আজ বেজায় খাতির করছ—ব্যাপার কী?

কিচ্ছু ব্যাপার নেই।...বলে ইন্দি কাপড় ভিজিয়ে জলে নেমে গেল পাশে। ...রাত্রিবাস করলেন, কুটুম্বিতে করবেন না?

চন্দনের কাঁধে তোয়ালে ঝুলছিল। সে ঘাটে উঠে মুখ মুছতে মুছতে বলল, আচ্ছা ইন্দি—ওই বাড়িটা—মানে ওই ঘামের ওপর বাড়িটা কাদের?

ইন্দি দেখে নিয়ে জবাব দিল, ময়রাদের। কেন?

এমনি জানতে ইচ্ছে হল।

ইন্দি হঠাৎ চাপা হাসল।...বুঝেছি। ঘাটে গৌরী এসেছিল নাকি?

কে গৌরী?

যাকে দেখে আপনার মুণ্ডু উড়ে গেছে!...ইন্দি খুব হাসতে লাগল।

চন্দন অপ্রস্তুত হয়ে বলল, যাঃ!

যাঃ নয় বাবা! তাই এতক্ষণ ধরে ঘাটে বসে...হঠাৎ ইন্দি কণ্ঠস্বর চাপা করল। মেয়েটা হাবা, তা জানেন? আপনি এবার যেদিন প্রথম এলেন, সেই যে গো—অনেকটা রাত্তিরে—সেই দিন নদীর চড়ায় একা গিয়েছিল—আর নাকি কারা ওকে জোর করে নষ্ট করে ফেলেছে। খুব ছোটাছুটি চ্যাঁচামেচি হল। লোক চিনতে না পারলে কী করবে, গৌরীর মা সব চেপে গেল। কিন্তু ঘাটের লোকে ছাড়বে কেন? এটা অন্যায় নয়? হাবাগোবা মেয়ে পেয়ে যা খুশি করবে নাকি? সবারই মামাসি রয়েছে ঘরে।

চন্দনের শরীর শক্ত হয়ে উঠেছিল। সে রুদ্ধশ্বাসে বলল, একেবারে চিনতে পারেনি?

ইন্দি একখাবলা বালি তুলে কড়াইটা পা দিয়ে ডলতে ব্যস্ত হল।...অত শত জানিনে বাবা। আপনার চা জুড়িয়ে গেল। বাবা ডাকছে—শিগগির যান।

চন্দনের মনটা আবার রাতের মতো তেঁতো হয়ে গেল। সে ভারি পা ফেলে ঘাটের ওপর উঠে গেল। কয়েক মুহূর্তের জন্যে একটু থেনম গৌরীদের বাড়িটার দিকে তাকাল। ওদের একতলার ছাদে সকালের উজ্জ্বল রোদ পড়েছে। একটা কাক আর কয়েকটা পায়রা বসে আছে চুপচাপ। নারকোল গাছের পাতাগুলো দুলছে।

সাধুপদ জলচৌকিতে বসে দেয়ালে ঠেস দিয়ে পায়ে পা তুলে চা খাচ্ছে পরম তৃপ্তিতে। একপাশে একটা বড গেলাস ভরতি চা ঢাকা। ছোট্ট থালায় পেঁয়াজ ভাজা লঙ্কা ভাজা আর মুড়ি! সাধুপদ বলল, চা জুড়িয়ে গেল। খেয়ে নিন।...

একটু পরেই লুঙি ছেড়ে প্যান্টশার্ট পরে চন্দন বেরোল। তার সারা শরীর তখনও থরথর করে কাঁপছে। পৃথিবী আর মানুষ শব্দ দুটো এত বিষাক্ত!

বাসস্ট্যাণ্ডে যথারীতি ভিড় হয়েছে। ঘাট থেকে গরুর গাড়িগুলো খন্দ আর কুমড়োবোঝাই হয়ে উঠে আসছে। চাকায় কাঁধ লাগিয়ে চ্যাঁচামেচি করে গাড়ি ঠেলছে গাড়োয়ানেরা। বাস-স্ট্যাণ্ডের ওদিকে ভিজে মাঠিতে পাকা আমের গাদা। একটা বাস তৈরী হয়েছে—বহরমপুর যাবে! এ্যাসিস্ট্যাণ্টটা চেঁচাচ্ছে—চলল গাড়ি তুফান মেল! প্রতিদিনের চেহারা-গন্ধ-স্বাদ নিয়ে পুশুলে বাজার চনমন করছে ব্যস্ততায়। চন্দন শ্যামার পানের দোকানে গিয়ে বসল। শ্যামা নমস্কার

করে বলল, গাড়ি দেখছিনে। ব্রজ রূপপুর গেছে বুঝি খেপ আনতে? আপনি যাননি?

চন্দন মাথা দোলাল মাত্র। তার মনে এখন গৌরী—লাঞ্ছিতা অপমানিতা একটি হাবাগোবা মেয়ে। এই ব্যাপারটা কেন কেউ তাকে বলেনি? বললে অবশ্য কিছু করার ছিল না। কিন্তু তবু মনে একটা জেদ থেকে যাচ্ছে। কেন তার কানে যায়নি এটা? আসলে জিয়াগঞ্জ থেকে আসার পর সে গৌরীর কথা আগের মতো ভাবেই নি।

সামনে থেকে একটা ট্রাক আসছিল। ট্রাকটা চেনা মনে হল। বাসস্ট্যাণ্ডের কাছে এসে পেঁছিলে চন্দন দেখল, শংকর ড্রাইভারের পাশে হৃদয় বসে রয়েছে। চন্দন চমকে উঠল। হৃদয় ট্রাকে এল যে? তাহলে কি গাড়ি নিয়ে ব্রজ রূপপুর যায়নি? রাগে লাল হয়ে গেল চন্দন। থানায় গিয়ে শুওরের বাচ্চাকে রুদ্দা-খাওয়ানোর ব্যবস্থা করতেই হবে। নৈলে ওর মাতলামি শায়েস্তা করা যাবে না। রুট পারমিট এবার নির্ঘাৎ ক্যানসেল করে ছাড়বে স্কাউণ্ড্রেলটা। কী মতলব ওর?

ট্রাকটা দাঁড়াতেই হৃদয় লাফিয়ে নামল। তারপর চন্দনের দিকে দৌড়ে এল। চন্দন বলল, ট্রাকে এলে যে?

হৃদয় হাঁফাতে হাঁফাতে চোখ কপালে তুলে বলল, সর্বনাশ স্যার। ভয়ানক কাণ্ড! শিগগির চলুন, শিগগির! কিছু নেই—সব শেষ স্যার!...হাঁউমাউ করে সে কেঁদে উঠল।

চন্দন ক্ষেপে গিয়ে বলল, কী সর্বনাশ হয়েছে বলবে না, খালি লাফাবে! কী হয়েছে, কী?

হৃদয় কাঁদতে কাঁদতে বলল, বেজা মরেছে—গাড়ি পুড়ে গেছে! ছাই—স্যারি! ভস্ম!

শংকর এসে বলল, বড়ই কঠিন ব্যাপার ছোটবাবু। রূপপুর ফরেস্ট বাংলোর কাছে বেজা গাড়িতে পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দিয়েছে গাড়িটা—আর নিজে করেছে কী, রাস্তার ধারে শিরিস গাছে জিভ বের করে ঝুলছে।...

আজকাল সব গাড়িই ইনসিওর করা থাকে। তাই ইচ্ছে করলে আবার গাড়ি কিনতে পারে রূপপুর পুশকুলিয়া রুটের ছোটবাবু। কিন্তু আর এই ছায়াঢাকা সুন্দর পীচের পথে কোন ব্রজগোপালের সবুজ ভ্যাংগাড়ি থামিয়ে কোন কাঠ-কুড়োনি বুড়ি কপালে হাত রেখে রোদ আড়াল করে বলবে, আমার কুসুমকে বলিস বাবা—তোর মা পরশু গিয়ে তোকে নিয়ে আসবে? যেন বলিস বাপ, তোর দিব্যি রইল!...

পাঁচণ্ডীর বাঁকে মনোহারিওলা হেঁপো রুগী জোবেদালি চাচা আর কাকে আনতে দেবে চুড়ি সাবান ফুলেল তেল—এক ডজন উকুনবাছা কাঁকুই?

ভাঙা সাঁকোর কাছে পণ্ডিতমশায়, তাঁর অসুস্থ মেয়ের জন্যে ওষুধ আনতে বলবেন কাকে—কে শুনবে গাড়ি থামিয়ে এই অসঙ্গত আবদার কিংবা সংস্কৃত শ্লোক?

বটতলার মাচা থেকে আড্ডাবাজ লোকগুলো বিড়ির আগুন চাইবে কেন ভালবাসার ড্রাইভারকে?

আর কেউ বলবে না—আমাদের ভ্যাংগাড়ি, আমাদের ভ্যাংগাড়ি! ছায়ায়

ঢাকা পীচের পথে হঠাৎ থেমে কোন ড্রাইভার বলে যাবে না ঘুঁটেকুড়ুনী ছোট-লোকের মেয়েটাকে—কেমন আছিস বোনটি? তোর দিদিকে দেখে এলুম—রাস্তার ধারে ধান শুকোচ্ছে।

কাস্তে হাতে ভাষা, তার কাঁধে হাটুরে, মাটি কোপানো রোডকুলির দল—কেউ পথের মাঝে চেঁচিয়ে উঠবে না আনন্দে—ওই বেজোর ভ্যাংগাড়ি! বেজেদা, ভালো আছো হে? ও বেজো, কাল সীট দিও এট্টুকুন—আমার জামাই আসবে। বেজা রে, এ্যাদ্দিন ক্যানে দেখিনি বাপ?

কত কথা, কত মানুষ, কতবার চাকার শব্দ, ভেঁপুর স্বর, রুটের নামতা—চিরচেনার খাতায় লেখা দীর্ঘ কবিতার মতো নানান ছন্দে লিখে রাখল এই পথ। এই পথে একজন পথের মানুষ ছিল, পথ যায় ঘর। মাথায় বড় বড় চুল, এলোমেলো গোঁফদাড়ি, জ্বলজ্বলে দুটি কোটরগত অমায়িক আমুদে চোখ—হোক সে মাতাল, সবার বড়ো আপনজন। কাছের মানুষ। রূপপুর থেকে পুশুলিয়া আজ স্তব্ধ হতবাক—চোখ থেকে জল মুছছে হাতের চেটোয়। আজ এ পথে যে বাতাস বইছে, শিরিস বট অর্জুন আকাশিয়া গাছের পাতায় পাতায় যে কম্পন উঠেছে—তা প্রাণের মানুষটির জন্যে দীর্ঘশ্বাস আর প্রবহমান শোক।

গাছের ছায়ায় বসে গ্রামবুড়োরা বলাবলি করছে—কী ছিল এই রাস্তাটা, কী হল! কাঁচা মাটির এবড়োখেবড়া গোগাড়ি চলা জেলাবোর্ডের রাস্তা। বর্ষায় হাঁটু অব্দি পাক জমে উঠত। তখন গাড়োয়ানদের সে কী কষ্ট, সে কী লাঞ্ছনা! চাকায় কাঁধ লাগিয়ে চ্যাচায় সবাই। গাঁশুদ্ধ ঘুম ভেঙে যায় রাত-দুপুরে। তারপর খোওয়া পড়ল, পীচ পড়ল। বাস চলতে লাগল। তবু যেন মন ভরে না। কী যেন খুঁত থেকে গেল, কী যেন নেই। তারপর এল একটা মজার ছোটখাটো সবুজ রঙের গাড়ি। এল এক তেমনি মজার ডেরাইভার। বাঃ রে বাঃ! লাগ ভেলকি লেগে যা দিনেরেতে প্রহরে-প্রহরে। সব খুঁত ঢেকে গেল। রূপপুরের অপরূপ পথরূপসী যেন দূর মৌরী নদীর ঘাটে জলকে যাচ্ছে বেলায়-বেলায়। প্যাঁক প্যাঁক ভঁক ভঁক 'ভ্যাংগাড়ি'র ভেঁপু বাজে। বুকের মধ্যেটা চনমন করে ওঠে। ওই শব্দ শুনে সময়ের হিসেব করে ক্ষেত-মজুর, রোডকুলিরা আন্দাবাজ গেঁয়ো মানুষ। ওই শব্দে কান খাড়া করে চার-দেয়ালের ভিতর গেরস্থগিন্নি। কাঠকুড়োনি ঘুঁটেকুড়ুনিরা আকাশে তাকায়—সূর্য দেখে। এই লোকটা ছিল যেন গ্রামজীবনের চমৎকার একটা ঘণ্টাঘড়ি।

সেই ঘণ্টাঘড়িটা চিরকালের মতো বিকল হয়ে গেল যেন।

...তবে কথা কী, মানুষের সব সয়। আবার হবে, ভাবতে নেই—আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। কোন না কোন ভাবে বিধাতাপুরুষ ঠিক করে নেবেন সব।

রূপপুর ফরেস্ট বাংলোর কাছে মেলার ভিড় জমেছে। কতদূর গ্রাম-গ্রামান্তে খবর চলে গেছে এরই মধ্যে। চারদিকে ভালো রাস্তাঘাট। সব সময় বাস রিকসো লরী টেম্পো চলছে। খবর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। কাতারে কাতারে লোকেরা এসে ভিড় করছে। সবার চোখে-মুখে ব্যাকুল প্রশ্নঃ কেন আত্মঘাতী হল? কেনই বা গাড়িটাকেও নিয়ে গেল সঙ্গে?

হ্যাঁ—নিজে একা যায় নি। প্রিয় গাড়িটাও নিয়ে পালিয়েছে ছোটবাবুর কাছ থেকে। রাস্তার ওপর একটা কালো পোড়া টাট কংকালের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। চাকা পোড়ার কুচ্ছিত গন্ধে ভরা চারদিক। এখনও ধুঁয়োচ্ছে গাড়িটা। পুলিশ এসে গেছে। লাসটা নামানো হয়েছে উঁচু ডাল থেকে। মাটিতে শুয়ে আছে ব্রজর লাস—ওপরে একটা চাদর ঢাকা দেওয়া হয়েছে। কান্দী থেকে এ্যাম্বুলান্স গাড়ি আসার অপেক্ষা শুধু। হকসায়েব এসে যথারীতি ভিড় সামলাচ্ছেন। সবার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন।

একটু তফাতে পার্কের কাছে অর্জুন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছে ব্রজ ড্রাইভারের 'মালিক' বুপপুর পুশুলিয়া রুটের ছোটবাবু। পায়ের কাছে হৃদয় ঠাকুর বসে আছে করুণ মুখে। পরনে হাফ প্যান্ট গায়ে চিত্রবিচিত্র হাওয়াই শার্ট, পায়ে কেডস জুতো- কাঁধে কন্ডাক্টারি ব্যাগ। অনবরত নাক মুছছে। গাঁজাখোর হৃদয়-ঠাকুর আজ আর ছিলিম টানবে না—অন্তত একটা দিন।...

রাধা এসে ডাকছিল, ছোটবাবু!

চন্দন মুখ তুলে তাকাল।

দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভেবে আর কী হবে? আসুন, চানখাওয়া করবেন। হতভাগার ইচ্ছে হয়েছিল—গেল। আপনি ভেবে কী করবেন, বলুন?

চন্দন বলল, হৃদয়--তুমি ওখানে গিয়ে থাকো। আমাকে দরকার হলে ডেকো। আমি যাচ্ছি।

হাইওয়েতে হাঁটছিল দুজনে। রাধা হঠাৎ বলল, একটু আগে পরেশবাবুর শালী এসে জিগ্যেসপত্তর করছিল।

চন্দন অন্যমনস্কভাবে বলল, কে—রুমা?

আজ্ঞে হ্যাঁ ছোটবাবু। রাধা যেন হাসল একটু। বলল, পাম্পে এসেছিল দিদির কাছে। ফেরার পথে এল। বললে, কী হয়েছিল—কেন ব্রজ ড্রাইভার মল। যেন আমি সব জেনে ঢেকে রেখেছি লোকের কাছে।

চন্দন কোন কথা বলল না আর।

রাধা বলল, ওদিকে আমার বাবা—হকসায়েব এক কান্ড করেছেন। সোনাডাঙায় হাসির দিদির কাছে লোক পাঠিয়েছিলেন। হাসি নাকি দুমকায় রয়েছে। পাগল, না মাথাখারাপ! সেখানেও লোক পাঠালেন। ও আসবার মেয়ে হলে ঠিকই আসত। হাজার হলেও সোয়ামী—তার ওপর প্রেম করে বেজাতে জাত দিয়েছিল, টনক নড়বে না? আপনি জেনে রাখুন, ও মেয়ে কক্ষনো আর এমুখো হচ্ছে না.....কণ্ঠস্বর চাপা করে রাধা আরও বলল, সেদিন নগেন ড্রাইভার রামপুরহাট হয়ে দুমকা গিয়েছিল। ওর মুখের কথা বিশ্বাস করা কঠিন। বললে, বেজোর বউর সঙ্গে দেখা হয়েছিল নাকি! আপনার কথা জিগ্যেস করেছিল। নগেন আপনাকে বলবে বলেছিল। বলে নি?

চন্দন বলল, না।

হয়তো সাহস পায়নি বলতে। হাসি ওখানের হাসপাতালে চাকরী পেয়েছে বললে। সত্যিমিথ্যে কে জানে বাপু! নগেনের একশো কথায় নিরানব্বুইটা ফালতু।...রাধা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল।. .অ সন্ধে, অ পোড়ামুখি! যাঃ, দিলে—

দিলে আচারগুলোয় হেগে। তখন বললুম খোলা ছাদে রাখিসনে—নিচে বারান্দায় দিব্যি রোদ পড়বে। ধুর, ধুর! যাঃ!

কাক তাড়াতে তাড়াতে দৌড়ল রাধা। চন্দন থমকে দাঁড়াল। চান-খাওয়ার জন্যে রাধার সঙ্গে সে আসেনি। কিছুক্ষণের জন্যে একলা হতে চেয়েছিল—একটা নির্জন ঘরে। পাণ্ডেজীর ওখানেই যাওয়া যাক বরং।

সে হাঁটতে লাগল। পিছনে রাধা ডাকছিল তাকে—ও ছোটবাবু! আবার ওদিকে কোথায় চললেন?

আসছি, বলে চন্দন হনহন করে হাইওয়ে ধরে এগোল। 'স্যাঙ্গুভ্যালি'র সামনে দিয়ে যাবার সময় সীতাংশুবাবু বেরিয়ে এল। চন্দন ফের আসছি বলে চলতে থাকল। পাণ্ডেজী গদীর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বস্তায় খন্দ ওজন হচ্ছে। চন্দনকে দেখে এগিয়ে এলেন।...আরে আসুন! সব শুনলাম। একবার যাব ভাবলাম—কিন্তু এই দেখেছেন ঝামেলা!,

চন্দন বলল, আপনার ওপরের ঘরটা খোলা আছে? একটু বিশ্রাম করব।

আটাশ

লতু ভীতু মুখে খড়ি খড়ি শুকনো চেহারায় যেভাবে বেরোল, রুমার বুক ঢিপ ঢিপ করে উঠল। চাপা গলায় বলল সে, আছে? কী বলল? আসছে?

লতু ফিসফিস করল।...আমার ভয় করছে! তুমি যাও, মাসি।

ভেংচি কেটে রুমা বলল, তিমি গ্যাও ম্যাছি। তোকে পাঠালুম কেন তাহলে?

আমি তো গেলুম! উঁকি মেরে দেখি—ওরে বাবা! সন্নেসীর মতো বসে আছে! কী লাল কটমটে চোখ মাসি!...লতু কাঁচুমাচু হয়ে বলল।...তুমি গিয়ে কথা বলো না! আমার ভয় করছে যে।

রুমা বলল, হ্যাঁ রে, গায়ে সাপটাপ জড়ানো আছে দেখলি?

এবার লতু মাসির অজ্ঞতায় ফিক করে হেসে ফেলল।...যাঃ! গায়ে সাপ থাকে নাকি? কিচ্ছু নেই। স্পষ্ট দেখলুম—তোমার দিব্যি!

রুমা সেই রাত্রিবেলা থেকে সন্দিগ্ধ হয়ে পড়েছে পৃথিবী সম্পর্কেই। সব সময় মনে হচ্ছে আশে-পাশে কোথাও সাপ লুকিয়ে রয়েছে। নিজের অজান্তে ছুঁয়ে ফেললেই ফোঁস করবে। অবশ্য তা করুক। কিন্তু নির্ঘাৎ পায়ে জড়িয়ে যাবে যে! ইস মাগো! হিলহিলে নরম কী জ্যান্ত প্রাণী।...গায়ের রক্ত হিম হয়ে যায় ভাবতে। রুমা চোখ বুজে ফেলেছে—যদি সত্যি ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে যায় এবং জড়িয়ে ধরে—বাঁচবেই না। পথ চলতে সাবধানে দেখেটেখে পা ফেলেছে সে। সামনে আবার একটা রাত আসছে। তখন কী হবে সেই ভাবনায় সে নিরন্তর অস্থির হয়ে থেকেছে।

যখন ওরা নুটুবাবুর গ্যারেজ ঘরে থাকত, কোন কোন রাতে প্রচণ্ড বৃষ্টিতে এ্যাজবেস্টাস চালের ফাটল চুঁইয়ে জল পড়ত। নিচু মেঝেয় জল ঢুকে যেত। সে অনেক কষ্টের রাত জেগে-জেগে পুইয়ে গেছে। পরেশ তো বাইরে তখন—কোথায় ট্রাক নিয়ে চলে গেছে। স্নেহধারাকে চুপি চুপি কাঁদতেও দেখেছে রুমা। তবু কখনও অসহায় মনে করেনি রুমা। বরং উপভোগ করেছে হেসেছে চুপি চুপি।

আর কালকের রাতটা! কী রাত, কী অদৃশ্য মারাত্মক দুর্যোগের কাল বয়ে গেল! একটা অবিশ্বাস্য ধরনের নতুন অভিজ্ঞতা হয়ে গেল রুমার। আর তো বৃষ্টিতে জল পড়ার ভয় ছিল না, জল ঢোকার সম্ভাবনাও ছিল না খাটের তলায়—শুধুমাত্র একদা সাপ তাদের কী অসহায় আর শঙ্কাক্লিষ্ট করে রাখল, ভাবা যায় না! স্নেহধারা প্রথমে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছিল বটে পরক্ষণে গ্যাঁদার বিকট চ্যাচানি—দিদি করছ কী, করছ কী, সাপ আছে—সাপ শুনেই সে এক লাফে পিছিয়ে এসে একেবারে তক্তপোষে রুমাদের কাছে হাজির! তারপর সব্বাইকে প্রচণ্ড গালমন্দ। 'সাপ' শব্দটার বাস্তবতা ততক্ষণে টের পেয়ে গিয়েছিল স্নেহধারা।

এমন রাত সত্যি তাদের জীবনে আসে নি। বসবার ঘরে ছোট্ট খাটের ওপর গাদাগাদি লতু সন্তু-মান্তুরা ঘুমোচ্ছে। রুমা টেবিলে বসে ঢুলছে। স্নেহধারা লতুদের মাঝখানে জটাবুড়ির মতো বসে আছে। কেবল গ্যাঁদা রান্নাঘরের সামনে খাটিয়ায় নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। তোরাপ সাপটা খুঁজে দেখতে চেয়েছিল—কিন্তু তা কী করে হয়? ঠাকুর ঘরে তাকে ঢুকতে দেওয়া যায় না। তোরাপ অবশ্য রাতটা থাকতেও চেয়েছিল, সেও হয় না। পাম্পে হীরুবাবু একলা কী ভাবে থাকবে। তাছাড়া যা দিনকাল পড়েছে, পাম্পে তোরাপের থাকাটা জরুরী। সে বলে গিয়েছিল—নির্ভাবনায় ঘুমোন আপনারা। ও কারো ক্ষতি করতে ঢোকে নি। তাই যদি মতলব থাকবে তাহলে দেখা দেবে কেন?

তা বললে কি মন মানে? অন্য কিছু নয়, সাপ। গভীরে যার থাকা—চোখের আড়ালে যার অবস্থান—অদৃশ্য পিছনের আততায়ীর মতো যার গতি-বিধি! সত্যি বলতে কী, রুমার খুব অবাক লেগেছে। পৃথিবী সম্পর্কে ধারণা বদলে দিয়েছে যেন এই বৃষ্টিসন্ধ্যার আগন্তুক প্রাণীটি। এ রাতের অসহায়তা পুরো ফ্যামিলির যৌথ অসহায়তা—তবু রুমা এই প্রথম নিজেরটা ভাগ করে নিয়ে আলাদা ভেবেছে—আলাদাভাবে অস্থির আর উত্যক্ত হয়েছে। কী চমৎকার ছিল এতদিন এই সুরম্য পৃথিবী এবং নিশ্চিন্ত জীবনধারণ জীবনযাপন। একটা রাতেই সব ভণ্ডুল হয়ে গেছে যেন। নিরন্তর সঞ্চরমান, চুপি চুপি আসা, গভীরের ঘৃণা আর হিংস্র একটা সরীসৃপ—সারাক্ষণ রুমাকে শান্ত থাকতে দিচ্ছে না আর।

আলতারাণী মনোহারিওয়ালীর স্বামী রুস্তম ফকির এ অঞ্চলের সেরা সর্প-তত্ত্ববিদ। সে বেদে নয়, সম্ভ্রান্ত ফকিরকুলের মানুষ। সৌখিন সাপুড়ে সে। সুযোগ পেলে সাপ ধরে বিষ সংগ্রহ করে বেচে আসে কান্দী শহরে। সেখানে কানাই কবরেজ মশাই তার খদ্দের। তোরাপ তার কথা বলে গিয়েছিল। সকালে কয়েক দফা লোক পাঠিয়েছিল স্নেহধারা। রুস্তম তখন ব্রজ ড্রাইভারের লাস দেখতে গেছে। পাত্তা দেয় নি। সহজে ধরা দেয় না রুস্তম। পাগলাটে চরিত্র, সব সময় গাঁজায় ঝিম মেরে থাকে। স্বয়ং তোরাপকেও সে গ্রাহ্য করে না।

তখন স্নেহধারা নিজে গিয়েছিল। পীরের দীঘির মাজারের লাগোয়া রুস্তম ফকিরের বাড়ি। একতলা ইঁটের বাড়ি। কত কালের পুরনো তা এলাকার বুড়োরাও বলতে পারে না। হকসায়েবের মতে কয়েক শো বছরের। মুরশিদাবাদে তখন দেশের রাজধানী। নবাব আলীবর্দীর টাকায় রূপপুর চটির পীরের মাজার হয়েছিল। হকসায়েব এই সব গল্প নিয়েই তো আছেন!

স্নেহধারা দেখেছিল রুস্তমের বাড়ি ফাঁকা। দরজায় তালা ঝুলছে। তারপর হীরুবাবু গেল রুস্তমের বউ আলতারাণীর দোকানে। হাইওয়ের ধারে থাকে সে। একা থাকে। কখনও ইচ্ছে হলে স্বামীর কাছে কোন-কোন রাত কাটিয়ে আসে নাকি, কখনও রুস্তম ফকিরও নাকি বউর কাছে এসে রাত কাটিয়ে যায়। তেঁতো মুখে আলতা বলেছিল, দোকান ফেলে কেমন করে যাই বলুন বাবু? আর গেলেও কি মিনসে আমার কথা শুনবে ভাবছেন?

হীরুবাবু বলেছিল, শুনবে, শুনবে। তুমি একবার যাও মা। ওনাদের বড্ড বিপদ।

আলতা হেসেছিল।...ঘরে সাপ ঢুকেছে, তাই বিপদ? কখন বেরিয়ে গেছে, দেখুন গে। ওই সামান্য জিনিসের জন্যে দেখছি রূপপুর মাথায় করছেন ওনারা! সাপ যেন কারো ঘরে ঢোকে না।

হীরুবাবুর রাগ হয়েছিল।...তোমরা সাপ নিয়ে ঘর করো। তোমাদের কথা আলাদা।

আলতা পলকে বদলে গিয়েছিল।...সাপ নিয়ে ঘর করবার দায় পড়েছে আমার! আমি কি বেদে, না সাপধরাদের মেয়ে, বাবু? যে সখের সাপ নিয়ে কারবার করে, যান না তার কাছে! উদিকে বেজোগোপালকে নিয়ে রূপপুর হুলুস্থুলুস হচ্ছে, অমন একটা কাণ্ড—আর এনারা দৌড়চ্ছে একটা তুচ্ছ সাপ নিয়ে। আমার সময় নেই অত!

কী বদমাস এই মেয়েটা! হীরুবাবু রেগে চলে এসেছিল। আজ যদি পরেশ মজুমদার বেঁচে থাকত, তাহলে দেখা যেত এই আলতারাণী কী করে!...হাইওয়েতে দাঁড়িয়ে এতদিনে মজুমদারবাবুর জন্যে মন কেমন করে উঠেছিল হীরুবাবুর। দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল সে। হ্যাঁ...ব্রজগোপাল ড্রাইভার একটা সাংঘাতিক কাণ্ড করেছে বটে। সেও ভাববার কথা নিশ্চয়। চাঁদুবাবুর গাড়িটাও পুড়ে গেছে। এও ভাববার কথা। স্পষ্ট বোঝা গেল, পাপের পয়সা কারো-কারো হজম হয় না। পরেশের হয়েছিল, চাঁদুবাবুর হল না। চাঁদুবাবু বাটপাড়ি করে ছিল—তাই হয়তো হল না। শোনা যাচ্ছে জিযাগঞ্জে গঙ্গার ধারে একটা বাড়িও নাকি কিনেছে চাঁদুবাবু। সেও কি টিকবে? সামনে বর্ষায় নির্ঘাৎ মা গঙ্গা গিলে না নিয়ে ছাড়বেন না। বেচারা চাঁদুবাবু!...

ইতিমধ্যে ব্রজর লাসের ওদিক থেকে ফরিদ খবর নিয়ে এসেছিল, রুস্তম এখনও ওখানে রয়েছে: আসতে চাইছে না। বলছে, বেজোকে ছেড়ে যাব কোথায়? সুখের দিনের দোস্ত—তার দুঃখের দিনে রুস্তম ফকির যাবে কোথায় কার বাড়ী সাপ ঢুঁড়তে? যা ব্যাটা, ভাগ্ ভাগ্!

স্নেহধারা তাই বলে ব্রজর লাসের ত্রিসীমানায় যেতে পারব না। ছিঃ, ওসব দেখা তো দূরের কথা। ভাবলেও পাপ হয়। আত্মহত্যা পাপ বটে, কিন্তু স্নেহধারা টের পেয়েছে—এ তো ব্রজর আত্মহত্যা নয়, হত্যা। চাঁদুটা ব্রজকে এমনি করে খুন করে ফেলল" তারপর? এবার কী করবে চাঁদু? গাড়ীখানাও তো সঙ্গে নিয়ে গেল চালক ব্রজ ড্রাইভার—এবার কী হবে?

আবার খবর এল রুস্তমের। হ্যাঁ—এবার সে বাড়ি ফিরেছে। স্নেহধারা বাড়ি গিয়ে খেয়ে এসেছে ততক্ষণে। গুমোট গরম নিয়ে বিকেল নেমেছে। আজও

আবার ঝড়জল হতে পারে মনে হচ্ছে। তোরাপকে রুস্তমের বাড়ি পাঠিয়েছিল স্নেহধারা। তোরাপ ফিরে এসে বলল, শালা আমাকে দেখলেই কেন ক্ষেপে যায়, জানি না মা! বাপ তুলে গালাগালি করল। কী বলব? পীরের খাদিম (সেবক), তার ওপর অল্পসল্প দোস্তালিও আছে—হাসি মুখে সইলুম। আর কেউ হলে, তার মড়োটা তক্ষুনি মুচড়ে দিতুম।

স্নেহধারা করুণ মুখে বলেছিল, আর কোথায় বেদে বা সাপুড়ে আছে—সেখানেই যাও তোরাপ। ওর আশা ছেড়ে দাও।

বেদে—সে কাছাকাছির মধ্যে তো ঝাঁপুইহাটিতে। আর আছে হাটপাড়া চন্ডীতলায়...তোরাপ আকাশ দেখে বলেছিল।...ইদিকে ঝড়পানির দিন। ফিরতে রাত হয়ে যাবে। রাতে তো কাজ হবে না। সেই কাল সকাল ছাড়া আর উপায় নেই, মা।

সেই হবে। অরেকটা রাত তো।.. স্নেহধারা উদ্বিগ্ন মুখে বলেছিল।.. কোন রকমে কাটিয়ে দেব আগের রাতের মতো। কথায় বলে, বাঘের দেখা সাপের লেখা। কপালে লেখা থাকলে খণ্ডায় কার সাধ্য! তুমি তাই করো, তোরাপ। ফরিদই যাক বরং। বাসে যাওয়া যায়?

সেই সময় হঠাৎ চমকে উঠেছিল স্নেহধারা। রুমা লতুকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে? দেখছ কান্ড! বাড়িতে সন্তুরা আছে—গ্যাঁদা তো নাবালক বলতে গেলে—ঘরে সাপ, আর মেয়ে দিব্যি বেরিয়ে পড়েছে! এত বয়স হল, এখনও ওর ছেলেমি গেল না। কী বলবে স্নেহধারা- লতুর বাবা যে আস্কারা দিয়ে নাই বাড়িয়ে দিয়ে গেছে। তার ওপর, সেই বদমাস শত্তুরটা- চাঁদু, সারা ছেলেবেলা মাথায় তুলে নাচিয়ে ছেলেবেলাতেই রুমার মগজটি খেয়ে ফেলেছে। আর ও মানুষ হয়?

কাল সন্ধ্যায় অমিতকে ঝড়জলের মধ্যে নির্বিকার মুখে বাড়ি ফিরে যেতে বলেছিল রুমা। প্রথমে লতুর মুখে, পরে গ্যাঁদার কাছে খুঁটিয়ে শুনেছিল স্নেহধারা। সাপটার জন্যে ব্যাপারটা তলিয়ে ভাবে নি—শুধু মনে হয়েছিল, রুমা খুব অন্যায় করেছে। এখন রুমাকে যেতে দেখে স্নেহধারার সবটা চকিতে মনে পড়ে গেছে। অমিত তাই আজ এলই না। সাপের খবর শুনেও এল না!

স্নেহ ধারা রেগে গিয়েছিল।...ফরিদ, লতুদের ডাক তো বাবা!

ফরিদ ফিরে এসে বলল, আসবে না বলছে। ব্রজর মড়া দেখতে যাচ্ছে। তারপর..

এ্যাঁ!...আঁতকে উঠেছিল স্নেহধারা।...কী আক্কেল দেখছ মেয়ের? তোরাপ, হীরুদা, ডাকুন তো ওদের! ছি, ছি, ছি!

ফরিদ হেসে বলল, যাক্ না। মড়া নামিয়ে নিয়ে কান্দী চলে গেছে কখন। কাটাকুটি করতে নিয়ে গেছে। গাছতলা ফাঁকা। পোড়া গাড়িটাও পুলিশ কোথায় নিয়ে গেছে কে জানে।

হীরুবাবু বলল, শঙ্করা বলছিল—সন্ধেবেলা বেজার লাস ফিরে আসবে। তখন মিছিল করে ওরা নাকি বহরমপুর ঘাটে বেজাকে পোড়াতে যাবে। এখানকার ড্রাইভারগুলো খুব রেগে গেছে চাঁদুবাবুর ওপর—শঙ্করাই বলল। চাঁদুবাবু এবার মরবে'

স্নেহধারা ধমকে উঠল, ও কেচ্ছা আমার শুনে কী হবে! রাখুন তো

হীরুদা। আমার মাথায় এখন সাপের ভাবনা—কে মল, কে মরবে, আমার ভাববার সময় নেই।

রুমা লতুর হাত ধরে ক্রমশ আবছা হয়ে উঠল চোখের ওপর। অসহায় আক্রোশে স্নেহধারা নিঃশব্দে ঠোঁট কামড়ে দেখতে থাকল। লতুটাকেও ও শেষ করে ফেলবে।

হীরুবাবু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, না—মানে বলছিলুম—চাঁদুবাবুর মার প্রাপ্য বুঝলেন দিদি? মারুক, মারুক চাঁদা করে চাঁদুবাবুকে। চেনে না তো রূপপুর কী জায়গা!...অপ্রস্তুত ভাবটা এই মন্তব্য আর হাসিতে কাটিয়ে ফেলল হীরু-বাবু। খুব হাসতে লাগল সে।

তোরাপ বলল, তাহলে ফরিদ ঝাঁপুইহাটি যাক। ও ফরিদ!

ফরিদ বলল, আমার কথাটা শেষ করতেই দিলে না কেউ। লতুদিরা ব্রজর মড়া দেখে তারপর রুস্তমের বাড়ি যাবে বলল। রুমামাসি বলল, তোরা কেউ তো পারিস নি, দ্যাখ, আমি রুস্তমকে নিয়ে আসব। রুস্তমের সঙ্গে মাসির নাকি খুব ভাব আছে।

স্নেহধারা ঝাঁঝাল স্বরে বলল, রাজ্যের লোকের সঙ্গে ওর ভাব আছে! কী আপদ না ঘাড়ে জুটেছিল আমার! ফরিদ, ওর কথা ছেড়ে দে, বাবা। তুই যা ঝাঁপুইহাটি—এই নে বাসভাড়া। তোরাপ, এক টাকায় যাওয়া আসা হবে না?

ফরিদ বলল, আমার যেতে আপত্তি নেই। তবে বলছিলুম কী একটুখানি দেখে গেলে ক্ষতি কী? আর আমি গেলে 'সারবিস' দেবে কে গাড়িফাড়ি এলে? বরং—

স্নেহধারা কড়া মুখে বলল, তুই চোরের সাক্ষী মাতাল। ও বলল, আর বিশ্বাস করতে হবে? রুস্তম ফকিরকে দেখেই নি চোখে।

তোরাপ একটু কেসে বলল, তবে কথাটা কী জানেন মা? ঝাঁপুইহাটির রমজান বেদে বলুন, আর হাটপাড়া চণ্ডীতলার ইয়াকুবই বলুন—রুস্তম শা (শাহ্ —খানদানী ঘরানার ফকিররা নিজেদের নামের সঙ্গে শাহ্ পদবী ব্যবহার করে সবার ওস্তাদ। হাত চালায় না, তন্তুরমন্তর পড়ে না—গিয়ে ঠিক জায়গায় খোঁচা মারে, অমনি বেরিয়ে আসে চক্কর তুলে। আর সাপ যদি ঘরে না থাকে, বাতাস শুঁকে রুস্তম শা বলে দেয়—নেই। ইদিকে ইয়াকুব বা রমজানের বিস্তর বায়না। আতপ চাল চাই, পাকাকলা চাই, দুধ চাই—হেন চাই তেন চাই, কাজের বেলা অষ্টরম্ভাটি। রমজান শালা তো চোর—কোমরে সাপ নিয়ে ঘরে ঢোকে। ওদের বিশ্বাস করা কঠিন। রুস্তম হলে চোখ বুজে বিশ্বাস করতে পারেন। ও একটা যাদুগীর মা —ওর দেহে পীরসায়েবের বাস যে! ফি রোববার ভর ওঠে—তখন গিয়ে দেখবেন। কী আজব কাণ্ড করে। সে মানুষ আর থাকে না, মা।—

হ্যাঁ এই রুস্তমের সম্পর্কে এখানে বিচিত্র আর আশ্চর্য গল্প চালু আছে। স্নেহধারা জানে। এবং রুমাও শুনেছিল।

তাই রুমা মরিয়া হয়ে বেরিয়ে পড়েছিল রুস্তমের বাড়ি যাবে বলে। পথে এসে হঠাৎ খেয়াল হয়েছিল, ব্রজর লাসটা দেখে যাবে। সারা রূপপুর তোলপাড় হচ্ছে সকাল থেকে। শুধু ওরাই যায় নি—ওরাই সে-তোলপাড়ে কান দেয় নি।

মন দেয় নি। এই একটি পরিবার কেবল সাপের কথাই ভেবেছে। তাই নিয়ে ব্যস্তভাবে ছোটাছুটি করেছে।

ফকিরদের কাছে লাসটার খবর শুনে আর সেদিকে এগোয় নি রুমা। পীরের দীঘির কাছে গিয়ে বাঁদিকে মোড় নিয়েছিল। পূর্বপাড়ে মেলা বসে। সেদিকটা এখন ফাঁকা ধু ধু। বাঁজাডাঙার মতো চটান জায়গা। কয়েকটা তালগাছ দাঁড়িয়ে আছে শুধু। বাকি তিন পাড়ে ঘন জঙ্গল। সরকারী উদ্যোগে জঙ্গলটা আরো বাড়ানো ও ছড়ানো হয়েছে। একটু গিয়েই দুধারে আগোছাল গাছপালা ঝোপ-ঝাড় ইঁটের টুকরো ছড়ানো। এক সময় কিছু বাড়ি ছিল সম্ভবত। একটা ভাঙা মসজিদও রয়েছে। রুস্তমের বাড়িটা পীরের থান আর কবরের পাশেই। সেখান থেকে সিঁড়ি নেমে গেছে ঘাটে। কতকালের এই সিঁড়িটা। চওড়া পাথরের ধাপ। শ্যাওলা আর ঝোপ গজিয়েছে জোড়ের মুখে। নিচে বিশাল দীঘিটা মজে চারপাশে। জলের রঙ কালচে—স্বচ্ছ। দাম আর শ্বেত পদ্মে ভরা। পান-কৌড়ি দলাপিঁপি আর বালিহাঁস চরছে সেখানে। নির্জনতা ছমছম করছে চার-পাশে। এখন বিকেল। গাছপালার ছায়া ফেলেছে দীর্ঘতর। থমথম করছে চারদিক—বাতাস নেই, পাখির ডাক ছাড়া কোন শব্দ নেই। গুমোট গরম। ইঁটের স্তূপ দু পাশে সরিয়ে রুস্তমের বাড়ির দরজায় পৌঁছনোর পথ করা হয়েছে। স্তূপের ওপর আগাছার জঙ্গল। রুমা সারাক্ষণ চমকে উঠেছিল। একেবারে সাপের আস্তানায় ঢুকেছে যে! অনবরত সে উদ্বিগ্ন মুখে গায়ের কাছটা লক্ষ্য করছিল। লোকটাকে শিগগির কোন রকমে ধরে নিয়ে যেতে পারলে বেঁচে যায়।

আর এই ভীতি-অস্বস্তি শিহরণের মধ্যে সে স্পষ্ট টের পাচ্ছিল, সত্যি তার বয়স খুব একটা বাড়ে নি। তার মধ্যে প্রকৃতই এক বালিকা এখনও বাস করছে। বরাবরই সে বাস করছিল, এতক্ষণে সেই সাপ আর এই দুর্গম দুর্বোধ্য পরিবেশ এবং রুস্তম ফকির নামক এক কিংবদন্তীর মায়াবী মানুষ মিলে চারদিক থেকে জোরাল আলো ফেলে সেই কোটরগত ভীতু অসহায় বালিকাটিকে খুঁজে বের করেছে। রুমাও অবাক হয়ে তাকে দেখছে। এর সঙ্গে জিয়াগঞ্জ শহরের সেই মেয়েটির আশ্চর্য মিল! মিল কেন—এ তো আসলে সেই!...

ভাঙা দরজার সামনে কয়েক মুহূর্ত এক গভীরতর বোধে তলিয়ে গিয়েছিল রুমা। বড় অস্পষ্ট সেই বোধ। এই ধ্বংসস্তূপ, উদ্ভিদের আগ্রাসী বন্যা, সন্তর্পণে স্পন্দনহীন চিত্র-বিচিত্র সুন্দর একটা সাপ—প্রকৃতির এই সব খেলা—আর খুব কাছে দাঁড়িয়ে আছে এক উদাসীন শক্তিধর ফকির! কোথায় চলে এসেছে না জেনে রুমা?

চরম মুহূর্তে সে লতুকেই ঠেলেঠলে পাঠিয়েছিল। নিজের অস্বস্তি লাগছিল যেতে। পৃথিবীতে এখনও প্রচুর দুর্বোধ্য দুর্গমতা আছে, যা হঠাৎ-হঠাৎ কারো-কারো চোখে পড়ে যায়। একদা গঙ্গাতীরের এক ছোট শহরে জলের ধারে, কিংবা অজস্র ঐতিহাসিক নবাবী আমলের ধ্বংসস্তূপের কাছে দাঁড়িয়ে বালিকা রুমা তা টের পেত। হাইওয়ে, স্কুল-কলেজ, শিক্ষা-দীক্ষা, ঘড়বাড়ি, জীবনধারণ জীবন-যাত্রা পোশাক-আশাক, গান-বাজনা—সব কিছুর তলায় তলায় কী একটা আছে। কিছু আছে। সাপের মতো প্রচ্ছন্ন আর নিঃশব্দে সঞ্চরমান কোন সুন্দর ভয়ঙ্কর। ...চরাচরব্যাপী জীবজগৎকে মাঝে মাঝে সে যন্ত্রণায় নীল করে ফেলতে পারে।

রুস্তম ফকির সেই নেপথ্য জগতের মানুষ কি? সেই রকম একটা বিশ্বাস তার কাছে প্রকৃতির অন্ধকার ঘর সুগম হয়তো। লতু ফিরে আসার পর ডাইনে স্তূপের ওপর একটা অচেনা বুনো ফুলে বসে থাকা প্রজাপতিটা দেখছিল রুমা। সেটা উড়ে গেলে দুরুদুরু বুকে সে বাড়ি ঢুকল। লতুর একটা হাত ছাড়ল না অবশ্য।

উঠোনটায় পাথর বসানো। জোড়ের মুখে শুকনো ঘাস রয়েছে। ফাটলধরা একটা দু'কামরা ঘর সামনে। বারান্দায় চটের ওপর একটা অদ্ভুত লোক বসে রয়েছে। ছালছাড়ানো শুকনো গাছের মতো ফরসা আর কেমন খটখটে গায়ের চামড়া তার। মাথায় ঝাকড়া চুল—একটু লালচে। অল্পস্বল্প কয়েকটা জটা আছে। পাতলা গোঁফ দাড়ি। গলায় একটা মোটা দানাওলা পাথরের মালা ঝুলছে। হাতে তামার মোটা বালা। খালি গায়ে বসে আছে। পরনে লুঙ্গি-মতো। চোখ দুটো বোজা। একটু একটু দুলছে।

কিন্তু কী সুন্দর চেহারা লোকটার! রুমার মনে পড়ল বাজারের সেই মনোহারিওয়ালি মেয়েটি এরই বউ। বউটিও এমনি সুন্দর ফুটফটে গায়ের রঙ। সেজন্যেই নাকি ওর নাম আলতা। পাণ্ডেজী ওকে কী ভাবে ঝড়ের রাতে পেয়ে মানুষ করেছিলেন, সে গল্পও রুমা শুনেছে। এই পাগলা ফকিরটার সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে নাকি পাণ্ডেজীই খুব ধুমধাম করে দিয়েছিলেন।

লম্বা সুন্দর নাক, কপালে ত্রিশূলরেখা—এই রুস্তম ফকিরকে কয়েক মুহূর্ত অবাক চোখে দেখল রুমা। চোখ বুজে আছে—অথচ ঠোঁটে একটা হাসির মতো ভাব লেগে রয়েছে। সিদ্ধপুরুষ না হয়ে যায় না। একবার গঙ্গার ধারে, জিয়া-গঞ্জের বামুনঘাটের ওপর যে বটগাছটা রয়েছে তার তলায় এমনি এক সাধু এসে বসেছিল। সে মুখ খুললে নাকি মাণিক ঝরে। তাই খুলত না—ফলে বেচারার কথা বলাও হত না। ভারি বিপদের কথা নয়? অবশ্য সব গল্প তো চাঁদুদার। চাঁদুদা নাকি.. ভ্যাট! কী ভাবছে সে।

লতু মাসির পাঁজরে খুঁচিয়ে দিতেই মাসির চমক ভাঙল। ফিসফিস করে বলল, লতু, ডাক না!

তুমি ডাকো মাসি।

রুমা চাপা ভেংচি কাটল। ..তিমি গ্যাকো মাছি!...পরক্ষণে হেসে ফেলল সে। কেন কে জানে হঠাৎ হাসি পেল তার। হয়তো নিজের এই সন্ত্রস্ত তোলপাড় ভাবটা লক্ষ্য করেই সে হাসল।

কেন কে জানে হঠাৎ হাসি পেল ভার। হয়তো নিজের এই সন্ত্রস্ত তোলপাড় ভাবটা লক্ষ্য করেই হে হাসল।

এবং হয়তো হাসি শুনতে পেয়েই রুস্তম ফকির চোখ খুলল। কী লাল কটমটে চোখ! এই নির্জন বাড়ি—বসতি থেকে এত দূরে স্তব্ধ ছমছমে বিকেলের বনঝোপ, আলো কমে আসছে, দ্রুত, পিছনে পীরের কবর, আর সাপ নিয়ে দিন রাত যার কেটে যায় সেই রকম একটা রহস্যময় লোক—রুমা তার সব স্মার্টনেস হারিয়ে ফেলল। তার শিক্ষাদীক্ষা আত্মসচেতনতা, তার বয়স, অহঙ্কার, মজুমদার মশায়ের শালাত্ব, সব—সব কিছু হারিয়ে পুরো অবোধ বালিকা হয়ে উঠল। চঞ্চল চোখে সে তাকিয়ে রইল লোকটার দিকে। গলা শুকিয়ে গেল রুমার। বুক টিপটিপ করতে থাকল।

রুস্তম হাসছে। দুলতে দুলতে মিটিমিটি হাসছে এবার।

হঠাৎ লতু দু'পা বাড়িয়ে বলে উঠল, ওগো ফকিরবাবা, আমাদের ঘরে সাপ ঢুকেছে। তুমি শিগগির এসো—শিগগির!

লতুর সাহস আর জড়তাহীন কথাবার্তায় অবাক হয়ে গেল রুমা। আশ্চর্য, লতুটা আশ্চর্য! লতুটা শেষ মুহূর্তে পেরে গেল! আর সে এত বড় ধিঙ্গি মেয়ে হয়ে ভয় পাচ্ছিল এতক্ষণ! রুমা একটু লজ্জা পেল মনে মনে। সে অকারণ কেসে গলা ঝেড়ে তারপর লতুর কথার সঙ্গে আরো কথা জুড়ে দিতে চাইল।... য়্যাঁ, মানে—সাপ। কী সাপ জানিনে। কাল রাতে ঝড়-জলের সময় ঢুকেছে।

রুস্তমের হাঁটুর ফাঁকে কোথায় একটা ছোট্ট কলকে লুকনো ছিল, বের করে সে গম্ভীর গলায় বলল, আজ আমি সাপ ধরব না। আজ বেজো মরেছে। আজ সাপ ধরে? ছি ছি ছি!

লতু সটান কাছে চলে গেল। তোমাকে সারাদিন ডাকছি আমরা। মা এসেছিল একবার। তারপর কতবার লোক পাঠাল।

রুস্তম রুমাকে দেখছিল ভ্রূ কুঁচকে। রুমা চোখ নামিয়ে ফেলেছে। কী যেন আছে লোকটার চোখে। রুস্তম বলল, আজ বেজো মরেছে। আজ রুস্তম সাপ ধরবে না।

লতু বলল, মাসি, তুমি একে বলো না! মাসি যেন কী। কথা বলছ না কেন? এই ফকিরবাবা, আমার মাসিও তোমাকে ডাকতে এসেছে।

রুমা বলল, আমরা ঘরে ঢুকতে পারছিনে কাল থেকে।

লতু ভেংচি কাটল।...ওই বললে কথা শোনে? ফকিরবাবা, তোমাকে টাকা দেবে মা। আমাদের পেট্রোল পাম্প আছে—আমার বাবাকে চেনো না? পরেশ মজুমদার! সেই যে গাড়ি এ্যাকসিডেণ্ট হয়ে মারা গেল।

রুস্তম ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলল, যা যা ভাগ! বেজো মরেছে, সাপ ধরতে নেই।

রুমা এবার রেগে গেছে। দেখ তো, কী হৃদয়হীন লোকটা! এতটুকু মেয়ে এমন করে বলছে, আর ও গ্রাহ্যই করছে না! পাগল, না হাতি! জামাইবাবু থাকলে ঘাড়ে ধরে নিয়ে যেত এতক্ষণ। গাঁজার নেশা কেটে যেত সঙ্গে সঙ্গে। রুমার রাগ এসে রুমাকে সাহস দিল। সে বলল, আশ্চর্য লোক তুমি তো! গেলে পয়সা পাবে—তাও যেতে চাইছ না?

রুস্তম নির্বিকার।...যা, যা, ভাগ বেটিরা। আজ বেজো মরেছে, আজ কি সাপ ধরে?

লতু বলল, বারে! কে মরেছে—তার জন্যে সাপ ধরবে না কেন? ও ফকিরবাবা!

রুমা লতুর হাত ধরে টানল।...চলে আয় তো! একটা আজেবাজে লোকের সঙ্গে- ভ্যাট! চলে আয়। আমরা হাসপাতালে যাই বরং। কারবলিক এ্যাসিডের কথা আমার মনেই ছিল না—বুঝলি লতু? ও দিলে সাপ ত্রিসীমানা মাড়াবে না। খুব মনে পড়ে গেছে এতক্ষণে। আয়, আয়।

লতুর হাত ধরে টেনে রুমা বেরিয়ে এল। পিছনে রুস্তম ফকির ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে হাসছে। যা, যা!...ভাগ! আজকের দিনে এয়েছে সাপের খবর নিয়ে। বেজো মরেছে, আর আমি শালা যাব সাপ ধরতে?

লতু দরজার মুখে ঘুরে রুস্তমকে ভেংচি কেটে দিল। বাইরে বেরিয়ে আবার ভয় পেয়ে গেছে রুমা। এখন মোটামুটি ষাট-সত্তর গজের বেশি জঙ্গলে রাস্তা সামনে—তারপর হাইওয়ে। এই রাস্তাটা নিরাপদে পেরোন যাবে তো? রুমা থমকে দাঁড়িয়েছিল। ডাইনে পীরের মাজার। উঁচু ইঁটের স্তূপ—পাকা চত্বর। অজস্র মাটির ঘোড়া ছড়ান রয়েছে। কয়েকটা কাঁটামাদারের গাছের জটলা আছে। ফুল ফুটেছে লাল। পিছনে বিশাল বটগাছ। ছায়ায় এখন অন্ধকারের ওতপ্রোত ছাপ সবখানে। একটা লোককে আসতে দেখা গেল বটতলার দিক থেকে। চাসা-ভূষো লোক। হাতে একটা নিড়ানি। সম্ভবত দীঘির মজা জায়গায় চাষবাস করে। এখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। রুমা সাহস পেল ওকে দেখে। লোকটা আগে-আগে যাক, তারা দুটিতে পিছনে যাবে—বাস, তাহলেই নিশ্চিন্ত।

লোকটা এদের হাঁ করে দেখল। তারপর বলল, থানে এসেছিলেন নাকি দিদিমণিরা?

লতুর হঠাৎ অসম্ভব জোর এসে গেছে তখন থেকে। বলল, আমরা ফকির-বাবাকে ডাকতে এসেছিলুম। ঘরে সাপ ঢুকেছে।

লোকটা বলল, কী বললে ফকির?

যাবে না।...বলে লতু রুমাকে টানল।...চলো মাসি, হাসপাতালেই যাই।

লোকটা আগে-আগে হাঁটতে লাগল।...ও ব্যাটার খেয়াল। ভাল মনে থাকলে যাবে, নয়তো যাবে না। কাদের বাড়ির আপনারা?

লতু জবাব দিল, আমি পরেশ মজুমদারের মেয়ে। মজুমদার মশাইকে চেনো? ওই যে পেট্রোল পাম্প আছে!

লোকটা বলল, খুব চিনি। আমার বাড়ি বাজারে না—গাঁয়ের দিকে। তাহলেও ওনাকে না চিনত, এমন কে আছে ইদিকে বলুন? ঘরে সাপ ঢুকেছে নাকি? দেখছেন স্বচক্ষে?

লতুই জবাব দিয়ে গেল।...আমিই তো দেখেছি। কাল ঝড়বৃষ্টি হল, তখন ঢুকে পড়েছিল ঠাকুরঘরে. .একটু থেমে সে রুমার দিকে তাকিয়ে ফের বলল, মাসিও দেখেছে। একটু লেজ দেখেছে।

লোকটা দাঁড়িয়ে গেল। বিজ্ঞের মুখে বলল, ঠাকুরঘরে! তাহলে আর ছোটা-ছুটি করবেন না দিদি। চুপচাপ বসে থাকুন গে! কতরূপে কে আসে কখন। উঁহু—খবদ্দার ও কম্ম করবেন না। ও ব্যাটা গেঁজেল—তার ওপর বেজাত। ওকে দিয়ে ঠাকুরঘরের সাপ ধরাবেন! কক্ষনো এ কাজ করবেন না—অমঙ্গল হবে।

আবার চলতে থাকল সে। রুমা মুখ টিপে হাসছিল। সারা গায়ে ঘাম ধুলোকাদা, আধন্যাংটো এই চাষাভূষো লোকটার ধর্মাধর্ম জ্ঞান দেখে তার হাসি পেয়েছিল।

হঠাৎ লোকটা আবার দাঁড়াল। পিছন ফিরে বলল, অবশ্যি পীরবাবার কথা আলাদা, তিনি যেমন হেঁদু—তেমনি মোছলমানের সবাই তেনার সন্তান।

বলে তেমনি হঠাৎ উল্টোদিকে অর্থাৎ ফের থানের দিকে চলতে সুরু করল। এরা একটু সরে দাঁড়াল। পরস্পর মুখ তাকাতাকি করছিল। হঠাৎ কী মনে পড়ে গেছে হয়তো—কিছু ফেলে এসেছে জমিতে—আনতে যাচ্ছে।

লতু রুমার হাত ধরে টানল। চলো মাসি, সেই এ্যাসিড আনতে যাই।

যেতে যেতে রুমা একবার পিছনে ঘুরল। লোকটা পীরের থানের মাঠে উপুড় হয়ে প্রণাম করছে। হঠাৎ কেন ভক্তি উথলে উঠল ওর কে জানে!

এরা হাইওয়েতে আসতেই সে দৌড়ে এসে সঙ্গ নিল। কাঁচমাচু হেসে বলল, মানুষের মুখ! কখন ভালমন্দ বেরিয়ে যায়। যাই বলুন দিদি, পীরবাবার মাহাত্ম্যের শেষ নেই। আমার বড় মেয়েটার অমন অসুখ রুস্তম ফকিরের একটা কবচেই সেরে গেল।

এতক্ষণে বুঝল রুমা। লোকটা রুস্তম ফকিরের বদনাম করে ফেলেছিল। পাছে পীরবাবার কোপে পড়ে যায় তাই তক্ষুনি মাথা ঠুকে ক্ষমা চেয়ে এল। অদ্ভুত মানুষেব বিশ্বাস! রুমা হাসি চেপে মনে মনে বলল, এই আমি আর লতু তো প্রণাম করে এলুম না! আমাদের ঘরে সাপ ঢোকা নিয়ে সারাটা দিন যা তোলপাড় যাচ্ছে। আমাদের ওপর রেগে যাবে নাকি পীরবাবা? পীরবাবা, তুমি রাগ করো না। আমরা সত্যি বিপন্ন।

লোকটা বাঁদিকে নামল হাইওয়ে ছেড়ে। গাঁয়ের দিকে একটা আলপথ চলে গেছে। বলে গেল, বরং পাণ্ডেজীকে গিয়ে ধরুন না। ওনার কথা ঠেলতে পারবে না রুস্তম। এখনও খানিকটা বেলা আছে। চেষ্টা করে দেখুন দিদি।...

দি আইডিয়া! রুমা ঠোঁট কামড়াল। কারবলিক এ্যাসিড যদি না পাওয়া যায় হসপাতালে, আবার সারাটা রাত টেবিলে জড়োসড়ো হয়ে জাগতে হবে। বরং আগে পাণ্ডেজীকে গিয়ে বলা যাক্। আঃ, হকসায়েব থাকলে কিছু ভাবতেই হত না এতক্ষণ! দিদিটা বড্ড ঝগড়াটে। সবাইকে চটিয়ে ফেলছে একে একে। হকসায়েব অত ভালমানুষ—অত ভদ্র, সৎ—অথচ তাকেও অবিশ্বাস করে চটিয়ে ফেলল দিদি!

পেট্রোল পাম্পের সামনে দিয়ে গেলেই স্নেহধারা আবার হন্তদন্ত হবে। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা দিয়ে লোক পাঠাবে। একটু দাঁড়িয়ে রুমা বলল, লতু, চল আমরা শর্টকাট করি। ডাইনে হসপাতালের পাশ দিয়ে ঘুরে মাঠে মাঠে চলে যাই চৌমাথায়।

লতু বলল, এ্যাসিড! চৌমাথায় এ্যাসিড আছে—না হাসপাতালে?

রুমা ওর কাঁধে হাত রেখে বলল, তর্ক করে না। চুপচাপ আয় তো সঙ্গে।

কিছুদূর ছড়ানো রয়েছে ইঁটখোলার চিমনিভাটা। নয়নতারা বোন মিলস। ওদিকটায় মাঠের ওপর হাড়ের পাহাড় জমে থাকে। পচা চিমসে দুর্গন্ধ আসে। দু-আঙুলে নাক টিপে হাঁটছিল রুমা। দেখাদেখি কিছু ঢের না পেয়েও লতু মাসির ভঙ্গী নিল। বলল, এঃ, এদিকে কেন এলে মাসি?

রুমা বলল, বকে না। চুপচাপ আয় তো সঙ্গে।

হাসপাতাল পেরিয়ে স্কুল এলাকা। একবার থেমে কোয়ার্টারগুলোর দিকটা দেখে নিল রুমা। হঠাৎ লতু বলল, কাকুকে ডেকে আনব মাসি?

রুমা ভুরু কুঁচকে বলল, কাকে?

কাকুকে—গানের কাকাবাবুকে। লতু বিরক্ত।

কে সে?...প্রশ্নটা করেই পরক্ষণে রুমা অবাক হয়েছে। সাপটা তাকে ভীষণ অন্যমনস্ক করে রেখেছে যেন। কী বলবে, কী করবে, সব বড্ড অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে ক্রমশ। রুমা মনে মনে বলল, যাকে বলে ইনস্যানিটি গ্রো করা, ঠিক সেই রকম। সকাল থেকে তার এই অপ্রস্তুত থতমত ভাবকেই গ্যাঁদা বলছিল, রুমা-

দিদিমণি 'থরবড়' করছে। থ-ত-ব ড়! গ্যাঁদাটা মাঝে মাঝে যা দেহাতি ঝাড়ে, তাক লাগিয়ে দেয়। রুমা চুপিচুপি হাসতে থাকল।

এদিকে লতু মাসির মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে।

রুমা বলল, না—কাকেও ডাকতে হবে না। বলছি, চুপচাপ সঙ্গে আয়। তা নয়, একে ডাকি, ওকে ডাকি।

ডাইনে মাঠের মধ্যে প্রকাণ্ড পুকুর। ধোপারা কাপড় মেলে দিয়েছে। হাঁস ডাকছে পুকুরের জলে। বিকেলের রেশমি ঝিলমিলে রোদ গায়ে নিয়ে দিগন্ত অবধি শস্য শূন্য মাঠটা আরামে ঝিমোচ্ছে। বাঁদিকে হাইওয়ের সমান্তরালে রূপপুর বাজার থেকে আবছা কোলাহল শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ থমকে দাঁড়াল রুমা।

সামনে নটুবাবুদের বাংলো বাড়ি। ঘন গাছপালার ফাঁকে বারান্দাটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এবং বারান্দায় দাঁড়িয়ে সুনন্দিতা এদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

এভাবে মুখোমুখি পড়ে যাবে ভাবতে পারেনি রুমা।

সে লতুর মুখটা দেখে নিল। আশ্চর্য, লতু—অত ছোট মেয়ে, সেও মুখ গম্ভীর করে ফেলেছে। তার মাকে এই মহিলা কীভাবে উত্যক্ত করেছে, লতুর জানা অবশ্য স্বাভাবিক। কিন্তু রুমা সুনন্দিতাকে এড়িয়ে যেতে চায়, তার পিছনে পারিবারিক কারণটা রুমার কাছে নিতান্ত গৌণ, সেটা আমল সে দেয়নি —এখনও দেয় না। যে-সুনন্দিতার জন্যে একদা তার মন পড়ে থাকত সারাক্ষণ, তার সঙ্গে স্নেহধারার খুনোখুনি হলেও রুমার কিছু আসে-যায়নি, আজও আসে যায় না। বরং জামাই-বাবুর ওভাবে আত্মহত্যার পর সুনন্দিতা রুমার চোখে রহস্যময়ী হয়ে উঠেছিল। সেই নতুন চোখে দেখছিল তাকে। তারপর হঠাৎ রুমা একদিন আবিষ্কার করেছিল, অমিতের সঙ্গে তার সম্পর্কটা সুনন্দিতা ক্রমাগত রক্তমাংস অর্থাৎ স্পষ্ট করে বললে যেন যৌনতার দিকেই ঠেলে দিতে চেষ্টা করছে। এত খারাপ লেগেছিল রুমার! চন্দনকেও একদিন কী কথায় এ-ব্যাপারটা বলেও ফেলেছিল সে।

তাহলেও এখন একা থাকলে সুনন্দিতার কাছে অন্তত একবার দাঁড়িয়ে যেতে আপত্তি ছিল না। কিন্তু লতুর জন্যে সেটা সম্ভব নয়।

এবং সম্ভব নয় বলেই যেন পরক্ষণে খুশি হল রুমা। সে একটু হেসে ফিস-ফিস করে বলল, লতু, বুঝলি? তুই আমার বডিগার্ড। কেমন?

লতু বুঝতে পারল না। সে গম্ভীর মুখে বলল, মাসি, দেখছ ডাইনিটা কেমন তাকাচ্ছে! চোখ গেলে দেব একেবারে।

রুমা বলল, চুপ। শুনবে।

সুনন্দিতা বারান্দা থেকে নেমে এগিয়ে আসছিল। সরু পথের কাছে রুমারা এলে সে বলল, কী রুমা, আসা যে ছেড়েই দিলে আজকাল! ওটি কে? তোমার দিদির মেয়েটা না? এতটুকু দেখেছি। বাঃ, বেশ বড়োসড়ো হয়েছে তো!

রুমা কাঁচুমাচু হাসল। লতু ফোঁস করে। মাসি দেরী হয়ে যাচ্ছে। মা বকবে। সন্তুরা একলা আছে। চলে এস।

সুনন্দিতা হেসে বলল, ওরে বাবা! মেয়ে যে মায়ের চেয়েও কড়া।

লতু কটমট তাকিয়ে বলল, বেশ—কড়া আছি, আছি। কারো খেয়ে পরে কড়া নাকি ?

পলকে সুনন্দিতার মুখটা হিংস্র দেখাল। নিষ্ঠুর হেসে বলল, সেটা তোমার মাসিকেই জিগ্যেস করো না মেয়ে। কার খেয়ে পরে মুখে এ্যাদ্দিনে বুলি ফুটেছে। রুমা, ওকে বুঝিয়ে দাও তো!

স্তম্ভিত হয়ে গেল রুমা। সুনন্দিতা কী! এত ছোট, এত হীনমনা মেয়ে—ভাবতেও পারেনি রুমা। দিদির সঙ্গে অমন কাণ্ড করার পরও সুনন্দিতার সম্পর্কে একটা উঁচু আর রহস্যময় ধারণা ছিল তার। রুমা মুখ নামিয়ে চুপচাপ চলতে থাকল। পিছনে ঘুরে সুনন্দিতাকে আর দেখতেও ইচ্ছে করছিল না তার। চৌমাথায় পৌঁছে একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল সে। সেই মুহূর্তে হঠাৎ তার মনে হল, সুনন্দিতা কি তাহলে পরেশের প্রতি কোন অচরিতার্থ কামনা বাসনার আক্রোশ এমনি করে পরেশের স্ত্রী আর সন্তানদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে হালকা হতে চাইছে ? একদিন গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রুমা স্পষ্ট জানতে চাইবে। সুনন্দিতাকে আর ভয় পাবে না সে। বলবে, বলুন—কী চেয়েছিলেন জামাইবাবুর কাছে ? কী পাননি!

চৌমাথায় প্রচণ্ড ভিড়। ব্রজর লাসটা এসে গেছে মনে হচ্ছে। তিনটে ট্রাক সাজানো হয়েছে। হরিধ্বনি দিচ্ছে সবাই। একটা ট্রাকে খোল-করতাল বাজিয়ে কীর্তন হচ্ছে। একটা পাগলাটে ড্রাইভারের জন্যে এত কাণ্ড হতে পারে ভাবা যায় না। কাতারে কাতারে লোক এসে জমছে। চারদিক থেকে। লতু বলল, দেরী হচ্ছে মাসি! কী দেখছ হাঁ করে ?

রুমা ওর কাঁধ ধরে বলল, দাঁড়া না বাবা! একটু দেখে যাই।

সেই সময় পশ্চিম থেকে হু হু করে একটা বাতাস এল। কখন সবার অলক্ষ্যে ওদিকের আকাশ কালো হয়ে গেছে। বাতাসটা ভিড়ের ওপর এসে নাচতে লাগল।

ঊনত্রিশ

ঠিক তখনই পাণ্ডেজীর ঘরে ঘুম ভেঙে গেল চন্দনের। একটা স্বপ্ন দেখছিল—অদ্ভুত। মনিরুদ্দি ব্যাপারীর শালার বিয়েতে মাঠের পথে তার গাড়ি চলেছে। কী ধুলো, কী ধুলো! টোপর পরে ব্রজগোপাল গাড়ি চালাচ্ছে। কী কাণ্ড! ব্রজই বর! তার গাড়ি চালাতে নেই। চন্দন স্টিয়ারিং ধরেছে কখন। আকাশপাতাল ধুলোয়-ধুলোয় ঢাকা। দম বন্ধ হয়ে যচ্ছে। গাড়িটা কোথায় চলেছে তার মধ্যে বোঝা যায় না। শ্বাসকষ্টে ছটফট করে চন্দন ভয়ার্ত স্বরে ব্রজকে ডাকতে চেষ্টা করছিল! ব্রজর মাথায় টোপর। ব্রজ নিষ্ঠুর মুখে তাকিয়ে আছে। চন্দন গোঙাচ্ছিল—ব্রজদা, ব্রজদা, ব্রজদা!

চোখ খুলে চন্দন দেখল, সে পাণ্ডেজীর বিছানায় শুয়ে আছে। ঘামে বালিশ ভিজে গেছে। তোয়ালেটা পড়ে গেছে নিচের সে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল ধবধবে সিলিংটার দিকে। মনে পড়ল, ব্রজ মরে গেছে। গাড়িটা পড়ে গেছে।

সব কিছু জুড়ে একটা বিকট শূন্যতা টের পেল সে। উদ্দেশ্যহীন মনে হল সব কিছু। বাইরের সব আলোও কখন ধূসরতম হয়ে উঠেছে। সেদিকে শূন্য দৃষ্টে তাকাল সে।

আজও কি আবার ঝড় উঠছে? দরজাটা ভেজিয়ে রেখেছিল, খুলে গেছে। জানালাগুলো সশব্দে বন্ধ হচ্ছে, আবার খুলে যাচ্ছে। বাইরে আকাশটা কালো হয়ে গেছে। বটগাছের মাথা তোলপাড় হচ্ছে। দূরে নারকেল গাছগুলো প্রচন্ড দুলছে। কালো আকাশের গায়ে দুরন্ত নারকোল গাছগুলো যেন ঝড়েরই প্রতীক হয়ে উঠেছে—ঝাকড়মাকড় চুল নাড়া দিয়ে নেচেওঠা গাজনের সন্ন্যাসী যেন।

আবছা শোনা গেল, বাইরে কোথায় খুব গোলমাল হচ্ছে। মিছিল নাকি? হঠাৎ মনে পড়ল ব্রজর লাসটা মর্গ থেকে ফিরে আসার কথা ছিল। এরই মধ্যে এসে গেল? শংকর বলছিল, সব ড্রাইভার আর স্থানীয় লোকেরা মিলে ব্রজকে বহরমপুর ঘাটে পোড়াতে যাবে। কয়েকটা ট্রাকও যোগাড় করেছে ওরা।

চন্দন উঠল। চটিটা পায়ে গলিয়ে খোলা ছাদে এসে দাঁড়াল। ঘন চাপ চাপ কালো মেঘে আকাশ ঢাকা। ঝড় আসছে। তারই মধ্যে চৌমাথায় ভিড়ে গিজ-গিজ করছে। তিনটে ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। সামনেরটায় সম্ভবত ব্রজর লাসটা রয়েছে—স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। একটা ট্রাকে খোল-করতাল বাজিয়ে কারা ঝড়ের মধ্যেই কীর্তন গাইছে। এই ঝড়ের সন্ধ্যায় ব্রজকে নিয়ে ওরা গঙ্গা দিতে চলেছে। চারদিক থেকে মানুষ আসার বিরাম নেই এ-দুর্যোগেও। ব্রজকে এত ভালবাসত ওরা! একজন মাতাল সামান্য মানুষ, পাগলাটে একটা ড্রাইভার —তার জন্যে এত সব শোকের আয়োজন। চন্দনের চোখ ভিজে এল। মনে মনে অস্ফুট বলল, আমাকে তুমি ক্ষমা করো ব্রজদা। আমাকে তুমি ক্ষমা করো।

ধুলো খড়কুটো শুকনো পাতা নিয়ে ঝড় তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ব্রজর শোকমিছিলের দিকে যেন টানল তাকে। কিন্তু পা ভারি হয়ে এল হঠাৎ। ও মিছিলে যাবার অধিকার কি তার আছে? ব্রজর বন্ধুরা তার দিকে কী চোখে তাকাবে কে জানে। সে টের পেয়ে গেছে আজ সারাদিনে সবাই ভ্যান গাড়ির ছোট-বাবুকে কী ঘৃণা করছে মনে মনে। সবাই ব্রজর মৃত্যুর জন্যে দায়ী করে ফেলেছে তাকে। ভাল করে কেউ তার সঙ্গে কথা বলেনি। এমনকি হকসায়েবও তাকে এড়িয়ে থেকেছেন।

এখন সে মিছিলে গিয়ে দাঁড়ালে চারদিক থেকে আক্রান্ত হবে বোবা স্তব্ধ ঘৃণায়। চন্দন একটু ভেবে দেখল। হ্যাঁ, ঘৃণাই বটে। সবার প্রিয় ব্রজগোপালের বউটাকে নষ্ট করেছিল চন্দন—তাই ব্রজ মনের দুঃখে আত্মহত্যা করেছে। চন্দন বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তার সরলচেতা ড্রাইভার তাকে বিশ্বাস করে বাড়িতে তুলেছিল, সম্মান দিয়েছিল—চন্দন সেই সরলতা আর সম্মানের সুযোগ নিয়েছে। স্বীকার করা যাক, ব্রজর বউটা খারাপ মেয়ে। কিন্তু চন্দনের মতো মানী শিক্ষিত 'ছোটবাবু' মানুষের পক্ষে সেই খারাপ মেয়ের সঙ্গে ঝট করে শুয়ে পড়াটা কি উচিত হয়েছিল?

চন্দনের মনে হল, তার সামনে অদৃশ্য দাঁড়িয়ে ওই আয়োজিত শোক-মিছিলের প্রতিনিধিরা একটা বোঝাপড়া করছে। সে আড়ষ্টভাবে নিজের ত্রুটি

স্বীকার করে নিল। মনে মনে বারবার বলল, আমি সত্যি অন্যায় করেছি। পাপ করেছি। বুঝতে পারছি এ-পাপের কোন ক্ষমা নেই—কারণ, এর ফলেই একটি হাসিখুশি জনপ্রিয় মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। সেই প্রথম রাতটার কথা বলা যাক। যদি সে হাসিকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিত বিছানা থেকে, যদি তার-পর ব্রজর বাড়ি ছেড়ে দিত এবং অন্য কোথাও বাসা নিত, তাহলে এমন করে ব্রজ মরত না। মরে যাওয়া তো খুব সহজ ব্যাপার, কত মানুষ মরে যাচ্ছে প্রতিদিন প্রতি রাত্রে- কিন্তু ওইরকমভাবে মরে যাওয়া! এক হাতে জিভ বেরিয়ে পড়া, ফুলে ওঠা বিকট প্রকাণ্ড দুটো চোখ, ঝুলন্ত দেহ, প্যাণ্টভরতি নোংরা পেচ্ছাপ-পায়খানা। কী কষ্ট পেয়ে না ব্রজ মারা গেছে। গলায় ফাঁস লাগিয়ে যখন গাছের ডাল থেকে ঝাঁপ দিয়েছিল ব্রজ, তখন সেই ভয়ঙ্করতম যন্ত্রণার মধ্যে আবার জীবনের জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠা নিশ্চয় স্বাভাবিক ছিল! গাড়িটা ধু ধু জ্বলে তখন হয়তো পুড়ে শেষ হয়ে গেছে, সেই ছাই তার শরীরে মেখেছে ব্রজ, তারপর আর কী ছিল তার জীবনের বাকি? কলঙ্কিনী হাসি ছিল? মৌরীগ্রামের সেই পাতানো মা-বুড়ী ছিল? কার জন্যে পুনর্জীবন প্রার্থনা করতে পারে ব্রজ?

না। ব্রজ মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্যে জৈব বৃত্তির বশে জীবনের জন্যে ব্যাকুল হয়নি। সমস্ত আলোও অবশিষ্ট ছিল না। সামনে ছিল শুধু অন্ধকার—বিশাল পরিব্যাপ্ত অগাধ অবাধ অন্ধকার।

আর সে অন্ধকারে তাকে ঠেলে ফেলেছিল তার প্রিয় মালিক ছোটবাবুই।

আকাশ তোলপাড় করে পুঞ্জ পুঞ্জ ভয়ঙ্কর মেঘ পৃথিবীর দিকে নেমে এসেছে এবার! হা হা হা হা...শাঁ শাঁ শন শন...ঝড় আছাড় খেয়েছে রূপপুর চটির ওপর। শোকমিছিল একটুও নড়ছে না তবু। ব্রজগোপালের জয়ধ্বনি উঠছে মত্তমাতাল বাতাসে জয়পতাকার মতো...ব্রজগোপাল অমর রহে। ...আমাদের ব্রজদা জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ!...বোল হরি হরি বোল!...রাম-নাম সৎ হ্যায়! প্রবল ধ্বনিপুঞ্জের বুদ্বুদ উড়ছে ঝড়ের আকাশে। ট্রাকের ওপর মাতাল ড্রাইভার আর অ্যাসিস্টাণ্টরা শোক-নৃত্য নাচছে। খোল-করতাল বাজিয়ে কীর্তন চলেছে অন্য ট্রাকে। অদ্ভুত পোষাক-পরা টিঙটিঙে চেহারার কে একজন বক চাপড়ে কী বলছে! হৃদয় ঠাকুর না? হৃদয়ও শোক করছে। চৌমাথার গোল পার্কটা ঘুরছে মিছিল। প্রথম গাড়িতে ব্রজর লাস সাদা কাপড়ে ঢাকা। এত ফুল ওরা পেল কোথায়? হঠাৎ চমকে উঠল চন্দন। ব্রজর মাথার কাছে ট্রাকের সামনের ছাদটা ধরে রাধা দাঁড়িয়ে আছে। আর তার পাশে হকসায়েব।

এ-শোকমিছিলে রাধা আর তার হকসায়েব বাবাও অনুগামী। চন্দন যাবে না? চন্দন, তুমি যাবে না?...নিজের দিকে তাকাল সে। দেখল একটা খড়-মাটির বিধ্বস্ত পুতুল দাঁড়িয়ে আছে। একটা ঝড়-খাওয়া বৃষ্টিভেজা ছেঁড়া-খোঁড়া কাক-তাড়ুয়ার মতো চেহারা—যার কোন রক্ত-মাংস নেই, হৃদয় নেই, মগজ নেই। আর সেই সময় বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি পড়তে লাগল।

শোক মিছিলটা চৌমাথা ঘুরে হাই-ওয়েতে পূর্বগামী হয়েছে দুধারে বাজারের দোকানে দোকানে লোকেরা দাঁড়িয়ে গেছে। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে ভ্যাংগাড়ির এক 'ছোটলোক' ড্রাইভারের শবযাত্রা দেখছে ওরা। ট্রাক-তিনটে

আস্তে আস্তে গড়াচ্ছে। পায়ে হেঁটে কিছু লোক এগোচ্ছে পিছনে। বৃষ্টির শব্দে মিছিলের শব্দ ডুবে গেল।

বৃষ্টি পড়তে লাগল। উদ্দাম বৃষ্টি! পশ্চিম থেকে পূর্বে আরও জোরে ছুটে এল পাগলা ঝড়। দূরে একটা নারকোল গাছের মাথায় আচমকা বাজ পড়ল। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল। চন্দন তখন সারা মনে ও শরীরে প্রকৃতির করতলগত। আমাকে ক্ষমা করো, আমাকে ক্ষমা করো। সে স্থির দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করছে। আবার কোথায় বাজ পড়ল। মেঘ ডাকতে লাগল। গাছের ডাল ভেঙে পড়ল।

পাণ্ডেজী খোলা সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে এলেন।...চন্দনবাবু, চন্দনবাবু।

চন্দন সরে আসছে না দেখে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, আরে চলে আসুন, চলে আসুন! মেঘ ডাকছে—চন্দনবাবু। বাজবিজলী হচ্ছে, চলে আসুন।

চন্দনের চমক ভাঙল এতক্ষণে। সে আস্তে আস্তে এসে ঘরে ঢুকল। পাণ্ডেজী জানালাগুলো বন্ধ করতে ব্যস্ত হলেন। ঘরের মেঝে ভিজে গেছে। কিছু জিনিসপত্রও ভিজেছে। দরজাটা পুবে—তাই ঝড়জল ঢোকে না। পাণ্ডেজী হাসতে হাসতে বললেন, আঃ রে! কত্তো ভিজলেন চন্দনবাবু, অসুখবিসুখ হতে পারে। ব্রজগোপালকে ওরা লিয়ে গেল—তাই দেখছিলেন এতক্ষণ? আর বলবেন না চন্দনবাবু, মুলুককা যেতনা ড্রাইভার আছে, সব ব্রজর দোস্ত-ইয়ার।...পরক্ষণে চাপা গলায় গম্ভীরমুখে বললেন, আমার মানা শুনে বহুৎ ভালো করছেন। আপনি ইজ্জৎওয়ালা, ওরা সব মাতাল বদমাস আদমি—কত্তো গুণ্ডা ভি আছে ওদের দলে—যাক্ গে, ভালো করেছেন। আমার তো ডর হল, যাই দেখি চন্দনবাবু আবার চলে গেলেন নাকি। আঃ হা! ভিজেছেন কত্তো! আমি কাপড় দিচ্ছি, বদলে লিন।

পাণ্ডেজী ব্যস্তভাবে তক্তপোষের নেচ থেকে একটা সুটকেস টানতে লাগলেন। চন্দন দাঁড়িয়ে রইল। বাইরে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়েছে ততক্ষণে। আবছা অন্ধকারে ভরে গেছে রূপপুর চটি। ঘরের ভিতর সব অস্পষ্ট। একটা ধুতি বের করে পাণ্ডেজী বললেন, বদলে লিন। আমি আলো জেবলে দিই। চা করি। বাসরে বাস! আজ সারাদিন যা গেল আমার—বলবেন না। সাঁইথিয়া থেকে দপ্ ট্রাক খন্দ এল খালাস করলুম। তো ফিরভি এক লরী গুড়...হাঃ হাঃ হাঃ নাহানার ফুরসৎ পাইনি আজ। আপনি নিদ যাচ্ছেন ভেবে এলুম না উপরে। যাক্, চন্দনবাবু শান্তিসে নিদ যাক! বহুৎ পেরেসানি গেছে। হাজার হাজার রুপেয়া আগুনে লোকসান ভি গেছে। তো চন্দনবাবু নিদ যাক। ইনসিওর তো ছিল গাড়ির—ছিল না?

চন্দন মাথা দোলাল।

তো ব্যস, শোচবেন না। একটু ঝামেলা হবে। সে কিছু না।...পাণ্ডেজী কুকার জ্বালাতে ব্যস্ত হলেন।...কাপড় বদলে লিন, ঠাণ্ডা লেগে যাবে।

চন্দন কাপড়টা হাতে নিয়ে বাইরে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে দাঁড়িয়ে রইল।

...তো এক বাত। যেতক্ষণ আমার ঘরে আছেন, মাথা খাড়া করে থাকুন। কছু ডর নেই। আমি শিশিরবাবুকে ভি বলেছি, তখন দেখা হল। একটা ট্রাক দরকার ছিল। তিসি বোঝাই হবে পুরুলিয়ায়। ওখানে আমি আড়ত খুলছি চন্দনবাবু। কেমন হবে? আপনার তো খুব জানা জায়গা।

চন্দন পণ্ডেজীর প্রথম কথাটায় চমকে উঠেছিল। সে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

...তো হাঁ, শিশিরবাবু ভি বললেন—চন্দনবাবুর কুছু ডর নেই। দরকার হলে আমাকে খবর দেবেন...পাণ্ডেজী কেটলিটা চাপিয়ে দিলেন কুকারে।

চন্দন অস্ফুটকণ্ঠে বলে উঠল, কিসের ভয় পাণ্ডেজী?

পাণ্ডেজী উঠে এসে বিছানায় বসলেন।...যা বলছিলুম, তখন। শালালোক বহত হারামী আছে তো! আরে ব্রজগোপাল আপনা জান দিয়েছে, তো তার মালিক কী করবে? শুনলাম, তখনই ওরা আপনাকে খুঁজছিল। বলে কী চলো—সবলোক আভি চলো, ছোটবাবুর সাথ মোকাবিলা করব। তো ওর মধ্যে ভালমন্দ আদমিও আছে তারা সব সামাল ছিল। না, আপনি ভাববেন না চন্দনবাবু। পাণ্ডের গদীর কাছে আসে তাকত কার?

চন্দন থরথর করে কেঁপে উঠল অজানা ভয়ে। ওরা কি ব্রজর মৃত্যুর প্রতিশোধ চায়? নাকি ওরা শুধু কিছু কৈফিয়ৎ চায়—কিছু ক্ষতিপূরণ চায়? ক্ষতিপূরণ কে নেবে? ব্রজর বউ তো এখানে নেই। না—টাকা-পয়সা ওরা নেবে না। তাহলে ব্রজকে পোড়ানোর খরচ তখনই দাবী করত।

পাণ্ডেজী বলল, আঃ হা! কাপড়া বদলে লিন।

নিচ্ছি। চন্দন শান্তভাবে বলল।.. আচ্ছা পাণ্ডেজী, ওরা কী বলতে চায়?

নিজে বুঝে লিন।...পাণ্ডেজী একটু হাসলেন।...তো বাত হল কী, যো কুছ ধা করে হোয় তড়িঘড়ি যো চিজ হোতা চন্দনবাবু দেরীতে আর তা হোয় না। কেন হোয় না? কী- আদমির মেজাজ এই রকম আছে। রাগে যা হল, রাগ জুড়িয়ে আব তো হল না। ঘাট থেকে ফিরে আসার পর যে-যার আপনা কামে চলে যাবে, তখন আর ব্রজ কাঁহা, কোথায় তার মালিক। হাঃ হাঃ হাঃ।...বলে সুইচ টিপে আলো জেবলে দিলেন পাণ্ডেজী।

চন্দন ঠোঁট কামড়ে বলল, আমাকে ওরা মারবে বলছিল?

পাণ্ডেজী হন্তদন্ত বললেন, আঃ হা! আপনি ছেড়ে দিন তো ও বাত! ছোটো আদমির ছোটো কথায় কান দিতে নেই। কাপড়া বদলে লিন। হায় রাম!...হঠাৎ পণ্ডেজী লাফিয়ে উঠলেন। চায় পাতা খতম। একদম ভুলে গেছি। বিকালে খতম হল। বললুম না, যা দিন গেছে আজ—নাহানের ফুরসুৎ ছিল না। এক মিনিট—নিচে থেকে আনি।...বলে পাণ্ডেজী মাথায় গামছা চাপিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেলেন। বাইরে খোলা সিঁড়িতে হয়তো একটু আছাড়-খেলেন—তাই তার কাতরোক্তি শোনা গেল বৃষ্টির মধ্যে। হায় রাম! এবং আরও কী সব অস্ফুট কথাবার্তা। বৃষ্টি আর ঝড়ের শব্দে স্পষ্ট বোঝা গেল না।

পরক্ষণে হুড়মুড় করে দুজনে এসে ঘরে ঢুকে পড়েছে। বৃষ্টি ভেজা দুটি মূর্তি এসেই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে গেছে চন্দনের মুখোমুখি।

চন্দনের মনে হল, এক্ষুনি প্রচণ্ড—ভীষণ চিৎকার করে পাণ্ডেজীর এই ছোট ছাদের ঘরখানা, বাইরের ওই উত্তরঙ্গ আকাশ আর রূপপুর চটিতে একটা ভয়ঙ্কর বিস্ফোরণ ছড়িয়ে দেবে। এই বিস্ফোরণে যে উষ্ণতা থাকার কথা, এবং যে লাভাস্রোত—তা সুখ কিংবা দুঃখের, আনন্দ কিংবা শোকের, চন্দন নিজেও জানে না। এই বিস্ফোরক চিৎকার তার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়ে উঠে আসছিল পলকে-পলকে। কিন্তু তারপর আর শক্তিতে কুলোল না। সুখ কিংবা দুঃখের

আগুনে আর পরিণত তাপের ইন্ধন যোগানোর মতো কিছু ছিল না হৃদয়ে কিংবা মনে। সে খুব আস্তে ভাঙা গলায় বলল, রুমা!...এস রুমা···তারপর লতুকে টেনে নিল কাছে। মাথায় হাত রেখে বলল, কেমন আছিস লতু? চিনতে পারছিস তো? রুমা তুমি বসো।

রুমা প্রথম বিস্ময়ের চাপটা ততক্ষণে কাটিয়ে উঠেছে। ব্রজ ড্রাইভারের শোক মিছিল দেখতে দেখতে কখন ঝড় এসে পড়েছিল। তবু মিছিলটা চলে যাওয়া অব্দি সে দাঁড়িয়েছিল। শেষে আচমকা টের পেয়েছিল, এই মিছিলের ভিড়ে সে কেবল একজনকেই খুঁজছিল এতক্ষণ। ঠিক তখনই বৃষ্টি এসে গেছে। লতুর হাত ধরে দৌড়ে সে পাণ্ডেজীর গদীতে চলে এসেছে। চৌমাথা থেকে সামান্য দূর বলে বেশ ভিজে গেছে ততক্ষণে। এসে শোনে পাণ্ডেজী ওপরের ঘরে গেছেন। রুমাকে পাণ্ডেজীর লোকেরা চেনে। বলেছে, ওপরে আছেন পাণ্ডেজী। চলে যান না ওখানে। সিঁড়িটা খোলা। ওখানে পাণ্ডেজীর সঙ্গে দেখা। পাণ্ডেজী অবাক। কিন্তু তিনিও বলে গেলেন না যে তাঁর ঘরে এখন কে আছে।

রুমা মুখ নামিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোন কথা বলল না। লতু গড়গড় করে বলল, আমাদের ঘরে সাপ ঢুকেছে কাল। কাল এমনি ঝড়জল হচ্ছিল, তখন ঢুকেছে। তাই আমরা ফকিরবাবাকে ডাকতে গিয়েছিলুম—ফকিরবাবা এল না। তাই মাসি বলল, পাণ্ডেজী বলে দিলে আসবে। আমরা এলুম! তাই না মাসি?

চন্দন বলল, ইস্! ভীষণ ভিজেছ যে তোমরা। লতু, এই ধুতিটায় মাথাটা মুছে নাও।

লতু রুমার দিকে তাকিয়ে বলল, ভ্যাট।

চন্দন একটু হাসল।···রুমা, কথা বলছ না কেন?

রুমা মুখ নামিয়ে বলল, কী বলব?

চন্দন বলল, হঠাৎ তোমার আসা দেখে ভেবেছিলুম—বুঝি বা আমার প্রায়শ্চিত্ত দেখতে এসেছে—হ্যাঁ, আমার যেন মনে হল তুমি এ সময় এমনি করে আমার কাছেই এসেছ! এখন জানলুম, তা নয়। পাণ্ডেজীর কাছে এসে আমার সামনে পড়ে গেছ। খুব খারাপ লাগছে, না রুমা? ঘেন্না হচ্ছে? ঘরের সাপ তাড়াতে এসে আবার একটা সাপের সামনে পড়ে যাওয়া। তোমার দুর্ভাগ্য রুমা।

রুমা বলল, দুর্ভাগ্য তোমারও হতে পারে, ছোটবাবু!

তুমিও আমাকে ছোটবাবু বলছ রুমা।

হ্যাঁ—সবাই বলে, আমি বললে দোষ হবে কেন?

চন্দন বৃষ্টি দেখতে দেখতে বলল, আজ কারোরই কোন দোষ হবে না রুমা। যে যা বলবে, যে যা করবে সব শুনতে হবে- সইতেও হবে। এখন আমার প্রায়শ্চিত্তের দিন শুরু হয়ে গেছে।

রুমা মুখ তুলে এবার চোখে চোখে তাকাল।···কিসের প্রায়শ্চিত্ত?

পাপের। পাপ ছাড়া কি পুণ্যের প্রায়শ্চিত্ত আছে?

রুমা আবার মুখ ঘুরিয়ে নিল। বৃষ্টি দেখতে দেখতে বলল, হয়তো আছে। আমি অন্তত জানি, কেউ কেউ পুণ্যের দায়েও প্রায়শ্চিত্ত করতে বাধ্য হয়।

চন্দন আহত স্বরে বলল, তুমি কি তোমার জামাইবাবুর হয়ে খোঁটা দিচ্ছ রুমা?

রুমার চোখ দুটো চকিতে জ্বলে উঠল।...না। তুমি গোঁয়ার—তাই তুমি বোকা। জামাইবাবু কি পুণ্য করেছিল, কে তার প্রায়শ্চিত্ত করছে—সে কথা বলিনি। তোমার নিজের ঘা থাকতে পারে সেখানে, তাই জ্বলে ওঠ। আমি অন্য কারো কথা বলছি।

কে—কে পুণ্য করেছিল, বলবে রুমা? কার কথা বলছ?

আমি জানি না।

লতু এতক্ষণ পর্যায়ক্রমে দুজনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকছিল। এবার একটা কিছু আঁচ করে বলে উঠল, মাসি! এখানে এসে ঝগড়া করছ—মাকে বলে দেব, দেখবে।

চন্দন বলল, তোমার মাসি বড্ড ঝগড়াটে, তাই না লতু?

লতুর কেন কে জানে চন্দনকে ইতিমধ্যে বেশ পছন্দ হয়ে গেছে। সে বলল, হ্যাঁ—ওই জন্যে তো মা ওকে খুব বকে। কারো সঙ্গে ভাব থাকে না মাসির! কাল সন্ধেবেলা আমাদের ঘরে সাপ ঢুকল—তার আগে, একটু আগে, গানের কাকু এল—তাকেও...

রুমা লতুকে এক চড় মেরে বসল। লতু অপ্রস্তুত হয়ে থেমে গেল। কেঁদে ফেলত নিশ্চয়—কিন্তু অন্যের ঘর, আধো চেনা একটা লোক, কাঁদতে দ্বিধা হল তার।

চন্দন বলল, আঃ, ওকে মারছ কেন? তুমি বলে যাও লতু। কাল সন্ধেবেলা গানের কাকু এল। তারপর? তোমার মাসির সঙ্গে ঝগড়া হল বুঝি। মারা-মারি হয়নি?

রুমা কি বলতে যাচ্ছিল, পাণ্ডেজী এসে গেলেন।...হা রাম। গিয়ে ফিরতি ঝামেলায় পড়েছিলুম। আর বলবেন না। গোডাউনের চাল কবে ফুটো হয়ে গেছে—জল পড়ে। বাস্, এক স্ট্যাক খন্দ বিলকুল ভিজে গেছে। বোস, বোস, রুমাদিদি। আরে! পরেশবাবুর মেয়ে না? কী নাম তোমার?

লতু ধরাগলায় বলল, শ্রীলতা মজুমদার।

বাঃ, বাঃ। বহুত আচ্ছা নাম—শ্রীলতা মজুমদার। রুমাদিদি, আজ বহত দিন বাদ এসেছ। আমি এখন পেরেসান হয়ে বসল। বহত রোজ বাদ তোমার হাতে চায় খাব আমরা। কী বলেন চন্দনবাবু।...পাণ্ডেজী বিছানায় বসে পড়লেন।

তো শ্রীলতা মজুমদার। এখন তো মজুমদার আছ। লেকিন শ্বশুরবাড়ি যখন যাবে তখন কী হবে—বোলো কী পছন্দ? শ্রীলতা রায় না ভট্টাচারিয়া না চক্রবর্তি।

পাণ্ডেজী খুব হাসতে লাগলেন। লতু ক্রমাগত আঙুল কামড়াতে থাকল। রুমা পাণ্ডেজীর কথার ভঙ্গীতে না হেসে থাকতে পারেনি। কিন্তু ইচ্ছে করেই গম্ভীর হয়ে গেল ফের। বলল, পাণ্ডেজী একটা জরুরী কাজে এসেছিলুম।

পাণ্ডেজী বাধা দিয়ে বললেন, ঝড়বৃষ্টির মধ্যেতে এমন জরুরী কাজ? তো শুনব—আগে চায় পিলাও রুমাদিদি। ঔর দেখছ তো কেমন আঁধার হয়ে গেল এক্ষুনি। কয় বাজে চন্দনবাবু। ঘড়ি দেখুন তো?

চন্দন বলল, ছটা প্রায়।

লতু মিনমিনে স্বরে বলল, বাড়ি চলো মাসি। মা বকবে।

পাণ্ডেজী লতুর কাঁধে হাত রাখলেন। রুমা বলল, আমি এসেছিলুম—আপনি একবার রুস্তম ফকিরকে বলে দেবেন আমাদের ঠাকুরঘরে একটা সাপ ঢুকেছে। ওকে সারাদিন ধরে আমরা গিয়ে খোসামোদ করছি, কানেই নিচ্ছে না। তাই ভাবলুম আপনার কাছে যাই।

পাণ্ডেজী চোখ বড়ো করে শুনছিলেন। তারপর হায় রামজী বলে কুকারের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ঢাকনা তুলে দেখে হাসলেন। জল তলায় বুজকুড়ি কাটছে! পাশের ঢাকা বালতি থেকে এক মগ জল ঢেলে দিয়ে বললেন, সাপ ঢুকেছে? ঠাকুরঘরে।

লতু কথা বলতে যাচ্ছিল, রুমা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, হ্যাঁ—কাল সন্ধ্যেবেলা। এমনি ঝড়ের সময়। হঠাৎ কারেণ্ট গেল, আপনি বলবেন রুস্তমকে?

পাণ্ডেজী একটু ভেবে বললেন, লেকিন এখন তো মুশকিল। আর রাতে সাঁপ রুস্তম তো ধরবে না রুমাদিদি। আমি জরুর বলব ওকে। বিষ্টি থামলেই লোক পাঠাব। লেকিন...

রুমা বলল বেশ—কাল দিনে এলেই চলবে। আপনি একটু বলে দেবেন কেমন? আয় লতু। সামনে আরেকটা রাত টেবিলে বসে জাগা আছে—সবই ভাগ্য। আর।

পাণ্ডেজী হাঁ হাঁ করে উঠলেন।...আরে, আরে। এ বিষ্টিতে যাবে কেমন করে? সবুর। সবুর বিষ্টি থামতে দাও রুমাদিদি। তারপরে সঙ্গে লোক দেব, আলো দেবো। রেখে আসবে তোমাদের। আরে. এখন তো পথে রাস্তায় সাঁপ থাকবে।

রুমা জেদের বশে পা বাড়াল। চন্দন ডাকল, রুমা।

লতু উঠে গিয়ে রুমার পাশে দাঁড়িয়েছিল। সে হাত বাড়িয়ে পরখ করে বিপন্নমুখে এদের দিকে তাকাল। রুমা দরজার দিকে তাকিয়েই জবাব দিল, বলো।

একটু অপেক্ষা করে যাও। ঘরটা তো আমার নয় পাণ্ডেজীর।

পাণ্ডেজীর চোখেমুখে ঝিলিক খেলে গেল। মাথা দোলালেন। চকিতে চতুর পাণ্ডেজী একটা কিছু টের পেয়ে গেছেন এতক্ষণে। হাসতে হাসতে বললেন, রুমাদিদি, চন্দনবাবু ঠিক বলেছেন। ঘর আমার আছে। বোসো, বোসো। আমি আসছি, এক্ষুনি আসছি। এসে যেন চায় খেতে পাই। হ্যাঁ?... পাণ্ডেজীর চতুর চোখে চন্দনের দিকে হেসে রুমার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।... বোসো রুমাদিদি. চায় করো।

চন্দন শশব্যস্তে বলল, আপনি আবার কোথায় যাচ্ছেন?

এক কাম ভুল হয়ে গেছে। এক্ষনি আসছি বলে এলুম ওদের—খন্দের বস্তা সরাচ্ছে ওরা। আসছি।...বলে পাণ্ডেজী বৃষ্টির মধ্যে গামছা মাথায় দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন। সিঁড়িতে অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেল আবার। অদ্ভুত লোক এই পাণ্ডেজী তো।

চন্দন বলল রুমা, পাণ্ডেজী তোমাকে চা করতে বলে গেলেন কিন্তু।

রুমা জবাব দিল, আমি চা করতে জানিনে।

আজ চেষ্টা করতে দোষ কী? এস দেখিয়ে দিচ্ছি। বলে হঠকারিতায় চন্দন লতুর সামনেই রুমার কাঁধ ধরে একটু টানল।

রুমা ঘুরে বলল, সরো—করছি।

কেটলিতে জল ফুটছিল। চায়ের পাতা ফেলে সে কুকারের দিকে ঘুরে বসে রইল। চন্দন তার উজ্জ্বল কাঁধ আর ভিজে চুলগুলো লক্ষ্য করতে থাকল। এই সেই রুমা! স্বপ্ন নয়—অথচ স্বপ্নের মতো অস্পষ্ট আর ধরা ছোঁয়ার বাইরে শুধু স্মৃতি—সুখ দুঃখের ছোট বড় অনেক স্মৃতির একটা রক্তমাংসময় প্রতীক। বাস্তব—অথচ বাস্তব নয়। একটু আগে কাকে ছুঁল চন্দন, তার আঙুলে কার ভিজে দেহের স্পর্শ আর ঘ্রাণ এখনও লেগে রয়েছে। এ রুমা কি সত্যিকার রুমা—যার আড়ালে বাস করছে এক বালিকা যেন দূরের গঙ্গার এক রুপোলী শস্য.. উরুতে স্নিগ্ধ ক্ষতে ভালবাসার জলছবি, দুটি নতুন স্তনের মাঝে পরম নীলভ তিল—জন্মজন্মান্তর ধরে ওকে চিনে রাখার জন্যে এক প্রাকৃতিক ষড়যন্ত্রের দেগে দেওয়া শীলমোহর? আঃ, মানুষের জীবনটা কত সহজে বিষাক্ত করে ফেলা যায়। কত সহজে অন্ধকারে পা বাড়ানো যায় আলো ছেড়ে।

লতু কোণের মোড়াটায় বসে মাসিব চা করা দেখতে লাগল। রুমার কাজে হয়তো নিষ্ঠা ছিল না। কিন্তু অবহেলাও ছিল না। একটা কাপে চা ছেঁকে চিনি দুধ মিশিয়ে সে বিছানায় তুলে দিল। চন্দন বলল, তুমি খাবে না?

আমি খই নে।

তাহলে লতুকে দাও। বেচারা ভিজে রয়েছে।

লতু চা খায় না।

একবার খেলে দোষ নেই—কী বলো লতু?

লতু সাহস পেয়ে বলল, হুঁউ।

রুমা চোখ পাকিয়ে বলল, না।

চন্দন একটু হেসে বলল, পাণ্ডেজী হঠাৎ কেন চলে গেলেন—জানো রুমা?

রুমা মাথাটা দোলাল মাত্র। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে তাকাল।

চন্দন বলল, পাণ্ডেজী হয়তো, একটু ভুল বুঝেছেন।

রুমা ভুরু কুঁচকে বলল, তার মানে?

হ্যাঁ—আমার ধারণা, পাণ্ডেজী কিছু একটা ভেবে নিয়েছেন। তাই—

রুমা তাকাল।

তাই হয়তো সুযোগ দিয়ে গেলেন।

কিসের?

তোমার সঙ্গে নিভৃতে কিছু কথা বলার। অবশ্য লতু—লতু কিছু তো জানে না।

রুমা মুখে গাম্ভীর্য টেনে বলল, আমার বলার কোন কথা নেই। যা ছিল, তা লিখে পাঠিয়েছিলুম। আশাকরি, তুমি তা পেয়েছিলে।

পেয়েছিলুম। কিন্তু আমারও তো কথা থাকতে পারে, রুমা!

লিখে পাঠিও। পড়ে দেখব।

রুমা। তুমি কি নিষ্ঠুর!

সিন ক্রিয়েট করো না সুযোগ পেয়ে।

আমার ভাগ্যের দান রুমা। এ সুযোগ আমার ভাগ্য আমাকে দিয়েছে।

ও সব এমোশনাল কথাবার্তা আমি অনেক শুনেছি। আজকাল সব অসহ্য লাগে।

কিন্তু আজ—এখন, রুমা তুমি আসার পর থেকে মনে মনে এত চেষ্টা করছি, এমোশান আমি আটকাতে পারছি না। না—কিছুতেই পারছি না। তুমি তো ভাল জান রুমা, আমি এত নির্লিপ্ত আর ঠাণ্ডা প্রকৃতির ছিলুম। আজ আমার ইচ্ছে করছে বাইরের ওই ঝড়বৃষ্টির মতো নিজেকে ভেঙেচুরে শেষ করে ফেলি। চন্দন উত্তেজনায় হাঁফাতে থাকল।

রুমা মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। স্তব্ধ।

আমার অনেক পাপ আজ। কিন্তু কেন আমি পাপ ছুঁতে গেলুম? না রুমা এ শুধু আমার চরিত্রের দুর্বলতা নয়। এ ছিল আমার আক্রোশ, প্রচণ্ড প্রতিহিংসা। নিজের ওপর নিজের আক্রোশ আর প্রতিহিংসা। আমি নিজে নিজেকেই তিলেতিলে বিষাক্ত করে ফেলেছিলুম। আর সেই আগুন আমার অজানতে বাইরে ছড়িয়ে গেল। একটা ড্রাইভারের প্রাণ নষ্ট হল।

রুমা ঝাঁঝালো স্বরে বলল, এই কৈফিয়ৎ শুনে আমার কোন লাভ নেই।

রুমা, সেদিন তুমি আমাকে চড় মেরেছিলে। আমি জানি, কেন তুমি আমাকে ক্ষমা করতে পারোনি—এখনও পারছ না। কিন্তু নিজের দিকটাও কি তুমি দেখেছ একবারও?

দেখেছি বলেই ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখেছিলুম।

তোমাকে ক্ষমা হয়তো মনে মনে করতে পারিনি—এখন বলতে আমার বাধা নেই। না—তোমাকে সত্যি ক্ষমা করিনি, রুমা। কেন করব ক্ষমা? যতদিন বেঁচে থাকব, ততদিন যে কিছুতেই ভুলতে পারব না—সেই ছেলেবেলা থেকে আমার নিজের একটা সুন্দর জগত ছিল, সে জগত তুমি রুমা—আমার অনেক যত্নে অনেক সুখে-দুঃখে গড়া। এই জগতে অন্যের দখল আমার সইবে কেমন করে বল তো রুমা? এর অধিকার আমি ছাড়ব না। কোনদিন না। জিয়াগঞ্জ ছেড়ে চলে এসেছিলে তোমরা, অতগুলো বছর কেটে গেল—তবু মনে মনে সে-অধিকার আমি একদিনও ছাড়িনি। মনে মনে জানতুম, সে আছে। তারপর এলুম এখানে। দেখলুম, ফলেফলে ভরে উঠেছে আমার সেই জগতটা—বিশ্বাস করো, এত ভাল লাগল। এত সুখে ভরে উঠল মন। কিন্তু হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলুম—

রুমা হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, তুমি চুপ করো।

না রুমা, চুপ করব না। একদিন তুমি বলেছিলে, কেন আমি জোর করতে পারছি নে—সত্যি পারছিলুম না। কিন্তু আজ আমার সামনে আর কোন অবলম্বন নেই। পুরুলিয়া রুটে গাড়ি চালাতুম—সারাক্ষণ, সারাদিন—সারারাত, মনের আড়ালে উঁকি মেরে দেখে নিতুম তুমি আছো কিনা। দেখতুম হ্যাঁ, আছো। যত দূরেই গেছি—যত কানামাছি খেলেছি, আজ অকপটে বলছি; তোমার বুড়িকে কেন্দ্র করেই খেলেছি। আজ আর কোন খেলা সামনে নেই—কিছু

নেই, আমার চারদিকে শুধু শূন্যতা। এই সাংঘাতিক ভ্যাকুয়ামটা দেখতে দেখতেই আমি এখন মরীয়া হয়েছি, রুমা।

রুমা মুখটা ফিরিয়ে আছে। এবার সে অস্ফুট হাসল—বাঁকা ঠোঁটের হাসি। বলল, হ্যাঁ—সামনে পেয়ে গিয়ে এখন যা আসছে মাথায় বলে যাচ্ছ।

হয়তো তাই, রুমা। ঠিকই বলেছ—সামনে হঠাৎ পেয়ে গেছি। কিন্তু যে বানের জলে জলে ভাসছে, সে হঠাৎ সামনে একটা নির্ভর করার মতো অবলম্বন পেলে কী করে বল তো?

না—আমি কোন নির্ভরযোগ্য অবলম্বন নই কারো।

কিন্তু আজ আমি এবার সত্যি সত্যি জোর করতে চাই, রুমা।

রুমা ঘুরে দাঁড়াল।

লতু হাঁ করে তাকিয়ে দেখছিল। মাসি আর এই লোকটা হঠাৎ কেন ঝগড়া করছে, সে বুঝতে পারছিল না। হঠাৎ তার একদিনের কথা মনে পড়ে গেল। মাসি তো একেই চড় মেরেছিল—জামা খামচে ছিঁড়ে দিয়েছিল। সে উদ্বিগ্ন মুখে কাঁদোকাঁদো স্বরে বলল, মাসি, বাড়ি চলো—মা বকবে।

চন্দন বলল, আজ আর আমি চড় খাবো না রুমা। আজ আমি সম্পূর্ণ তৈরী।

রুমা স্থির দাঁড়িয়ে বলল, কী চাও আমার কাছে?

তোমার নিষ্ঠুরতাকে এখন আমার ভয় নেই। কাজেই ও প্রশ্ন করো না।

রুমা ঠোঁট কামড়ে ধরল। তারপর হঠাৎ লতুর হাত ধরে টান দিল। তারপর বৃষ্টির মধ্যে ঝাঁপ দেবার মতো বেরিয়ে গেল লতুকে নিয়ে। চন্দন একটু ইতস্তত করে তার পিছনেই বেরিয়ে গেল। সে সিঁড়িতে নামতে-নামতে দেখল রুমা গেট পেরিয়ে যাচ্ছে।

রুমা লতুকে নিজের সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছে। সামনে ঝুঁকে হাঁটছে ওরা। বৃষ্টির ঝাপটায় রাস্তার আলোগুলো দুলছে। ঝড় কমে গেছে। বৃষ্টি বেড়েছে। মাঝে মাঝে ডাকছে। চন্দন দৌড়ে গিয়ে ওদের সঙ্গ নিল। রুমা একবার মুখ তুলে দেখল মাত্র। তার সারা শরীরে এখন যা সিক্ততা, তা অন্য এক বৃষ্টিপাতের।

দরজা খোলা ছিল। স্নেহধারা উদ্বিগ্ন মুখে অপেক্ষা করছিল। রুমা আর লতুকে দেখে চেঁচিয়ে কী বলতে গিয়ে থেমে গেল। আগে চন্দন। একলাফে বারান্দায় উঠে বলল, তোমাদের ঘরে নাকি সাপ ঢুকেছে. বউদি? সাপুড়ে খুঁজছ শুনলাম—তাই চলে এলুম। জানো তো, সেবার বর্ষায় কী বিশাল পাহাড়ে চিতি মেরেছিলুম নেহালিয়াবাবুদের বাগানে? আমি ভীষণ সাপ মারতে পারি। ...সে খুব হাসতে লাগল।

স্নেহধারা মুহূর্তে আশ্বস্ত হয়ে বলল, ইস! কী ভিজেছ তোমরা! গ্যাদা এদিকে আয়।

ত্রিশ

মুহূর্তে আশ্বস্ত হয়েছিল স্নেহধারা। চন্দনকে দেখামাত্র চকিতে যথারীতি আগের মতই সে মনে একটা অসম্ভব জোর পেয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ, এই চেহারা সেই জিয়াগঞ্জের চাঁদুর। এমনি বর্ষার সন্ধ্যায় ভিজে গায়ে দৌড়ে বাড়ি ঢুকে

সে চেঁচিয়ে উঠেছে, বউদি, বউদি! সেদিন দুঃখের সংসারে দারিদ্রের ঘর-কন্নায় এই চাঁদু ছিল স্নেহধারার কাছে একটা সুন্দর মুক্তি। ওকে দেখামাত্র, ওর কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে মনে বল পেত সেদিন। খেয়ালী মানুষ পরেশের চেয়ে কত নির্ভরযোগ্য ছিল এই যুবকটি! ওর হাতে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসে ঘর-দোরের চাবি দিয়ে স্নেহধারা যত্রা শুনতে গেছে। সিনেমা গেছে। কত জায়গায় না নিরুদ্বেগ যেতে পেরেছে সে!

'সিরাজদ্দৌলা' নাটক হল একবার। ওতে চন্দন মীরজাফরের পার্ট নিয়েছে সে রাতে। ক্লাইভ সেজেছিল সেজচৌধুরীদের নেমাই। পলাশীযুদ্ধ জিতে মীরজাফরকে বলবে—লুক হেয়ার মিঃ জাফর আলি খান, আর কেহ আপনাকে ক্লাইভের গদ্ধা বলিবে না।' নিমাই করল কী, মুখ ফসকে স্টেজের মধ্যেই বলে বসল, লুক হেয়ার মিঃ জাফর আলি খান, আর কেহ আপনাকে পরেশের গদ্ধা বলিবে না!...পরমুহূর্তে দর্শকরা হেসে তোলপাড়। নিমাইও অপ্রস্তুত। কী বদ অভ্যাস!

স্নেহধারা তখন বুঝতে পারেনি, কেন তারপর হঠাৎ চাঁদু নাটক পন্ড করে অদৃশ্য হয়েছিল। সে পরে বুঝেছিল। পরেশ হেসে খুন তা শুনে।...তোকে সবই পরেশের গাধা বলে নাকি রে চাঁদু? বলুক না—আমিও তো গাধা। আমি কার গাধা জানিস তো? তোর বউদির!

বন্ধুরা চন্দনকে 'পরেশের গাধা' বলে কি কম উত্যক্ত করত? রুমা—রুমাও কম যায় না। সেও কতদিন বলত, এই জামাই-বাবুর গাধা! চন্দন ওকে দু'হাতে শূন্যে তুলে আছাড় দেবার ভয় দেখাত। সেইসব কথা হুড়মুড় করে মনে পড়ে গিয়েছিল স্নেহধারার।

ছোটখাটো পরিবারটা বারান্দার তক্তাপোষে বসে তখন বৃষ্টির রাতে পুরনো দিনের গল্প শুনছে কর্ত্রী ঠাকুরাণীর কাছে। গ্যাঁদা নির্ভয়ে বারান্দার মেঝেয় বসে হাঁ করে চন্দনকে দেখছে। তার লালাভেজা জিভটা গলার ভিতর অদি দেখা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে পোকা উড়ে এলে সে হাত তুলে তাড়াচ্ছে। তার অন্য হাতে কয়েকটা মোমবাতি আর দেশলাই। বলা যায় না, কারেন্ট যে কোন মুহূর্তে চলে যেতে পারে।

...হ্যাঁ. সবাই রাগাতো চাঁদুকে। আমি বলতুম, বেশ তো—তাই। গাধা গাধাই। মুখে বললেই তো সত্যি তুমি তাই হচ্ছ না ভাই।...স্নেহধারা হেসে উঠল।

মায়ের হাসি শুনে ছেলেমেয়েরা খিক-খিক করে হাসতে লাগল। হঠাৎ স্নেহধারা এদিক-ওদিক খুঁজে বলল, রুমা! রুমা কোথায় গেলি?

স্নেহধারার ঘরের ভিতর আলো জ্বলছে। বিছানা ফাঁকা। দরজা আজ একটু আগে খোলা হয়েছে। সারাদিন প্রায় বন্ধই ছিল। স্নেহধারা আবার ডাকল. রুমা!

রুমা পাশের ঘর থেকে জবাব দিল কেন?

স্নেহধারা উঁকি মেরে দেখে বলল. অন্ধকারে কী করছিস? দেখছ কান্ড মেয়ের। চলে আয় এখানে, চলে আয় বলছি।

আমার শীত করছে বাইরে।...রুমার জবাব এল।

করবেই তো? বৃষ্টি থামলে তারপর এলেই পারতিস। চাঁদু সঙ্গে ছিল—

ভয় কিসের? তারপর চন্দনের দিকে তাকিয়ে সে বলল, এইজন্যেই সবাই বলে মজুমদারের শালী নয়, মজুমদারের বোন। হুবহু একই স্বভাব, এক অভ্যেস। লতুর বাবাকে বলতুম, বালিশে তুলো কম হয়েছে—তা প্রতাপপুর হয়ে আসার সময় খানিক তুলো এনো তো। ওখানে অনেক শিমুল গাছ আছে—খুব তুলো হয়। আমার কপাল! লতুর বাবা বহরমপুর নয়তো একেবারে কলকাতা থেকে একগাদা আস্ত বালিশ এনে হাজির। আমি থ। তখন বলত কী জানো? বলত—বারে তুলো আর বালিশ তো প্রায় একই জিনিস। বালিশ ভরতি তুলো রয়েছে না?...সেই কাণ্ড করল আজ ওর শালী। গেল সাপুড়ে আনতে, নিয়ে এল চাঁদুকে। চাঁদু বলে কী না—খুব সাপ মারতে পারি। কবে কোথায় সাপ মেরেছিলুম...স্নেহধারা প্রাণভরে হাসতে লাগল আবার। লতু-সনতু-মানতু-নানতু আর গ্যাঁদাও হাসতে লাগল।

এই হাসির মধ্যে পরিবারটির নিরাপত্তা-বোধও কাজ করছিল। আড়ালের ভয়ংকরটার কথা ভুলে গিয়ে ওরা বৃষ্টিপাতের স্বাদ নিচ্ছিল স্বচ্ছন্দ সুখে।

অবশ্য ওরা রুমার কথা কেউ ভাবছিল না। রুমার মনে এখন কী, জানতে পারাও তো সহজ নয়।

স্নেহধারা আরো কিছু ছোটখাটো গল্প শোনাল জিয়াগঞ্জের বাসার। প্রায় সবই হাসির গল্প। এমনি বৃষ্টি-বাদলার সময় একবার ঘাটে পা পিছলে স্নেহধারা ভেসে যায় আর কী। না—চাঁদ তখন ছিল না কাছ কাছি। ঘাটের নিচে একটা আকন্দ ঝাড় ছিল। ভাগ্যিস হাত বাড়িয়ে সেটা ধরে ফেলেছিল! তবে পরে চাঁদু যখন ব্যাপারটা শুনল, কী বলল জানিস গ্যাঁদা? চাঁদু বলল, ওই দ্যাখো—আজই রাসু সাহা ঘাটে জঙ্গল হচ্ছে বলে ঝাড়টা কাটতে এসেছিল—আমি দিইনি কাটতে। ঘাটটা দিনে দিনে ন্যাড়া হয়ে যাচ্ছে না? আকন্দ ঝাড়, তার নাকি চমৎকার ফুল হয়! শোন কথা চাঁদুর! হ্যাঁ, বৃষ্টিমাসে গঙ্গা ওখানে যা হয়, কী রূপ কী চেহারা, উঃ, তার তুলনা নেই রে। গ্যাঁদা, তোরা তো খাঁটি রাঢ়ের ঘাঁটি—খটখটে মাটিতে থাকিস তোরা। ভাবতে পারিস, দুপায়ে দুটো শহর, রেলস্টেশন, মাঝখানে ভরা গঙ্গা। ট্রেন গেলে জল গুম-গুম করে। হুইসিল দিলে কদ্দুর চলে যায় শিসের শব্দ কাঁপতে-কাঁপতে। আর তার ওপর ইলিশ! আহা হা হা...

স্মৃতির মধ্যে ডুবে গেছে স্নেহধারা। ওকে কেমন অস্পষ্ট আর দূরের মানুষ মনে হচ্ছে। অদ্ভুত মানুষ এই স্নেহধারা! এখন স্মৃতির মধ্যে থেকে ছোট ছোট সুখগুলো কুড়িয়ে সবাইকে দেখাচ্ছে। অথচ এখানে নিরাপদ জীবনে স্থিত হবার পর থেকে সারাক্ষণ পিছনের সেই জীবনকে অভিসম্পাত দিয়েছে। ঘৃণা করেছে। জিয়াগঞ্জের কথা তুললে বিকৃত মুখে বলেছে, ঝাঁটা মারো, ঝাঁটা মারো! স্নেহধারার দোষ নেই। দুঃখ-দারিদ্রসংকুল জীবনের স্মৃতি কে খুঁড়ে দেখতে চায়! ভয় করে। নিজেদের বড় ছোট মনে হয় সংসারে। ও তো পিছনের কলঙ্ক। কে চায় নিজের জামা তুলে পৃষ্ঠক্ষতের চিহ্ন দেখাতে।

স্নেহধারা এখন বলছে, যাই বলো ভাই চাঁদু—তখন আর কিছু না থাক, মনে সুখ-শান্তি ছিল। সবসময় মনে ধুকপুকুনি ছিল না এখনকার মতো। আঃ পয়সাকড়ি না থেকেও স্বস্তি নেই—থেকেও স্বস্তি নেই। আমাদের চেয়ে

হাঘরেরা—ওই যারা পথে পথে গাছতলায় এসে থাকে, আবার চলে যায়—খুব ভালো থাকে।

গ্যাঁদা বলল, এবারও এয়েছিল দিদি। জ্ঞানবাবুদের ওখানে। খুব ঝগড়া-ঝাঁটি হল। ছুরি বের করেছিল একটা হাঘরে। তা'পরে...

লতু বলল, অনেক গাধা এনেছিল ওরা।

মানতু বলল, না দিদি– ঘোড়া, ঘোড়া।

গল্প অন্যদিকে চলে যাচ্ছে দেখে স্নেহধারা ধমকাল।...চুপ কর তো তোরা। আচ্ছা চাঁদু সেই যে নাদু মিত্তির ছিল, খুঁড়িয়ে হাঁটত, রাস্তায় ময়লা দেখলেই চেঁচিয়ে গাল দিত—সে বেঁচে আছে? একবার রুমা করেছে কী—তখন বছর পাঁচের মেয়ে, বুঝলি লতু, রাস্তার ধারে ড্রেনে বসে...হাসিতে ভেঙে পড়ল স্নেহধারা।

লতুরা চেঁচিয়ে উঠল কেরাসে—কী, কী মা? কী করছিল মাসি?

স্নেহধারা বলল, ওকেই শুধো কী করছিল মুখপুড়ী মেয়ে। নাদু মিত্তির কখন আচমকা এসে চুল ধরেছে খামচে! সে কী কান্না মেয়ের! লোক জড়ো হয়ে গেল। লতুর বাবা নেই ঘরে। আমি রুমাকে ছাড়িয়ে এনে যা মার দিলুম। তারপর কখন মেয়ের পাত্তা নেই। সন্ধ্যে হয়ে গেছে, রুমা আর আসে না। রাত হয়, রুমা আর আসে না। লতুর বাবা বলল, চাঁদুদের বাড়ি খুঁজেছ?

লতু চন্দনের দিকে তাকিয়ে বলল, তারপর? পেলে মাসিকে?

স্নেহধারা বলল, পেলুম। তোমার মাসি তখন দিব্যি খেয়েদেয়ে পেটটি মোটা করে চাঁদুবাবুর বিছানায় ঘুমোচ্ছে। চাঁদু দেয়ালে হেলান দিয়ে স্কুলের পড়া করছে। আমি চুপটি করে দাঁড়িয়ে দেখে চলে এলুম।

চন্দন অনুচ্চস্বরে বলল, সেবারই আমার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা। মনে পড়ছে।

স্নেহধারা হাসতে হাসতে বলল, ওই মেয়ে হাগলে জলশৌচ করাবে কে—না চাঁদু! ওকে চান করাবে কে—না, ওই চাঁদু। ওকে ভূতের গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়াবে কে—না, চাঁদু।

বৃষ্টিরাতের বাড়িতে একটা গভীর আবহসঙ্গীত বাজাচ্ছিল স্নেহধারা। সেই সঙ্গীতের সুরে জেগে উঠছিল একটা অতীতকাল—যা এখন অন্ধকার। নিপুণ কথকের মতো স্নেহধারা স্মৃতির রামায়ণ পাঠ করছিল। আবিষ্ট মুখে তাকিয়ে ছিল সবাই।

শুধু একজন—রুমা, রুমা তার ঘরে। তার খবর কেউ জানে না।

হঠাৎ খুব জোরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল স্নেহধারা। গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে রইল বৃষ্টির দিকে কয়েকটা মুহূর্ত। তারপর বলল, আজ সবাই বলছে—চাঁদু মজুমদারের টাকা মেরে বড়লোক হয়েছে। চাঁদু গাড়ি কিনেছে, বাড়ি কিনেছে। কত বদনাম সবাই দিচ্ছে চাঁদুর নামে—সত্যমিথ্যে সাত-পাঁচ যা নয়, তাই রটাচ্ছে। রটাক, বলুক। ওই তো মানুষের অভ্যেস। কারো সুখ সহ্য হয় না—কারো না। প্রথম প্রথম লতুর বাবার নামে কি কম বলেছে সবাই? বলে কী-ই বা করতে পেরেছিল? বাংলোবাড়ির সেই ছেনাল মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে কত কথা বলেছিল। এখনও বলে। বলে, মজুমদার নাকি ওই বেশ্যার জন্যেই নিজের প্রাণ দিয়েছে!...বিকৃত মুখে

স্নেহধারা বলতে লাগল! মুখে সব কুষ্ঠ হবে—খসে যাবে। আজ যারা চাঁদুকে সাত-পাঁচ বলছে, তাদেরও মুখে কুষ্ঠ হবে—খসে যাবে! গলে-গলে পড়বে। হ্যাঁ, তুমি দেখে নিও।

গ্যাঁদা হাই তুলে বলল, খাবে না গো সব? রাত হয়েছে যে।

স্নেহধারা ধমকাল।...থাম ছোঁড়া।...পরক্ষণে হঠাৎ গলা চড়িয়ে দিল। যেন সারা রূপপুরকে শোনাতে চাইল সে। চাঁদু মজুমদারের টাকা মেরেছে, গাড়ি বাড়ি কিনেছে—বেশ করেছে—চাঁদু মজুমদারের কে, তা তোরা জানিস ছোট লোকেরা? সে বেঁচে থাকলে আজ চাঁদ যে আরও কত কিছুর মালিক হত, কত টাকাকড়ি জিনিসপত্র যৌতুক পেত—হিসেব করছিল কেউ?

চন্দন উঠে দাঁড়াল।...বউদি, যে জন্যে এলুম—তা কিন্তু করা হয়নি এখনও। রাত নটা বাজে।

স্নেহধারা তার দিকে ঘুরে বলল, কী?

সাপ!

ওমা! ভুলেই গেছি।...স্নেহধারা হন্তদন্ত উঠল।...সন্তু নান্তু, ঘুমোয় না। কাকু সাপ মারবে দেখবি—ওঠ, ওঠ। গ্যাঁদা টর্চটা কই?

গ্যাঁদা বলল, ওই তো তোমার পাশে।

লতুর ঘুম ঝেড়ে ফেলে উত্তেজিত মুখে সোজা হল। স্নেহধারা বলল, গ্যাঁদা, লাঠিগাছটা কই?

গ্যাঁদা পিঠের ছায়া থেকে একটা ছোট্ট মোটা লাঠি বের করে বলল, এই নিন বাবুদাদা।

স্নেহধারার ঘরে রডলাটই জ্বলছে। চন্দন টর্চ আর লাঠিটা নিয়ে ঘরে ঢুকল। ঠাকুরঘরেও আলো আছে—তবে চল্লিশ ওয়াটের বালব, আলো অনুজ্জ্বল। সতর্কভাবে ঠাকুরঘরে ঢুকল সে। বাইরে দরজার মুখে বারান্দায় সবাই ভিড় করে দেখছে। রুমা পাশের ঘরে রয়েছে। এঘর থেকে ওঘরে যাবার দরজাটা খোলা। পর্দা একপাশে গোটানো রয়েছে। তবু তাকে দেখা যাচ্ছে না—ঘরটায় আলো জ্বলেনি।

চন্দন বলল ঠাকুরের ছবিটি কিন্তু সরাতে হবে বউদি।

স্নেহধারা বলল, সরাও ভাই। উপায় তো নেই। তুমি তো আর বেদে মুসলমান বেজাত নও যে মনে কিন্তু করে বলব।

গ্যাঁদা ফোড়ন দিল!...রুস্তম ফকির এলে ছুঁয়েটুয়ে বারোটা বাজাত।

সবাই হাসতে লাগল। চন্দন সাবধানে টর্চের আলোয় একটা করে ছবি তুলে তাকে রাখতে লাগল। সবগুলো সরানো হল। ধুনচি, গঙ্গাজলের ঘটি, থালা—সব কিছু। কিন্তু কোথাও কোন সাপ নেই।

চন্দন ভালভাবে ছোট্ট ঘরটা পরীক্ষা করে এসে বলল, নাঃ—সাপটাপ নেই। কী দেখতে কী দেখেছে সব।

লতু প্রবল আপত্তি জানিয়ে বলল, না না। আমি দেখেছি, মাসি দেখেছে। মাসি ও মাসি। এসে বলে যাও না!

রুমার জবাব এল না!

চন্দন বলল, তাহলে চলে গেছে কখন। নেই।

স্নেহধারা বলল, যাবে কোন পথে, দরজা তো বন্ধ ছিল। তুমি এ ঘরটাও দেখ ভাই।

এঘরে অনেক আসবাব। খাট আলমারি বাকসো—ঠাসাঠাসি জিনিসপত্র। একটা করে সরাতে থাকল চন্দন। গ্যাঁদাও গিয়ে হাত লাগল। কোথাও সাপটা নেই।

এবার পাশের ঘর—যে ঘরে রুমা আছে। স্নেহধারা কড়স্বরে বলল, রুমা! আলো জেবলে দে। ওঘর দেখবে।

জবাব এল, এঘরে কিছু নেই।

তুই জেনে বসে আছিস, নেই! স্নেহধারা পরক্ষণে হেসে ফেলল।..যত ভয় তো রুমারই। তা জানো চাঁদু? সবসময় পায়ের দিকে চোখ করে ঘুরছে ও। কাল রাত্রে বইরে গিয়ে শুলুম সবই। ও শুলো টেবিলে। আমার তো ঘুম করে গেছে। দেখি রুমা ঢুলতে ঢুলতে চমকে উঠছে।

চন্দন হাসল।...ঘরে সাপ দেখা গেছে—কথাটা শুনতে সহজ, কিন্তু এ যে কী মারাত্মক ব্যাপার, তা তো কেউ জানে না! কেন- সেবার বোসদের বাড়ি কী হয়েছিল?

স্নেহধারা ব্যস্ত হয়ে বলল, তুমি ওঘরটা দেখে দাও চাঁদু।

টর্চের আলো ইচ্ছে করেই বিছানার দিকে ফেলল চন্দন। রুমা চিত হয়ে শুয়ে ছিল। আলো পড়তেই দু'হাতে মুখ ঢেকে আঃ বলে পাশ ফিরল। চন্দন গম্ভীর মুখে সুইচ টিপে বাতি জেবলে দিল। উজ্জ্বল সাদা আলোয় রুমাকে কী অলৌকিক মনে হয় এখন।

গ্যাঁদা বলল, কই বাবুদা, টেবিলটা।

হ্যাঁ। বলে চন্দন টেবিলটা সরিয়ে কোণে টর্চের আলো ফেলল। এঘরে আসবাব কম। খাটের নিচে সাপ নেই। আলনার তলায় নেই। সাপটা ঢোকেনি এঘরে।

চন্দন বলল, কিন্তু একটা ব্যাপার আমার অবাক লাগছে। এত পিছল সিমেন্টের মেঝে। সাপ এর ওপর একটুও এগোতে পারবে না। অসম্ভব। পুরনো চটে যাওয়া খসখসে মেঝে হলে কথা ছিল। তেলেতেলে জিনিসের ওপর সাপ এল কেমন করে? এ কিছুতেই হতে পারে না বউদি। ওরা ভুল দেখেছে।

লতু বলল, কিন্তু আমি যে দেখলুম'

তোমার চোখের ভুল, লতু। চন্দন হাসতে লাগল।

মাসিও যে দেখল!

তোমার মাসিরও চোখের ভুল!

লতু রুমার কাছে গিয়ে বলল, ও মাসি, বলো না এবার।

রুমা বলল, আঃ চেঁচাসনে কানের কাছে।

স্নেহধারা বাঁকা ঠোঁটে বলল, ওর ওই মেজাজই ওকে খাবে। তোমরা দেখে নিও, বলে দিলুম। ভাগ্যিস সঙ্গে করে এনেছিলুম ন্যাকড়ার এইটুকুন্ পিণ্ডিটা —আজ মুখ ফুটেছে। সবাই একদিকে তো, উনি আর একদিকে।

স্নেহধারা চটে উঠেছে, বোঝা যায়। আসলে হয়েছে কী, আজ বৃষ্টিঝরা

রাতের জমজমাট ঐক্যতানে কোথায় যেন একটা যন্ত্র বেসুরো বাজছিল। সেটা রুমা। তাই স্নেহধারার ক্ষোভ।

রুমা বলল, এনেছিলে কেন? রাত্রিদিন এমনি করে খোঁটা দেবে বলে?... পরক্ষণে সে উঠে বসল। সবাই অবাক হয়ে গেল ওর মূর্তি দেখে।...কতদিন... কতকাল এমনি করে খোঁটা খেতে হবে। দিদি? তোমার সংসারে উড়ে এসে জুড়ে বসেছি—এ কথাটা একমুহূর্তও তো ভুলতে দেখিনে কখনও। তাছাড়া আমি তো জানিই—তোমার সংসার তোমার। তাই তো আমি বাইরে-বাইরে থাকি বরাবর। বলো তুমি, থাকি কী না।

তারপর সে উঠে দাঁড়াল। কান্না চাপতে চাপতে দৌড়ে বেরিয়ে গেল বাইরে। বারান্দার থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বৃষ্টির ছাঁট এসে পড়ছিল তার পায়ে।

হঠাৎ এমন একটা অনাছিষ্টি অভাবিত ব্যাপার ঘটবে, কেউ আশা করেনি। সবাই হাঁ করে পরস্পর মুখ তাকাতাকি করছে। চন্দন বেরিয়ে এল। রুমার একটা ব্যাপার এতদিনে তার কাছে ধরা পড়ে গেছে। রুমার এই সংসারের সঙ্গে যেন গভীরে কোন যোগ নেই। রুমা নিজেকে উন্মূল মনে করে। ভেবে দেখলে, রুমার এই বোধের মধ্যে সত্য আছে বইকি! তাকে অনাথ মেয়ে হিসেবে সঙ্গে এনেছিল স্নেহধারা। জামাইবাবু পরেশ মজুমদার যে চোখেই দেখুক, আসলে তো রুমা সামাজিক রীতি অনুসারে একজন আগন্তুক, একজন বহিরাগত। অত ছেলেবেলা থেকে রুমা তাহলে এই বোধটা মনে মনে পালন করে আসছে।

হ্যাঁ, তাই। স্মৃতি খুঁজে দেখলে এই সত্য বেরিয়ে আসে। চন্দনের সঙ্গে সব সম্পর্কের মূলে ভিত্তিটা তো রুমার এই উন্মূলতার বোধটাই। পরেশের স্নেহ যত খাঁটি হোক, রুমার কাছে তা সৌখিনতা বলে গণ্য হতে বাধ্য। রুমা এ বাড়ির বাগানে একটা সখের তরুণ গাছ—এবং সেই গাছটা সামাজিক রীতি অনুসারে অন্যখানে দ্বিতীয়বার রোপিত হয়ে থাকে, এবং মহীরুহ হয়। রুমা কেন, সব মেয়েই—এদিক থেকে ভাবলে বড় গাছের চারার মত একটা সংসারের মাটিতে আর জল রোদে বাতাসে অঙ্কুরিত হয়ে মাথা তোলে—তারপর একদিন তাকে দ্বিতীয়বার অন্য সংসারের মাটিতে পুঁততে হয়। এটাই নিয়ম পৃথিবীতে।

স্নেহধারা ভাবপ্রবণ মেয়ে। ওর আবেগগুলো অদ্ভুতভাবে আসে আর চলে যায় কখন কোনদিকে সে আবেগ তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে—তা অনিশ্চিত। চন্দন তাকে হাড়েহাড়ে চেনে। আজ এখন স্নেহধারা তাকে নিয়ে উৎসাহে আনন্দে মেতে উঠেছে—কালই যদি গোমড়ামুখে ঠাণ্ডা স্বরে উল্টো কথা বলে বসে, অবাক হবার কিছু নেই। পরেশ বলত, লতুর মা বড্ড আনপ্রেডিকটেবল মেয়ে, বুঝলি চাঁদু? ও ঘড়ির পেনডুলাম একটা দিক থেকে আর একটা দিকে শুধু দোলে না—দশদিকে চক্কর খায়। আমাকে হেল্ করে ছাড়লে রে!...

স্নেহধারা ততক্ষণে আরও চটে গেছে। হয়তো চন্দনের সামনে রুমা ওই সব কথা বলে বসেছে বলেই তার রাগ হয়েছে। সে তেতোমুখে বলে উঠল, কী বলল, শুনলে তোমরা? আমি ওকে পর ভাবি—পর করে রেখেছি? আশ্চর্য চাঁদু আশ্চর্য! এমনি করে ও সবার সামনে বলবে, আর লোকে ভাববে—আমি ওকে কী অত্যাচার না করি। ওকে পর করে রাখি! এত নেমকহারাম স্বার্থপর মেয়ে তুই!

রুমা কোন জবাব দিল না। চন্দনের মনে হল, রুমা নামে একটি মেয়ের ওপর পৃথিবীর সবাই মিলে—এমনকি নিজেও যেন, নিরন্তর উৎপীড়ন চালিয়ে আসছে। এত কাঁদতে হয় ওকে—এখনও! সারা ছেলেবেলাও এমনি করে বার-বার কাঁদতে হয়েছে রুমাকে। চন্দন নিজেও কতবার কষ্ট দিয়ে কাঁদিয়েছে বেচারাকে। এটা ঠিক নয়, এটা ঠিক হচ্ছে না। কেন ওর মুখের সবটুকু সুখ আনন্দ আরামের আলোয় উজ্জ্বল থাকবে না, জমে থাকবে কোথাও কোথাও কিছু কালোছায়া! কী পাপ করে পৃথিবীতে আবার জন্ম নিয়েছে সে?

চন্দনের ইচ্ছে হল, পুরনো দিনের মতোই এক্ষুনি রুমাকে দু'হাতে শূন্যে তুলে নিয়ে চলে যায়। চন্দনের ইচ্ছে হল চিৎকার করে বলে, আমি আছি রুমা—আমি আছি! কিন্তু কিছু করা গেল না। একটা আমেজ তাকে মনে মনে কাতর করে রাখল শুধু। চন্দনের দেহমনে অনেক পাপের ময়লা লেগে রয়েছে—আর ওই একটা শুদ্ধ নিষ্পাপ ফুলের মতো মেয়ে, তাকে ছুঁতে বড় দ্বিধা জেগে উঠল এতক্ষণে। যে মরীয়াপনা যে চরম বোঝাপড়ার আবেগ তাকে বৃষ্টির মধ্যে রুমার পিছনে দৌড়ে আসতে বাধ্য করেছিল তাকে, তারা এখন যেন পরস্পর মুখ তাকাতাকি করতে লাগল। সে সাপের কথা তুলে দুই বোনের সংঘর্ষ শান্ত করতে চাইল। বউদি, বর্ষাবাদলার রাতে চ্যাঁচামেচি ভালো নয়। এখন সাপের ব্যাপারটা ভাবা যাক, এস। সাপ আসলে আসেইনি—এই পিছল তেলতেল জায়গায় আসা তার পক্ষে অসম্ভব। অতএব, সাপটা চোখের ভুল।

লতু কী বলতে যাচ্ছিল, গ্যাঁদা বাধা দিয়ে বলল, কিন্তু ধাঁধা যাবে না যে বাবুদাদা!

হ্যাঁ—ধাঁধা!...চন্দন একটু হাসল!...বুঝলে বউদি, সাপটা মনের সাপ।

লতুর হেসে উঠল। কী বুঝল, তারা নিজেরাও জানে না অবশ্য। হাসল না স্নেহধারা। বিকৃত মুখে সে বলে উঠল, ঠিক বলেছ—চমৎকার কথা বলেছ। মনের সাপ! ওর মনে যে সাপের বাসা, সাপ ঢুকে আছে, ও সাপ দেখবে না তো কে দেখবে?

তারপর অকারণে লতুর মাথায় একটা ঠেলা দিয়ে সে বলল, এই হতচ্ছাড়ীটাও এরই মধ্যে চোখে ভুল দেখতে লেগেছে। ওর পাল্লায় পড়ে এও এরই মধ্যে পাকতে লেগেছে। আজ ওবেলা দু-দুবার লোক পাঠালুম—কোথায় যাচ্ছিস ওর সঙ্গে, তা এল বাঁদরমুখী মেয়ে? ওর চোখ ফুটেছে, বাড় বেড়েছে—ও বন-জঙ্গল চষে বেড়াক, যেখানে খুশি যাক, তুই গেলি কেন ওর সঙ্গে? এ্যাঁ? বল, কেন গিয়েছিলি? সারাবেলা যে ভিজলি, অসুখ হলে কী হবে?

লতুর চুল খামচে ধরল স্নেহধারা। লতু ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল। চন্দন বাধা দিয়ে বলল, আঃ, ওকে মারছ কেন? ছাড়ো, ছাড়ো বউদি।

আসলে হয়েছে কি সারা বিকেল ঝড়-জলে বাইরে কাটিয়েছে লতু আর রুমা, নাবালক সন্তুরা বাড়ীতে অসহায় হয়ে মনমরা বসে থেকেছে—সেই জমে-ওঠা রাগটা এতক্ষণে বেরিয়ে পড়েছিল স্নেহধারার। সে ঠাস করে লতুকে একটা চড় মেরে বলল, বল, আর কখনও যাবি? যাবি, বল?

চন্দন দু'হাতে ওকে টেনে তফাতে নিয়ে গেল। রুমা একবার ঘুরে দেখল শুধু।

স্নেহধারা সগর্জনে বলল, সব্বাইকে খারাপ করে ছাড়বে ও! ভেবেছে কী?

সে মাথার ওপর ছিল, যা খুশি করেছে—এড়িয়ে থেকেছি। সংসারে মালিক যখন আছে, সেই দেখুক সব। কিন্তু এখন তো আমি সইতে পারব না। ইচ্ছেমত যা খুশি করবে, তাই বসে বসে দেখব ভেবেছ তোমরা? আমার গায়ে কি মাছের রক্ত?

রুমা শান্ত চাপা স্তরে বলল, কী করেছি দিদি? যা খুশিটা কী, বলবে?

নিজে বুঝে দেখ বোন—কী করেছ না-করেছ। আমি কী বলব?...স্নেহ-ধারা রান্নাঘরের দিকে এগোল।...সন্তু মান্তু, আয়। খেতে দিই। গ্যাঁদা, নান্তুকে ওঠা।

যেতে যেতে আবার ঘুরল স্নেহধারা। চন্দনের কাছে এসে চাপা গলায় বলল, পাঁচজনে পাঁচকথা বলতে লাগল। রূপপুর কি জায়গা—তা তো দেখছ, ভাই। ভেবে দেখলুম যেখানে ওর মন মিলেছে সেখানেই হয়ে যাক কাজটা। বাব-মা নেই, মাথার ওপর কেউ পুরুষমানুষ নেই—একদিন না একদিন দিতেই হবে কোথাও।—তাই সব ঠিকঠাক করে ফেললুম। দিনক্ষণ সব ঠিকঠাক হয়ে গেল! এদিকে কলেজেও যাওয়া ছেড়েছে। যা সেকেলে গোঁড়া ফ্যামিলি ওরা —নিজে হেডমাস্টার হলে কি হবে, হাড়ে হাড়ে অন্যরকম। নইলে আজকালকার দিনে কারো বাড়ির গিন্নী মাথায় এক হাত ঘোমটা দিয়ে বেরোয়? আমার মন ছিল না ভাই—সত্যি বলছি। যখন বললে না-না—তা কি করে হয়! আমার বাড়ীর বউ সবার ভিড়ে দু'বেলা বাসে চেপে কান্দী কলেজ করতে যাবে? শুনে আমার তো খুব খারাপ লাগল। লতুর বাবা বলেছিল, এম-এ পড়াবে?—কলকাতায় হোস্টেলে রাখবে!...হ্যাঁ, যাচ্ছি। গ্যাঁদা, নিয়ে চল এদের। তা শেষ অব্দি ভেবে দেখলাম, মেয়ের ইচ্ছে যখন, তখন তাই হোক। আর ছেলের কথা আর বলো না—কথায় বলে 'গেনেগুনে কেত্তনে এই উচ্ছন্নে'—একেবারে বাউণ্ডুলে! হ্যাঁ, যা বলছিলুম। সামনে মাসের একুশে তারিখে বিয়ের দিন। এদিকে পাত্রীর মূর্তি অন্যরকম! যেন সব কিছু আমার করা, ও কিছু জানে না! হ্যাঁ গো, তাই বলল সোজাসুজি। আমি তো শুনে থ। তার ওপর কাল বিকেলের কাণ্ড শোন। ঝড়জলে ছেলেটা ভিজতে ভিজতে এসে বাড়ী ঢুকেছে...তাকে সেই মুখেই তাড়িয়ে দিয়েছে। আমি বলি কি, এমনি করলে কে তোকে উদ্ধার করবে বোন? কেউ তো মুখে...

অশ্লীল বাক্যটা আর উচ্চারণ না করে স্নেহধারা চলে গেল রান্নাঘরের দিকে।

চন্দন ডাকল, রুমা!

কী?

তোমাদের ঘরে সাপ নেই বলেছিলুম—কথাটা উইথড্র করছি।

রুমা কোন জবাব দিল না।

কিন্তু এ সাপ তো চন্দন বের করে ধরতে পারবে না রুমা। রুস্তম ফকিরও নয়। চন্দন একটু হাসল। এ সাপ তোমাদের বাস্তুসাপ।

রুমা একটু চুপ করে থেকে বলল, তুমি জিয়াগঞ্জ কবে যাবে?

একটু হাওয়া এল জোরে। বৃষ্টি ছড়িয়ে এল বারান্দায় অনেক দূর। চন্দন বলল, কী বললে রুমা?

বলছি, কবে জিয়াগঞ্জ যাবে?

চন্দন এক পা বাড়িয়ে বলল, কেন রুমা?

এমনি বলছি। তোমার গাড়িটা তো পুড়ে গেছে। রূপপুরের ড্রাইভাররাও তোমাকে নাকি মারবে শুনেছিলাম। জিয়াগঞ্জ পালানো ছাড়া তোমার তো উপায় নেই।

চন্দন শুকনো হাসল। হ্যাঁ, তা তো নেই। কিন্তু ধরো, আমি যদি গায়ের জোরে থেকে যাই? তোমার বুঝি খুব ক্ষতি হবে?

হবে বইকি।

তোমার ক্ষতি করতেই তো বৃষ্টির মধ্যে তোমার পিছনে-পিছনে ছুটে এসেছি!

তাহলে জিয়াগঞ্জ ফিরে যাবে না তুমি?

ইচ্ছে করছে না।

রুমা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত। রুমার চুলে বৃষ্টির ফোঁটা, কপালে, নাকের ডগায় বৃষ্টির ফোঁটা। কিন্তু চোখের নিচে গালের ওপরও কি তাই? সে পা বাড়াল হঠাৎ। শোন, তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে। বলে সে ঘরে ঢুকে গেল।

কিন্তু চন্দন ঘরে ঢুকতেই রুমা সুইচ টিপে ঘরটা অন্ধকার করে দিল তক্ষুনি। তারপর আচমকা একটা গোড়াকাটা গাছের মতো সশব্দে চন্দনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। হু হু করে কেঁদে উঠল।...তোমার পায়ে পড়ি চাঁদুদা, আমাকে জিয়াগঞ্জ নিয়ে চলো। এখানে থাকলে আমি বাঁচব না—আমি মরে যাব, চাঁদুদা!

অন্ধকার ঘরে তখন পুরনো সময়ের এক বহতা গঙ্গা তার কালো জলের স্রোত এনে ফেলেছে। চন্দন দু'হাতে তুলে ধরেছে সেই বহতা জলের অলৌকিক শস্য—রুপোলী শরীর যে বালিকার, উরুতে স্নিগ্ধ ক্ষতের জলছবি আর দুটি নতুন স্তনের মাঝে পরম নীলাভ তিল! এই শস্যে পৃথিবীর একজনেরই অধিকার।

কখন রান্নাঘর থেকে স্নেহধারা এসে দাঁড়িয়েছিল নিঃশব্দে। একটু পরে গলা ঝেড়ে সে বলল, কী হয়েছে চাঁদু?

চন্দন অন্ধকার থেকে জবাব দিল, রুমা আমার সঙ্গে জিয়াগঞ্জ যাবে বলছে।

একটু চুপ করে থেকে স্নেহধারা বলল, তাই যাক। মনটা ভালো হবে, যাক।

রুমা অন্ধকার থেকে ভাঙা গলায় বলল, যাবো না তো তোমার সংসারে সবাইকে জ্বালাতে পুড়ে থাকব নাকি? আমার কোথাও যাবার জায়গা নেই?

স্নেহধারা এবার রাগ করল না। চোখ মুছে বলল, কেউ কাকেও বোঝে না—সবাই সবাইকে শত্রুর ভাবে। আমার দিকটা তো কেউ দেখল না।

চন্দন বলল, তুমি ওকে নিয়ে যেতে অনুমতি দিচ্ছ তো বউদি?

স্নেহধারা জবাব দিল, এতটুকুন থেকে হাতে গড়ে মানুষ করেছিলে—আজ না হয় বড় হয়েছে!—ও তোমার সেদিনকার ছায়া, ভাই। তোমাকে না বলতে পারি?

বাইরে তখনও বৃষ্টি পড়ছে। খুব তাড়াতাড়ি বর্ষা এসে গেল এবার। এবং অনেক অনেক দূরে জেলার মফঃস্বরে একটা ছোট্ট শহরের ধারে বহতা নদীটা এখন অন্ধকারে ফুলে উঠছে—দুলে উঠছে, এ বাড়ীর অন্তত তিনটি মানুষ তা জানতে পারছিল।